মণি-মুক্তা
৪

Peace tv

ডা. জাকির নায়েক
উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর

ডেয়ার টু আস্ক

ডা. জাকির নায়েক উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর
ডেয়ার টু আস্‌ক
৪

ডা. জাকির নায়েক

সংকলক ও সম্পাদনা

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক ঃ কারেন্ট নিউজ

ও

ডাঃ আব্দুল্লাহ সাঈদ খান

ঢাকা মেডিকেল কলেজ
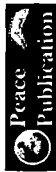
পিস পাবলিকেশন-ঢাকা

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর
OPEN QUESTION & ANSWER
ডেয়ার টু আস্‌ক
ডা. জাকির নায়েক

প্রকাশক
মোঃ রফিকুল ইসলাম
সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

প্রকাশনায়
পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট
ফোন ০১৭১৫৭৬৮২০৯

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
মাহফুজ কম্পিউটার

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা মাত্র।
ISBN 978-984-8885-02-4

OPEN QUESTION & ANSWER : Dr. Zakir Naik, Editors By Md. Rafiqul Islam & Abdullah Saeed Khan, Published By Peace Publication, Dhaka.

Price : Tk. 350.00 Only.

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ

তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে

জেনে নাও। – সূরা নাহল ঃ ৪৩, সূরা আম্বিয়া ৭

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রকাশকের কথা

অনেকদিন থেকে মনের গভীরে দুটো ইচ্ছে পোষণ করে আসছিলাম; কিন্তু তা পূরণ করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। একটি ইচ্ছে ছিল কলকাতার ২০০৮ বইমেলায় যাওয়া, আর দ্বিতীয় ইচ্ছে ছিল মুম্বাই গিয়ে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাৎ করা। আল্লাহর মেহেরবাণীতে অবশেষে কলকাতা যাওয়ার একটা সুযোগ হলো; কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি এ যাত্রায় পূরণ করা গেল না।

অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমতে ০৩-১২-২০০৮ তারিখে হজ্ব পালন অবস্থায় কাবা ঘরের চত্বরে জমজম টাওয়ারে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি পূরণ হয়। আলহামদুলিল্লাহ

কলকাতা বইমেলা– ২০০৮-এ আসতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে হলো। মনে হলো আরো আগেই মেলায় আসা উচিত ছিল। অনেক তারকাসমৃদ্ধ বইয়ের মাঝে ডা. জাকির নায়েকের বেশ ক'টি বইও দেখলাম জ্বলজ্বল করছে। তবে সব বই-ই ইংরেজি ভাষায়। ভাবলাম জাকির নায়েকের সাথে তো আর এ যাত্রায় দেখা করা সম্ভব হলো না। তাঁর কিছু বই বাংলাদেশে নিয়ে যাই এবং সেগুলো বাংলায় ভাষান্তর করে আমাদের দেশের পাঠকদের হাতে পৌছিয়ে দেই। তাঁর সম্পর্কে, তাঁর মেধা ও যোগ্যতা এবং দ্বীনী দাওয়াতের কৌশল সম্পর্কে আমার দেশের জনগণকে অবহিত করতে পারলে এবং এতে করে যদি কিছুলোকও দ্বীনের পথে এগিয়ে আসে, তাহলে এটাই আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যেতে পারে। ইনশাআল্লাহ।

বাংলা ভাষায় ডা. জাকির নায়েকের দু'চারটা বই বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়েছে। আমাদের পিস পাবলিকেশন হতেও বিষয়ভিত্তিক ৩০ খানা বই বাজারে রয়েছে। তবে ব্যাপক পাঠক চাহিদার জন্য ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র নামক ১, ২, ৩ ও ৪ খণ্ড পুস্তক ইতোমধ্যেই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। এতে ডা. জাকির নায়েক কর্তৃক রচিত অধিকাংশ বইয়ের সমাহার ঘটেছে। আশা করি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর পাঠক মহলের অন্তরের নানা প্রশ্ন ও তার সমাধান পাবে। পরিশেষে ডা. জাকির নায়েকের বইগুলোর ব্যাপক প্রচার আবশ্যক কামনা করি।

তারপর যে কথাটি না বললেই নয়, পিস পাবলিকেশন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনো নবীন। মানুষ ভুল-ক্রটির উর্ধ্বে নয়। তদুপরি বিভিন্ন সংকট-সমস্যার কারণে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ আমরা এটাকে স্বাগত জানাব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেবো। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে দ্বীনী দাওয়াতের কাজের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি কামনা করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে নাজাতের আশা রেখে শেষ করছি। আমিন।

নভেম্বর, ২০০৯ — প্রকাশক

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক-এর জীবনী

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক ১৯৬৫ সালের ১৫ অক্টোবর ভারতের মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে পেশায় একজন ডাক্তার হলেও ১৯৯১ সাল থেকে তিনি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করার ফলে চিকিৎসা পেশা থেকে অব্যাহতি নেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে বৈজ্ঞানিক, গঠনমূলক যুক্তি ও অন্যান্য প্রমাণাদির মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হন। এ সময়ে ইসলামের দাওয়াতের পাশাপাশি অমুসলিম ও অসচেতন মুসলিম বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্য থেকে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস দূরীকরণার্থে ভারতের মুম্বাইয়ে তিনি 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' (আই.আর.এফ) নামক একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপরে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তথ্যাবলি ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে রয়েছে। পরবর্তীতে তাঁরই উদ্যোগে আই.আর.এফ 'এডুকেশনাল ট্রাস্ট' ও 'ইসলামিক ডিমেনসন' নামক দুটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। এজন্য আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক (বিশেষত তাদের নিজস্ব টিভি নেটওয়ার্ক 'Peace TV', ইন্টারনেট এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের কাছে এটি ইসলামের প্রকৃত রূপকে উপস্থাপনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গৌরবান্বিত আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের পাশাপাশি মানবীয় কারণ, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সাপেক্ষে এটি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের বোধগম্যতা ও ইসলামের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করে।

ডা. জাকির মূলত ইসলামের দাঈ'র অনন্য দৃষ্টান্ত। 'ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন' গঠন ও তার পরিচালনার কঠিন সংগ্রামের পেছনে তিনিই প্রধান তদারককারী। আধুনিক ভাবধারার এই পণ্ডিতের ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের বিশ্লেষণে বিশ্ববিখ্যাত সুবক্তা ও বিশিষ্ট লেখক হিসেবেও জুড়ি নেই। তাঁর বক্তব্যের পক্ষে ব্যাপকভাবে অক্ষরে অক্ষরে গৌরবান্বিত আল-কুরআন, সহীহ্ হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে তথ্য ও প্রমাণপঞ্জি পৃষ্ঠা নম্বর, খণ্ড ইত্যাদিসহ উল্লেখ করার কারণে যে কেউ তাঁর বক্তব্য বা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করুক বা তাঁর এ পর্ব শ্রবণ করুক না কেন, সে বিস্মিত ও অভিভূত না হয়ে পারে না। জনসমক্ষে আলোচনার সুতীক্ষ্ণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রদানের জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ।

অন্যান্য ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনা (বিতর্ক) ও সংলাপের সময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় আল্লাহর রহমতে তিনি সফলতার সাথে বিজয়ী হয়েছেন। ২০০০ সালের ১ এপ্রিল আমেরিকার শিকাগো শহরের আই.সি.এন.এ.ই কনফারেন্সে

'বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন' বিষয়ে এক আমেরিকান চিকিৎসক ও খ্রিস্টানধর্ম প্রচারক ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল-এর সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল হচ্ছেন সেই লেখক যিনি তিন বছর ধরে গবেষণা করার পর 'ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন ও বাইবেল' (১৯৯২ সালে ১ম সংস্করণ এবং ২০০০ সালে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়) নামক দুটি গ্রন্থ লিখতে সমর্থ হন, যে বইটিকে তিনি ১৯৭৬ সালে ডা. মরিস বুকাইলির লেখা 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' নামক বইটির উত্থাপিত অভিযোগগুলোর খণ্ডনকারী হিসেবে ধারণা করেন। শেখ আহ্মাদ দীদাত ১৯৯৪ সালে ডা. জাকির নায়েককে ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্ম বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত বক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং ২০০০ সালের মে মাসে দাওয়াহ্ ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপর গবেষণার জন্য 'হে তরুণ! তুমি যা চার বছরে করেছ, তা করতে আমার চল্লিশ বছর ব্যয় হয়েছে'– 'আলহামদুলিল্লাহ' খোদাই করা একটি স্মারক প্রদান করেন।

জনসমক্ষে আলোচনার জন্য ডা. জাকির পোপ বেনেডিক্টকে চ্যালেঞ্জ করেন, যা সারা বিশ্ব অবলোকন করেছে। বেনেডিক্ট নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক ও বিতর্কিত মন্তব্য করায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ক্ষোভ স্ফুলিঙ্গের মতো দাউদাউ করে জ্বলছিল। তাই মুসলিমদের এ উদ্বেগ নিবারণ করতে পোপ বিশটি ইসলামিক দেশ থেকে কূটনীতিকদেরকে রোমের দক্ষিণে তার গ্রীষ্মকালীন বাসভবনে আলোচনার জন্য আহ্বান জানায়। কিন্তু ডা. জাকির তাকে একটি প্রকাশ্য সংলাপের জন্য আহ্বান করে বলেন যে, 'ইসলাম সম্পর্কে তার এই বিতর্কিত মন্তব্যের ফলে মুসলিম বিশ্বব্যাপী যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা শান্ত করতে এটি যৎসামান্য প্রচেষ্টা মাত্র। মূলত ইসলাম সম্পর্কে পোপের এ মন্তব্য পূর্বপরিকল্পিত। পোপ জার্মানির রিজেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বলেছিলেন সে ব্যাপারে তিনি নিজেই ভালোভাবে অবগত।

তাই মুসলিমদের প্রতি পোপের এ দুঃখ প্রকাশ করাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়ারই নামান্তর। পোপের উচিত ছিল গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি তার মন্তব্য তুলে নেয়া। দেখে মনে হয়, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পদাঙ্কই পোপ বেনেডিক্ট অনুসরণ করে চলছেন। ডা. জাকির আরো বলেন, 'পোপ যদি সত্যিই সঠিক সংলাপের মধ্যদিয়ে এ উত্তেজনা শান্ত করতে প্রয়াসী হন, তাহলে তার উচিত হবে জনসমক্ষে একটি প্রকাশ্য বিতর্ক অনুষ্ঠান করা। বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক টিভি নেটওয়ার্কের ক্যামেরার সামনে পোপ বেনেডিক্ট-এর সঙ্গে আমি জনসমক্ষে প্রকাশ্য সংলাপ বা বিতর্কে অংশ নিতে দৃঢ়ভাবে ইচ্ছুক। এর ফলে সারা বিশ্বের ১শ কোটি ৩০ লাখ মুসলমান ও ২শ কোটি খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সেই বিতর্ক অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে পারবে।

পোপের ইচ্ছেমতোই কুরআন ও বাইবেল-এর যেকোনো বিষয়ের ওপর সংলাপে বা বিতর্কে আমি রাজি। তাছাড়া এটা কেবল বিতর্ক অনুষ্ঠানই হবে না; বরং এখানে উপস্থিত ও

অনুপস্থিত দর্শক-শ্রোতার জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকতে হবে। আর এটা পোপের ইচ্ছেমতো কোনো রুদ্ধদ্বার বৈঠক হবে না, যেমনটা তার পূর্বসূরি দ্বিতীয় পোপ জন পল দক্ষিণ আফ্রিকান ইসলামি পণ্ডিত আহমেদ দীদাতের খোলামেলা সংলাপের আহ্বানে চেয়েছিলেন। শেখ দীদাতকে পোপ জন পল তার নিজের কক্ষে এসে বিতর্ক করতে বলেছিলেন।

একটি আন্তঃবিশ্বাসগত সংলাপ কেন রুদ্ধদ্বারের মধ্যে সংঘটিত হবে? উপরন্তু আমার জন্য যদি একটি ইটালিয়ান ভিসা সংগ্রহ করা হয় তাহলে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে পোপের সাথে বিতর্ক করতে আমি রোম বা ভ্যাটিক্যানে নিজের খরচায়ও যেতে পারি। তবে একথা সবার মনে রাখতে হবে যে, 'মুসলমানদের নিজস্ব মিডিয়াই হচ্ছে ইসলামের ওপরে আক্রমণের জবাবে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানার উৎকৃষ্ট উপায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক মিডিয়া পশ্চিমা সমর্থনপুষ্ট। সুতরাং আমাদের যদি নিজস্ব মিডিয়া না থাকে তাহলে পশ্চিমারা সাদাকে কালো করে ফেলবে, দিনকে রাত করে ফেলবে, নায়ককে সন্ত্রাসী বানাবে আর সন্ত্রাসীকে বানাবে নায়ক।'

রিয়াদে অবস্থিত শ্রীলংকার দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত বহুসংখ্যক রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক ও শ্রীলংকার জনগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত 'ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সম্পর্কিত ২০টি সাধারণ প্রশ্ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় ডা. জাকির তাঁর বক্তব্যের শেষে এক ইন্টারনেট সাক্ষাৎকারে এ কথাগুলো বলেন।

ষোড়শ পোপ বেনেডিক্ট যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর কোনো বিশ্বাস না রাখেন, তাহলে তার কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়; বরং জনসমক্ষে একটা বড় আকারের খোলামেলা বিতর্কের মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা উচিত। কিন্তু পোপের যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর আত্মবিশ্বাস না থাকে অথবা তিনি যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলকে ততটুকু পরিমাণে বিশ্বাস না করেন যাতে বড় রকমের কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়; তাহলে মুসলমানদের অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না এই পোপ বেনেডিক্ট তার জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে অথবা পদত্যাগ করার মাধ্যমে পরবর্তী পোপকে এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার নিশ্চয়তা দেন। অবশেষে যদি এ বিতর্ক পরিচালিত হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা ইসলাম সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের মানুষের ভুল ধারণা দূর করতে সক্ষম হব এবং সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে ইসলামের সত্যতা ও খ্রিস্টান ধর্মের মিথ্যাচারিতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মুসলমানদের সাথে সংলাপ করার জন্য পোপ বেনেডিক্ট অবশ্য প্রথমাবস্থায় তার আন্তরিক ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু ডা. জাকিরের আহ্বানের পর থেকে এমন ভঙ্গিমা দেখাচ্ছেন যে, মনে হয় মুসলমানদের সাথে সংলাপের জন্য তিনি কখনো আহ্বানই জানান নি অথবা এ ধরনের কোনো কিছু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিশ্বের অনেক মুসলমান পোপ বেনেডিক্ট-এর সাথে ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে পশ্চিমা মিডিয়া যেমন

বিভিন্ন জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলে, পত্র-পত্রিকার অফিসে ই-মেইল করেছে; কিন্তু তারাও পোপের ভান করছে। তাই সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আজ একটাই প্রশ্ন, ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জে সমগ্র পশ্চিমা মিডিয়া বিশেষ করে পোপ নিজেই কেন এখন নিশ্চুপ?

ডা. জাকির সাধারণত লিখিত কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না; বরং সর্বদা জনসমক্ষে বিতর্ক করেন। কারণ, এটা সবার জানা কথা যে, লিখিতভাবে কোনো বিতর্ক করলে তা কখনো শেষ হবার নয়; কিন্তু প্রকাশ্যে বিতর্ক করলে তা কার্যকরীভাবে একটা ফলাফল বয়ে আনে।

যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস বিমানবন্দরের একটি ঘটনায় তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেয়া যাক :

১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অনেক বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অধিকাংশ মুসলিম বিভিন্ন প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর দিতে না পারার জন্য অযথা হয়রানির শিকার হন। কিন্তু ইসলাম ও মানবতার প্রতি অবদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইন্টারনেট ইউনিভার্সিটি' কর্তৃক দেয়া পুরস্কার গ্রহণ করতে ১২ অক্টোবর ডা. জাকির নায়েক যখন লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তখন তাঁর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে কি-না তা জানতে ইমিগ্রেশন অফিসারের আচরণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমার জন্য সেখানে কোনো সমস্যা ছিল না এবং তাদের সবার ব্যবহার ছিল মনোমুগ্ধকর।' কয়েকটি সৌদী সংবাদপত্র ডা. জাকির নায়েকের এ সাক্ষাৎকার নেয়ার পরবর্তী অনুসন্ধানে জানতে পারে যে, লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণের পর ডা. জাকিরও তার দাড়ি এবং মাথার টুপির জন্য কাস্টম অফিসারদের দৃষ্টির আড়াল হতে পারেন নি। তাই সাথে সাথে তাঁকেও প্রশ্ন করার জন্য অনুসন্ধান করা শুরু করে।

যেমন : ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চেয়ে 'জিহাদ' শব্দটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন ডা. জাকির নায়েক বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, কুরআন, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ভগবত গীতাসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, জিহাদ শুধু ইসলামিক নয়; বরং বৈশ্বিক একটি বিষয়। এ কথা শুনে কাস্টম অফিসাররা উৎসাহী হয়ে আরো প্রশ্ন করেন। কিন্তু ওদিকে ডা. জাকির তাঁর মেধা, জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা উত্তর দেয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। ইতোমধ্যে এক ঘণ্টা সময় পার হয়ে যায়। অন্যদিকে যেহেতু প্রশ্ন করার কারণে দীর্ঘ লাইনে লোকজন অপেক্ষা করছিল তাই ডা. জাকিরকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয়। যখন তিনি উঠে দাঁড়ান ও কক্ষটি ত্যাগ করেন তখন প্রায় ৭০ জন কাস্টম অফিসার তাদের নিজেদের ধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে জানতে তাঁর পিছে পিছে যাচ্ছিল। পরবর্তীতে কাস্টম অফিসারগণ বলেন যে, তারা বিস্মিত হয়েছেন এবং তারা জীবনে কখনো এতো জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দেখেন নি।

আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সাউথ আফ্রিকা, মৌরিতানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, ঘানা (দক্ষিণ আফ্রিকা) সহ আরো অনেক দেশে এ পর্যন্ত নয়শোরও বেশি বার জনসম্মুখে প্রকাশ্য আলোচনায় বিভিন্ন ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের ওপর তুলনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। উপরন্তু ভারতেও তিনি অসংখ্য বার বক্তব্য প্রদান করেছেন। যার অধিকাংশ অডিও এবং ভিডিও আকারে এবং ইদানিং বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়। বিশ্বের একশোরও বেশি দেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টিভি ও স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে ডা. জাকিরকে প্রতিনিয়ত দেখা যায়। তিনি প্রায় প্রতিনিয়তই সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রিত হন।

ভারতের মিডিয়া ছাড়াও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় রয়েছে তাঁর প্রভাব। ভারতীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ইনকিলাব, দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট, দ্য ডেইলি মিডডে, দ্য এশিয়ান এইজ ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকা তাঁর অনেক বক্তব্য প্রকাশ করেছে। বাহরাইন ট্রিবিউন, রিয়াদ ডেইলি, গালফ টাইমস, কুয়েত টাইমসসহ আরো অন্যান্য সংবাদপত্রে ইংরেজি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি সাধারণত ইংরেজিতে বক্তব্য দেন। তাঁর দর্শক-শ্রোতার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেশের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত, আর্মি জেনারেল, রাজনৈতিক নেতা, নামকরা খেলোয়াড়, ধর্মীয় পণ্ডিত, শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষ। তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব নেটওয়ার্ক 'Peace TV'-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়। তাঁর বক্তব্যগুলোতে খুবই সাধারণ ভূমিকা রয়েছে এবং একজন আন্তর্জাতিক বক্তা হিসেবে তিনি তাঁর প্রায় সব বক্তব্যে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বাণীগুলো বিজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেন। ফলে দর্শক ও শ্রোতারা সহজেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পূর্ণভাবে মুখস্থ করার মতো অসাধারণ গুণটি তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষণীয় একটি বিষয়। মনে হয় কুরআন, বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ম্যানুসম্যারিটি, ভগবতগীতা ও বেদসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে তাঁর মুখস্থ রয়েছে। তাছাড়াও বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক বিষয় এবং তত্ত্বেও রয়েছে তাঁর পূর্ণ দখলদারিত্ব। কেননা তিনি কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করলে তার পৃষ্ঠা, অধ্যায় ও খণ্ডসহ উল্লেখ করেন।

ডা. জাকির নায়েকের

সমসাময়িক ৩২৮টি প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ ১। আল্লাহ তায়ালাকে কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর ঃ এ প্রশ্নটির উত্তর দেয়া যায় আরেকটি প্রশ্নের মাধ্যমে। মনে করুন আমার বন্ধু 'জন' সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। সে একটি বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, বাচ্চাটি কি ছেলে না মেয়ে? এ প্রশ্নটির উত্তর দেয়া কি সম্ভব?

আসলে প্রকৃত ব্যাপার হল 'জন' একজন পুরুষ। সুতরাং তার পক্ষে যেখানে বাচ্চা জন্ম দেয়ারই প্রশ্ন উঠেনা সেখানে সে বাচ্চাটি কি ছেলে না মেয়ে এ প্রশ্ন অবান্তর। ঠিক একইভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার ক্ষেত্রে এ প্রশ্নটি অবাস্তব যে তাকে কে সৃষ্টি করেছে? কেননা আল্লাহ তা'আলার সংজ্ঞা তথা সত্যিকারের ঈশ্বরের সংজ্ঞা হল তিনি সৃষ্টি হননি। তিনি কারও সন্তান নন অর্থাৎ তিনি জন্মান নি। সুতরাং যদি এ ধরনের কোন ঈশ্বরের ধারণা পাওয়া যায়, যিনি বানানো ঈশ্বর তথা যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাহলে তিনি সত্যিকারের ঈশ্বর নন। অন্য কথায় যে ঈশ্বরের সৃষ্টা আছে সে সত্যিকারের ঈশ্বর নয়। কারণ, সত্যিকারের ঈশ্বর কেবল তিনিই যার শুরুও নেই শেষও নেই অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি হননি এবং যার ধ্বংস নেই। এ কারণেই আমরা কালেমা শাহাদাতে বলি, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই।' তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পরিচয় হল তিনি সৃষ্টি হননি বরং তিনি একক। তিনিই একমাত্র সত্ত্বা যাকে সৃষ্টি করা হয়নি। অন্য সব কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর সৃষ্ট। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা সৃষ্ট নন বরং সবকিছু তাঁরই সৃষ্টি।

প্রশ্ন ঃ ২। আমি পবিত্র কোরআনে পড়েছি যে, আল্লাহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। এ কথা শুনে একজন ব্যক্তি আমাকে বলল যে, যেহেতু আল্লাহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন সেহেতু আমি যে পাপ করি সেটাও আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং একজন ব্যক্তি মুসলিম হবে কি অমুসলিম হবে সেটাও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? আমি এখানে তাকদীর তথা অদৃষ্ট সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছি।

উত্তর ঃ আপনি কোরআনের যে কথাটি বললেন প্রকৃতপক্ষে সেটা অদৃষ্ট সম্বন্ধে নয়। আর এখানে শব্দটা নিয়ন্ত্রণ হবে না; বরং হবে সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান এবং এ দুটো ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। যাই হোক, এখন অদৃষ্ট সম্পর্কে আসা যাক অনেকের মধ্যেই অদৃষ্ট বা তাকদীর সম্পর্কে ধারণা হল যে, আল্লাহই সবকিছু নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে, কোন চোর যদি চুরি করে এর জন্য দায়ী কে হবে? নিশ্চয়ই তিনি যিনি চুরি করাটা তার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। যদি কারও তাকদীরে লিখা থাকে যে সে মানুষ হত্যা করবে তাহলে

সেই হত্যার জন্য ঐ ব্যক্তি দায়ী হতে পারে না, বরং দায়ী হবে অদৃষ্টের লেখক অর্থাৎ আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ)। এমন কি, কারও অমুসলিম হওয়াটা যদি তার ভাগ্যে লেখাই থাকে তাহলে সে দোযখে যাবে কেন?

প্রকৃতপক্ষে এখানে যে সমস্যাটা হচ্ছে তা হল কদরের অর্থ বুঝতে ভুল করা। আমাদের অদৃষ্টে বিশ্বাস করতে হবে, এটা নিয়ম। কিন্তু সাথে আমাদের এটা জেনে নিতে হবে যে অদৃষ্ট বলতে কি বুঝায়? এটাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝানো যেতে পারে।

ধরুন, একটা ক্লাসে এক'শ জন বসে আছে। ক্লাসটি হচ্ছে বছরের শেষ দিকে বার্ষিক পরীক্ষার আগে। ক্লাসে শিক্ষক ছাত্রদের দেখিয়ে বলছেন, তুমি হবে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট। তুমি পাবে সেকেন্ড ক্লাস আর তুমি ফেল করবে। এখন বার্ষিক পরীক্ষা হল এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দেখা গেল প্রথমজন ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছে, দ্বিতীয় জন সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে এবং তৃতীয় জন ফেল করেছে। এখন তৃতীয়জনের ফেল করার জন্য কি টিচারকে বলার সুযোগ আছে যে আপনি বলেছিলেন বিধায় আমি ফেল করেছি? না এ সুযোগ নেই। কারণ উক্ত শিক্ষক তাদের এক বছর পড়িয়েছেন, তাই তিনি তার অভিজ্ঞতা থেকে উক্ত ছাত্রদের পারফরমেন্স দেখে অনুমান করেছেন যে, কে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে, কে সেকেন্ড ক্লাস পাবে আর কে অমনযোগী বিধায় খারাপ করবে? এখানে শিক্ষকের এ অনুমানকে দোষ দেওয়ার সুযোগ নেই। ঠিক তেমনি বিশ্বজাহানের স্রষ্টা আল্লাহ, তিনি এ টিচারদের থেকেও অনেক অনেক ঊর্ধ্বে এবং তাঁর আছে ইলমুল গায়েব অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যতের কথাগুলো জানেন। এগুলো তিনি একটি কিতাবে লিখে রেখেছেন। সুতরাং মানুষ ভবিষ্যতে কি করবে, এটা আল্লাহর জানা আছে বলে তাকে ঐ কর্মের জন্য দায়ী করা হবে, এমনটি করার সুযোগ নেই। উদাহরণস্বরূপ মনে করি, একজন লোকের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য পাঁচটি রাস্তা সামনে আছে। আল্লাহ পূর্ব হতে জানেন যে, লোকটি দ্বিতীয় রাস্তাটি বেছে নেবে তাই তিনি সেটা লিখেছেন। এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, তিনি লিখে রেখেছেন বলে লোকটি দ্বিতীয় রাস্তা দিয়ে যাবে ব্যাপারটা এমন নয়; বরং লোকটি দ্বিতীয় রাস্তা দিয়ে যাবে বলেই আল্লাহ সেটা লিখে রেখেছেন।

আবার ধরুন, আপনি একজন ভাল ছাত্র। ইন্টার পরীক্ষায় আপনি পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও গণিতে এ প্লাস পেয়েছেন। এখন আপনি ডাক্তারও হতে পারেন আবার ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারেন। আপনি ঠিক করলেন আপনি ডাক্তার হবেন। আল্লাহ জানেন আপনার চয়েস দুটো, তবে আপনি ডাক্তার হবেন। তাই আল্লাহ তা লিখে রেখেছেন। এরপর আপনি যখন রুজি রোজগার শুরু করবেন তখন আপনি সৎভাবেও কামাই করতে পারেন আবার দুর্নীতিও করতে পারেন। ধরি, আপনি আপনার রোজগার দুর্নীতির মাধ্যমে করলেন। এক্ষেত্রেও আল্লাহ তা

পূর্বে থেকেই জানেন বলে তিনি লিখে রেখেছেন। এমন নয় যে, তিনি আগেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন বলেই আপনি হারাম পথে রোজগার করবেন। এটাই হল তাকদীর তথা অদৃষ্ট।

তবে তাকদীরের কিছু জিনিস আছে নির্ধারিত যেমন কে কখন জন্মাবে কার মৃত্যু কখন হবে ইত্যাদি। আল্লামা ইকবাল বলেন, "খুদ কো কর, ইতনা বুলন্দ কেয়া তাকদীর কে পেহলে আল্লাহ আপনে বান্দাছে পুছলে কে বাতাদে রাজা কেয়া হ্যায়।"

অর্থাৎ, নিজেকে এতটাই মহান বানাও যে অদৃষ্ট লেখার পূর্বে আল্লাহর নিজের বান্দাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমার ইচ্ছা কি?

সুতরাং আমাদের অপরাধগুলোর জন্য আমরাই দায়ী। কেউ যদি চুরি করে সে চুরির জন্য সেই দায়ী। এজন্যই আল্লাহ আমাদের জন্য দিক নির্দেশনামূলক গ্রন্থ কোরআন পাঠিয়েছেন। যে কোরআন মেনে চলবে না এর জন্য দায়ী সে-ই হবে অন্য কেউ নয়।

একইভাবে যারা অমুসলিম তাদের এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে যে, প্রত্যেকটি শিশু প্রকৃতিগতভাবে মুসলিম হয়ে জন্মায়, পরবর্তীতে তার গুরুজনেরা তাকে পথভ্রষ্ট করে। সুতরাং কারও অমুসলিম হওয়া আল্লাহ নির্ধারিত করে দেন নি। কারণ একজন অমুসলিম ব্যক্তির মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সুযোগ আছে যে, সে তার বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে কোরআন অধ্যয়ন করে মুসলিম হতে পারবে।

আর এজন্যই হাশর ময়দানে বিচার করা হবে মানুষের কর্মের আলোকে। যে ভাল কাজ করবে সে জান্নাত পাবে। আর যে মন্দ কাজ করবে সে হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

প্রশ্ন ঃ ৩। আমার নাম জাবের, আমি কোন প্রকাশনা থেকে আসিনি। আমি আপনাদের এই অনুষ্ঠানের বিষয়ে 'Times of India' তে বিজ্ঞপ্তি দেখে এখানে এসেছি, যেন আমার এ বিকালটা ভালভাবে কাটে। যাই হোক আমার প্রশ্ন সরাসরি ডা. জাকির নায়েকের কাছে। তার আগে একটি বিষয়ে পরিষ্কার করতে চাই যা মি. সাহানী উল্লেখ করেছেন, তাহলো তাসলিমা নাসরিন ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যাইহোক আপনি যদি টাইম ম্যাগাজিনের ৩১ জানুয়ারী ১৯৯৪ সংখ্যা পড়ে থাকেন তাহলে দেখবেন যে, মি. ফারজান আহমদ একটি রিপোর্ট করেছেন, তাসলিমা নাসরিন বলেছেন, "সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে" Ok আচ্ছা ঠিক আছে। যদি কোরআনে এ বিষয় থেকেই থাকে তাহলে আমি কিভাবে এরকম অবৈজ্ঞানিক বিষয়টি বিশ্বাস করবো? আর দ্বিতীয়ত: হলো তিনি (তসলিমা) ইসলামকে দোষারোপ

করেছেন এই বলে যে, বাংলাদেশে ইসলামের জন্যই মেয়ে শিশু হত্যার হার অনেক বেশি ভয়াবহ। আমি ভাবছি কুরআনে এ বিষয়ে কি আছে? থাকলে তা কি স্পষ্ট করে বলবেন?

ডা: জাকির: ভাই মি. জাবেদ, এর দুটি প্রশ্ন রয়েছে। যদিও একটি প্রশ্ন করার কথা ছিল। পরিচালক যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি দুটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারবো। প্রথম প্রশ্ন হলো 'টাইম ম্যাগাজিন' এর ৩১ জানুয়ারি ৯৪ সংখ্যায় (যা বিশ্বের একটি প্রসিদ্ধ ম্যাগাজিন) প্রকাশ পেয়েছে, আমিও ৩১ জানুয়ারি ৯৪ এর প্রকাশিত রিপোর্ট সম্পর্কে একমত পোষণ করছি। যেখানে সে (তাসলিমা নাসরিন) বলেছেন, যে কুরআন বর্ণনা করেছে, "সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে" তার প্রশ্ন হলো তিনি (জাবেদ) যদি কুরআনের শিক্ষা বিশ্বাস করেন তাহলে এটি কিভাবে প্রমাণ করবেন? আমি তার এ বিষয়ে মন্তব্যের সাথে একমত। এটা কিভাবে সম্ভব যে এমন তথ্যবিহীন যুক্তিবিহীন, প্রমাণহীন একটি বিষয়ের প্রমাণ করা। কুরআন বলে "সূর্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে" তাহলে কুরআন অবশ্যই বলবে-

قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

অর্থ : 'বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণ উপস্থিত কর।' (সূরা বাকারা-আয়াত-১১১)

তাহলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে, আসুন আমরা প্রমাণ দিব। আসুন দেখি কুরআন এ বিষয়ে কি বলেছে–

প্রিয় উপস্থিতি, সে (তসলিমা নাসরিন) কুরআন থেকে যে আয়াতটিকে রেফার করেছে তাহলো কুরআনের সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াত। যেখানে বলা হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থ: "তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।" একই বিষয়ে সূরা ইয়াসিন-এর ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থ : "সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে।"

কুরআন একথা বলেনি যে, "সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে" কুরআন বলেছে সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে।"

আর শব্দ « يَسْبَحُونَ » শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি سَبْحٌ শব্দমূল থেকে এসেছে। যা কোন চলন্ত বা গতিশীল বস্তুর গতির প্রকৃতি/Motion বুঝায়। (Discribing the motion for moving body)

আপনি যদি বলেন একজন মানুষের سَبْحٌ -র বিষয়টি বুঝান তাহলে এর দ্বারা তার দাঁড়িয়ে থাকা বুঝাবে না, বরং এর দ্বারা বুঝাবে সে হয় হাঁটছে না হয় দৌড়াচ্ছে। আপনি যদি কোন লোকের পানিতে سَبْحٌ (সাবহান) করা বুঝান তাহলে তখন তাকে পানিতে ভাসা বুঝাবে না। এর দ্বারা পানিতে সাঁতার দেওয়া বুঝাবে। একইভাবে আপনি যদি 'সাবহা' শব্দটি কোন স্বর্গীয় বা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন তাহলে এর দ্বারা ঐ বস্তুর তার পরিভ্রমণকে বুঝাবে।

'If you use the word Subha for heavenly body it means it is rotating about its own access.'

কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্য ও চন্দ্র পরিভ্রমণ করছে। তারা নিজ অক্ষে স্ব স্ব গতিতে ঘুরছে। "The sun and the moon rotate, they travel in their motion that revolve and they rotate about its own Axis."– এই আয়াত আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। কারণ, আমি যখন ১৯৮২ সালে সেন্ট পিটার কলেজ থেকে আমার I.S.C পাস করি তখন সেখানে জানি যে সূর্য Rotate করে না, সূর্য Resolve করে। যাই হোক, এখানে দুটি বিষয় ছিল। এক হলো গবেষক বলছে সূর্য তার নিজ অক্ষে Rotate (আবর্তন) করে না। অন্য দিকে কুরআন বলছে- সূর্য তার নিজ অক্ষে Rotate (আবর্তন) করছে। এ কারণে এ বিষয়ে আমার দ্বিধা হয়। তারপর আমি জানতে পারলাম যে, বর্তমান সর্বাধুনিক Advanced research and Astronomy গবেষণা করে আবিষ্কার এবং প্রমাণ করেছে যে, সূর্য তার নিজ অক্ষে সর্বদা Rotate করছে।

আপনি যদি সূর্যকে নিজে ল্যাবরেটরিতে বা নিজে সরাসরি প্রত্যক্ষ করেন তাহলে দেখবেন সূর্য নিজ অক্ষেই ঘুরছে এবং এর নিজের কিছু Black hole রয়েছে। আপনি যদি এর ইমেজগুলো দেখেন তাহলে দেখবেন যে, সূর্যের বেশ কিছু Black Spots রয়েছে। সূর্যের কতগুলো নির্দিষ্ট Hols রয়েছে যেমন– Black Spots এবং সেই Black Spots গুলো সম্পূর্ণরূপে Rotate করতে পঁচিশ দিন সময় নেয়। তাই সংক্ষেপে বলা যায় সূর্য নিজে Rotate করতে প্রায় পঁচিশ দিন সময় নেয়। সুতরাং আমি বলবো কুরআন অবশ্যই সেকেলে বা Backword নয় বরং কুরআন হলো সর্বাধুনিক Most up to date. আমি তাসলিমা নাসরিনকে জিজ্ঞেস করতে চাই, কে ১৪০০ বছর আগে প্রচার করেছে, ঘোষণা করেছে–

وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থঃ "প্রত্যেকেই তার নিজ অক্ষে পরিভ্রমণ করছে।"

অর্থাৎ তারা Revolve এবং Rotate (আবর্তন) করছে।

আপনারাও তাকে জিজ্ঞেস করুন। কুরআন কখনই বলেনি যে, সূর্য পৃথিবীকে Rotate বা Revolve করছে। এটা হলো তার অপব্যাখ্যা। যেহেতু পরিচালক আমাকে অনুমতি দিয়েছেন, তাই আমি প্রশ্নকারীর প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর দিচ্ছি। যেহেতু সে (তাসলিমা) কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই এ বিষয়টি জলজ্যান্ত প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, শুধু ইসলামের কারণেই বাংলাদেশে মেয়ে শিশু হত্যার হার অনেক বেশি। বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যা অর্থাৎ ইসলামের কারণেই মেয়ে শিশু হত্যার হার অনেক বেশি। এ বিষয়টি কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই সে এমন দাবি করেছে আমি তাকে বলতে বলবো, সে কেবল কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করুক যেখানে বলা হয়েছে যে, মেয়ে শিশুদের হত্যা কর। বস্তুত বিবিসি (B.B.C) এর একটি প্রোগ্রাম এ্যাসাইনমেন্ট যা "Small clipping was let her die" শিরোনামে একজন ব্রিটিশ Amili Bucenin এ্যামিলি ব্যাকেনিন প্রস্তুত করেছেন। তিনি U.K থেকে এসে মেয়ে শিশু হত্যার উপর একটি জরিপ করে দেখেছেন যে, মেয়ে শিশু হত্যার হার সবচেয়ে বেশি ইন্ডিয়াতেই। তার মতে প্রত্যেক দিন তিন হাজারেরও বেশি (Flitases) চিহ্নিত হয়েছে, অপেক্ষায় থাকে যারা .... Females নারী। এটা তিন হাজার Flit শুধু আমাদের দেশেই। আপনি যদি এই সংখ্যাকে ৩৬৫ দিয়ে গুণ করেন তাহলে তা অবশ্যই এক মিলিয়নের চাইতে বেশি হবে। এক মিলিয়ন Flit চিহ্নিত করা হয়েছে যারা কেবল শুধু মেয়ে শিশু নিয়ে অপেক্ষা করছে।

আপনারা কেন এ খবরটি আমাদের পত্রিকার হেড লাইনের খবর হিসেবে পড়েন না? যতক্ষণ পর্যন্ত এ রকম মেয়ে শিশুর হত্যা বন্ধ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা এটাকে পত্রিকার Front Page-এ নিউজ করুন। তামিলনাড়ুর সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী যেসব মেয়ে শিশু জীবন্ত জন্মগ্রহণ করে তাদের মধ্যে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৪টি শিশুকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হয়। ভেবে দেখুন প্রতি দশজনে ৪জন! একজন ব্রিটিশ Inteligent কে আমাদের দেশের মেয়ে শিশুর হত্যার হার তদন্ত করে রিপোর্ট করতে হয়েছে।

এবার আমি মেয়ে শিশু হত্যা সম্পর্কে কুরআন কি বলেছে, কুরআনে কি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে উল্লেখ করবো। সে (তসলিমা) একটি আয়াত উল্লেখ করতে পারবে না। এ বিষয়ে সে একটি আয়াতও উল্লেখ করতে পারবে না। আমি তাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি। মেয়ে শিশু হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এমন একটি

আয়াতও সে কুরআন থেকে উদ্ধৃত করতে পারবে না। আসলে আপনি যদি কুরআন পড়েন তাহলে সূরা তাকবীর এর ৮ ও ৯ নং আয়াতে পাবেন।

তাসলিমা নাসরিন কেবল বলে থাকে, কুরআন বলেছে, কোরআন এমন বলেছে, কুরআন তেমন বলেছে, আমি বুঝিনা।

কিভাবে একজন ব্যক্তি কুরআন পড়ে নাই অথবা সে যদি বলে আমি কুরআন পড়েছি তাহলে সে (তাসলিমা) বললো যে কুরআন অমুক আয়াতে বলেছে আর আপনারা তা কুরআনের আয়াত হিসেবে গ্রহণ করে নিচ্ছেন। Give benefit of doubt. আপনারা তাকে সন্দেহের সুযোগ দিচ্ছেন, সে সন্দেহের সুযোগ নিচ্ছে। যেমন– কুরআন বলেছে যে, সূর্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, তাই কুরআন মেয়ে শিশু হত্যা করতে বলেছে। তাতেই আপনারা তার সাথে একমত হয়ে যাচ্ছেন।

আপনারা যদি কুরআন এর সূরা তাকবীর এর ৮ ও ৯ নং আয়াত পড়ে, যেখানে বলা হয়েছে –

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ـ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ـ

অর্থ: "যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো?"

অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন জানতে চাওয়া হবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো? কিয়ামতের দিন এই শিশু চিৎকার করতে থাকবে তখন জানতে চাওয়া হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? সুতরাং বুঝতেই পারছেন মেয়ে শিশু হত্যা করা ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে। যেকোনভাবেই হোক, তা মেয়ে হোক, যে কোন শিশু হত্যা ইসলাম হারাম করেছে। শিশু হত্যা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। কুরআনের সূরা আল ইসরা'র ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلاَ تَقْتُلُوْآ اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ـ

অর্থ: "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।"

একই কথা সূরা আনআম এর ১৫১ নং আয়াতেও বলা হয়েছে–

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوْآ اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوْا

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

অর্থ : "আপনি বলুন : এসো, আমি তোমাদেরকে ঐসব পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর, স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দিই, আর নির্লজ্জতার কাছেও যেও না। প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে ব্যতীত। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ।"

কুরআন ছেলে সন্তান হওয়ার পর আনন্দিত হওয়ার বিষয়ে এবং মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে তার চেহারা মলিন হয়ে যাওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।" যেমন– কুরআনের সূরা 'আন নাহাল' এর ৫৮ ও ৫৯ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ـ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ـ

অর্থ : "যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিস্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে যে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে সেভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।"

আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৪। কোন একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আ) (তার স্ত্রীকে দেখিয়ে) বলেছিলেন, এ হল আমার বোন, স্ত্রী নয়। আমাদের কি এমন কি বলার অনুমতি আছে?

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, সত্যি কথা বল। তবে জীবন হুমকির মুখে থাকলে মিথ্যা কথা বলা যেতে পারে। এমনকি শিরকও করা যেতে পারে। যদি মনে ঈমান থাকে। যেমন– কোন মুশরিক এসে আপনার মাথায় বন্দুক ধরে বলল, আপনি কি মুসলিম না হিন্দু? আপনি বললেন আপনি হিন্দু। আপনাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল আপনি কি মূর্তিপূজা করেন? আপনি বলবেন আমি মূর্তিপূজা করি। এমনটি

বলার অনুমতি আছে যখন আপনার জীবন হুমকির সম্মুখীন, কিন্তু শর্ত হল মনে ঈমান থাকতে হবে। তবে এটা আবশ্যক নয় যে, আপনার মিথ্যে বলতেই হবে। কেউ যদি এক্ষেত্রে মুসলিম পরিচয় দিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে সেটা অধিকতর সাহসিকতার ব্যাপার।

এখন ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি সম্পর্কিত আপনার প্রশ্নটি সম্পর্কে আসা যাক। ইবরাহীম (আ) বলেছিলেন যে, এ আমার স্ত্রী নয়, বোন। অর্থাৎ এখানে মনে হতে পারে তাহলে কি ইবরাহীম (আ) অসত্য বলেছিলেন? এ সন্দেহ নিরসণ করার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। সাহাবীরা সবাই স্বভাবতই সত্যবাদী ছিলেন। একবার কোন এক যুদ্ধের ময়দানে জনৈক অমুসলিম একজন সাহাবীকে চিনতে না পেরে তাঁর কাছেই তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলেন যে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন কিনা? তখন ঐ সাহাবী একটু পাশে সরে এসে তাঁর পূর্বের স্থান দেখিয়ে বললেন যে, তিনি তো এইমাত্র এখানেই ছিলেন। অর্থাৎ তিনি জীবনের হুমকির মুখেও মিথ্যা না বলে কৌশলে সত্যই বললেন।

আবার ধরুন, আমি স্টেজে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছি আর দর্শকসারিতে আমার স্ত্রীও আছে। এক্ষেত্রে আমি প্রাথমিক সম্বোধনের ক্ষেত্রে যেহেতু আমার স্ত্রী দর্শক সারিতে আছেন এভাবে বলব না যে, আসসালামু আলাইকুম ভাই ও বোনেরা একজন ব্যতিরেকে; বরং আমি সাধারণভাবে সবাইকে ভাই ও বোন বলব এবং সেখানে আমার স্ত্রীও থাকবে। এক্ষেত্রে সে আমার ইসলামের জাতীয়তার কোন রক্তের সম্পর্ক নয়।

ঠিক একইভাবে স্পষ্টতই ইবরাহীম (আ) আল্লাহর নবী ছিলেন। সুতরাং তিনি সত্যবাদী ছিলেন। তাই আমার মতে, তিনি যখন তাঁর স্ত্রীকে বোন বলেছিলেন তখন কার্যত তিনি ইসলামের জাতীয়তার বোন বলেছিলেন। অর্থাৎ তিনি অসত্য বলেননি। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনের সূরা তাওবার ৭১ নং এ উল্লেখ আছে–

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۔

"মুমিন পুরুষ ও নারীগণ একে অন্যের সাহায্যকারী ও সমর্থক।"

অর্থাৎ মুমিন নরনারীগণ একে অপরের ভাই ও বোন। তাই ইবরাহীম (আ) কার্যত মিথ্যা না বলে বিপদ থেকে বের হয়ে আসার জন্যই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ঃ ৫। বাইয়াতের গুরুত্ব কতটুকু? বর্তমান যমানায় যখন খিলাফত নেই তখন বাইয়াত কি প্রযোজ্য?

উত্তর ঃ বাইয়াত শব্দটির অর্থ আনুগত্যের শপথ করা। সূরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতে এ শব্দটি এসেছে। বাইয়াতের গুরুত্ব নির্ভর করে স্তরের ওপর। প্রথমতঃ নবীজী ﷺ-এর সাথে বাইয়াত করা বাধ্যতামূলক। আমরা কালেমা শাহাদাত পড়ার মাধ্যমে নবীজীর সাথে সেই বাইয়াতে আবদ্ধ হয়েছি। দ্বিতীয়তঃ ইসলামী

রাষ্ট্রের খলিফাদের নিকট বাইয়াত করা বাধ্যতামূলক। তৃতীয়তঃ খলিফা কর্তৃক নির্ধারিত কোন প্রতিনিধির আনুগত্য করাও বাধ্যতামূলক। এরপর কোন দল বা সংগঠনের নেতার অধীনে বাইয়াত করা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। হাদীসে এসেছে, কোন স্থানে তিনজন ব্যক্তিকে একত্রিত হলে একজনকে আমীর বানাতে হবে। সুতরাং তিনজনের একটি ছোট্ট দল হলেও সেখানে একজন নেতা থাকবে। যদিও সংশ্লিষ্ট নেতার নিকট বাইয়াত করাটা অতটা আবশ্যক নয় যতটা খিলাফতের অধীনে বাইয়াত করার গুরুত্ব। তথাপি যেকোন দলের দলীয় শৃঙ্খলার স্বার্থে নেতৃত্বের আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রশ্ন ঃ ৬। নিকাহ্ অথবা রেজিস্ট্রি বিয়ে। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী কোনটা ঠিক?

উত্তর ঃ ইসলামে নিকাহ্ বা বিয়ে ইসলামী শরীয়াহর হুকুম অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। বিয়ে সম্পন্ন হতে হলে বর ও কনে থাকবে, একজন ব্যক্তি থাকবে যে বিয়ে পড়াবে এবং কমপক্ষে দুজন সাক্ষী থাকবে। বিয়েতে বরের পক্ষ হতে দেনমোহর ধার্য করতে হবে। মেয়ের পক্ষ থেকে ও ছেলের পক্ষ থেকে কবুল করা হবে। এটাই হল বিয়ের ইসলামিক নিয়ম এবং এটা আবশ্যক। রেজিস্ট্রি বিয়ের ব্যাপারটা হল দুজন ছেলেমেয়ে পারস্পারিক বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে, এ বিয়ে সরকারের নিবন্ধন খাতায় তালিকাবদ্ধ করা। অর্থাৎ সরকারকে জানানো যে, আপনারা বিয়ে করেছেন। এটা ইসলামে জায়েয, যদিও তা ফরয নয়। তবে সংশ্লিষ্ট সরকারের নিয়ম অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক। রেজিস্ট্রি করলে পরবর্তীতে বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। এ কারণে ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী বিয়ে করে তা সরকারের রেজিস্ট্রারভুক্ত করা যাবে।

কোর্ট ম্যারিজ বলে আরেকটা বিয়ের পদ্ধতি আছে, যে পদ্ধতি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কতকগুলো নিয়মের অধীন। ইন্ডিয়ায় কোন অমুসলিমকে বিয়ে করতে হলে আপনার কোর্ট ম্যারিজ করতে হবে। এটি সিভিল ল'-এর অন্তর্ভুক্ত। প্রশ্ন হল, ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী কোর্ট ম্যারিজ হালাল কিনা? উত্তর– আমার মতে এটা কুফরী। কারণ, কোর্ট ম্যারিজের ল' ইসলামী শরীয়াহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইসলামী শরীয়াহর সাথে মিল থাকলে কোর্ট ম্যারিজ হালাল হত। যেমন– উত্তরাধিকার আইন। ভারতের উত্তরাধিকার আইন কোরআনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নীতিমালার অনুসরণ। সুতরাং উত্তরাধিকার আইন মানা যাবে। যেহেতু কোর্ট ম্যারিজ ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেহেতু কেউ কোর্ট ম্যারিজ করা মানে আল্লাহর উপর মানবরচিত আইনকে প্রাধান্য দেয়া, এ কারণে এটা কুফরী। সুতরাং কোর্ট ম্যারিজ করা যাবে না, তবে নিকাহ ও রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।

প্রশ্ন : ৭। হিন্দুগণ কাফির না মুরতাদ? যদি মুরতাদ হয় তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার কোন ব্যক্তির আছে কিনা? মুরতাদ শব্দের অর্থ আসলে কি?

ডা. জাকির : আচ্ছা বোন আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, মি. বিদ্যা, যিনি বলেছেন যে হিন্দুগণ কাফির নয় বরং তারা হলো মুরতাদ, এই কারণে মৌলবাদীদের কি তাদের জীবন হুমকি দেওয়ার অধিকার আছে কিনা?

আবারো তিনটি প্রশ্ন করেছেন। যাইহোক, প্রথম প্রশ্নের উত্তর, মি. বিদ্যা বলেছেন– হিন্দুরা কাফির নয় বরং তারা মুরতাদ। তার এ কথার কোন ভিত্তি নেই। কেননা তিনি আরবি ভাষা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন না 'কাফির' শব্দের অর্থ আমি আপনাদের আগেই বলেছি। 'কাফির' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে সত্যকে ধারণ করে অথবা সত্যকে পরিত্যাগ করে। তার মানে 'কাফির' হতে হলে তাকে যে হিন্দু হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

সে হিন্দুও হতে পারে আবার হিন্দু নাও হতে পারে। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

আমি এখানে অর্থের Justify করিনি বোন, আমি কেবল উত্তর Justify করেছি।

আমি যদি অর্থের সঠিকভবে Justify করি তাহলে আমার উত্তরদানের কোন সাম স্যতা থাকে না। অর্থাৎ সঠিক অর্থ না বললে উত্তর দেওয়ার কোন সামঞ্জস্য থাকে না।

কুরআন সবসময় বলে যে, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

অর্থ : 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থাপন কর।'

যখন তোমরা উত্তর দিবে তখন অবশ্যই প্রমাণ দিতে হবে।

মি. বিদ্যার মতে মুসলমানরা মৌলবাদী, না মৌলবাদী নয়, তা আমার জানা নেই। তিনি মি. বিদ্যার মন্তব্য অনুযায়ী একজন মুসলিম সে মৌলবাদী কি মৌলবাদী না তা আমার জানা নেই।

কোন ব্যক্তি মুরতাদ হলে তাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার কোন ব্যক্তির আছে কিনা বা মুরতাদ ব্যক্তিকে কোন প্রকার শাস্তি দেওয়ার অধিকার কারও আছে কি না তা আপনি জানতে চেয়েছেন। প্রমাণ ছাড়া কোন প্রকার শাস্তি দেওয়ার কোন অধিকার কারও নেই। আমি বলবো কারও শাস্তি দেওয়ার অধিকার নেই। যদি তার এ সুযোগ থাকে বা তাকে এ সুযোগ দেওয়া হয় যে সে নিজের পরিচয় স্পষ্ট করতে পারে, সে যদি ভুল করে, কুরআনের অপব্যবহার করে কুরআনের অবমাননা করে তাহলে এ বিষয়টা অবশ্যই ভিন্ন প্রসঙ্গ। এটা অবশ্যই মি. বিদ্যার দেওয়া মুসলমান ছাত্রদের বিষয়ে প্রমাণের উপর নির্ভরশীল।

অন্যথায় আমি বলতে চাই, কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়া যদি ঐ সব মুসলমানকে মুরতাদ বলা হয় তা অবশ্যই সঠিক হবে না, এটা কোনভাবেই বৈধ বা জায়েয হবে না। এটা অবশ্যই ইসলামী বিধানের বিরোধী। ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ। আমি যদি অর্থের যথার্থতা করতে পারি তাহলে আমার উত্তরও যথার্থ হবে। আমি যদি অর্থের সঠিকতা তথা অর্থ যদি যৌক্তিক না হয়, সঠিক না হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমার উত্তরের সাথে কোন সামঞ্জস্যতা থাকবে না। কুরআন সর্বদা বলে যে,

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ .

অর্থ : "তাদেরকে বলুন, তোমরা প্রমাণ উপস্থিত কর।"

তাহলে কেন আমি প্রমাণ ছাড়া উত্তর দিব? প্রমাণ ছাড়া আমি অবশ্যই কোন মন্তব্য করতে চাই না। সুতরাং প্রথমে বলি, 'কাফির' অর্থ অবশ্যই শুধু হিন্দু না। 'কাফির' একজন হিন্দু হতে পারে আবার হিন্দু নাও হতে পারে। মুরতাদ শব্দের অর্থ তাহলে কি হবে? মুরতাদ বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যে ব্যক্তি প্রথমে ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করার পর আগের অন্য ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে। ইসলাম ত্যাগ করে অন্য বিশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করে। সুতরাং মি. বিদ্যার ব্যাখ্যার সাথে আদৌ কোন যথার্থতা নেই। তিনি এ বিষয়ে যা বলেছেন তার আগাও নেই মাথাও নেই।

প্রশ্ন ঃ ৮। কোরআনে নামাজ আদায়ের আদেশ এসেছে আর নবী করিম (সা) নামাজ আদায়ের নিয়ম দেখিয়েছেন। কোরআন কিংবা হাদীসের কোথাও কি তাবলীগ করার ব্যাপারে কোন কথা এসেছে?

উত্তর ঃ কোরআন এবং হাদীসের অনেক জায়গায় ধর্ম প্রচার নিয়ে বলা হয়েছে। এগুলো আমাদের জন্য পথনির্দেশনা। ইসলামী শরীয়ার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার যে, কোরআন ও হাদীসে যে ইবাদতগুলোর ব্যাপারে বলা হচ্ছে যেমন নামাজ আদায় করা, যাকাত দেয়া কিংবা আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে বলা, সেগুলো অবশ্যই মানতে হবে। এ সম্পর্কিত যেসব নিয়ম বা কথা সমাজে প্রচলিত কিন্তু কোরআন বা সহীহ হাদীসে নেই সেগুলো ভুল। ইবাদত ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারগুলোতেও কোরআন ও হাদীসে যেটাকে হারাম করেছে সেটা বাদে সব কিছু হালাল। যেমন– খাওয়া, পোশাক পরিধান, কথা বলার ধরণ, ধর্ম প্রচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোরআন বর্ণিত নিয়মটা কেবল অনুমোদিত অন্য কোনো উপায় বা পন্থা অনুমোদিত নয়। তবে যেসব বিষয়গুলো অনুমোদিত হয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বভেদে কোনটা ফরজ, কোনটাই মুস্তাহাব, কোনটা মুবাহ কিংবা কোনটাকে হয়ত মাকরুহ তথা অনুৎসাহিত করা হয়েছে; কিন্তু যেটাকে অনুমতি দেয়া হয়নি সেটা নিষিদ্ধ তথা হারাম। দাওয়াত বা ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে বেশ কিছু নির্দেশনা দেয়া আছে। সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

অর্থ : "মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদেরকে যুক্তি দেখাও সবচেয়ে উত্তম পন্থায় ও গ্রহণযোগ্য উপায়ে।"

এটি দাওয়াত সম্পর্কিত কোরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। এখানে হিকমাহ বলতে কেউ কেউ বুঝান নরম সুরে বলা বা কঠোর না হওয়া। শেখ আহমদ দিদাত যখন স্টেজে উঠতেন তখন লোকজন বলত হিকমাহর সাথে বলেন অর্থাৎ কঠোর হতেন না বা কঠিন কথা বলতেন না। কিন্তু কোরআনে সুনির্দিষ্টভাবে এরকম কথা বলা হচ্ছে না। কোরআন বলছে হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান কর। কঠোর হয়েও হিকমত অবলম্বন করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে হিকমত বলতে সবসময় নরমভাবে বলা বুঝায় না। দাওয়াত দেওয়ার সময় নরম থাকা ভালো, তবে শতভাগ নরম না থাকাই উত্তম। হিকমাহ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। একস্থানে যেটা হিকমাহ সেটা অন্য স্থানে হিকমাহ নাও হতে পারে। আসলে হিকমাহ মানে এমনভাবে বুঝানো, যাতে যাকে বলা হচ্ছে যেন সে বিষয়টা বুঝতে পারে।

উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী ১২০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে—

إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ۔

অর্থ : "নিশ্চয়ই নবী ইবরাহীম (আ)-এর মধ্যে রয়েছে মানব জাতির জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত অর্থাৎ নবী ইবরাহীম (আ)-এর জীবন থেকে ধর্ম প্রচারের শিক্ষা লাভ করা যেতে পারে।"

এখন কোরআনের অন্য জায়গায় আছে নবী ইবরাহীম (আ) দেবতার মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন। আবার তার মুশরিক পিতাকে মুশরিক বলেছিলেন। এক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে মুশরিককে মুশরিক বলে অভিহিত করা যেতে পারে যদিও বা সেটা তিক্ত হয়। আর এটাই হল হিকমাহ যে, পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে কঠোর অথবা কোমল হতে হবে।

উক্ত আয়াত ছাড়াও কোরআনে দাওয়াত সম্পর্কে আরও আয়াত আছে। যেমন– সূরা আল ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ ۔

অর্থ : "এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করি না।"

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা যে, আমরা যখন অমুসলিমদের সাথে কথা বলব তথা দাওয়াতের কাজ করব তখন তাদের সাথে আমাদের সাদৃশ্যের কথা বলব। যেমন, এখানে বলা হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করি না।

এভাবে হাদীসেও দাওয়াতের ব্যাপারে পথ নির্দেশনা দেয়া আছে। যেমন, একটা হাদীসে আছে 'আমার কাছ থেকে মাত্র একটি আয়াত জানলেও তা প্রচার কর।'

সুতরাং আপনি ইসলামের একটি আয়াত জানলেও তা প্রচার করুন। এরকম অনেক নির্দেশনা দাওয়াতের ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে এসেছে। দাওয়াত দেয়া ফরজ। সুতরাং ধর্মপ্রচার অবশ্যই করতে হবে। এক্ষেত্রে আপনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করবেন তা আপনি কোরআন ও হাদীস দিয়ে যাচাই করে দেখুন যে তা অনুমোদিত কিনা নিষিদ্ধ। যেমন– আপনি দাওয়াত দিতে গিয়ে যদি মাইক্রোফোন, মিডিয়া ব্যবহার করতে চান দেখতে হবে যে, কোরআন বা হাদীসে এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা আপনি যদি একটি সহীহ হাদীস পান যেখানে মাইক্রোফোন ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে, তবে আপনি তা ব্যবহার করতে পারবেন না। টেলিভিশন মিডিয়ায় অনেক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় সেগুলো হারাম। কিন্তু এ মিডিয়ায় ভাল কাজেও ব্যবহার করার সুযোগ আছে। যদিও কোরআনে সরাসরি এ ব্যাপারে কথা নেই, কিন্তু কোরআনে বলা হয়েছে হিকমাহ ব্যবহার করতে। এ কারণে আমরা দাওয়াতের কাজের জন্য মিডিয়া ব্যবহার করছি।

কোরআনে ধর্মপ্রচারের হুকুম এসেছে এবং ইসলামী শরীয়ায় তার দিক নির্দেশনা দেয়া আছে। সুতরাং সে দিক নির্দেশনা অনুসারে আমাদের ধর্ম প্রচার করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ৯। পৃথিবীতে অনেক মানুষ ভুল কাজ করছে, যেমন কেউ মূর্তিপূজা করছে, কেউ রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে বই লিখছে। আমার প্রশ্ন হল এতগুলো মানুষ দোযখে যাবে? এ ব্যাপারে আমরা কিছুই করতে পারব না?

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে আমাদের এ জীবনটা হল পরীক্ষা। আপনারা খেয়াল করবেন নিচের স্তরের পরীক্ষাগুলোতে উত্তীর্ণ হওয়া সহজ, কিন্তু উঁচু স্তরের পরীক্ষাগুলো তুলনামূলক কঠিন। আপনার যে উপলব্ধি হয়েছে যে, এতগুলো মানুষ দোযখে কিভাবে যাবে, সেটা উত্তম? কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা এ বিষয়টি উপলব্ধি করার পরও মনে করেন যে, পৃথিবীতে অনেক মানুষ খারাপ কাজ করছে সুতরাং আমিতো বেহেশতে যাবই। একটি হাদীসে এসেছে যে, যদি তুমি জান মাত্র একজন লোক বেহেশতে যাবে তবে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া কর যেন সেই লোকটি তুমি হতে পার। সুতরাং একথা ভাবার সুযোগ নেই যে, যেহেতু পৃথিবীতে এত লোক ভাল সেহেতু আমার সেই লোকটি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমি দোযখে যাব; বরং দোয়া করতে হবে যেন সেই লোকটি আপনি হোন। আবার উক্ত হাদীসে আরও এসেছে,

"আর যদি জান যে একজন লোক দোযখে যাবে তাহলে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া কর যেন সেই লোকটা আমি না হই।

বলার সুযোগ নেই যে, জানেন আমিতো দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, যাকাত দেই ইত্যাদি ভাল কাজ করি আর এ লোকটা চোর, ঐ লোকটা পাপ করছে, সুতরাং যে লোকটা দোযখে যাবে, সে আবশ্যই আমি না।" বরং দোয়া করতে হবে যেন সেই লোকটি আপনি না হোন। কোরআন আমাদের জন্য পথ নির্দেশনা নিয়ে এসেছে। অতএব দোযখ থেকে মুক্তি পেতে হলে উক্ত নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই এ নির্দেশনা মেনে চলছে না। এ কারণে দোযখে অধিক মানুষ যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি আমাদের আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা দরকারে যে, তিনি আমাদের হেদায়াত দিয়েছেন।

সুতরাং আমাদের তাঁর নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। অনেক মুসলিম নামসর্বস্ব ব্যক্তি আছে যারা কোরআন ও হাদীসের হুকুম এবং দিক নির্দেশনাগুলো মেনে চলে না। আমাদের আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিৎ যেন আমরা সে রকম না হই। বেশিরভাগ মানুষ যদি পরীক্ষায় ফেল করে সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ মানুষের দোযখে যাওয়াই স্বাভাবিক। আপনারা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার কথা চিন্তা করুন। মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে, কিন্তু পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয় তাদের সংখ্যা সেই তুলনায় খুবই কম। খুব কম ছাত্র ছাত্রীই মেডিকেলে ভর্তি হতে পারে। এখানে এভাবে ভাবার সুযোগ নেই যে, আমি বুঝতে পারছি না যে কেন এত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারবে না? মেডিকেলে চান্স পেতে হলে অনেক পড়তে হবে ও পরিশ্রম করতে হবে। এমনিভাবে বেহেশতে যাওয়া কোন সহজ কাজ নয়; বরং এটা মেডিকেলে ভর্তির তুলনায় অনেক কঠিন পরীক্ষা। দুনিয়া হচ্ছে সেই পরীক্ষার পরীক্ষাগার। সুতরাং যারা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে আল্লাহর ইচ্ছায় তারা বেহেশতে যেতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ঃ ১০। যারা দরিদ্র তাদের যাকাত দিতে হবে বলেই আমরা জানি। কিছু লোক আছে যারা বলে সৈয়দদের যাকাত দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ যাকাত দেয়ার কিছু নিয়মাবলী আছে। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে এ নিয়মাবলীগুলো উল্লেখ করা আছে। কোরআনে সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতে যাকাত দেয়ার আটটি খাত সম্পর্কে বলা আছে। যেমন–

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -

অর্থ : "সদকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহ্‌র পথে ও মুসাফিরদের জন্য। ইহা আল্লাহর বিধান আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

হাদীসে এসেছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, নবীজীর পরিবারের কোন সদস্যকে যাকাত দেয়া যায় না। (উল্লেখ্য, নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধরদের সৈয়দ বলা হয়) তবে কোন হাদীসে এ রকম আসেনি যে সৈয়দদের কাউকে যাকাত দেয়া যাবে না। নবীজীর পরিবারের সদস্যের যাকাত দেওয়া না যাওয়ার কারণ হল, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাননি যে লোকজন ভাবুক যাকাতের মাধ্যমে নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য করা হবে।

এখন কিছু লোক দাবি করেন যে, তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধর। অর্থাৎ তাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। অন্যভাবে বললে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ের দিক দিয়ে তার সাথে সম্পর্কিত, আবার অনেকে মনে করে, কারও নামের সাথে সৈয়দ থাকলে সে নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশধর। তবে এ ধারণার সত্যতার বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ, এ ধরনের লোক সমাজে আছে যারা তাদের পদবী পরিবর্তন করে সৈয়দ রেখেছেন। কোন কোন নওমুসলিম আছেন যারা অমুসলিম থেকে মুসলিম হওয়ার সময় তাদের নামের সাথে সৈয়দ যোগ করেন। সুতরাং সৈয়দ হলেই যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধর হবেন এমনটা বলা কঠিন। আর সহীহ হাদীসে শুধুমাত্র নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধরদের যাকাত না দেয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে, কিন্তু পদবি দেখে যাকাত না দেয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই। আর বর্তমান সময়ে অর্থাৎ যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর ১৪০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তখন একজন ব্যক্তির শুধুমাত্র পদবি থেকে নিশ্চিত হওয়া মুশকিল যে, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধর। তবে যদি তিনি নিশ্চিতভাবে তার বংশধর সম্পর্কে অবহিত থাকেন তবে ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে সহীহ হাদীস অনুসারে তার জন্য যাকাত নেয়া নিষিদ্ধ।

এখন শুধুমাত্র পদবি দেখে যাকাত না দেয়া বা দেয়া উভয়ের ব্যাপারেই আলেমদের অভিমত আছে। তবে আমার মতে, পদবি দেখে বর্তমানে এত বছর পর কারো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশের হওয়া নিশ্চিত করা যেহেতু সম্ভব নয় সেহেতু সৈয়দদের যাকাত দেয়া যাবে।

প্রশ্ন ঃ ১১। যেকোন কাজের জন্য নিয়ত খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একজন ব্যক্তির ভাল কাজ করার পিছনে বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তাহলে একজন ব্যক্তির নিয়তকে কিভাবে বিচার করা যায়? আর নিয়তকে কিভাবে বিশুদ্ধ করতে হবে?

উত্তর ঃ কোরআন ও হাদীসে যেকোন কাজ কোন পন্থায় করতে হবে সে ব্যাপারে মৌলিক পথ নির্দেশনা দেয়া আছে। বুখারী শরীফের প্রথম হাদীসে নিয়ত সম্পর্কে

বলা আছে, 'নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।' সুতরাং কাজের ক্ষেত্রে নিয়ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন একজন খ্যাতিমান ধর্ম প্রচারক যিনি অনেকের নিকট ধর্ম প্রচার করেছেন তার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, তিনি কি আল্লাহর জন্য ধর্ম প্রচার করছেন নাকি খ্যাতির জন্য? তিনি যদি সে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকেন তবেই তিনি তার কাজের প্রতিফল পাবেন। আবার কারও যদি শুধু নিয়ত থাকে, কাজ না করে তাহলেও হবে না। নিয়ত ও কাজ পরস্পরের সহযাত্রী।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ব্যাপারে পশ্চিমারা অভিযোগ করেন যে, (নাউযুবিল্লাহ) তিনি তার কাজ করেছিলেন খ্যাতি কিংবা ধন-সম্পদের জন্য। কিন্তু নবীজী ﷺ-এর জীবনী থেকেই এ অভিযোগের উত্তম জবাব পাওয়া যায়। মক্কায় একবার যখন নবীজী ﷺ ধর্ম প্রচার করতে গেলেন তখন কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের নেতৃবৃন্দ নবীজী ﷺ-এর নিকট প্রস্তাব রাখল যে নবী ﷺ যদি ধর্ম প্রচার ছেড়ে দেন তাহলে তারা তাঁকে নেতৃত্ব দেবেন এবং অনেক ধনসম্পদের মালিক বানিয়ে দেবেন। নবীজী ﷺ-এর জবাবে বলেছিলেন যে, সূর্যকে তাঁর ডান হাতে ও চাঁদকে বাম হাতে এনে দেয়া হলেও তিনি তাঁর ইসলামের প্রচার ত্যাগ করবেন না। এতেই প্রমাণিত হয় যে, নবীজী ﷺ এ কাজগুলো অর্থ-সম্পদের জন্য করেননি।

এভাবে যেকোন ব্যক্তির নিয়ত সম্পর্কে তার জীবনাচরণ ধারণা দিতে পারে। আর আপনার নিজের নিয়তকে বিশুদ্ধ করার জন্য যেটা করতে হবে তা হল আপনার খেয়াল রাখতে হবে যেন আপনার নিয়ত ও কাজ আল্লাহও তাঁর রাসূলের জন্য হয়। অন্য কথায় কোরআন ও হাদীসের আলোকে আপনার কাজটি যেন অনুমোদিত হয় ও কাজের পিছনের নিয়ত যেন হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। যেকোন কাজের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য তা ধর্ম প্রচারই হোক বা অন্য কোন ভাল কাজই হোক।

আপনার নিয়তের ব্যাপারে যদি অন্য কারো অভিযোগ থাকে তবে সেটা নিয়ে না ভেবে আপনার দেখতে হবে কোরআন ও হাদীসের আলোকে আপনার নিয়ত বিশুদ্ধ কিনা? তাহলেই আসা করা যায় আপনার নিয়ত বিশুদ্ধ থাকবে।

এখন দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসের রেফারেন্স দেয়ার চেষ্টা করা দরকার যেন নিয়ত ও কথার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না থাকে।

আরেকটি ব্যাপার হল মাথার কুমন্ত্রণা সব সময়েই আসবে। শয়তানের কাজই হল কুমন্ত্রণা দেয়া। পবিত্র কুরআনে সূরা নাসের ১-৪ নং আয়াত থেকে জানা যায় শয়তান মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়। যেমন– ফজরের নামাজের ক্ষেত্রে আযানে বলা হয় ঘুম হতে নামাজ উত্তম। কিন্তু শয়তান ধোঁকা দেয় যে আরও সময় আছে কিছুক্ষণ পর উঠলেও হবে। এভাবে হয়ত নামাজের সময় শেষ হয়ে যেতে পারে।

এক্ষেত্রে যদি নবীজী ﷺ-এর এই হুকুমটি মানা হয় যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামাজ পড় তাহলে হয়ত ভুল করা হতে বাঁচা সম্ভব হবে। এভাবে কোরআন ও হাদীসের পথ নির্দেশনা অনুসারে নিয়তকে ঠিক করে নিলে শয়তান ধোঁকা দিতে সক্ষম হবে না।

প্রশ্ন ঃ ১২। খৃস্টান ধর্মে ইয়াহুয়ার ধারণাটি কি?

উত্তর ঃ পবিত্র বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে, ঈশ্বরের একটি নাম হল YHWH এটা একটা হিব্রু শব্দ। হিব্রুতে সাধারণ Vowel গুলো লেখা হয় না। YHWH এর সাথে Vowel বসালে হবে ইয়াহুয়া। আবার সাধারণত তারা আগে একটি যোগ করে। ফলে ইউনুস হয়ে যায় জোনাহ তেমনিভাবে ইয়াহুয়া হয়ে যায় জেহোয়া বা জোহাভা। সুতরাং ইয়াহুয়া বা জেহোভা হল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনেকগুলো নামের একটা যেটা আছে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে।

প্রশ্ন ঃ ১৩। কয়েকদিন যাবৎ বোম্বে শহরের অলিতে গলিতে একটা পোস্টার দেখা যাচ্ছে যেখানে বলা হয়েছে ইমাম মাহদী এসে গেছেন। তার মুখ চাঁদে দেখা গেছে। পোস্টারগুলো লাগানো হয়েছে ইমাম মাহদী ফাউন্ডেশন থেকে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ ইমাম মাহদী এসেছেন বা তার মুখ চাঁদে দেখা গিয়েছে কিনা এ ব্যাপারে আমার জানা নেই। তবে এটি বলা যায় যে, হাদীসে বলা আছে ইমাম মাহদী আসবেন এবং তার আসার কতিপয় নিদর্শন দেয়া আছে। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি তিনি আসবেন। তবে কবে আসবেন সেটা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। "ইমাম মাহদী ফাউন্ডেশন" নামে কোন ফাউন্ডেশন আছে বলে আমার জানা নেই। এছাড়া পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম অনেক ব্যক্তি নবীজী ﷺ এর পরে এসেছেন যারা নিজেদের ইমাম মাহদী বলে দাবি করেছেন কিন্তু পরবর্তীতে তারা কুরআন ও হাদীস থেকে দূরে সরে গেছেন। এজন্য আমাদের উচিৎ এই বিশ্বাস রাখা যে, ইমাম মাহদী আসবেন, ঈসা (আ)ও আসবেন এবং পৃথিবীতে খিলাফত পুনরায় প্রতিষ্ঠা হবে ইনশাআল্লাহ এবং আরও উচিৎ কোরআন হাদীস অনুসরণ করে চলা। কেননা ইমাম মাহদী ও তাঁর অনুসারীরা কোরআন ও হাদীসের প্রকৃত অনুসারী হবেন।

প্রশ্ন ঃ ১৪। আমরা ভাল কাজের উপদেশ দেই আর খারাপ কাজে নিষেধ করি। এখন মুসলিম এলাকায় যেসব মদের দোকান আছে তারা যেন মদ বিক্রি না করে সেজন্য আমরা কি করতে পারি?

উত্তর ঃ হাদীস অনুযায়ী খারাপ কিছু দেখলে হাত দিয়ে থামানো উচিৎ। যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে মুখ দিয়ে আর সেটাও যদি সম্ভব না হয় অন্তরে ঘৃণা পোষণ করতে হবে। আর শেষেরটা হল দূর্বলতম ঈমানের পরিচয় বা এখানে যেটা করা

যেতে পারে। তা হল সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এজন্য কোরআন হাদীসের উদ্ধৃতি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি ও মদের ক্ষতিকর দিক পরিণতির পরিসংখ্যানমূলক তথ্য সহকারে পুস্তিকা তৈরি করে বিলি করা যেতে পারে এছাড়াও আলোচনা, সেমিনার, ক্যামপেইন ওয়ার্কশপ ইত্যাদি করা যেতে পারে। এখন এগুলো তাদের মনে কোন পরিবর্তন আনবে কি না সে ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিৎ। আল্লাহ নবীজী ﷺ -কে সূরা গাশিয়াহর ২১ নং আয়াতে বলছেন, তোমার কাজ হল উপদেশ দেয়া। সুতরাং আমাদের কাজ হবে উপদেশ দেয়া। এরপর মানুষের মন পরিবর্তন করার মালিক আল্লাহ্ এবং আমাদের উচিৎ আমাদের পক্ষ থেকে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা যেন আল্লাহর নিকট অন্ততঃপক্ষে বলা যায় যে, আমি চেষ্টা করেছি।

প্রশ্ন ঃ১৫। স্কুলে বা কলেজে ভর্তির জন্য Donationদেয়ার অনুমতি আছে কি?

উত্তর ঃ আমার মতে যদি Donation দেয়া হয় এ জন্য যে স্কুলের উন্নতি হবে অথবা নতুন কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে, তবে সেটা দেয়া যেতে পারে। তবে সেটা যদি ঘুষ হয়, তাহলে সেটা হারাম। ঘুষ আর উপহারের মধ্যে পার্থক্য আছে। পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারার ১৮৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ .

অর্থ : "অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য বিচারকদের হাতে ঘুষ দিও না।"

অনেকে হয়ত বলতে পারে উপহার আর ঘুষ একই জিনিস। নবী করিম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, উপহার ও ঘুষের মধ্যে পার্থক্য করব কিভাবে? উত্তরে নবী করীম ﷺ বলেন, তুমি ঐ অবস্থানে না থাকলে উপহারটা যদি না আসত তাহলে সেটা ঘুষ।

সুতরাং আপনি ডোনেশন দেন এ উদ্দেশ্যে যে সেটা প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হবে সেটা উত্তম। কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, সে টাকাটা যেন প্রিন্সিপাল বা কর্তৃপক্ষের পকেটে না যায়। আর ভর্তি করার জন্য উপহার তথা ঘুষ প্রদান করা হারাম।

প্রশ্ন ঃ ১৬। নবী করীম ﷺ এর সময়ে আযল ও মুতাহ্ বিয়ের অনুমতি ছিল কি? এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলবেন কি?

উত্তর ঃ আযল মানে হল সহবাস থেকে বিরত থাকা এবং মুতাহ্ মানে অস্থায়ী বিয়ে।

আযল সম্পর্কে একটি হাদীসে এসেছে যে, নবীজী ﷺ -এর কাছে একজন লোক এসে বলল যে, সে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত রয়েছে। নবীজী এ কথা শুনে চুপ থাকলেন। এর ওপর ভিত্তি করে দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে। একদল বলছেন নবীজী ﷺ চুপ করে থেকে সম্মতি দিয়েছিলেন। আরেক দলের অভিমত– নবীজী

ﷺ শুনে খুশি হন নি। অর্থাৎ কারও মতে এটা না করলেই ভাল, আর কারও মতে এটার অনুমতি আছে। তবে কোন আলেমই এটাকে হারাম বলেননি।

এখন মুতাহ বিয়ের সম্পর্কিত আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ নবীজী ﷺ এর সময় মুতাহ বিয়ের অনুমতি ছিল। তবে এ অনুমতি ছিল নবুয়ত পাওয়ার প্রথম দিকে। লক্ষ্যণীয় যে, নবুয়তের প্রথম দিকে মদও নিষিদ্ধ ছিল না। পরবর্তীতে কোরআনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে মদ নিষিদ্ধ হয়। সে সময়ে আরব দেশে মুতাহ বিয়ের প্রচলন ছিল এবং এটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে এ বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। প্রথমে ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতঃপর ৭ম হিজরীতে তাবুকের যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ মুতাহ বিয়েকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। তবে এ নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে তখন অল্প কিছু সংখ্যক সাহাবী অভিহিত ছিলেন যার মধ্যে উমর (রা) ছিলেন। পরবর্তীতে নবীজী ﷺ-এর ওফাতের পর উমর (রা) এ বিধানকে শক্তভাবে জারী করেন।

সুতরাং ইসলামে মুতাহ বিয়ে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারও সাথে চুক্তি ভিত্তিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া স্পষ্টতই হারাম। অর্থাৎ কারও সঙ্গে এ চুক্তি করে বিয়ে করা যে, এই সময় পর আমি তোমাকে তালাক দেব, এটা অনুমোদিত নয়। তবে কেউ যদি আজীবন সম্মানী করে নেয়ার নিয়ত করে নারীকে বিয়ে করে থাকে কিন্তু পরবর্তীতে কোনো কারণে বিয়ের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। সেটার অনুমতি ইসলামে আছে। কিন্তু অস্থায়ী তথা মুতাহ বিয়ে ইসলামে নিষদ্ধ।

প্রশ্ন ঃ ১৭। কিছুদিন আগে হিন্দুস্তান টাইমস এ একটা প্রবন্ধ এসেছিল যেখানে বর্ণপ্রথা ও জাতিভেদের পক্ষে লেখা হয়েছিল। সেখানে মনুস্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছিল, বলা হয়েছিল ব্রাহ্মণরা এসেছিল মাথা থেকে, শুদ্ররা এসেছিল পা থেকে। আমার প্রশ্ন হল হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে মনুস্মৃতির অবস্থান কোন স্তরে? আর এ কথাগুলো উঁচু স্তরের গ্রন্থ যেমন ঋগবেদ এ আছে কি?

উত্তর ঃ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ দুই প্রকার। শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতিকে বলা হয় মহান ঈশ্বরের বাণী। যেমন– বেদ ও উপনিষদ। আর স্মৃতি হল যে কথাগুলো মানুষ লিখেছে। এর মধ্যে আছে মহাভারত, রামায়ণ, পুরানা মনুস্মৃতি ইত্যাদি। তারা এটাকে ধর্মশাস্ত্রও বলে। এখানে আছে যেকোন একজন মানুষের এককভাবে কিভাবে জীবনযাপন করা উচিৎ ও সামাজিকভাবে কিভাবে চলা উচিৎ। তবে শ্রুতির তুলনায় এগুলোর গুরুত্ব কিছুটা কম। ধর্মশাস্ত্রগুলোর মধ্যে মনুস্মৃতিকে নিচু সারির শাস্ত্র ধরা হয়।

মনুস্মৃতিতে এসেছে যে, মহান স্রষ্টার মাথা থেকে ব্রাহ্মণ, বুক থেকে ক্ষত্রীয়, পাকস্থলী থেকে বৈশ্য ও পায়ের ধূলা থেকে এসেছে শুদ্র। এ কথাগুলোকে শুধু

মনুস্মৃতিতেই নয় অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও এসেছে এমনকি হিন্দুদের সর্বোচ্চ গ্রন্থ বেদেও একথা এসেছে। অবশ্য অনেক সংস্কারপন্থী হিন্দু বর্ণ প্রথাকে অস্বীকার করে বা মানে না।

প্রশ্ন ঃ ১৮। হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকায় দেখতে পেলাম যে, অম্বরনাথে মানুষের তৈরি একটি মূর্তির ব্যাপারে হিন্দুরা আপত্তি জানিয়েছে। একদিকে তারা মানুষের তৈরি মূর্তির পূজা করছে আবার অন্য দিকে বিরোধিতা করছে। আপনি তাদের এরূপ দ্বিমুখী নীতির সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে মানবরচিত মূর্তির বিরোধিতা করা হিন্দুদের দ্বিমুখী নীতি নয়; বরং এটা তারই প্রমাণ যে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঋগবেদ, ভগবত গীতার মূর্তিপূজার বিরোধিতা করা হয়েছে এবং তাদের ধর্মশাস্ত্রবিদরাও এটা জানেন। কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা এটা সাধারণ হিন্দুদের থেকে লুকিয়ে রাখেন অথবা তারা চান না যে, সাধারণ হিন্দুরা তাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলো পড়ুক। তবে যাই হোক অনেক সাধারণ হিন্দুই এখন তাদের মূল গ্রন্থগুলো পড়ে সচেতন হচ্ছে, যে জন্য তারা অভিবাদন পাওয়ার যোগ্য।

হিন্দুদের প্রতি আমাদের আহ্বান হল, আসুন আমরা আমাদের ধর্মগ্রন্থ ও আপনাদের ধর্মগ্রন্থ-এর মধ্যে যে বিষয়গুলো একই সেগুলো পালন করি বা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি। যে বিষয়গুলোতে আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে সেগুলো পাশে সরিয়ে রাখি, সেগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। যে বিষয়গুলো হিন্দুধর্ম ও ইসলামে এক তা হল–

০ ঈশ্বর এক

০ মূর্তিপূজা করা যাবে না

০ ঈশ্বরের কোনো সন্তান নেই

০ ঈশ্বর জন্ম নেননি।

০ সকল নবী-রাসূলকে বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এবং পরকালে বিশ্বাস করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ১৯। বর্তমানে ভারতে কিছু রাজনৈতিক দল মুসলিমদের জন্য আলাদা আসন রাখছে এবং মুসলিমদের কিছু পদবীকে গুরুত্ব দিচ্ছে। আমরা কি এটা মানব কিনা? কেননা আমরা জানি ইসলামের বর্ণ প্রথার স্থান নেই।

উত্তর ঃ হ্যাঁ। ইসলামে বর্ণপ্রথার বা জাতিভেদের কোনো স্থান নেই। তবে কেউ যদি দরিদ্র হয় এবং তাকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য আলাদাভাবে প্রাধান্য দেয়া হয় বা পৃথক দলে তাদেরকে চিন্তা করা হয় সেটা ভিন্ন কথা। তবে এক্ষেত্রে মানবীয় মর্যাদার কোন ভিন্নতা থাকতে পারবে না।

প্রশ্ন ঃ ২০। পত্রিকা পড়ে জানলাম ভারতবর্ষে এইডস আবির্ভূত হয়েছে ২০ বছর আগে এবং বর্তমানে এইডস রোগীর সংখ্যার দিক দিয়ে ভারত দ্বিতীয় স্থানে আছে। আমার প্রশ্ন হল এইডস কি কোন নতুন রোগ? এর ইতিহাস কি? এর কি কোন প্রতিকার নেই? এ রোগের প্রতিরোধের জন্য সেকেন্ডারি লেভেল থেকে নৈতিক শিক্ষা দেয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ এইডস একটা নতুন রোগ। এ রোগটা এসেছে কয়েক দশক আগে। এর কারণ হিসেবে অনেক কিছুই বলা হয়। যেমন– সমকামিতা, অবাধ যৌনাচার, অনেক যৌনসঙ্গী, সঙ্গী বদল করা, একই সিরিঞ্জ ব্যবহার করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে মাদক সেবনও একটা কারণ। কেননা মাদকসেবীরা একই সিরিঞ্জ ব্যবহার করে থাকে। তবে প্রধান কারণ অবাধ যৌনাচার। এ রোগের কারণ সম্পর্কে জানা গেলেও প্রতিকার সম্পর্কে জানা যায়নি।

পশ্চিমা বিশ্বে স্কুলে যৌন শিক্ষা দেয়া হয় এবং ইসলামেও যৌন শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে। তবে পশ্চিমা বিশ্বে যেভাবে যৌন শিক্ষা দেয়া হয় সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। টাইমস অব ইন্ডিয়ায় একটি রিপোর্ট এসেছিল, সেখানে বলা হয়েছে ইংল্যান্ডে ৪০% এর বেশি সংখ্যক মহিলা সন্তান জন্ম দিচ্ছে বিয়ে করার আগেই। বিশ বছর আগেও এটা এ সংখ্যাটা ছিল ২০%। আরও কয়েক দশক আগে এটা আরও কম ছিল। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১২ সালের মধ্যে এ সংখ্যা ৫০% এরও বেশিতে গিয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে তাদের সমাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং তারা এ কারণে স্কুলে যৌনশিক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু তাদের স্কুলে যৌনশিক্ষা দেয়ার পদ্ধতিটি বিস্ময়কর। যারা এইডসের সচেতনা বৃদ্ধি প্রোগ্রামের সাথে জড়িত তারা যৌনশিক্ষা নিতে গিয়ে বলছেন, যৌনকর্মের সময় যেন কনডম ব্যবহার করা হয়। বিস্ময়কর ব্যাপার হল তারা অবাধ যৌনাচার থেকে বিরত থাকতে বলছেন না। তাদের এ পদ্ধতি ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। এইডসকে প্রতিরোধ করতে হলে এর মূল কারণকেই প্রতিরোধ করতে হবে।

সুতরাং অবাধ যৌনাচার থেকে বিরত থাকার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সমাজ থেকে অশ্লীলতার বিস্তৃতি প্রতিরোধ করতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষদের ৮০% পর্ণ সাইটে যায় এবং এর মধ্যে ২০% পর্ণ সাইট ব্রাউজ করে অফিস টাইমে। নারীদের মধ্যেও ১৩% পর্ণ সাইটে যায় অফিসের সময়ে। এছাড়াও পর্ণ ম্যাগাজিনের ছড়াছড়ি তো আছেই। অথচ বিস্ময়কর হল পর্ণ সাইটের ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা পশ্চিমা বিশ্বে দেয়া হচ্ছে না; বরং কোনো কোনো অফিসে আলাদা বিনোদন কক্ষ রাখা হচ্ছে। আসলে পর্ণ সাইট, পর্ণ ম্যাগাজিন এগুলোর বিস্তৃতি রোধ না করে বরং পতিতাবৃত্তির মত অবাধ যৌনাচারকে উৎসাহিত করে শুধুমাত্র যৌনাচারের সময় কনডম ব্যবহারের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে

এইডস প্রতিরোধ করার পদ্ধতি পশ্চিমারা অনুসরণ করতে পারে, কিন্তু ইসলামে তা অনুমোদিত নয়। ইসলাম অনুযায়ী এইডস প্রতিরোধ করতে হলে অবাধ যৌনাচার প্রতিরোধ করতে হবে, পতিতাবৃত্তি, পর্ণসাইট, পর্ণ ম্যাগাজিন নিষিদ্ধ করতে হবে।

স্কুলে যৌন শিক্ষা দেয়া যেতে পারে, তবে এক্ষেত্রে ইসলামিক পদ্ধতি হল একজন বিশেষত আলেম যিনি ইসলাম ও মেডিকেল সাইন্স সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে তাদের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে এ শিক্ষা দেবেন। তবে এক্ষেত্রে কোনো অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। কোরআনে বর্ণিত আরবী শব্দগুলোকে ব্যাখ্যা করে মার্জিত ভাষায় তারা বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

ভাবতে অবাক লাগে যে, বর্তমানে মুম্বাই শহরে ৭০% এর বেশি মেয়ে স্কুল পাস করার আগেই তাদের কুমারিত্ব হারায়। এ রিপোর্টটি এসেছে এইডস সম্পর্কিত একটি সম্মেলনে। ইউনিভার্সিটি বা কলেজ নয়, স্কুলেই তারা কুমারিত্ব হারাচ্ছে! সুতরাং দ্রুত ও ব্যাপকভাবে ইসলামের আলোকে যৌনশিক্ষা প্রণয়ন করা দরকার। হয়ত এ পদ্ধতিতে প্রথম যে জেনারেশন বের হবে তারা সাফল্যের শিখরে আরোহণ করবে পর্যায়ক্রমে।

প্রশ্ন ঃ ২১। পবিত্র বাইবেলে আছে যীশু তার শিষ্যদের বলছেন, তোমরা মানুষকে ব্যাপটাইজ কর পিতা, পুত ও পবিত্র আত্মার নামে। এটার মানে কি ট্রিনিটি?

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে এটা পূর্ণাঙ্গ ট্রিনিটি নয়। বাইবেলে ট্রিনিটির ধারণার কাছাকাছি অনুচ্ছেদ আছে জনের প্রথম এপিস্টলের ৫নং অধ্যায়ের ৭নং অনুচ্ছেদে যেখানে বলা হচ্ছে :

স্বর্গের তিনজন সব হিসেব রাখেন পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। আর এরা তিনজন এক।

সুতরাং তিনজন লোক আছে বললে তিনটি হবে না। তবে তিনজন এক হলে সেটা ট্রিনিটি হবে। তবে বাইবেলে কোথাও ট্রিনিটি শব্দটি নেই। পবিত্র কোরআনে ট্রিনিটি শব্দটি আছে। সূরা নিসার ১৭১ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

'তোমরা ট্রিনিটি বল না। তোমাদের জন্য এটা কল্যাণকর।' এরপর সূরা মায়িদার ৭৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

'তারা কুফরি করছে যারা বলে, আল্লাহ হল তিনের মধ্যে একজন বা আল্লাহ হল তিনজন মিলে।'

পবিত্র কোরআনে ট্রিনিটি শব্দটি এসেছে দুইবার। তবে সাথে বলা হয়েছে একটা নিষিদ্ধ। পবিত্র বাইবেলের কোথাও ট্রিনিটি শব্দটি নেই। সবেচেয়ে কাছাকাছি যে

বাক্যটি সেটি হল পূর্বে উল্লিখিত গসপেল অব জনের প্রথম এপিস্টলের ৫ম অধ্যায়ের ৮৭ম অনুচ্ছেদে। তবে বাইবেলের রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সনে এই ব্যাখ্যাগুলো নেই। কারণ ৩২ জন উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টান বিশেষজ্ঞ যাদের পিছনে ৫০টি খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠান সমর্থন দিচ্ছে। স্ট্যান্ডার্ন ভার্সন গবেষণা করে বলেছেন যে, পবিত্র বাইবেলের এ অনুচ্ছেদটি বানানো হয়েছে, পরে লেখা হয়েছে এবং ঢুকানো হয়েছে। এ কারণে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বিকৃত বাইবেলের রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড এডিশন এ অনুচ্ছেদটি বাদ দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২২। আমরা জানি অধিকাংশ হোমিওপ্যাথি ওষুধে অ্যালকোহল থাকে। অনেকে বলে প্রায় ৯০% হোমিওপ্যাথি ওষুধে অ্যালকোহেল আছে। তাহলে হোমিওপ্যাথি ওষুধ কি খাওয়া যাবে? বিশেষ করে এমন রোগের ক্ষেত্রে যার চিকিৎসা শুধুমাত্র হোমিওপ্যাথি দিয়েই করা সম্ভব।

উত্তর ঃ যেহেতু হোমিওপ্যাথি ওষুধে অ্যালকোহল আছে, সুতরাং যেকোন রোগের ক্ষেত্রে আরো বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। যেমন– অ্যালোপ্যাথি দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। তবে যদি অ্যালোপ্যাথি দিয়ে কাজ নয় তখন সর্বশেষ উপায় হিসেবে হোমিওপ্যাথি গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধুমাত্র হোমিওপ্যাথি দিয়েই চিকিৎসা করা যায় এমন রোগ নেই বললেই চলে। তাই যেকোন রোগের ক্ষেত্রেই হোমিওপ্যাথি হবে সর্বশেষ উপায়।

প্রশ্ন ঃ ২৩। আমি কিছুদিন আগে উমরাহ্ করতে গিয়েছিলাম। সেখানে কিছু বিষয় লক্ষ্য করলাম যেটা কাম্য নয়। তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার চেয়ে বিলাসিতা ও অমিতব্যয়ীতাকে প্রাধান্য দিচ্ছে, যেমন– হোটেলের ভাড়া অনেক বেশি। অথচ প্রত্যেক মুসলমানেরই সেখানে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। এছাড়াও বিলাসিতা করে অনেক অনেক টাকা খরচ করা হচ্ছে। তাদের এ বিলাসিতার বিরুদ্ধে কি কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বা এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে অবগত করে কোন ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ আছে কি? ভারতে আমরা যে ধরনের মুসাফিরখানা দেখি যেখানে অল্প খরচে অথবা বিনে পয়সায় থাকার সুযোগ আছে এরকম কোন মুসাফিরখানার ব্যবস্থা আছে কি?

উত্তর ঃ আপনি যে বেশি ভাড়ার কথা বললেন, তা আসলে সিজনাল। মক্কা ও মদীনা হজ্জ মওসুমে এবং রমজান মাসে হোটেলের ভাড়া বেশি থাকে। অন্য সময় এ স্থান পৃথিবীর স্বল্প ব্যয়ের জায়গাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়াও আপনি হয়ত এ বিষয়ে অবগত নন যে, যে হোটেলেগুলো হারামাইন শরীফের কাছাকাছি সেগুলোর ভাড়াই বেশি। আপনি যেসব হোটেলের কথা বলছেন সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া মক্কার হারামাইন শরীফ থেকে একটু দূরবর্তী স্থানে সেগুলোর ভাড়া কম।

হারামাইন শরীফের কাছাকাছি জমির দাম বেশি হওয়ার কারণে সেগুলোর ভাড়া বেশি। সুতরাং যাদের সামর্থ আছে তারা সেখানে থাকবে, আর যাদের সামর্থ কম তারা দূরবর্তী হোটেলগুলোতে থেকেও হজ্ব সম্পন্ন করতে পারে।

মক্কা ও মদীনায় মুসাফিরখানাও আছে। সেখানে ফ্রি অথবা কম খরচে থাকার সুযোগ আছে। এভাবে কার্যত সবধরনের লোকেরই হজ্ব করার অথবা রোযার মওসুমে ওমরা করার সুযোগ আছে।

আর আপনি সৌদি সরকারের আর্থিক খরচে বিলাসিতা বললেন। আমি এর সাথে দ্বিমত পোষণ করছি। বরং আমি বলব সৌদি সরকার এ অধিক খরচ করার কারণেই সবধরনের লোক এবং লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ হজ্ব করার সুবিধা পাচ্ছে। সৌদি সরকার অনেক সুবিধা দিচ্ছে বিধায় হজ্বের সময় সরকারের খরচটা বেড়ে যায়।

হারামাইনের আশেপাশে যে হাম্মামখানা তথা টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে অনেক লোকের একসাথে টয়লেটে যাওয়ার সুবিধা আছে। তারা টয়লেটে মারবেল পাথর বসিয়েছে। কিন্তু একে আপনি বিলাসিতা বলতে পারেন না। কারণ, সৌদি সরকার হাজীদের সুবিধার জন্য এ ব্যবস্থা করেছে।

সৌদি সরকার অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মানুষরাও যেন হজ্ব করতে যেতে পারে, তার জন্য ভর্তুকি দিচ্ছে। তারা ভর্তুকি দেয়ার কারণেই বিমানের ভাড়া তুলনামূলক কম। এমনকি এর ফলে ব্যবসায়ী এয়ারলাইনস সবগুলো তাদের ব্যবসা ধরে রাখার জন্য ভাড়া কম রাখতে বাধ্য হচ্ছে। এ কারণে অসংখ্য লোকের হজ্বে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এছাড়াও সৌদি সরকার খাবারে ভর্তুকি দিচ্ছে। ফলে হজ্বের মৌসুমে কম দামে উন্নতমানের উত্তম ও সুস্বাদু উত্তম খাবার পাওয়া যাচ্ছে।

হজ্ব মৌসুমে বিদেশী হাজীদের ব্যবসা করারও অনুমতি দিয়েছে সৌদি সরকার।

জেদ্দা থেকে মদীনায় যাওয়া ও আসার বাস ভাড়া মাত্র ১৩০ রিয়াল। যেটা কার্যত অসম্ভব। কিন্তু এটা সম্ভব হচ্ছে, কারণ ধনী ব্যক্তিরা অতিরিক্ত ভাড়াটা ভর্তুকি দিচ্ছেন।

এভাবে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে একজন ব্যক্তির মক্কা বা মদীনায় প্রতিদিনের খাবার খরচ পড়ছে তুলনামূলক খুবই কম। আপনি যদি আমেরিকা বা ইউরোপে প্রতিদিনের থাকার খরচের সাথে তুলনা করেন তাহলেই কেবল এ পার্থক্যটা বুঝতে পারবেন।

সুতরাং এজন্য বরং সৌদি সরকারকে আমাদের ধন্যবাদ দেয়া উচিৎ। কারণ, তাদের এ সুযোগ সুবিধাগুলোর ফলে দরিদ্রদের পক্ষেও হজ্ব করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ ২৪। যাকাত কি শুধুমাত্র রমজান মাসেই দিতে হবে, অন্যান্য মাসে দেয়া যাবে না? এ ব্যাপারে কি সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম আছে?

উত্তর ঃ যাকাত দেয়ার মৌলিক নিয়ম হল যদি কোন ব্যক্তির সঞ্চয় নিসাবের চাইতে বেশি হয় তথা ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের চাইতে বেশি হলে এবং এ পরিমাণ সম্পদ তার কাছে এক বছরের বেশি সময় ধরে থাকলে তাকে যাকাত দিতে হবে।

সঞ্চয়টা বছরের যেকোন সময় থেকে শুরু হতে পারে। আর যাকাতও বছরের যেকোন সময়ে দেয়া যেতে পারে। এমন নিয়ম নেই যে রোযার মাসে দিতে হবে। তবে এভাবে একটা মাসকে শুধু হিসেবে ধরলে হিসেবের সুবিধা হয়। যেমন– ধরি, কারও জানুয়ারিতে আছে দুই লাখ, মার্চে এক লাখ, মে'তে তিন লাখ, এজন্য হিসেব করার জন্য একটা মাসকে শুরু ধরে নিলে হিসেবের সুবিধা হয়। সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি রমজানের একটি নির্দিষ্ট দিন যেমন– প্রথম রোজা অথবা ৫ম রোজা অথবা ১৫ রোজা ধরে সঞ্চয়ের সময়ের হিসাব শুরু করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে সৌর মাস যেমন– জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ইত্যাদি ধরা যাবে না। কারণ সৌর মাসে ১১ দিন বেশি থাকে। এভাবে ধরলে প্রতি ৩৩ বছরে আপনার এক বছরের যাকাত মিস হয়ে যাবে। আর যেহেতু অধিকাংশ মানুষ হিজরী সাল ও আরবী মাস সম্পর্কে ভাল জানে না সেহেতু তারা রোযার সময় একটা সময় বেছে নেয়।

তাছাড়া রমজান মাস পবিত্র মাস হিসেবেও এ সময়টাকে যাকাত দেয়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়। ধরা যাক, আপনি এক রমজান থেকে যাকাতের বছরের হিসাব শুরু করলেন। তাহলে তখন হিসেব অনুযায়ী নিসাবের চেয়ে বেশি যে পরিমাণ টাকা আপনার কাছে আছে তার ওপর আপনাকে যাকাত দিতে হবে। হয়ত এ সময় আপনার হিসেবের চেয়ে সামান্য কিছু টাকা বেশি দিতে হবে, তবে কম দেয়ার সুযোগ নেই।

এখন আপনার যদি পহেলা রমজানে থাকে দশ লাখ টাকা এর উপর আপনার যাকাত দিতে হবে। ধরা যাক পরবর্তী বছরের পহেলা রমজানে আপনার সঞ্চয় হল বিশ লাখ টাকা। তাহলে সে বিশ লাখ টাকার যাকাত দিতে হবে। এখন ধরি, এ বিশ লাখ টাকার মধ্যে ২ লাখ টাকা হয়ত ২ মাস আগে এসেছে। ফলে যদিও সে টাকাটার যাকাত হওয়ার কথা ১০ মাস পরে, কিন্তু আপনি রমযানেই যদি উক্ত বিশ লাখ টাকার যাকাত দিয়ে দেন তাহলে হয়ত আপনার কিছু টাকা বেশি দিতে হবে। তবে আপনি যাকাত আদায় না হওয়ার শংকা থেকে রক্ষা পাবেন। কারণ হিসেবে সর্বনিম্ন যে পরিমাণ যাকাত আপনার আসে তার চেয়ে কম দেয়ার অনুমতি নেই। এভাবে রমজানে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে নিলে আপনার কিছু টাকা বেশি দিতে হলেও হিসেবের গণ্ডগোল হবে না।

কেউ চাইলে ভাগে ভাগেও যাকাত দিতে পারে। কেউ হিসেব করল নির্দিষ্ট সময়ে তার সঞ্চিত সম্পদের যাকাত ৫ লাখ আসে। সে পর্যায়ক্রমে ৫০ হাজার করে

যাকাত প্রতিমাসে দিতে পারে। আবার পরবর্তী বছরের যাকাত পূর্বেই দিয়ে দেয়ার সুযোগ আছে অর্থাৎ আগাম যাকাত দেয়ার সুযোগ আছে। এমন কি দুই বছর আগের যাকাতও দিতে পারেন।

জনৈক সাহাবী যাকাত দেয়ার পর রাসূল ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, পরবর্তী বছরের যাকাতটাও তিনি দিতে পারবেন কিনা? রাসূলুল্লাহ তার অনুমতি দিলেন। তবে বছরের একটি নির্দিষ্ট মাস ধরে নিলে যাকাতের হিসেবে সুবিধা হয়। আবার ধরুন আপনি প্রথম রমজান থেকে আপনার সঞ্চয়ের হিসেব করা শুরু করলেন যে, আপনি পরবর্তী বছর যাকাত দেবেন। সেক্ষেত্রে আপনার পূর্বের যে টাকা সঞ্চিত আছে সেটার যাকাত পরিশোধ করতে হবে। এভাবে চিন্তা করা যাবে না যে এ বাকি টাকার যাকাত কয়েকমাস পরে আমি দেব। সেটা ভুল চিন্তা হবে।

সুতরাং যাকাত রমযানেই দিতে হবে এমন কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবে একটি মাসকে নির্দিষ্ট করে নিলে যাকাতের হিসেবে সুবিধা হয়। সেক্ষেত্রে যেকোন হিজরী মাসকেই নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ২৫। ধরুন আমার একজন ভদ্রলোকের সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছে। আমি কি ঐ ভদ্রলোক ও তার মায়ের সাথে হজ্ব করতে যেতে পারব? ইসলামে এ ব্যাপারে অনুমতি আছে কি?

উত্তর ঃ যে লোকের সাথে আপনার বিয়ে ঠিক হয়েছে বা এনগেজমেন্ট হয়েছে সে তখনও পর্যন্ত আপনার জন্য গায়রে মাহরাম। আর গায়রে মাহরামের সাথে হজ্ব ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আপনি আপনার বাবা, ভাই অথবা বিয়ের পরে আপনার স্বামীর সাথে হজ্বে যেতে পারবেন। কিন্তু হবু স্বামীর সাথে হজ্বে যাওয়ার অনুমতি ইসলামে নেই।

প্রশ্ন ঃ ২৬। আমরা খ্রিষ্টানদের প্রায়ই বলতে শুনি সেইন্ট পিটার্স, সেইন্ট জোসেফ, সেইন্ট অ্যান্টিন ইত্যাদি। আসলে এ সেইন্ট বলতে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ খ্রিষ্টান ধর্মমতে, সেইন্ট মানে একজন পবিত্র লোক, যে আল্লাহর কাছে থাকে। তাদের বিশ্বাস হল সেইন্ট উপাধি দিতে পারেন একমাত্র পোপ। সেইন্ট উপাধি তখন-ই দেয়া যায় যখন লোকটি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তার দুটি অলৌকিক কাজ ছিল। সম্প্রতি মাদার তেরেসার মৃত্যুর পর মাদার তেরেসাকে সেইন্ট উপাধি দেয়ার ব্যাপারে ভ্যাটিকান সিটিতে মিটিং বসেছিল। কিন্তু তার একটিমাত্র অলৌকিক কাজ তারা খুঁজে পেয়েছিলেন বিধায় তাকে সেইন্ট উপাধি দেন নি।

প্রশ্ন ঃ ২৭। কিভাবে একজন অমুসলিমকে ইসলামের পথে আহ্বান জানাবে?

উত্তর ঃ পবিত্র কোরআনে ধর্মপ্রচারের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বলা আছে। সূরা নাহলের ১২৫নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর হিকমত এবং সবচেয়ে উত্তম ও গ্রহণযোগ্য পন্থায়।"

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, আমরা সব মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করব হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করতে হবে সবচেয়ে উত্তম ও গ্রহণযোগ্য পন্থায়।

হিকমাত যা পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে কোথাও বলা হয়নি। কোরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় সেটা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সেটাও পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে বদলায়। যেমন ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা দেন তাদের অসুস্থতা ও অসুস্থতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে। দাওয়াতের ক্ষেত্রেও তেমনি অমুসলিম বন্ধুকে আগে বুঝতে হবে। অতঃপর তার মনমানসিকতা বুঝে তাকে দাওয়াত দিতে হবে। এটাই হল হিকমাত।

হিকমাত বলতে নরম গলায় বলাও হতে পারে, আবার জোরে জোরে বলাও হতে পারে। আবার কারও নিকট হিকমা হল বিজ্ঞান ও ইতিহাস নিয়ে বলা। দাওয়াত দেয়া হল আবশ্যক। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতিতেই দেয়া আবশ্যক নয়।

দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে দক্ষ হতে হলে প্রথমে আপনার জানা উত্তম পদ্ধতিতেই অগ্রসর হবেন। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে আছে,

"আমার নিকট হতে একটি আয়াত জানলেও তা প্রচার কর।"

অর্থাৎ আপনার যতটুকু জানা আছে, আপনি যদি নিশ্চিত হন যে তা সঠিক; তবে তা প্রচার করুন। প্রথমেই আপনাকে শেখ আহমদ দিদাত হতে হবে, তারপর দাওয়াত শুরু করবেন এমন কোন কথা নেই।

আমার মতে দাওয়াত দেয়ার একটি মূলমন্ত্র আছে যা পবিত্র কোরআনের সূরা আল ইমরানের ৬৪নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۔

অর্থ : "বল হে আহলে কিতাব! এস সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক। আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করি না, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করি না। আমাদের মধ্যে কাউকে আল্লাহ ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ করি না। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল, "তোমরা সাক্ষ্য থাকো যে, আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী।"

এটা হল অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার একটি পদ্ধতি। যা আল্লাহ তায়ালা আমাদের শিখিয়েছেন। সুতরাং আপনি যদি জানেন যে, আপনার বন্ধুর সাথে আপনার সাদৃশ্যগুলো কি কি? তবে আপনি আরও ভালভাবে দাওয়াত দিতে পারেন। শুরুতে আপনি আপনার অমুসলিম বন্ধুটিকে ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিতে পারেন, তাকে পুস্তিকা বা ভিডিও সিডি দিতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ ২৮। নবী ﷺ বলেছেন, "আমার কাছ হতে একটি আয়াত হলেও প্রচার কর।" অথচ অনেকে দাওয়াত দিতে গেলে বলে জুম্মায় জুম্মায় আট দিনও হয়নি এখনই এ অবস্থা। এদের জবাবে কি বলব?

উত্তর ঃ আপনি যে কথাটা বললেন তা কেবল একজন মুসলিম-ই আপনাকে বলবে। আপনি তাকে জবাব দিবেন যে, "জুম্মায় জুম্মায় আট দিন হতে হলে তা অনেক দেরি হয়ে যাবে অথচ আমাদের নবী ﷺ বলছেন, একটি আয়াত জানলেও তা প্রচার কর। সুতরাং দাওয়াতী কাজ এখনই শুরু করতে হবে। আপনি যদি নবীজী ﷺ -কে মানেন তবে একটি আয়াত জানা মাত্রই তা প্রচার শুরু করে দিন।"

অমুসলিমরা আপনাকে এ ধরনের কথা বলবে না। এজন্য তাদের ক্ষেত্রে দাওয়াতের পদ্ধতিও ভিন্ন হবে। দাওয়াত দেয়ার একটা কৌশল হল কোন বাধা না দেয়া প্রতিপক্ষের বক্তব্য দিয়েই তাকে ধরাশায়ী করা। দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে ভয় বা লজ্জা পাওয়া যাবে না; বরং প্রতিপক্ষের যেকোন প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধিমত্তা সহকারে দিতে হবে। পবিত্র কোরআনের সূরা আনকাবুতের ৬৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا -

অর্থ ঃ "যারা আমার জন্য চেষ্টা সাধনা করে তাদেরকে আমি পথ দেখাব।"

সুতরাং যতটুকুই আমরা জানি তা নিয়েই দাওয়াত শুরু করতে হবে এবং চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ মৌলিক বিষয় হল আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা চালানো।

প্রশ্ন ঃ ২৯। আমরা জানি, মুসলিমদের জন্য দাওয়াত দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মুসলিম মহিলাদের জন্য দাওয়াত দেয়াটা খুব কঠিন। তারা ঘরের দেখাশোনা করে, ভদ্রতা বজায় রাখে। আর সে যদি অন্তর্মুখী হয় তাহলে তার জন্য দাওয়াত দেয়াটা আরও কঠিন। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কি?

উত্তর ঃ দাওয়াত দেয়া শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, আবশ্যক। সুতরাং আপনার দওয়াত দিতে হবে। অনেক মানুষের ধারণা যে শুধুমাত্র বহিঃমুখী হলেই দাওয়াত দিতে পারবেন। আরেকটা ভুল ধারণা হল দাওয়াত মানে কথা বলা। দাওয়াত মানে শুধু কথা বলা নয়। চিঠি লেখা, ই-মেইল, এসএমএস ইত্যাদি প্রক্রিয়ায়ও দাওয়াত দেয়া যেতে পারে। সুতরাং অন্তর্মুখী কোন নারীর পক্ষেও দাওয়াত দেয়া কঠিন কিছু

নয়। তবে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিপর্যায়ে পুরুষ কেবল পুরুষ ও নারী কেবল নারীদের দাওয়াত দিতে পারবে।

দাওয়াত দেয়া শুরু করতে হয়ত দ্বিধা বা সংকোচ কাজ করতে পারে। লজ্জার কারণে দাওয়াত দিতে বিব্রতবোধ করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর পথে কেউ জিহাদ করলে তার পথ আল্লাহ্ সহজ করে দেন। আমি নিজে এক সময় তোতলা ছিলাম। পরবর্তীতে দাওয়াতের কাজ শুরু করতে আল্লাহ্ আমার ভাষার জড়তা দূর করে দিয়েছেন। সুতরাং আপনি যদি দাওয়াতের কাজ শুরু করেন আল্লাহ্ আপনার পথ সহজ করে দেবেন। আল্লাহ্ সাহায্য করলে কেউ তাকে হারাতে পারে না, আর আল্লাহ্ সাহায্য না করলে কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। সূরা আলে ইমরানের ১৬০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "মুমিনদের শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত।"

অনেক সময় শুধুমাত্র আপনার বাহ্যিক বেশভূষা ও চালচলনের মাধ্যমেও আপনি দাওয়াত দিতে পারবেন। এরকম একবার হয়েছিল আমাদের IRF-এ। আমরা মহিলাদের দাওয়াতের ট্রেনিং দেয়ার জন্য দায়ী সংগ্রহ করছিলাম। আমি ও আমার বোন তাদেরকে তাদের সাথে কথা বলছিলাম প্রশ্ন করেছিলাম ও প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলাম। তাদেরকে আমরা পর্দা বা পোশাক সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কথা না বললেও তাদের মাঝ হতে দুই একজন অমুসলিম প্রশ্ন করেছিল যে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের কী পোশাক পরে আসতে হবে? শাড়ি বা স্যালোয়ার কামিজ পরে আসা যাবে কি না? এর কারণ তারা আমার বোনকে দেখেছিল হিজাব পড়া অবস্থায়। সুতরাং এক্ষেত্রে তার বাইরের এপেয়ারেন্সটাই তার দাওয়াতী মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে।

সুতরাং আপনি দাওয়াতী কাজ শুরু করেন, এরপর আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। আল্লাহ্ আপনার কাজ সহজ করে দেবেন।

প্রশ্ন ঃ ৩০। আমরা জানি, ইসলাম অ্যানথ্রোপোমরফিজম-এর দর্শনে বিশ্বাস করে না। তাহলে ইসলাম-ই কেন বলছে, আল্লাহর হাত আছে কিংবা কেয়ামতের দিন আমরা আল্লাহকে দেখতে পাব?

উত্তর ঃ অ্যানথ্রোপোমরফিজম মানে হল পৃথিবী স্রষ্টার এমন জীবজন্তুর রূপ নিয়ে আসা যেগুলো সম্পর্কে মানুষের জানা আছে। যেহেতু স্রষ্টা জীবের রূপ নিয়ে আসছে, মানুষ ঐ জীবরূপী ঈশ্বরকে সম্মান দেবে। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের দর্শনে বিশ্বাস করে না।

অ্যানথ্রোপোমরফিজমের ভিত্তি হল এ বিশ্বাস যে, "আমাদের সৃষ্টিকর্তা এত মহান, এত পবিত্র, এত ধার্মিক যে তিনি মানুষের অসুবিধাগুলো বুঝতে পারেন না। তিনি এত পবিত্র ও বিশুদ্ধ যে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন না (নাউযুবিল্লাহ) যে, মানুষের কেমন লাগে যখন ব্যথা পায় বা কোন সমস্যা বা বিপদে পড়ে। তাই তিনি একজন মানুষ হয়ে জানতে চান যে কোনটা মানুষের জন্য ভাল আর কোনটা খারাপ।"

অন্য কথায়, স্রষ্টা এত পবিত্র যে, তিনি মানুষের সীমাবদ্ধতাগুলো উপলব্ধি করতে পারেন না, তাই তিনি মানুষ হয়ে জানতে চান তাদের সীমাবদ্ধতাগুলো এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে চান।

এ যুক্তিটা শুনতে খুব ভাল মনে হতে পারে। কিন্তু একজন মানুষ যদি একটি ভিসিআর তৈরি করে, উক্ত ভিসিআরের সমস্যাগুলো বুঝতে কি তার ভিসিআর হতে হবে? অবশ্যই না; বরং ভিসিআরটির তৈরিকারী হিসেবে তার নিজেরই জানা থাকবে যে, ভিসিআরটি কিভাবে চালালে সমস্যা সৃষ্টি হবে আর কিভাবে চালালে কোন প্রকার সমস্যা ছাড়াই চলবে? সে এ জ্ঞান থেকে একটা ব্যবহারবিধি তৈরি করবে যেন ভিসিআর যে চালাবে সে সঠিকভাবে চালাতে পারে।

একইভাবে মানুষ জাতির স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষের জন্য যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারবিধি দিয়েছেন, তা হল পবিত্র কোরআন।

এখন অনেকে মনে করেন কোরআনে যে আল্লাহর হাতের কথা বলা আছে তা মানুষের হাতের মত। বিশেষ করে যারা এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন তারা এমনটিই মনে করে থাকেন।

পবিত্র কোরআনের সূরা শূরার ১১নং আয়াতে বলা হয়েছে–

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ ـ

অর্থ ঃ "কোন কিছুই তার সাদৃশ্য নয়।"

অর্থাৎ আল্লাহর সাদৃশ্য কোন কিছুই নেই। তিনি শোনেন ও দেখেন, তবে সে শোনা বা দেখা আমাদের মত নয়। একইভাবে সূরা ইখলাসের ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

অর্থ ঃ "তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

সুতরাং কোরআনের যেখানে আল্লাহ হাতের কথা বলছেন সেখানে তিনি মানুষের হাতের মত কোন হাতের কথা বলছেন না। এভাবে কোরআন ও হাদীসের মধ্যে এ ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হলেও সে বৈশিষ্ট্যগুলো তার কোন সৃষ্টির সাথে

সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। সুতরাং তিনি তাঁর হাত বলতে কি বুঝিয়েছেন, তা কি রকম সে ব্যাপারে তিনিই ভাল জানেন। ঠিক তেমনি মানুষের মত তাঁর শ্রবণশক্তি শব্দ তরঙ্গের ওপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং তিনি কিভাবে শুনেন তা তিনিই ভাল জানেন। আর আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে বলা যায় যে, পৃথিবীর এ চোখ দিয়ে তাঁকে দেখা যায় না, এটা নিশ্চিত। তবে কেয়ামত দিবসে তাঁকে দেখা যাবে এবং কিভাবে দেখা যাবে সে ব্যাপারে তিনিই ভাল জানেন।

অন্যান্য ধর্মে অ্যানথ্রোপোমরফিজম বলতে মানুষ-ঈশ্বরকে বুঝায়। ঈশ্বর যখন মানুষের রূপ নিয়ে জন্মান তখন তার খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। অথচ পবিত্র কোরআনের সূরা আনআমের ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ -

অর্থ ঃ "তিনি খাদ্য দান করেন, তাকে কেউ খাদ্য দান করে না।"

আবার মানবরূপী ঈশ্বরের ঘুমানোর দরকার হয়। পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ২৫৫নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ -

অর্থ ঃ 'আল্লাহ চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর, তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। তিনি কখনও ঘুমান না এবং তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।'

সুতরাং কোরআনে আল্লাহর হাতের যে কথা বলা আছে তা অ্যানথ্রোমরফিজম নয়। তাই এর প্রকৃত অর্থ বা রূপ কি তা আল্লাহ-ই ভাল জানেন। আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা এবং কোন সৃষ্টির সাথে তার সাদৃশ্য নেই।

প্রশ্ন ঃ ৩১। মহিলারা বাইরে কাজ করতে পারবে কি? তারা কি ক্যারিয়ার গড়তে পারবে?

উত্তর ঃ পুরুষকে যেমন উপার্জন করতেই হবে তেমনি মহিলারা কাজ করবেই এটা আবশ্যক নয়। ইসলামে একজন নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব বিয়ের আগে তার বাবা বা ভাইয়ের আর বিয়ের পরে তার স্বামীর। অর্থাৎ ইসলাম অনুযায়ী অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব পুরুষের, নারীর নয়। তবে কোন নারী নিজের ইচ্ছায় উপার্জন করতে চাইলে করতে পারবে। আর যদি সে বলে আমি কাজ করতে চাই না তাহলে স্বামী জোর করতে পারবে না।

ইসলাম ধর্মে নারী ও পুরুষ সমান। কিন্তু এ সমান মানে অভিন্ন নয়। কোন পুরুষ যদি চায় যে সে গর্ভধারণ করবে তা কি সম্ভব? সম্ভব নয়।

ইসলামে কিছু কাজ ফরজ, কিছু সুন্নত আর কিছু নফল। অর্থাৎ কাজের বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে। লক্ষ্যণীয় যে, এ ক্যাটাগরি অনুযায়ী পুরুষদের ওপর নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়া ফরজ। এছাড়া নারী পুরুষের শারীরিক ও মানসিক গঠন

ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে কাজের ভিন্নতা থাকবে। এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং, নারীরা যদি প্রয়োজনে উপার্জন করতে চায়, করতে পারবে, শর্ত হল তারা হিজাব পরবে, পুরুষ ও নারীর কর্মস্থল হবে আলাদা। তারা একসাথে কাজ করবে না। প্রয়োজন হলে তারা কথা বলতে পারবে, কিন্তু প্রয়োজন ব্যতীত গল্প, গুজব, আড্ডা, হাসি-তামাশা ইত্যাদি করা যাবে না। নারী পুরুষ একসাথে কাজ করার ফল কি হয় তা সবারই জানা।

মহিলারা শিক্ষক হতে পারে, ডাক্তার হতে পারে, কাপড় বানাতে পারে, এমনকি ব্যবসায়ীও হতে পারে। তবে কর্মক্ষেত্র আলাদা হতে হবে।

কিছু কিছু কাজ মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ। আবার কিছু কিছু কাজ পুরুষদের জন্যও নিষিদ্ধ। কিছু কাজ উভয়ের জন্যই হারাম। মহিলাদের মডেলিং করা, নাচার সুযোগ ইসলামে নেই। তেমনি পুরুষ বা নারী কারও জন্যই মদের দোকানে কাজ করা জায়েয নেই। জুয়ার আসরে কাজ করাও উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ।

মহিলারা অবশ্যই ক্যারিয়ার গড়তে পারবে, তবে তা ইসলামী শরীয়ার মধ্যে থেকে। মহিলাদের প্রধান দায়িত্ব হল মা ও স্ত্রী হিসেবে। কিন্তু মহিলারা যদি তাদের এ দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন না করে শুধু চাকরিতে মনোনিবেশ করে তাহলে তারা তাদের ইসলাম প্রদত্ত সম্মান হারাবে। একজন মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে–

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ .

অর্থ ঃ "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।"

এছাড়াও সহীহ বুখারীর বুক অব আদাব ৮ নং খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২য় হাদীসে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ .

অর্থ : "একজন লোক নবীজী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রশ্ন করল, সবচেয়ে বেশি ভালবাসা কার প্রাপ্য? নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে লোকটিকে বললেন তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? নবীজী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? নবীজী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবারও বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কাকে ভালবাসব। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, তোমার বাবা।

অর্থাৎ চারভাগের তিনভাগ ভালোবাসা ও সাহচর্য পাবেন মা ও একভাগ পাবেন বাবা। কিন্তু যে সকল মহিলারা তাদের ক্যারিয়ারের পিছনে গুরুত্ব বেশি দিচ্ছে, তারা তাদের এ বিশাল সম্মান হারাচ্ছে। এখানে হালাল ক্যারিয়ারের কথাই বলছি। হারাম কাজ যেমন মডেলিং করার প্রশ্নই ওঠে না।

যাই হোক, ইসলামী সীমার মধ্যে থেকে মহিলারা ক্যারিয়ার গড়তে পারবেন। যাতে করে জান্নাতে যাওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ ৩২। আমি একজন হিন্দু। আমার মতে আমরা যে যে ধর্মের অনুসারী হই না কেন, আমরা সবাই ঈশ্বরের উপাসনা করছি। আমাদের উপাসনার নিয়ম হয়ত আলাদা, কিন্তু আমার মনে হয় উপাসনার নিয়মটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল মন থেকে উপাসনা করা। আমাদের হিন্দুধর্মের দর্শন বলছে যে কোন মানুষই মর্যাদার দিক দিয়ে উচ্চতর স্তরে যেতে পারবে, কিন্তু আপনার মতে নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপরে কেউ যেতে পারবে না। আমি এ বিষয়ে আপনার সাথে একমত নই। এ বিষয়ে আপনার কর্তব্য কি?

উত্তর ঃ আপনি বললেন যে, উপাসনার পদ্ধতি যাই হোক না কেন মন থেকে উপাসনা করতে হবে। কিন্তু ভাই মন থেকে করলেও ঠিক কাজ করতে হবে। কেউ যদি মন থেকে চুরি করে সেটা কি ঠিক হবে? অর্থাৎ আপনি মন থেকে পূজা করছেন ঠিক আছে, কিন্তু কার পূজা করছেন, কেন করছেন এবং কিভাবে করছেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি মন দিয়ে চোরের পূজা করে বা রাবনের পূজা করে কিংবা বলে আমি রাক্ষসের পূজারী, তাহলে আপনি কি মেনে নেবেন? মানার কথা নয়, আর যদি মেনেও নেন তাকে আপনি নিচু স্তরে রাখবেন, উপরের স্তরে নয়। আমরা চাই, সব মানুষই যেন উপরের স্তরে থাকে, তাই নয় কি? আর যদি একটা ভাল কাজ দুটো পদ্ধতিতে করা যায় এবং দুটোই ঠিক হয় তাহলে উভয়টিই মেনে নিতে কোন সমস্যা নেই।

এখন উপরের স্তরে পৌছার ব্যাপারটিতে আসা যাক। ইসলাম অনুসারে আল্লাহর পরে মর্যাদার দিক দিয়ে নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর স্থান। কোন মানুষ তাঁর ওপরে যেতে পারবে না। কারণ আমরা জানি মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এবং কোরআন হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উপরের স্তরের হলেন নবী রাসূলগণ। এছাড়া মুহাম্মদ ﷺ-এর পরে কোন নবী অথবা রাসূল আসার সম্ভাবনা নেই। কোরআনে সূরা আহযাবের ৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ـ

অর্থ ঃ "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন। তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।"

যদি কেউ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর পর নবুয়তের দাবি করে তার উচিৎ পাগলের ডাক্তার দেখানো। সুতরাং কোরআন ও হাদীসে বিশ্বাসী মানুষ মাত্রই এ বিশ্বাস রাখবে যে, কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় নবী রাসূলদের মত মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া, তবে তাদের মত মর্যাদা লাভের জন্য যে কেউ চেষ্টা করতে পারবে। অর্থাৎ তাদের ১০০% মেনে চলার চেষ্টা করা যেতে পারে। এমনকি হয়ত চেষ্টা করতে করতে কেউ কাছাকাছি পৌছেও যেতে পারে। কিন্তু তাদের স্তরে পৌছানো সম্ভব নয়।

হিন্দুধর্ম অনুসারে মানুষ শুধু নবী নয়; বরং অবতারও হতে পারে তথা ঈশ্বরের স্তরে পৌছাতে পারে। তবে এ স্তরে পৌছার জন্য ঈশ্বরের ভক্তি করতে হবে তথা ধ্যান করতে হবে দুনিয়াদারী বাদ দিয়ে। অন্যদিকে ইসলাম অনুসারে দুনিয়াদারী ও ধর্মের পরীক্ষা একটা অংশ। দুনিয়াদারী বাদ দিযে পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হওয়া সম্ভব নয়; বরং সবকিছু ভারসাম্য বজায় রেখে করাই ইসলাম। ইসলাম অনুযায়ী মানুষ ঈশ্বরের স্তরে পৌছতে পারবে না, কারণ তিনি মানুষ নন। আর নবী-রাসূলগণ হলেন ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত মানুষ যারা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হন। এ কারণে মানুষের পক্ষে তাদের স্তরেও পৌছানো সম্ভব নয়।

সুতরাং এ বিষয়ে হিন্দুধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের পার্থক্য আছে। কিন্তু আসুন আমাদের যে পার্থক্যগুলো আছে সেগুলো ভুলে যাই আর যেগুলো আমাদের উভয় ধর্মে কমন সেগুলো পালন করার চেষ্টা করি।

আপনি মনে করেন বেদ আল্লাহর বাণী। আমি মনে করি কোরআন আল্লাহর বাণী। এ প্রসঙ্গে আমাদের বিশ্বাস আলাদা। তাই এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলব। আগে যেগুলো এক সেগুলো পালন করি। অর্থাৎ যেহেতু বেদ বলছে ঈশ্বর একজন, কোরআন বলছে ঈশ্বর একজন, সুতরাং ঈশ্বর একজন। বেদ বলছে মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর নবী হিসেবে আসবেন কোরআনও বলছে নবী, সুতরাং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর নবী। কুরআন বলছে মেয়েদের পর্দা করতে হবে, বেদও বলছে করতে হবে, সুতরাং মেয়েদের পর্দা করতে হবে। এভাবে যে হুকুমগুলো আপনাদের ও আমাদের মধ্যে এক আসুন সেগুলো আগে পালন করি, বাকিগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

প্রশ্ন ঃ ৩৩। একবার একজন খ্রীস্টান বন্ধুর সাথে আমার কথা হচ্ছিল কোরআন ও বাইবেল নিয়ে। সে বলল খ্রীস্টানরা আদি পাপে বিশ্বাস করে। আর বাইবেলেও নাকি লেখা আছে কেউ যদি খারাপ কাজ করে তার সাত বংশ এর পাপের বোঝা বহন করে। আর ডায়াবেটিস জাতীয় বংশগত রোগগুলো নাকি আদি পাপের সত্যতার প্রমাণ। এর উত্তরে উক্ত বন্ধুকে কি বলা যায়?

উত্তর ঃ আপনি বাইবেলের পাপের বোঝা বহন সম্পর্কিত যে কথাটি বললেন, সেটি কোথাও লেখা আছে বলে আমার জানা নেই। তবে বাইবেলের বুক অব ইজাকেল

১৬ নং অধ্যায়ের ২০ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্ট লেখা আছে, যে পাপ করবে সে মারা যাবে। বাবা তার ছেলের পাপের বোঝা বহন করবে না। খারাপ লোকের খারাপ কাজ তার কাছেই থাকবে। ভাল লোকের ভাল কাজও তার সঙ্গেই থাকবে। তবে খারাপ লোক তার পথটা বদলে ভাল পথে আসলে সে মারা যাবে না।

সুতরাং বাইবেল বলছে, যে পাপ করছে সে মারা যাবে অর্থাৎ পাপের জন্য পাপী ব্যক্তিই দায়ী থাকবে। কোরআনেও একই কথা আছে। কোরআন বলছে, কোন বহনকারীই অন্যের বোঝা বহন করবে না। আবার কোরআন যেমন বলছে তওবা করে ফিরে আসার কথা, বাইবেলও তেমনি বলছে কেউ খারাপ পথ থেকে ভাল পথে ফিরে এলে পুরস্কৃত হবে।

বাইবেলের কোথাও আদি পাপের কথা বলা হয়নি। এটা বাইবেলের মতবাদ নয়। এ কথাটি এনেছে চার্চ। অধিকাংশ খ্রীস্টানদের বিশ্বাস আদম ও হাওয়া (আ)-এর নিষিদ্ধ ফল খেতে বারণ করা হয়েছিল। হাওয়া আদম (আ)-কে প্রলুব্ধ করলেন সেই ফল খাওয়ার জন্য। সেই পাপের বোঝাই আমরা বহন করে চলছি।

কিন্তু এ ধরনের বিশ্বাসের যৌক্তিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ আছে। আদম কি আমাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করে ফল খেয়েছিলেন যে আমরা তার জন্য দায়ী থাকব? যদি আমার বাবা কাউকে খুন করেন পুলিশ কি এসে আমাকে ধরবে? যেহেতু খ্রীস্টানরা আদি পাপে বিশ্বাস করে, তাদের উচিত তাদের দেশে এমন আইন পাস করা যে, বাবার অপরাধের জন্য ছেলেকেও শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু তারা তা কখনই করবে না। কোন দেশেই এ ধরনের আইন হতে পারে না। কারণ তা অযৌক্তিক। সুতরাং কারও আদি পাপের জন্য তার বংশধররা দায়ী থাকবে এ ধারণা অযৌক্তিক।

একজন ডাক্তার হিসেবে আমার জানা আছে, ডায়াবেটিস একটি বংশগত রোগ। তবে ডায়াবেটিস জাতীয় বংশগত রোগগুলো আদি পাপের শাস্তি হিসেবে এসেছে এ কথা বাইবেলের কোথাও লেখা নেই। যদি এ যুক্তি সত্য ধরে নেয়া যায় যে, জেনেটিক্যালি এ রোগ পাপের বোঝা হিসেবে পরিবাহিত হচ্ছে, তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে অনেক স্মাগলার, রেপিস্টদের সন্তানরা বুদ্ধিমান ও ভাল হয়। এটা কি কারণে হয়? এক্ষেত্রে তো উল্টো তাদের আরও খারাপ হওয়ার কথা।

প্রকৃতপক্ষে ডায়াবেটিস কোন পাপের বোঝা নয়; বরং এটি একটি পরীক্ষা। আল্লাহ এই পরীক্ষা দিয়েছেন মানুষের ধৈর্য যাচাই করার জন্য। তিনি দেখতে চান যে, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি কি ধৈর্য ধারণ করে নাকি বলে যে, আল্লাহ কেন এ রোগ দিলেন, ডায়াবেটিস কেন হল ইত্যাদি? পবিত্র কোরআনে সূরা মূলকের ২ নং আয়াতে বলেছেন,

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ـ

"তিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এ জন্য যেন তিনি দেখে নিতে পারেন তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলকারী।"

অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যু দেয়া হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য। এছাড়াও কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন ভয়ভীতি রোগব্যাধি ধনসম্পদের ক্ষতি দিয়ে।

একজন স্মাগলারের ছেলেকে তার জন্য শাস্তি দেয়ার সুযোগ নেই। যদি প্রমাণ করা যায় যে, চুরি করা, ধর্ষণ এগুলো জেনেটিক্যালি পরিবাহিত হচ্ছে তখন ছেলের অপরাধের জন্য বাবাকে দায়ী করা যেতে পারে।

সুতরাং ডায়াবেটিস কোন আদি পাপের বোঝা নয় বরং এটি পরীক্ষা।

প্রশ্ন ঃ ৩৪। এমন কোন মুসলিম কি আছে যে বিশ্বাস করে যে, পবিত্র কোরআন ও বাইবেল দুটোই আল্লাহর বাণী? এমনটি করা কি সম্ভব যে, পবিত্র কোরআন ও বাইবেল দুটোই মানব?

উত্তর ঃ মুসলিমরা ঈসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিলে বিশ্বাস করে। ইসলামই একমাত্র অখ্রীস্টান ধর্ম বিশ্বাস যেখানে ঈসা (আ)-কে নবী হিসেবে বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলক। সে মুসলিম মুসলিম নয়, যে ঈসা (আ)কে বিশ্বাস করে না। মুসলিমরা বিশ্বাস করে, ঈসা (আ) আল্লাহর রাসূল ছিলেন তিনি মসীহ, তার জন্ম হয়েছিল অলৌকিকভাবে কোন পুরুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই। তিনি আল্লাহর আদেশে জীবিতকে মৃত করতে পারতেন এবং আল্লাহর আদেশে তিনি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীদের সুস্থ করতে পারতেন। ঈসা (আ)-এর উপর আল্লাহর ওহী নাযিল হয়েছিল আর সেটা হল ইঞ্জিল।

যেকোন ব্যক্তিই যদি মনোযোগ দিয়ে বাইবেল পড়ে সে বুঝতে পারবে যে, এ বাইবেল সেই ওহী নয় যা যীশু খ্রিস্টের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। বাইবেল শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ বিবলোস থেকে। যার অর্থ অনেকগুলো বই। একজন খ্রীস্টান মাত্রই জানে যে বাইবেল হল অনেকগুলো বইয়ের সংগ্রহ। প্রোটেস্টেন্টদের মতে বইয়ের সংখ্যা হল ৬৬ এবং ক্যাথলিকদের মতে ৭৩টি।

মুসলিমদের মধ্যে যারা শরীয়াহ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন তাদের মতে, বর্তমানে যে বাইবেল প্রচলিত তার পুরোটা আল্লাহর বাণী নয়। বাইবেলের সামান্য কিছু অংশ আল্লাহর বাণী, কিছু অংশ যীশু খ্রিস্টের কথা আর কিছু অংশ ঐতিহাসিক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে এর কিছু অংশে আছে পর্ণোগ্রাফি, পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা ও অবৈজ্ঞানিক উক্তি– যেগুলোকে আল্লাহর বাণী ভাবার সুযোগ নেই।

সুতরাং বর্তমান বাইবেল সেই ইঞ্জিল নয়, যা ঈসা (আ)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। মূলত বাইবেল একটি মিশ্র গ্রন্থ। অতএব সামগ্রিকভাবে একে আল্লাহর বাণী ভাবার সুযোগ নেই।

বাইবেল ও কোরআনের মধ্যে কতগুলো জায়গায় সাদৃশ্য আছে। মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি বলতে চাই যেহেতু আমরা জানি, ঈসা (আ)-এর ওপর আসমানী কিতাব ইঞ্জিল নাযিল হয়েছিল সেহেতু বাইবেলের সে কথাগুলো কোরআনের সাথে তথা সর্বশেষ আসমানী কিতাবের সাথে মিলে যায় আমরা সেগুলো মেনে নেব। আপনারা যদি ওল্ড টেস্টামেন্টে ও নিউ টেস্টামেন্টের কথা বলেন তাহলে কোরআন হল লাস্ট টেস্টামেন্ট। প্রশ্ন আসতে পারে যে, কোরআনকেও কেন মানদণ্ড হিসেবে নেব? এর উত্তর হল কোরআনই হল একমাত্র আসমানী কিতাব যা অপরিবর্তিত আছে। বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করলে সবগুলো ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কেবল কোরআনই পাস করবে। কোরআনে কেন একটাও অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা নেই, নেই কোন ভুল।

ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার একটি গ্রন্থে কোরআনের ৩০টা বৈজ্ঞানিক ভুল দেখিয়েছিলেন। আল্লাহর রহমতে আমি তার ৩০টি যুক্তিই খণ্ডন করেছি। আমি তাকে বাইবেলের ৩৮টি বৈজ্ঞানিক ভুল দেখালাম কিন্তু তিনি সেগুলো খণ্ডন করতে পারেননি।

কোরআন হল ফুরকান অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। বাইবেলের যে অংশগুলো কোরআনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সেগুলোকে আমরা তথা মুসলিমরা আল্লাহর বাণীরূপে মেনে নেব। যেমন শুরুতে ঈসা (আ) সম্পর্কিত মুসলমানদের যে বিশ্বাসগুলোর কথা বলা হয়েছে, সে ব্যাপারে কোরআন ও বাইবেলে সাদৃশ্য আছে।

কোন কোন খ্রীস্টানদের ধারণা যীশুখ্রিস্ট নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু পুরো বাইবেলের কোথাও এ কথা নেই যে, ঈসা (আ) নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন অথবা বলেছেন, আমার উপাসনা কর, গসপেল অব জন ১৪ নং অধ্যায়ের ২৮ অনুচ্ছেদে যীশুখ্রিস্ট নিজের মুখে বলেছেন, আমার পিতা আমার চাইতে মহান।

গসপেল অব জন ১০ নং অধ্যায়ের ২৯ অনুচ্ছেদে আছে, আমার পিতা সবার চাইতে মহান।

গসপেল অব জন ম্যাথিউ ১২নং অধ্যায়ের ২৮ অনুচ্ছেদে আছে,

আমার ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে শয়তানকে তাড়িয়ে দেই। গসপেল অব লুক ১১ নং অধ্যায়ের ২০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আমি ঈশ্বরের আঙ্গুলের সাহায্যে শয়তানকে তাড়িয়ে দেই।

গসপেল অব জন ৫ নং অধ্যায়ের ৩০ নং অনুচ্ছেদে আছে,

আমি নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না। আমি এখানে বিচার করি এবং আমার বিচার সঠিক। কারণ আমি আমার নিজের ইচ্ছাকে দেখি না আমার পিতার ইচ্ছাকে দেখি।

যদি কেউ বলে আমি নিজের ইচ্ছাকে দেখি না আল্লাহর ইচ্ছাকে দেখি, অর্থাৎ সে আল্লাহর নিকট নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে এমন একজন ব্যক্তিকে আরবিতে বলে মুসলিম। সুতরাং যীশুখ্রিস্ট নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেননি। বুক অব অ্যাকটস এর ২ নং অধ্যায়ের ২২ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা আছে,

হে ইসরাইলের সন্তানেরা! একথাটা কোনো নাজারাথের যীশু যে তোমাদের ঈশ্বরের প্রেরিত নবী ও ঈশ্বরের আদেশে সে অলৌকিক কাজ করেছে– তোমরা তার সাথী থাকবে।

অর্থাৎ যীশু ছিলেন মানুষ এবং আল্লাহতায়ালা তাঁকে রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন মানব জাতির হেদায়েতের জন্য। কোরআনের সাথে বাইবেলের এ সাদৃশ্য ছাড়াও আরও সাদৃশ্য আছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট উভয় জায়গায়ই মুহাম্মদ ﷺ এর পৃথিবীতে আসার ব্যাপারে ভবিষ্যত বাণী আছে। বুক অব ডিউটারোনোমী ১৮ নং অধ্যায়ের ১৮ নং অনুচ্ছেদে আছে, মুহাম্মদ ﷺ আসবেন। এছাড়াও বুক অব ডিউটারনোড়ামী ১৮ অধ্যায়ের ১৯ অনুচ্ছেদে বুক অব ইসায়ইয়া ২৯ নং অধ্যায়ের ১২ নং অনুচ্ছেদে সং অব সলোমন ৫ নং অধ্যায়ের ১৬ নং অনুচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করে তাঁর আসার কথা বলা হয়েছে। নিউ টেস্টামেন্টের গসপেল অব জন ১৪ নং অধ্যায়ের ১৬ নং অনুচ্ছেদে, গসপেল অব জন ১৫ নং অধ্যায়ের ২৬ নং অনুচ্ছেদে, গসপেল অব জন ১৬ নং অধ্যায়ের ৭ নং অনুচ্ছেদে ও গসপেল অব জন ১৬ নং অধ্যায়ের ১২–১৪ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, সর্বশেষ এ চূড়ান্ত নবী আসবেন, যার নাম মুহম্মদ ﷺ।

বাইবেলে অযু ও নামাযের ব্যাপারেও বলা আছে। যেমন– নামাজের অন্যতম প্রধান অংশ সেজদার কথা বলা আছে, বুক অব জেনেসিস বুক অব জোসেয়া ও গসপেল মেথিউতে।

ইসলামে যাকাতের কথা বলা আছে, বাইবেলও তেমনি দান করার কথা বলা আছে। বুক অব শামস ৮৪ নং অধ্যায়ের ৪ থেকে ৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সে লোকগুলো আশীর্বাদ প্রাপ্ত যারা বাক্কা শহরে যায়।" অর্থাৎ হজ্জের ব্যাপারেও বাইবেলে ইঙ্গিত আছে। পবিত্র কোরআনে কিছু জিনিস নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেগুলো বাইবেলেও নিষিদ্ধ।

পবিত্র কোরআনে সূরা মায়িদার ৩ নং, সূরা বাকারার ১৭৩ নং সূরা আনআমের ১৪৬ নং আয়াত এবং সূরা নাহলের ১১৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"তোমাদের জন্য হারাম খাবার হল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস আর যে পশু জবাই করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেয়া হয়েছে।"

বাইবেলেও এ জিনিসগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বুক অব জেনেসিস, বুক অব লেভিটিকাস ও বুক অব ডিউটারোনোমীতে রক্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বুক অব ডিউরোনোমী ১৪ নং অধ্যায়ের ১৮ নং অনুচ্ছেদে ও বুক অব ইসাইয়া ৬৫ নং অধ্যায়ের ২-৫ নং অনুচ্ছেদে আছে শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বুক অব অ্যাক্টস ১৫ নং অধ্যায়ের ২ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে যে প্রাণীগুলো জবাই করার সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নাম নেয়া হয়েছে সেগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কোরআন ও বাইবেলে এ ধরনের আরও অনেক সাদৃশ্য আছে। ইসলামী শরীয়াহর নিয়ম অনুযায়ী ভদ্রতা বজায় রাখার জন্য নিয়ম হল-

মহিলাদের মাথা ঢাকতে হবে পুরো শরীর ঢেকে রাখতে হবে, ঢিলেঢালা পোশাক পরতে হবে এবং পুরুষ বা মহিলা কেউই বিপরীত লিঙ্গের মত পোশাক পরতে পারবে না। বাইবেলের বুক অব ডিউটারোনোমী ২২৫ নং অধ্যায়ের ৫নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "পুরুষরা এমন কোন পোশাক পরতে পারবে না যেটা মেয়েদের মত হয় এবং মেয়েরাও পুরুষদের পোশাক পরবে না। এরকম পোশাক যারা পরে তারা সবার ঘৃণার পাত্র। সুতরাং বাইবেলেও বিপরীত লিঙ্গের ন্যায় পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফার্স্ট টিমোথীর ২য় অধ্যায়ের ৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'মহিলারা পোশাক পরবে ভদ্রতার সাথে, তারা শরীর ঢেকে রাখবে, শালীন পোশাক পরবে ও দামী গহনা তথা স্বর্ণ বা মুক্তার কিছু পরবে না।

ফার্স্ট কোরিথিয়ানুসের ১১ নং অধ্যায়ের ৫ থেকে ৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'যে মহিলা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার সময় তার মাথা ঢাকে না, সে নিজেকে অসম্মান করে, তার মাথার চুল ছেটে ফেলতে হবে।' অথচ কোরআন বা হাদীসে এত কঠিনভাবে কোথাও বলা হয়নি যে মাথা না ঢাকলে তা কামিয়ে দিতে হবে। আপনারা মা ম্যারীর ছবি বা গীর্জার নানদের দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, মহিলাদের কিভাবে পোশাক পরতে হবে। মুসলিম মহিলারাও এভাবে নিজেদের পুরো শরীর ঢেকে রাখে, শুধু মুখ ও হাত কবজি পর্যন্ত খোলা থাকে। এভাবে আরও সাদৃশ্য দেখানো সম্ভব। এজন্য আমার মতে, খ্রীস্টান বলতে যদি তাকে বুঝায় যে যীশু খ্রিস্টের অনুসরণ করে তাহলে মুসলিমরা খ্রীস্টানদের চেয়ে অনেক বেশি খ্রীস্টান।

বাইবেলে মদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বুক অব এফিসিয়ান্স ৫ নং অধ্যায়ের ১৮ নং অনুচ্ছেদ ও বুক অব প্রোকাইস ২০ নং অধ্যায়ের ১ নং অনুচ্ছেদে নির্দেশ করা হয়েছে যে, তোমরা মদ পান করো না। অথচ দেখুন মুসলিমরা মদ না পান করলেও খ্রীস্টানদের অনেকেই মদ পান করে। মুসলিমরা খাৎনা দেয়। গসপেলে বলা আছে যীশু খ্রিস্টের খাৎনা দেয়া হয়েছিল অষ্টম দিনে। সুতরাং খ্রিস্টের অনুসারী হিসেবে খ্রীস্টানদেরও খাৎনা দেয়ার কথা, কিন্তু অধিকাংশ খ্রীস্টানরা খাৎনা দিচ্ছে না, মুসলিমরা এ হুকুমটি অনুসরণ করছে।

সুতরাং পুরো বাইবেলও মহান ঈশ্বরের বাণী নয় বরং এর অংশবিশেষ মহান ঈশ্বরের বাণী, যেটা কোরআনের সাথে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে খুঁজে বের করতে হবে। অতঃপর সে অংশটুকু মেনে চলতে মুসলিমদের কোন সমস্যা নেই। যদি খ্রীস্টানরাও সে অংশটুকু মেনে চলে, তবেই মুসলিম ও খ্রীস্টানরা এক হতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ ৩৫। আমি কোরআনের ইংরেজি অনুবাদ পড়েছি। সেখানে লেখা আছে, তাওরাত, যবুর, ইনজীল এগুলো আল্লাহর বাণী, "আল্লাহর বাণীকে কেউ বদলাতে পারবে না" এবং আরেক জায়গায় নবী মুহাম্মদ ﷺ কে বলা হয়েছে, "যদি এ কোরআনের ব্যাপারে সন্দেহ হয় তাহলে যারা তোমার আগে আসমানী কিতাব পেয়েছে, তাদের জিজ্ঞাসা কর।" আমার মনে হয়, এরা ইহুদী ও খ্রীস্টান কোরআনের এ আয়াতগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছে যে, যদি তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জীল আল্লাহর কিতাব হয় কেউ তাকে বদলাতে পারবে না। আবার কোরআন ও বাইবেলের মধ্যেও বেশ সাদৃশ্য আছে। আমার প্রশ্ন হল, এমনটি কি হতে পারে যে, পবিত্র বাইবেলে কোন পরিবর্তন হয়নি?

উত্তর ঃ প্রথমত পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায় এ কথা বলা হয়েছে যে, 'তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জীল এগুলো হল আল্লাহর বাণী।' এগুলো আসমানী কিতাব। তাওরাত নাযিল হয়েছিল মুসা (আ)-এর উপর, যাবুর দাউদ (আ)-এর উপর, ইঞ্জীল ঈসা (আ)-এর উপর এবং সর্বশেষ আসমানী কিতাব কোরআন নাযিল হয়েছে সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর।

দ্বিতীয়ত, 'আল্লাহর বাণীকে বদলানো যায় না এ কথাটি সর্বশেষ আসমানী কিতাব কোরআনের জন্য প্রযোজ্য। তবে এ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো না পড়লে এ বিষয়টি জানা সম্ভব নয়। সূরা বাকারার ১০৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

"আমি কোন আয়াত রহিত করলে বা বিস্মৃত হতে দিলে তা থেকে উত্তম বা সমতুল্য আয়াত আনি।"

অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন যে, আগের যে ওহী এসেছিল অথবা আগে যে ওহীগুলো বিস্মৃত হতে দেয়া হয়েছিল সেগুলোর চেয়ে উত্তম আয়াত আনা হবে।

অন্যদিকে কোরআন হল সর্বশেষ ওহী। সূরা মায়িদাহ-এর ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

অর্থ ঃ "আজ আমি তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পন্ন করলাম।"

সুতরাং সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ কোরআনে কোন কিছু যোগ করা বা বাদ দেয়া যাবে না। অর্থাৎ আল্লাহর বাণীকে বদলানো যাবে না কথাটি কোরআনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রশ্ন হতে পারে যে, কোরআন কেন সর্বশেষ নাযিল হল? কেউ যদি বলে যে, 'আমি ডাক্তার হব অতএব আমাকে স্কুল-কলেজ রেখে প্রথমেই কেন মেডিকেলে ভর্তি করলে না।' সেটা কি যৌক্তিক হবে? কখনই নয়। তেমনি আগের যুগের আসমানী গ্রন্থগুলোতে ইসলামী শরীয়াহর মূলনীতি এক ছিল তা হল তৌহিদ, নামাজ কিন্তু শরীয়াহর অন্যান্য কিছু প্রয়োজন সাপেক্ষে ভিন্ন ছিল।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁর জ্ঞানের আলোকে আসমানী কিতাব কোরআন নাযিল করলেন ১৪০০ বছর আগে এবং এ কিতাবকে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশেষ কিতাব হিসেবে ঘোষণা দিলেন। যেটা সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۔

অর্থ ঃ "আজ আমি তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পন্ন করলাম।"

আর কোরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও বাণী হত তাহলে এতে অনেক অসঙ্গতি থাকত। এ কথাটাই সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

অর্থ ঃ "তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে আসত তাহলে এতে অনেক অসংগতি থাকত।"

তৃতীয়ত, আপনি বললেন, কোরআন আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলছেন যদি তোমার এ বাণীর ব্যাপারে ইহুদী খ্রীস্টানদের জিজ্ঞাসা কর।

এখানে আপনি বুঝতে ভুল করেছেন, প্রকৃতপক্ষে এখানে আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলছেন, 'ইহুদী খ্রীস্টানদের বল যে, তোমরা যদি কোরআন বিশ্বাস না কর তাহলে তোমাদের ধর্মগ্রন্থে দেখ।' কারণ, কোরআন হল লাস্ট টেস্টামেন্ট যেখানে ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের অংশ বিশেষ থাকবে।

এবার আপনার এ প্রশ্নটিতে আসা যাক যে, এমনকি সম্ভব যে 'বাইবেলের কোন পরিবর্তন হয়নি' বাইবেল যদি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ঈশ্বরের বাণী হত তাহলে এতে

ভুল থাকার কথা নয়। অথবা যুক্তি যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, বাইবেলে অনেকগুলো ভুল আছে। এখানে কিছু ভুলের নমুনা দেয়া হল। গসপেল অব ম্যাথিউ ৪ নং অধ্যায়ের ৮নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে পৃথিবী সমতল। বুক অব জেনেসিস ১ নং অধ্যায়ের ১৬-১৯ অনুচ্ছেদে বিশ্বজগত সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ আছে আগে আলো ছিল না ঈশ্বর সেখানে আলো দিলেন, অতঃপর তিন দিন অতিবাহিত হল এরপর চতুর্থ দিনে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র। আলোর উৎসের আগে আলো আসা সম্ভব নয়, এটা অযৌক্তিক। এরপর বলা আছে, পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে তৃতীয় দিনে ও গাছপালা চতুর্থ দিনে। পৃথিবী হল সূর্যের একটি অংশ। যদি বলা হয় যে, পৃথিবী সূর্যের আগে এসেছে, সেটা অযৌক্তিক হবে। বুক অব জেনেসিসের একই অংশে বলা হয়েছে যে, মহান ঈশ্বর দুটো আলোকে সৃষ্টি করেছেন। বড় আলোটা হল সূর্য যা দিনকে শাসন করবে। আর ছোট আলোটা হল চাঁদ যা রাতকে শাসন করবে। বাইবেলের কথাগুলো এমনভাবে বলা আছে, যেটা পড়লে মনে হয় চাঁদের আলোটা তার নিজস্ব আলো। সূরা ফুরকানের ৬১ নং আয়াতে কোরআন বলছে, সূর্যের আলো তার নিজস্ব ও চাঁদের আলো হচ্ছে প্রতিফলিত। বৈজ্ঞানিকভাবে দ্বিতীয়টি সত্য। প্রকৃতপক্ষে চাঁদের আলো নিজস্ব আলো এটা একটা প্রাচীন ধারণা। এ ধরনের অনেকগুলো ভুল আছে বাইবেলে।

এছাড়াও আছে অনেক অসঙ্গতি। এসব থেকে স্পষ্ট যে বাইবেল অপরিবর্তিত নেই। অর্থাৎ এটা ঈশ্বরের বাণী নয়।

প্রশ্ন ঃ ৩৬। আমি হোটেল ম্যানেজমেন্টের একজন ছাত্র। আমাদের ট্রেনিং এর সময় অ্যালকোহল সার্ভ করতে হয়। ইসলামে কি এর অনুমতি আছে?

উত্তর ঃ ইসলামে অ্যালকোহল পরিবেশন করা হারাম। কোরআন ও হাদীসে অ্যালকোহল পান করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইবনে মাজাহ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের একটি হাদীস। অ্যালকোহলের সাথে সম্পর্কিত আছে যেখানে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ১০ ধরনের মানুষের একটি তালিকা করেছেন এবং বলেছেন এরা অভিশপ্ত। এদের মধ্যে আছে যে লোক অ্যালকোহল তৈরি করে, যে লোকের জন্য এটা তৈরি করা হয়, যে লোক এটা বহন করে, যে লোক এটা বিক্রি করে, যে লোক এটা থেকে লাভ গ্রহণ করে, যে লোক এটা পরিবেশন করে, যে লোকের জন্য পরিবেশন করা হয়। সুতরাং অ্যালকোহল পরিবেশন করা নিষিদ্ধ।

অতএব আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানে বলতে পারেন যে, অ্যালকোহল নিষিদ্ধ এটা পরিবেশন করা যাবে না। সেটা সম্ভব না হলে পানীয়টা পরিবর্তন করে নিতে পারেন। সেটাও সম্ভব না হলে পেশা পরিবর্তন করাই উত্তম।

এমন কোন হোটেল বা রেস্টুরেন্টে আপনার চাকরি করা যাবে না, যেখানে অ্যালকোহলই হল আয়ের প্রধান মাধ্যম। এমন জায়গায় আপনি অ্যালকোহল

পরিবেশন করতে পারবেনই না; বরং সেখানে আপনার চাকরিও করা যাবে না। তবে কোন প্রতিষ্ঠানে যদি অ্যালকোহল আয়ের অনেকগুলো উৎসের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র উৎস হয় সেখানে আপনি অ্যালকোহল ছাড়া সংশ্লিষ্ট কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ করতে পারেন। আপনি এয়ারলাইন্সে চাকরি করতে পারেন, তবে এয়ার হোস্টেজের কাজ ছাড়া। কারণ, এয়ার হোস্টেজের যাত্রীদের জন্য অ্যালকোহল পরিবেশন করতে হয়।

অর্থাৎ ইসলামী শরীয়াহ্‌র হুকুম হচ্ছে যদি এমন কোন প্রতিষ্ঠানে আপনার চাকরি করতে হয় যেখানে কিছু হারাম কাজ হয় এবং আপনার পক্ষে সেটাকে পরিবর্তন করার সুযোগ নেই– সেখানে নিজেকে হারাম কাজের সাথে না জড়ালে আপনি মনে করতে পারেন যে আপনার আয় হালাল।

সুতরাং আপনি আপনার ট্রেনিং সেন্টারের পরিচালকের সাথে হিকমাহ্‌র সাথে কথা বলে ড্রিঙ্কস পরিবেশনের ট্রেনিং-এর ক্ষেত্রে অ্যালকোহলের পরিবর্তে অন্য কোন হালাল পানীয় ব্যবহার করতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ ৩৭। কিছুদিন আগে ডেনমার্কে আমাদের নবীজী ﷺ-কে ব্যঙ্গ করে কার্টুন ছাপা হয়েছিল। এ ধরনের অপমানজনক ঘটনা যখন ঘটে তখন আমাদের কি করণীয়?

উত্তর ঃ ২০০৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর একটি ড্যানিশ কাগজে নবী মুহাম্মদ ﷺ -কে ব্যঙ্গ করে ১২টা কার্টুন ছাপা হয়েছিল। এছাড়া এর আগে সালমান রুশদী, তসলিমা নাসরিনদের মত ব্যক্তিরাও এ ধরনের ঘটনার অবতারণা করেছিল। আমেরিকাতেও নবীজী ﷺ-কে অবমাননা করে লেখালেখি হয়েছে। 'Time' ম্যাগাজিনের ১৯৬৯ সালের এপ্রিল সংখ্যায় একটি রিপোর্টে এসেছিল যে, ১৮০০ থেকে ১৯৫০ এ দেড়শ বছরের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ষাট হাজারের বেশি বই লেখা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদিন একটা বই লেখা হয়েছে। নাইন ইলেভেনের পরে ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা বইয়ের সংখ্যা বেড়ে গেছে। প্রতিদিন কয়েকটা করে বই লেখা হচ্ছে। অসংখ্য আর্টিকেল ছাপানো হচ্ছে। মিডিয়াতেও ইসলাম বিরোধী প্রচারণা বেড়েছে। এখন প্রশ্ন হল আমরা মুসলমানরা এর জবাব কিভাবে দেব? অর্থাৎ এর প্রতিবাদ কিভাবে করব?

ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, নবীজীর অবমাননা এ ধরনের অপমানজনক কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার পদ্ধতিকে ৬ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথমঃ মিডিয়ায় উত্তর দেয়া অর্থাৎ প্রিন্ট মিডিয়া, খবরের কাগজ, স্যাটেলাইট চ্যানেল ইত্যাদি ব্যবহার করে অপপ্রচারের ভুল জবাব দেয়া বা ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেয়া। এ পদ্ধতিতে পৃথিবীর যেকোন দেশেই অপপ্রচারের ঘটনা ঘটুক না কেন তার জবাব অন্য যেকোন প্রান্ত থেকেই দেয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয়ঃ সভা, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবাদ জানানো। এ ধরনের প্রতিবাদও পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে হতে পারে।

তৃতীয়ঃ আইনগত ব্যবস্থা তথা কোর্টে মামলা করা। এ পদ্ধতি কেবল সে দেশেই ফলপ্রসূ হতে পারে যে দেশে আইন ব্যবস্থা কড়া এবং দীর্ঘসূত্রিতা নেই। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ হল আমেরিকান মুসলিম অর্গানাইজেশন কেয়ারের একটি ঘটনা। একবার বিখ্যাত জুতো কোম্পানি নাইক (NIKE) এমন এক ধরনের জুতো বের করল যার পেছনের দিকে লেখাটিকে আরবী হরফের আল্লাহ লেখার মত মনে হয়। যেটা ইসলামের জন্য অবমাননাকর। এ কারণে কেয়ার নাইকের (NIKE) বিরুদ্ধে কেস করেছিল। তবে সে কেস কোর্টে যাওয়ার আগেই নাইক (NIKE) কেয়ারের সাথে সমঝোতা করে এবং প্রায় ১৭ মিলিয়ন ডলার জরিমানা দেয়। এ টাকাটা পরে কেয়ার জন মুসলমানদের সেবামূলক কার্যক্রমে ব্যয় করে।

চতুর্থঃ অর্থনৈতিকভাবে চাপ দেয়া। যেমন ব্যবসায়িক চাপ। এ পদ্ধতিও সবদেশে কাজে নাও লাগতে পারে। যে দেশ অপপ্রচারের সাথে জড়িত যদি সে দেশের প্রেসিডেন্ট এ কার্যক্রমের নিন্দা না করে সমর্থন করে, তবে সে দেশের পণ্য বর্জন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পণ্যসামগ্রী বর্জন করা হয়েছিল। ফলে আমেরিকার অনেক অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। এ ধরনের পদ্ধতি ফলপ্রসূ হবে কেবল তখনই যখন একটা বড় সংখ্যক দল এক সাথে পণ্য বর্জন করে।

পঞ্চমঃ রাজনৈতিক চাপ। অর্থাৎ সমস্ত মুসলিম দেশগুলোর প্রধানরা একত্রিত হয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের প্রধানকে প্রতিবাদ জানাতে পারে। তারা বলতে পারে, আপনাদের অপপ্রচার বন্ধ করতে হবে নাহলে আমরা আপনাদের দেশ থেকে আমাদের রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে নেব এ ধরনের কোন কথা।

ষষ্ঠঃ শক্তি প্রয়োগ করে। যেমন কুশপুত্তলিকা পুড়ানো, পতাকা পোড়ানো, অ্যামবেসিতে পাথর মারা, ভাঙচুর চালানো, এমনকি বোমা ফাটিয়ে দেয়া ইত্যাদি। প্রথম পাঁচটা পদ্ধতিতে কোন সমস্যা নেই। কারণ সেগুলো হল বাক স্বাধীনতার ব্যবহার। তবে ষষ্ঠ পদ্ধতিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন যদি ধ্বংসাত্মক বা ক্ষতিকর না হয় তাহলে কোন সমস্যা নেই। যেমন পতাকা পুড়ানো ইত্যাদি। তবে সেটা এমন হয় যে, সেই দেশের নিরীহ মানুষকে ধরে আটকে রাখা হল বা হত্যা করা হল, ইসলামে এটা নিষিদ্ধ। ইসলামী দেশে ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী প্রকৃত অপরাধীকে ধরে বিচার করা হলে এটা ভিন্ন ব্যাপার। নিরীহ মানুষকে হত্যার ব্যাপারে কোরআনে সূরা মায়িদার ৩২ নং আয়াতে এসেছে, 'যদি কেউ কোন মানুষকে হত্যা করে অথচ সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা খুনের অপরাধে অপরাধী নয়, তাহলে সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করল। আর যদি কাউকে বাঁচানো হয় তাহলে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচালো।

ডেনমার্কের একটি স্থানীয় পত্রিকায় যখন প্রথম কার্টুনগুলো প্রকাশিত হয়েছিল তখন সে দেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রদূতগণ একত্রিত হয়ে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে এবং তিন সপ্তাহ পর প্রধানমন্ত্রীর সাথে মিলিত হয়ে প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু ড্যানিশ প্রাইম মিনিস্টার বিষয়টিকে হালকাভাবে নিলেন এবং কোন পদক্ষেপ নিলেন না।

তিন মাস পর ২০০৬ এর ২০শে জানুয়ারি একই কার্টুন ছাপানো হল নরওয়েতে। চারটি পত্রিকায় ছাপানো হল। এরপর ছাপানো হল জার্মানীতে, তারপর হাঙ্গেরীতে। প্রথম থেকেই মুসলিম বিশ্বের স্থানে স্থানে এ কার্টুনের প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। পরবর্তীতে যখন কার্টুনগুলো বিভিন্ন দেশে ছাপানো হচ্ছিল তখন সমগ্র মুসলিম একযোগে এর তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিল। মুসলিম বিশ্বে এ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছিল উপরে আলোচিত ৬টি পদ্ধতিতেই। মিডিয়া, ইন্টারনেটে এর উত্তর দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এসব স্থানে এর শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানানো হয়েছে, শান্তিপূর্ণ মিছিলের মাধ্যমে। সে সময় সৌদি আরবের পাঁচশত-এর বেশি আইনজীবীদের একটি আন্তর্জাতিক কমিটি ঘোষণা করেছিল যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করা হবে।

ডেনমার্কের ওপর অর্থনৈতিক চাপও সৃষ্টি করা হয়েছিল। ডেনমার্কের আয়ের অন্যতম উৎস হল দুগ্ধজাত পণ্য সামগ্রী। কুয়েত একাই প্রতি বছর ১৭০ মিলিয়ন ডলারের পণ্য ডেনমার্ক থেকে আমদানী করত। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে এ আমদানীর পরিমাণ হল প্রতি বছর ৮০০ মিলিয়নেরও উপরে। সে সময় মধ্যপ্রাচ্যের স্বদেশ একযোগে ডেনমার্কের পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এভাবে যখন ডেনমার্কের ব্যবসায়িক ক্ষতি হল তখন ডেইরি ফার্মের মালিকরা মিলিত হয়ে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী ও প্রিন্টমিডিয়ার কাছে গেল এবং ব্যবস্থা নিতে বলল। প্রিন্ট মিডিয়া তখন ক্ষমা চেয়েছিল। ইংরেজি, আরবি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলোতে তাদের ক্ষমা চাওয়ার ভাষা স্পষ্ট ছিল, যদিও ড্যানিশ ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলোতে এ ক্ষমা চাওয়ার ভাষা জোরালো ছিল না। দোষী পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক বলল যে, 'আমরা যে কার্টুন ছাপিয়েছি তা ডেনমার্কের আইনে অবৈধ নয়, তবে যেহেতু এতে মুসলিম বিশ্ব আহত হয়েছে এ জন্য আমরা ক্ষমা চাইছি।'

অর্থাৎ অনেকটা শর্ত আরোপ করে ক্ষমা চাওয়ার মত। যেন, কোন দেশে ধর্ষণ অবৈধ না বিধায় সে দেশের কোন লোক কোন মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ করে বলল যে, আমাদের দেশে ধর্ষণ বৈধ কিন্তু আপনি যেহেতু কষ্ট পেয়েছেন সেহেতু আমি দুঃখিত।

এ ধরনের কোন অযৌক্তিক নিয়ম তৈরি করার কোন সুযোগ নেই। যা অবৈধ তা সবার জন্যই অবৈধ। যা ক্ষতিকর তা সবার জন্যই ক্ষতিকর। সেটা বৈধ নাকি অবৈধ তার ওপর ভিত্তি করে ক্ষতির পরিমাণ কমবেশি হবে না।

ডেনমার্কের উক্ত ঘটনায় রাজনৈতিক চাপও দেয়া হয়েছিল। যেমন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ ঘটনার সাথে রাষ্ট্রদূতরা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সে পদ্ধতিতে যখন কাজ হল না তখন সাথে সাথেই সৌদি আরব তার রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো বলল যে, তাদের দেশে ডেনমার্কের অ্যামবেসী দরকার নেই। এরপর ডেনমার্ক ক্ষমা চেয়েছিল।

শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও এ ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। যেমন– ইন্দোনেশিয়ায় ডেনমার্কের অ্যামবেসী ভাঙচুর হয়েছে, অ্যামবেসীতে পচা ডিম ছোঁড়া হয়েছে, ইরাকে ডেনমার্কের পতাকা পুড়ানো হয়েছে। প্রতিবাদের এ পদ্ধতি যদিও গ্রহণযোগ্য মাত্রায় ছিল, তবে কিছু জায়গায় যেমন– ফিলিস্তিনে একজন জার্মান নাগরিককে ড্যানিশ ভেবে আটক করা হয়েছিল। যেটা প্রতিবাদের বৈধ পদ্ধতি নয়। যদিও পরবর্তীতে তারা উক্ত লোকটির সঠিক পরিচয় পেয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। এভাবে ছয়টি পদ্ধতিতেই প্রতিবাদ করা হয়েছিল।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আমেরিকায় কার্টুনগুলো ছাপানো হয়নি এবং ইংল্যান্ড ডেনমার্কের বিরুদ্ধে কথা বলেছে। তারা বলেছে যে, বাকস্বাধীনতা থাকতে পারে কিন্তু কোন ধর্মের অবমাননা করার সুযোগ নেই। আমেরিকাও নিন্দা করেছে। কারণ, তারা পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছে। তারা দেখেছে যে, এ ধরনের ক্যারিকেচারের কারণে অনেক টাকা লোকসান হচ্ছে।

সুতরাং নিরীহ মানুষের ক্ষতি হয় এ ধরনের কোন কাজ ছাড়া ছয়টি পদ্ধতিতেই প্রতিবাদ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ৩৮। যীশু খ্রীস্ট বলেছেন যে, তোমরা শত্রুকে ভালবাস, প্রতিবেশীকে ভালবাস। এভাবে শ্রী শ্রী রবিশংকর ও অন্যান্য ধর্মীয় গুরুরাও ভালবাসার কথা প্রচার করছে। এ কারণে দিনে দিনে তাদের অনুসারীর সংখ্যাও বাড়ছে। আমাদের নবী ﷺ কি ভালবাসার কথা প্রচার করেছেন?

উত্তর ঃ যীশু খ্রীস্ট ভালবাসার কথা বলেছেন, কিন্তু আপনারা দেখবেন ধর্ম পালনের দিক দিয়ে খ্রীস্টানদের থেকে মুসলমানদের সংখ্যাটা বেশি। খ্রীস্টানদের সংখ্যা প্রায় ২০০ কোটি, আর মুসলমানদের সংখ্যা ১২০ কোটি। কিন্তু তুলনামূলকভাবে গণনা করলে ধর্ম পালনকারী মুসলিমদের সংখ্যা বেশি পাওয়া যাবে। সুতরাং কতজন খ্রীস্টান যীশু খ্রীস্টের এ কথা মেনে চলছে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। যদি তারা তাদের ধর্মের কথা মেনেই থাকত তাহলে বিশ্বব্যাপী তাদের যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক অত্যাচার সেটা থাকত না। শ্রী শ্রী রবিশংকরও ভালবাসার কথা বলেছেন, কিন্তু আমাদের নবীজী ﷺ শুধু ভালবাসার কথা বলেই ক্ষান্ত

থাকেননি; বরং তিনি তাঁর কথা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তির আশেপাশের চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশীর কেউ না খেয়ে থাকে সে ভরাপেটে ঘুমানোর অধিকার রাখে না। কি চমৎকার শিক্ষা। অথচ আপনি অমুসলিম ও সিউডো মুসলিমদের মিডিয়াগুলোতে দেখলে লক্ষ্য করবেন যে, তারা ইসলামের ন্যায়বিচারের কথা হয়ত ঘুরিয়ে, পেচিয়ে পরিবেশন করছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যে প্রতিবেশীদের ভালোবাসার কথা বলেছেন তা ন্যূনতম প্রচার করছে না। তাদের এ আচরণে মনে হতে পারে যেন নবী ﷺ ভালোবাসার কথা প্রচারই করেননি (নাউযুবিল্লাহ)।

শ্রী শ্রী রবীশংকর শুধু এ পুস্তকের মাধ্যমে ভালোবাসার কথা প্রচারেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। উল্টো ইসলামকে নিয়ে যে বুকলেকটি তিনি প্রকাশ করেছেন তা রীতিমত অবমাননাকর। ইসলামে যাকাত ফরয করা হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে, "ধনীদের সম্পদে আছে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার।" এ বিষয়গুলো কখনও মিডিয়াতে ফোকাস হয় না। মিডিয়াতে বরং ইসলামী শরীয়াহতে ধর্মের অবমাননাকর যে শাস্তি নির্ধারিত আছে সেটা এমনভাবে প্রচার করা হয় যেন ইসলাম কি নির্মম! সূরা মায়িদার ৩৩ নং আয়াতে উল্লেখ আছে, "যদি কেউ আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড করে বেড়ায় তাহলে হয় তাকে হত্যা কর বা ক্রুশবিদ্ধ কর বা তার হাত পা কেটে ফেল অথবা নির্বাসন দাও।" একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে কোন ধর্মদ্রোহীর জন্য এটাই শাস্তির বিধান। কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষীরা এ ধরনের শাস্তির কথা শুনে আঁতকে উঠে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে আখ্যা দেয়।

যৌক্তিকভাবে বিবেচনা করলে এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে সন্ত্রাসের কোন কথা নেই। কারণ কোন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির মায়ের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়, তার বদনাম করে, তার ক্ষতি করে তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি তার অধিকার বলেই প্রথম ব্যক্তির বিরুদ্ধে রেগে যাবে কিংবা শাস্তির ব্যবস্থা নিতে চাইবে। ঠিক তেমনি একজন মুসলিম ব্যক্তি কোরআনের হুকুম অনুযায়ী তার মায়ের চেয়েও বেশি আল্লাহর ও তার রাসূলকে বেশি ভালবাসে। বিধায় আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে অবমাননাকর কোন কথা বা কাজ সংঘটিত হলে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চাইবে। এটাই যৌক্তিক ও প্রাকৃতিক। অন্য কোন ধর্মানুসারীরা তাদের নবী-রাসূলকে ভালবাসে না সেটা তাদের ব্যাপার, কিন্তু প্রকৃত মুসলিমরা তাদের নবী ﷺ -কে তাদের মা, বাবার, স্ত্রী সন্তানের চেয়েও বেশি ভালবাসেন।

সুতরাং আমাদের নবী ﷺ ভালবাসার কথা শুধু বলেন নি; বরং তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন। এ ক্ষেত্রে মিডিয়ার কৌশলীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না।

প্রশ্ন ঃ ৩৯। একবার এক কোম্পানি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম লেখা জুতো বের করলে পরে মুসলিমরা প্রতিবাদ জানালো– জুতার দোকানে পাথর ছুঁড়ে মেরে, হরতাল করে, আমার প্রশ্ন হল এভাবে স্ট্রাইক করলে বা হরতাল করলে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় যারা এর সাথে জড়িত নয়, তাহলে এ ধরনের কাজে কি ইসলামে জায়েয আছে?

উত্তর ঃ আগের একটি প্রশ্নের উত্তরে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, কিভাবে ইসলামের প্রতি অবমাননাকর কোন ঘটনার প্রতিবাদ করা যায়? সেখানে ছয়টি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। আপনি যে ঘটনা উল্লেখ সেটা হল ছয় নম্বর পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে মুসলিমরা প্রতিবাদ করে থাকে। কিন্তু এ ধরনের ঘটনায় প্রথমে নন ভায়োলেন্ট পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করা দরকার। যেমন– মিডিয়ার মাধ্যমে এর প্রতিবাদ জানানো যেতে পারে। সে কোম্পানির জুতো না কিনে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এ সকল পদ্ধতিতে কাজ না হলে তখন ষষ্ঠ পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানানো যায়। তবে সেক্ষেত্রে যারা দোষী নয় তাদের দোকান ভাঙ্গা বা দোকানে পাথর ছুঁড়ে মারা এগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। হরতাল করার মাধ্যমে যেহেতু এখানে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেহেতু হরতালও বৈধ হবে না।

প্রশ্ন ঃ ৪০। আপনি যে ছয়টি পদ্ধতির কথা বললেন, নবীজী ﷺ তার বিরুদ্ধে অপবাদ বা বদনাম এর প্রতিবাদে উক্ত পদ্ধতির একটিও ব্যবহার করেননি। কিন্তু তথাপি ইসলাম সম্প্রসারিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের কি ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ বা নবীজী ﷺ-এর অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দরকার আছে?

উত্তর ঃ এখানে দুটো বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমতঃ নবীজী ﷺ কোন কাজ না করার মানে এ নয় যে তা আমরা করতে পারব না। নবী ﷺ যেটা করেছেন সে কাজটাই কেবল বৈধ। যেটা তিনি বলেছেন সেটা সুন্নত এবং ক্ষেত্রবিশেষে ফরজ। কিন্তু নবী ﷺ যেটা করেননি সেটা নিষিদ্ধ এমন কোন নিয়ম নেই। কেউ যদি বলে আমি মাইক ব্যবহার করব না, কারণ নবীজী ﷺ ব্যবহার করেননি, তাহলে সেটা অযৌক্তিক হবে। কারণ নবীজী ﷺ এর সময় মাইক আবিষ্কার হয়নি। তবে নবী ﷺ -এর যদি এমন কোন হাদীস পাওয়া যায় যেখানে তিনি মাইকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন, তাহলে সেটা হারাম। অনুরূপ নবী ﷺ মেডিকেলে ভর্তি হননি বলে কি আমরা ভর্তি হতে পারব না?

দ্বিতীয়তঃ প্রতিবাদের উপায় নির্ভর করে সমসাময়িক পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর। আর নবী করীম ﷺ কে তাঁর নিজের বিরুদ্ধে আনিত অবমাননাকরের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। নবী করীম ﷺ মক্কায় থাকা অবস্থায় এর প্রতিবাদ না করার অন্যতম কারণ ছিল তাদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে না দেয়া। আরেকটা কারণ ছিল, তার অপরিসীম দয়া। পরবর্তীতে মহানবী ﷺ যখন

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করলেন তখন প্রতিবাদের শক্তি মুসলমানদের সঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু মহানবী ﷺ অপরাধীদের ক্ষমা করে দিয়ে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন– মক্কা বিজয়ের পর মক্কার কাফেরদের শুধু ক্ষমা করে দেয়াই হয়নি; বরং তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল। এর চেয়ে বড় মহত্তের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই।

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি তার নিজের বিরুদ্ধে সংঘটিত কোন অপরাধের অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয় তা ভিন্ন কথা। কিন্তু নবীজী ﷺ-এর বিরুদ্ধে আনিত অপবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। তিনি নিজে ক্ষমা করে দিতে পারেন, কিন্তু খলিফার জন্য এ অপরাধের শাস্তি বিধান করা বাধ্যতামূলক। যেমন– একজন বিচারক যদি তার নিজের বাসায় চুরির অপরাধে চোরকে ক্ষমা করে দেন, দিতে পারেন কিন্তু আদালতের কাঠগড়ায় কোন চোরের চুরি প্রমাণিত হলে উক্ত চোরের শাস্তি বিধান করা তার জায়েয।

এছাড়া নবী করীম ﷺ-এর সাহাবারা যারা দুর্দান্ত সাহসী ছিলেন। যেমন– ওমর (রা) বিভিন্ন সময়ে নবীজী ﷺ-এর বিরুদ্ধে তথা ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার জবাব দিতে চেয়েছিলেন আঘাতের মাধ্যমে। কিন্তু তারা নবী করীম ﷺ -এর নির্দেশে নিজের ক্রোধের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই সর্বোত্তম ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমাদের উচিৎ এ মহৎ দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরে অমুসলিমদের কাছে ইসলামের পরিচয় সুস্পষ্ট করে তোলা।

কোন অন্যায় দেখলে আমাদের নবী ﷺ-এর হাদীস অনুসারে সম্ভব হলে হাত দিয়ে ঠেকাতে হবে সেটা না পারলে কথা দিয়ে বিরত রাখতে হবে আর সেটাও সম্ভব না হলে মনে মনে ঘৃণা করতে হবে। আর শেষটা হল দূর্বলতম ঈমানের পরিচয়। সুতরাং আমরা আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন ব্যক্তি আমাদের ক্ষতি করলে তাকে ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো হলে, ইসলামকে হেয় করা হলে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য প্রতিবাদ করাটা আরও জরুরি। সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতিভেদে উপরিউক্ত ছয়টা পদ্ধতিই অনুসরণ করতে পারি।

প্রশ্ন ঃ ৪১। সূরা আসরে একজন মুমিনের যে মানদণ্ড দেয়া আছে তার মধ্যে একটি হল মানুষকে সততা ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়া। আমার প্রশ্ন হল এখানে প্রকৃত অনুবাদটি মানুষকে উপদেশ দেয়া হবে নাকি নিজে সততা ও ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে?

উত্তর ঃ পবিত্র কোরআনের সূরা আসরে বেহেশতে যাওয়ার মানদণ্ডের মধ্যে ঈমান আনা ও সৎকর্ম করার পাশাপাশি মানুষকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও ধৈর্যের উপদেশ

দেয়ার কথা বলা আছে। সুতরাং বেহেশতে যেতে হলে সৎকর্ম তো করতে হবেই সাথে সাথে সৎ কাজের ও ধৈর্যের উপদেশও দিতে হবে। তবে নিজে সৎ না হয়ে উপদেশ দেয়া যাবে না, আবার উপদেশ না দিয়ে শুধু সৎকর্ম করলেও জান্নাতে যাওয়া যাবে না। যদি আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করেন সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

প্রশ্ন ঃ ৪২। কিছুদিন আগে আপনার একটি লেকচার কনসেপ্ট অব গড ইন মেজর রিলিজিয়নস্ এর ভিডিও সিডি একজন অমুসলিমকে দেখেছিলাম। তিনি একজন প্রফেসর। তিনি আমাকে একটা প্রশ্ন করলেন যে, প্রত্যেক ধর্মই বলছে ঈশ্বর দয়ালু। কিন্তু দেখা গেল একটি দিনে যখন মুসলমান, হিন্দু, খ্রীস্টানরা নিজ নিজ নিয়মে ঈশ্বরের পূজা করছে এবং কিছু উপজাতি পূজা করছে সূর্যের। তখনই আবার সুনামীর মত বিপর্যয় হয়ে যখন হাজার মানুষ মারা গেল। তাহলে আমরা কোন ঈশ্বরের পূজা করব? এ প্রশ্নের জবাব আপনি কি বলেন?

উত্তর ঃ সকল ধর্মেই বলা হয়েছে, ঈশ্বর দয়ালু। কিন্তু ইসলামে ঈশ্বরকে শুধু দয়ালুই বলা হয়নি সাথে বলা হয়েছে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। সূরা নিসার ৪০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ـ

"কারও উপর আল্লাহ অণুপরিমাণও অবিচার করেন না।"

অর্থাৎ দয়ালু হবার পাশাপাশি তিনি ন্যায়বিচারক। উদাহরণস্বরূপ একজন ব্যক্তি যদি কাউকে ধর্ষণ করে তাহলে ন্যায়বিচারের দাবি হল ধর্ষকের শাস্তি হতে হবে। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্ষণের শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। ইহকালের ধর্ষককে যদি ক্ষমা করে দেয়া হয় তাহলে ধর্ষিতার ওপর ইনসাফ হবে না। তবে পরকালে আল্লাহ্ যখন তাঁর অসীম (দয়ালু এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক) জ্ঞানের আলোকে বিচার করবেন, মানুষের জীবনের সমগ্র চিত্র সম্পর্কে তার সামগ্রিক জ্ঞান থাকায় তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে ধর্ষিতাও যে ক্ষতিপূরণ পাবে এতে সন্দেহ নেই।

এখন সূরা মূলক এর ২নং আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন–

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ـ

অর্থ ঃ "তিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি পরীক্ষা করে নিতে পারেন তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলকারী।"

সুতরাং সুনামির ঘটনাটার দুটো ব্যাখ্যা থাকতে পারে। এটা কারও জন্য পরীক্ষা এবং কারও জন্য শাস্তি। হতে পারে এটা ভাল মানুষের জন্য পরীক্ষা আর খারাপ মানুষের জন্য শাস্তি। আবার খারাপ মানুষের জন্যও এটা পরীক্ষা আবার হতে

পারে। ঠিক তেমনি যদি কোন ভাল কিছু সংঘটিত হয়, সেটি কারও জন্য পরীক্ষা কারও জন্য পুরস্কার হতে পারে। খারাপ বা ভাল উভয়ের জন্য এটা পরীক্ষা হতে পারে অথবা হতে পারে– ভাল মানুষের জন্য একটি পুরস্কার।

পৃথিবীতে মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সময় দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। সুতরাং সুনামিতে আক্রান্ত হয়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছে– তার মধ্যে ভাল খারাপ সব মানুষই থাকতে পারে– তাদের পৃথিবীতে প্রদত্ত পরীক্ষার সময় শেষ। এমনটি ভাবার সুযোগ নেই– যে এটি শুধু শাস্তিই হতে হবে। যারা ভাল ছিল তাদের সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় তারা সুনামিতে ইন্তেকাল করেছে। আর যারা খারাপ ছিল হতে পারে দুনিয়ায় থাকতেই তাদের শাস্তি দিয়ে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে অথবা হতে পারে তাদেরও সময় শেষ।

দুনিয়াতে কোন পরীক্ষার কথা আপনারা চিন্তা করুন। তিন ঘণ্টা শেষ হয়ে গেলে কি করা হয়? খাতা নিয়ে নেয়া হয়। এখানে কারও এটা ভাবার সুযোগ নেই যে, শাস্তিস্বরূপ তার খাতা নিয়ে নেয়া হয়েছে; বরং খাতা নিয়ে নেয়ার কারণ সময় শেষ। এখন পরীক্ষক যেমন খাতাগুলো দেখে ফলাফল নির্ধারণ করবেন তেমনি আল্লাহও পরকালে মানুষের আমলনামা দেখে তাদের জান্নাত বা জাহান্নাম দেবেন।

এখন সুনামিতে যে ব্যক্তি মারা গেল, তার পরিবারের জন্য এটি এমনি বিপর্যয় এবং একই সাথে একটি পরীক্ষা। যদি কোন পরিবারের ছোট একটা ছেলে মারা যায়। তাহলে এটা হতে পারে উক্ত পরিবারের মা-বাবার জন্য পরীক্ষা এভাবে যে, তারা ধৈর্য ধারণ করে কিনা? অথবা পরিবারটি যদি ধনী ও অহংকারী হয় তাহলে এটা হবে পরিবারটির জন্য একটি শাস্তি। এভাবে যে ধন সম্পদ তাদের সন্তানকে বাঁচাতে পারল না আর ঐ সন্তানের হিসেব ও পুরস্কার আলাদা ব্যাপার। পরীক্ষা যত কঠিন হবে, পুরস্কারও বেশি হবে। বি. এ পাশ করা সহজ কিন্তু এম. বি. বি. এস. পাস করা কঠিন।

পৃথিবীতে আল্লাহ সবাইকে সমান সময় দেন না। কেউ বাঁচে ১০ বছর, কেউ ২৫ বছর, কেউ ৫০ বছর। এ সময়ের মধ্যে সে কি আমল করল ও কতটুকু সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছিল এটার ওপর ভিত্তি করে হবে ন্যায়বিচার।

সুতরাং সুনামি হলেই যে ঈশ্বর দয়ালু হবেন না এটা ভাবার সুযোগ নেই। যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারাই কেবল এ ধরনের বিপর্যয় দেখে হতাশায় পড়ে অর্থাৎ তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

সুনামি জাতীয় ঘটনাগুলো আল্লাহর নিদর্শনের হতে পারে। মানুষকে আল্লাহর হুকুমের সামনে কত অসহায় ও একই সাথে মানুষ যে কি পরিমাণ নিয়ামতরাজির মধ্যে ডুবে আছে মানবজাতির মধ্যে এ উপলব্ধি জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ এ ধরনের নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন। আমেরিকা, ইরাক ও আফগানিস্তানে যে পরিমাণ ক্ষতি সাধন করেছে, আল্লাহর ক্যাটরিনা নামক ঘূর্ণিঝড় দিয়ে আমেরিকাতে তার

চেয়েও বেশি সম্পদের বিপর্যয় ঘটিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিও কিছু করতে পারেনি। পবিত্র কোরআনের সূরা ফুসসিলাতের ৫৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। "তাদের জন্য আমার নিদর্শনগুলো প্রকাশ করব, বিশ্ব জগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে, ফলে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এটাই সত্যি।"

অতএব আল্লাহ্‌র এ নিদর্শন দেখে আমাদের সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিৎ এবং আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে আরও নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ ৪৩। ঘরের ভিতর কোন ইসলামী বক্তব্য উপস্থাপন করতে গেলে কি মসজিদ থেকে অনুমতি নিতে হবে?

উত্তর ঃ কোরআন ও হাদীসে এমন কোন কথা আসেনি যে ঘরের ভেতর ইসলামী বয়ান দিতে গেলে মসজিদ থেকে অনুমতি নিতে হবে। সহীহ্ হাদীসে এসেছে রাসূল ﷺ বলেছেন, بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "আমার কাছ থেকে একটি আয়াত হলেও তা প্রচার কর।"

তবে এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যেটি প্রচার করবেন সেটি যেন সঠিক হয়। ভুল কোন কথা প্রচার করা যাবে না। অনেক ব্যক্তি হয়ত বলতে পারে, যারা দারুল উলুমে পড়াশোনা করেননি, যাদের ইসলামী শরীয়াহ্‌র ওপর কোন ডিগ্রি নেই, তারা দাওয়াতী বক্তব্য দিতে পারবেন না।

আবার আরেক দল তথাকথিত আধুনিক মুসলিম আছে, যারা বলে দারুল উলুম পশ্চাৎপদ প্রতিষ্ঠান অতএব এর প্রয়োজন নেই। আমরা এ দুটো এক্সট্রিম পর্যায়ের লোকদের দলে সামিল হাত চাই না। আমরা বলব, ইসলামের ওপর বক্তব্য দেয়ার জন্য দারুল উলুমে যাওয়া জরুরি নয়। যেকোন ব্যক্তিই যদি কোরআন ও হাদীস পড়ে এবং কোরআন ও হাদীসের রেফারেন্স দিয়ে বক্তব্য দেয় তাহলে সে বক্তব্য দিতে পারবে। তবে সেক্ষেত্রে সঠিকভাবে জানা, সঠিক তথ্য উপস্থাপন করা জরুরি। আর সঠিক মানে জানার জন্য দারুল উলুমের ডিগ্রি থাকা অপরিহার্য নয়। এটা আমরা অস্বীকার করছি না যে, দারুল উলুম থেকে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ইসলাম সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন না। কিন্তু দারুল উলুম থেকেও কিছু ভুল শিখে তা প্রচার করলে সেটা ইসলামের জন্যই ক্ষতিকারক হবে। সুতরাং আপনি ঘরে ইসলামী বক্তব্য পেশ করতে চাইলে মসজিদ থেকে অনুমতি নেয়া জরুরি নয় এবং বক্তব্য পেশ করার ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, তা কোরআন ও হাদীসের আলোকে যথার্থ কিনা।

প্রশ্ন ঃ ৪৪। খ্রীস্টানরা বলে যে, পবিত্র আত্মা তাদের পথ দেখায়। তাদেরকে কিভাবে বুঝানো যায় যে, পবিত্র আত্মা বলে কিছু নেই।

উত্তর ঃ পবিত্র আত্মার অর্থ নিয়ে খ্রীস্টানদের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল মনে করেন পবিত্র আত্মা হল হযরত জিবরাইল (আ)। এ দলটি সঠিক। তবে হযরত

জিবরাইল (আ) আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কারও জন্য হেদায়েতের বাণী আনেন না। যেহেতু আমরা জানি পবিত্র হযরত মুহম্মদ (স া)-এর মাধ্যমে নবুয়ত সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং জিবরাইল (আ) কর্তৃক আল্লাহর বাণী বহন করার কাজের সমাপ্তি ঘটেছে।

এখন আরেক দল আছে, যারা মনে করে পবিত্র আত্মা হল তিনটির একটি অংশ। কিন্তু এটি ভুল। খ্রীস্টান ধর্মে তথা তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে ট্রিনিটি বলে কিছু নেই। কোরআনে সূরা নিসার ১৭১ নম্বর আয়াতে এসেছে "তোমরা ট্রিনিটি বল না।" কেউ যদি পবিত্র আত্মা বলতে স্বয়ং ঈশ্বরকে বুঝান তাহলে সেটা ঠিক। ঈশ্বর ইচ্ছা করলে যে কাউকে পথ দেখাতে পারেন। তবে পবিত্র আত্মাকে ট্রিনিটির অংশ ভাবা ভুল। বাইবেলে আত্মার কথা বলা হয়েছে। গসপেল অব জন ১৬ নং অধ্যায়ের ১২ থেকে ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, যে যীশু তার নিজের মুখে বলেছেন, আমি তোমাদের অনেক কথাই বলতে চাই; তবে তোমরা সেগুলো এখন বুঝবে না। কারণ তখন সত্যের আত্মা পৃথিবীতে আসবে সে তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবে। সে তোমাদের নিজের কথা বলবে না; বরং যা শুনবে সেগুলোই বলবে। সে আমাকে মহিমান্বিত করবে।

প্রকৃতপক্ষে এ সত্যের আত্মা হল হযরত মুহাম্মদ ﷺ! যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়েত গ্রন্থ কোরআন নিয়ে এসেছেন।

সুতরাং খ্রীস্টানদের বুঝানোর ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে পবিত্র আত্মা বলতে তারা কি বুঝাচ্ছে। যদি তারা একে ট্রিনিটির অংশ বলে মনে করে। সেক্ষেত্রে তাদের বুঝতে হবে যে, বাইবেল বা কোরআনে ট্রিনিটি বলে কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে আরও জানতে "সিমিলারিটিস বিটুইন ক্রিশ্চিয়ানিটি এন্ড ইসলাম লেকচারটির ভিডিও সিডি দেখা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ৪৫। অমুসলিমদের কিভাবে বুঝানো যায় যে, প্রস্রাব নোংরা জিনিস এবং এটা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে?

উত্তর ঃ প্রস্রাব হল বর্জ্য পদার্থ এবং এটা নাপাক। ইসলামী শরীয়াহ প্রস্রাবকে নাপাক হিসেবে ঘোষণা করেছে। এছাড়াও প্রস্রাব করে প্রস্রাবের রাস্তা পরিষ্কার না করলে নানা ধরনের ইনফেকশন হতে পারে। যেকোন ডাক্তারই প্রস্রাব হওয়ার পর ভাল মত পানি নেয়ার কথা বলবে।

এভাবে একজন অমুসলিম প্রস্রাব নাপাক হওয়া সম্পর্কে বুঝানো যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ৪৬। বর্তমানে অনেক অমুসলিম মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু বেশির ভাগ মুসলিম পরিবার চায় না তাদের সন্তান এ ধরনের ধর্মান্তরিত মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করুক। এ প্রসঙ্গে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

উত্তর ঃ আমি আপনার সাথে একমত যে, পুরুষদের চাইতে মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করছে বেশি। ইসলাম গ্রহণকারী মহিলার সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণ।

অমুসলিম মহিলাদের ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন কারণ থাকে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিয়ের আগে প্রেম। বিয়ে করতে হলে ধর্মান্তরিত হতে হয় বিধায় কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করে। তবে অধিকাংশ অমুসলিম মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামকে জেনে, ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে। এ ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে, তারা অধিকাংশই অনেকক্ষেত্রে ধর্মপরায়ণ হবে। এমনকি মুসলিম পরিবারে যে সকল মুসলিম জন্ম থেকে বড় হয় তাদের চেয়েও বেশি এরা ধর্মপরায়ণ হয়। সুতরাং ধর্মক্ষেত্রে মুসলিম মহিলাদের বিয়ে করার ক্ষেত্রে যে অনীহা কাজ করে সেটা অনুত্তম; বরং এক্ষেত্রে যেহেতু ধর্মান্তরিত নওমুসলিমটির ইসলাম পালন করার সম্ভাবনা বেশি থাকে সেহেতু অনুৎসাহিত না করে উৎসাহিত করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ ৪৭। মক্কা মদীনায় হিজরী ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের পূর্বে কি কোন ক্যালেন্ডার ছিল? কিভাবে সৌর ক্যালেন্ডারের সাথে হিজরী ক্যালেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য করব?

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে হিজরী ক্যালেন্ডার হল চন্দ্র ক্যালেন্ডারের। মক্কায় ও মদীনায় হিজরী সাল প্রবর্তনের পূর্বেও চন্দ্র মাসের হিসাব ছিল। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় থেকে হিজরী সালের হিসাব শুরু হয়। এমনিভাবে সৌর ক্যালেন্ডারের আরেকটা নাম হল গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার।

সৌর ক্যালেন্ডারের ভিত্তি হল সূর্য। পৃথিবী নিজ কক্ষে একবার আবর্তন করে ২৪ ঘণ্টায়। সমগ্র সূর্যকে ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ১ বছর। সূর্যের চারপাশে এ আবর্তনের ওপর ভিত্তি করেই পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তিত হয় এবং ঋতুচক্র ঘটে। এ কারণে পৃথিবীর যেকোন স্থানে যেকোন বছরের নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখে একই ঋতু পাওয়া যায়।

চন্দ্র বছরের হিসেব হয় চাঁদের পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তন করার উপর। চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে একবার আবর্তন করতে ১ চান্দ্র মাস পরিমাণ সময় নেয়। সৌর ও চান্দ্র বছরের পার্থক্য প্রায় ১১ দিনের। অর্থাৎ চান্দ্র বছর সৌর বছরের চেয়ে ১১ দিন কম। ফলে চান্দ্র বছর সৌর বছরের মধ্যে আবর্তিত হয়। চান্দ্র বছরের কোন নির্দিষ্ট তারিখে কোন নির্দিষ্ট স্থানে একই ঋতু নাও পাওয়া যেতে পারে। প্রতি ৩৩ সৌর বছরে চান্দ্র বছর হয় ৩৪টি। তবে চান্দ্র বছরের একটি হাকীকত আছে। পবিত্র রমজান মাস প্রতি ১ চান্দ্র বছরের একবার হওয়ায় গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত প্রত্যেক ঋতুতেই রোযা রাখার সুযোগ তৈরি হয়। রমজান মাস সৌর বছরে হলে দেখা যেত, পৃথিবীর কোন জায়গায় রোজা সব সময় গ্রীষ্মেই হত আবার কোন কোন জায়গায় সব সময় শীতেই হত। সুতরাং এটা আল্লাহ পাকের মহীমা যে, তিনি রোজার হুকুমকে চান্দ্র বছরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্রশ্ন ঃ ৪৮। জিহাদ অর্থ কি? জিহাদ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ জিহাদ শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ (জাহাদা) থেকে। জিহাদ যার অর্থ চেষ্টা ও সংগ্রাম করা। তবে অনেক অমুসলিম, এমনকি কতিপয় মুসলিমের ধারণা হল জিহাদ অর্থ যুদ্ধ করা। ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি কারণে যুদ্ধ করা। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ইসলামী পরিভাষায় জিহাদের বারোটি অর্থ আছে। এগুলো হল নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, সমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা ও সংগ্রাম করা, যুদ্ধের ময়দানে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা বা সংগ্রাম করা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

একজন ছাত্র যে স্কুলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যে চেষ্টা ও সংগ্রাম করে সেটাও এক ধরনের জিহাদ। জিহাদ শুধুমাত্র মুসলিমরা নয় অমুসলিমরাও করে। তবে মুসলিমরা জিহাদ করে আল্লাহর পথে ও অমুসলিমরা জিহাদ করে তাগুতের পথে।

প্রশ্ন ঃ ৪৯। শিখ-ইজম ও সিন্ধি-ইজম এ দুটো ধর্মে ইসলামের ধারণাটা কি? শিখরা কি গুরু নানককে তাদের ঈশ্বর হিসেবে মানে?

উত্তর ঃ সিন্ধি হল যে ব্যক্তি সে সিন্ধু এলাকা থেকে এসেছে। এ ব্যক্তি যেকোন ধর্মালম্বী হতে পারে। একজন সিন্ধি মুসলিমও হতে পারে, হিন্দুও হতে পারে। সিন্ধুইজম বলে পৃথক কোন ধর্ম নেই।

শিখ-ইজম-এর শিখ শব্দটা এসেছে সিসিয়া শব্দ থেকে। সিসিয়া অর্থ শিষ্য। শিখিজম ধর্মে রয়েছে ১০ জন গুরু। এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু হলেন নানক। তিনি পাঁচ নদীর উৎস জায়গা অর্থাৎ পাঞ্জাবে পনের শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পনের শতাব্দীর শেষ দিকে তিনি এ ধর্মের উদ্ভব করেন। ১০ জন গুরুর সবশেষ জন হচ্ছেন গুরু গোবিন্দ শিং। শিখরা তাদের গুরুদের ঈশ্বর মনে করে না। তারা মনে করে গুরু হল পথপ্রদর্শক। শিখদের ধর্মগ্রন্থ হল গুরুগ্রন্থ সাহেব। একে আদিগ্রন্থও বলা হয়। শিখ-ইজম-এর মৌলিক নীতি হল পাঁচটি। প্রথমতঃ 'কেশ' শিখরা চুল কাটে না। দ্বিতীয়তঃ কড়া অর্থাৎ তারা হাতে চুড়ি বা ব্রেসলেট পরে। তৃতীয়তঃ কৃপাণ অর্থাৎ ছুড়ি। চতুর্থতঃ কাঙ্কা অর্থাৎ চিড়নী এবং শবশেষ কাচ্ছা, যা এক ধরনের লম্বা অন্তর্বাস।

শিখরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। গুরুগ্রন্থ সাহেবের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ 'যাপজি'তে বলা আছে, "ঈশ্বর হলেন সত্য, তিনি সৃষ্টিকর্তা, তার কোন শুরু নেই, তিনি কখনও জন্মাননি, তিনি সকল ভয় ও অভাব থেকে মুক্ত, তিনি করুণাময় ও ক্ষমাশীল।" সুতরাং কোরআনে ঈশ্বরের ধারণার সাথে শিখইজম-এর ঈশ্বরের ধারণার মিল রয়েছে। শিখ ধর্মাবলম্বীরা মানে যে ঈশ্বর একজন। তারা তাকে এক ওংকারা বলে অভিহিত করে। গুরুগ্রন্থ সাহেবে ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম দেয়া আছে। যেমন– কর্তার বা সৃষ্টিকর্তা, আকলি বা অবিনশ্বর, সাহেব বা প্রভু, পরওয়ারদিগার বা

পালনকর্তা, কারিম বা পরোপকারী, রাহিম বা করুণাময়, ওয়াহে বা একমাত্র ঈশ্বর ইত্যাদি। শিখরা অবতারবাদে বিশ্বাস করে না এবং তারা মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী। সংক্ষেপে এই হল শিখ-ইজমের ঈশ্বরের ধারণা।

প্রশ্ন ঃ ৫০। যে জায়গায় ছয় মাস সূর্য দেখা যায় এবং ছয় মাস সূর্য দেখা যায় না, সে জায়গায় মানুষ কিভাবে নামাজ পড়ে?

উত্তর ঃ কোরআন ও হাদীসে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় বলে দেয়া হয়েছে। সূর্য ওঠার আগে ফজর, সূর্য যখন মধ্য আকাশে থাকে তখন জোহর, সূর্য ডোবার আগে আসর, সূর্য ডোবার পরপর মাগরিবের নামাজ। এর পর দিন শেষে রাতের বেলা এশার নামাজ। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় নির্ভর করছে সূর্যের ওপর।

পৃথিবী তার নিজ অক্ষের চারদিকে ঘুরছে। পৃথিবী ঘোরার কারণে দিন ও রাত হয়। তবে দু'মেরুর দিকে দীর্ঘ ছয় মাসব্যাপী দিন অথবা রাত থাকে। এ সকল স্থানে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণের সমস্যা সমাধানের জন্য কোরআনে এ কথাটির সাহায্য নেয়া যেতে পারে যে, তোমার সব শহরের 'মা' এর দিকে তাকাও। অর্থাৎ মক্কার সময়কে ধিরে নামাজ পড়া যেতে পারে। অথবা সংশ্লিষ্ট স্থানের কাছাকাছি কোন শহর যেখানে দিন ও রাত সময়কাল স্বাভাবিক সে শহরের সময় অনুসরণ করা যেতে পারে। রোযা রাখার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ঃ ৫১। যদি কোন মানুষ এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাদেরকে মুওয়াহিদ বলা যাবে? তাদেরকে কিতাবী বলা যায়?

উত্তর ঃ একজন ব্যক্তি শুধু মুখে নিজেকে এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী বললেই তাকে মুওয়াহিদ বলা যাবে না। ইসলামী নাম থাকলেই মুসলিম হওয়া যায় না। মুসলিম হওয়া নির্ভর করে ইসলামের অনুসরণের ওপর। শিখধর্মেও এক ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা বলা আছে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে কেউ করে না। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং এক ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রতিফলন তার আমলে পাওয়া যায় তখনই তাকে তৌহিদে বিশ্বাসী তথা মুওয়াহিদ বলা যেতে পারে। আহলে কিতাব বলতে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের বোঝানো হয়েছে। যদিও শাব্দিকভাবে ধরলে মুসলিমরাও আহলে কিতাব হয়। এমনকি অন্য যেকোন জাতি যাদের কাছে কিতাব এসেছে তাদেরকেও এ হিসাবে আহলে কিতাব বলা যায়। কিন্তু পবিত্র কোরআনের পরিভাষায় আহলে কিতাব হল ইহুদী ও খ্রীস্টানগণ। পবিত্র কোরআনের সূরা রাদের ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "প্রত্যেক যুগেই তোমাদের জন্য ওহী পাঠিয়েছি।" সুতরাং এখান থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক জাতির নিকটই ওহী প্রেরণ করা হয়েছে। কোরআন থেকে আমরা কেবল চারটি ওহীর নাম জানি, সেগুলো হল তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জীল ও কোরআন। বর্তমানে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, সেগুলো আসমানী কিতাব হয় ও সেটা নাযিল হয়েছিল নির্দিষ্ট যুগে নির্দিষ্ট জাতির জন্য। বর্তমানে সর্বশেষ আসমানী

কিতাব নাযিল করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। এ কিতাব নাযিল হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য সকল আসমানী কিতাবের হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এখন সকল মানুষের শুধুমাত্র কোরআনেই বিশ্বাস করতে হবে এবং কোরআন মেনে চলতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ৫২। শিরক বলতে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ 'শিরক' শব্দটি আরবি। শিরক অর্থ শরিক করা। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করাকেই ইসলামের পরিভাষায় শিরক বলে। শিরক সবচেয়ে বড় পাপ। অন্যান্য ধর্মে এক ঈশ্বরের কথা বললেও ইসলামে এক ঈশ্বরের বিশ্বাসের সাথে তৌহিদে বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তৌহিদে শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ ওহাদা থেকে। ওহাদা অর্থ একতাবদ্ধ হওয়া বা একতাবদ্ধ করা। তৌহিদের তিনটি প্রকার আছে।

এক. তৌহিদ আল রুবুবিয়াহ্

দুই. তৌহিদ আল আসমাউল সিফাত

তিন. তৌহিদ আল ইবাদাহ।

এক. তৌহিদ আল রুবুবিয়াহ অর্থ হল একত্রিত হয়ে একথা মেনে নেয়া যে, এ বিশ্ব জগতের কথাবার্তা ও পালনকর্তা কেবল একজন। তিনি হলেন আল্লাহ। পৃথিবীর সব মানুষ ও বিশ্বজগতের অন্য সব কিছু তার উপর নির্ভরশীল এবং তিনি কারও ওপর নির্ভরশীল নন।

দুই. তৌহিদ আল আসমাউল সিফাত অর্থ আল্লাহর নামের ব্যাপারে একমত হওয়া। এটি আবার পাঁচভাগে বিভক্ত।

১. মহান স্রষ্টা আল্লাহকে আমাদের সেই নামে ডাকতে হবে যে নাম তিনি উল্লেখ করেছেন।
২. তার বর্ণনা কেবলমাত্র সেভাবেই দেয়া যাবে যেভাবে কোরআনে ও হাদীসে তার বর্ণনা এসেছে।
৩. আল্লাহ তায়ালার কোন গুণ অন্য কারোও ওপর আরোপ করা যাবে না। যেমন– বলা যাবে না যে ঐ মানুষটি অবিনশ্বর, তার শুরু নেই ইত্যাদি।
৪. আল্লাহর নাম অন্য কাউকে দেয়া যাবে না। যেমন– 'আব্দুর রহমান' বলা যাবে কিন্তু কাউকে 'রহমান' বলা যাবে না।
৫. আল্লাহর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আল্লাহর ওপর আরোপ করা যাবে না। যেমন– মানুষ ভুল করে কিন্তু এটা বলার সুযোগ নেই যে আল্লাহ্ ভুল করে, আল্লাহ্ ভুল করেন না।

তৌহিদ আল ইবাদাহ অর্থ হল শুধু আল্লাহর ইবাদাত করা যাবে অন্য কাউকে তার ইবাদাতে শরীক করা যাবে না। অর্থাৎ শুধুমাত্র এক আল্লাহতে বিশ্বাস যথেষ্ট নয় সাথে অন্যান্য কথিত রব বা ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে হবে।

তৌহিদের এ তিনটি প্রকারের যেকোন একটির শর্ত হল শিরক।

প্রশ্ন ঃ ৫৩। পিতামাতার আনুগত্যের সীমা কি? আমার একজন মুসলিম বন্ধু একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করতে চাচ্ছে, কিন্তু তার পিতামাতা লোক লজ্জার ভয়ে এ বিয়েতে রাজি হচ্ছে না। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি যদি ঐ মহিলাকে বিয়ে করে তাহলে পিতামাতার অবাধ্য হতে হয়। আমরা তো জানি, ইবরাহীম (আ) একবার তার সন্তান ইসমাইল (আ)-এর স্ত্রীকে তালাক দিতে বলেছিলেন আবার কোরআনে সূরা ইসরার ২৩ নং আয়াতে এসেছে, তোমরা পিতামাতার প্রতি 'উফ্' শব্দটি পর্যন্ত কর না। তাহলে এক্ষেত্রে উক্ত মুসলিম লোকটির কি করণীয়?

উত্তর ঃ পিতামাতার হুকুম যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে না হয় তাহলে মানা যাবে। এটা হল পিতামাতার অনুগত থাকার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সীমা। সূরা লুকমানের ১৪ নং আয়াতে এসেছে, "আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহারের। মা অনেক কষ্ট সহ্য করে সন্তান গর্ভে ধারণ করে তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছর বয়সে।" অর্থাৎ পিতামাতার কথা মানতে হবে, এর পরবর্তী আয়াতে এসেছে, 'যদি তোমার পিতামাতা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করার ব্যাপারে জোর করে তাদের কথা মানবে না; তবে তাদের সাথে সৎভাবে বাস করতে হবে।'

একই ধারার কথা আছে সূরা আনকাবুতের ৮ নং আয়াতে। সুতরাং পিতামাতা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হওয়ার নির্দেশ দিলে তা মানা যাবে না।

এখন প্রশ্ন হল, যদি পিতামাতা আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে না গিয়ে কোন নির্দেশ দেন সে নির্দেশ মানতে হবে কিনা?

এর উত্তর হল, নির্দেশ মানাটাই উত্তম। এখন উক্ত ব্যক্তির প্রসঙ্গে আসা যাক। এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, উক্ত অমুসলিম মহিলা কি কারণে মুসলিম হয়েছে। যদি অমুসলিম মহিলাটি পূর্ব থেকেই ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে তারা বিয়ে করার জন্য মুসলিম হয়ে থাকে তাহলে পিতামাতার নির্দেশ মেনে নেয়াই উত্তম। কেননা একজন মুসলিম পিতার বা মাতার লোকলজ্জার ভয়ে নয়; বরং ধার্মিকতার বিচারে মেয়েটিকে যাচাই করেই তার সিদ্ধান্ত দেয়ার কথা। তবে যদি মেয়েটি ইসলামের সৌন্দর্য দেখে মুসলিম হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে পিতামাতাকে ভালমত বুঝাতে হবে যে, এখানে লোকলজ্জা কোন বড় ইস্যু নয়; বরং মেয়েটির পূর্ণাঙ্গ মুসলিমে পরিণত হওয়াটাই বড় ব্যাপার।

আর ইবরাহীম (আ)-এর উদাহরণ এখানে প্রযোজ্য নয়। কারণ ইবরাহীম (আ) নবী এবং নবীর আদেশ মেনে চলা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও পরিস্থিতিটাও গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতার প্রতি 'উফ' শব্দ না করার মানে হচ্ছে বিরক্ত না হওয়া বকাবকি না করা। তবে পিতামাতা যদি আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে কিছু করার জন্য বলে

সেক্ষেত্রে যেমন তাদের নির্দেশনাকে মানা যাবে না এবং হাসিমুখে বুঝাতে হবে, ঠিক তেমনি উপরে আলোচিত উক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শর্তটা পূরণ হয়ে থাকলে, অনুরূপভাবে পিতামাতাকে রাজি করানো যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ৫৪। যীশু বলেছেন, "আমার পিতা আমার চাইতে মহান" বা আমার পিতা সবার চাইতে মহান।" আমার প্রশ্ন হল, স্রষ্টাকে পিতা বলে ডাকার সুযোগ আছে কি?

উত্তর ঃ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালার ৯৯টি নাম দেয়া আছে। তবে কোরআনে কোথাও তার 'আব' বা 'পিতা' নাম নেই। আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের কোন রূপক নাম কোরআনে ব্যবহার করেননি। যেন মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ঈশ্বরকে পিতা তথা জৈবিক পিতা ভেবে না বসে। পিতা নামটা আল্লাহর কোন বৈশিষ্ট্য নয়।

বাইবেলে আল্লাহ পাকের একটি নাম ছিল 'পিতা'। যীশুখ্রীষ্ট স্রষ্টাকে পিতা বলে ডাকতেন। তবে, বাইবেল সঠিক হোক বা ভুল হোক বাইবেল একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জাতির জন্য নাযিল হয়েছিল। কোরআন নাযিল হওয়ার পর পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং বর্তমানে আমরা যে যেই দেশেরই অধিবাসী হইনা কেন, আমাদের জন্য কোরআনের আদেশ মেনে চলা বাধ্যতামূলক। আর কোরআনে যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালার পিতা নামক কোন বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়নি, অতএব ঈশ্বরকে পিতা ডাকা যাবে না।

প্রশ্ন ঃ ৫৫। ভারতীয় অনেক মুসলিম দ্বিধায় আছেন। কিংফিশার এয়ারলাইনসে চাকরি করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ যেকোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার ব্যাপারে নিয়ম হল এ যদি উক্ত কোম্পানিতে অধিকাংশ কাজ হয় হারাম, তাহলে সেখানে চাকরি করা হারাম। যেমন– ব্যাংকের ক্ষেত্রে যে সকল ব্যাংক সুদী লেনদেন করে, সে ব্যাংকের যেকোন ধরনের চাকরিই হারাম।

যে সকল কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান কিছু কাজ হারাম, সে সকল প্রতিষ্ঠানে কাজ করা যেতে পারে এ শর্তে যে, হারাম কাজটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না। ফাইভ স্টার হোটেল। এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অল্প অংশ হারাম। যেমন– 'বার'-এর অংশ। এ অংশে মদ পরিবেশন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে বারের সাথে সম্পৃক্ত কাজ ব্যতিরেকে অন্য যেকোন কাজ করা যেতে পারে।

এয়ারলাইনসের চাকরি করার ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। যে সকল এয়ারলাইনসে মদ পরিবেশন করা হয় সেখানে এয়ার হোস্টেজ হিসেবে চাকরি করা যাবে না। তবে টিকিটিং, একাউন্ট গ্রাউন্ড স্টাফ এ জাতীয় কাজগুলো করা যাবে।

কিংফিশার মূলত একটি মদ উৎপাদনকারী কোম্পানি। এ কোম্পানির একটি সহব্যবসায় হল এয়ারলাইনস। যদি এ এয়ারলাইনসের উদ্দেশ্য হয় মদ ব্যবসায়

প্রমোট করা, তাহলে এয়ারলাইনসে চাকরি করা যাবে না। তবে যদি এ এয়ারলাইনসে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবসা হয়, সেক্ষেত্রে কিংফিশার নামে কোন সমস্যা নেই। চাকরি করা যাবে।

প্রশ্ন ঃ ৫৬। ইসলাম ধর্মে পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি বা স্বর্ণের ঘড়ি পরা হারাম করা হয়েছে কেন?

উত্তর ঃ সহীহ হাদীসে পুরুষদের জন্য স্বর্ণালঙ্কার পরা হারাম করা হয়েছে। একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য এটা জানাই যথেষ্ট যে ইসলামী শরীয়াহ এটা হারাম করেছে। তবে যুক্তি দিয়ে বলা যায়, এর কারণ হল স্বর্ণালঙ্কার পরা অমিতব্যয়ের লক্ষণ বা বড়াই করে দেখানো। কোরআনের সূরা ইসরার ২৭ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই'। সুতরাং এ ধরনের অপব্যয় থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

প্রশ্ন ঃ ৫৭। আমরা কি রোগ নিরাময়ের জন্য রেইকি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতে পারি?

উত্তর ঃ রেইকি পদ্ধতি হল জাপানে প্রচলিত এক ধরনের আধ্যাত্মিক চিকিৎসাপদ্ধতি। যেকোন কাজের ব্যাপারে শরীয়াহর নিয়ম হল যদি তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে না যায় তাহলে সেটা করা যাবে। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও যদি সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি শরীয়াহর কোন সীমালঙ্ঘন না করে তাহলে তা পালন করা যাবে। যেমন– অ্যালকোহলযুক্ত ঔষধ খাওয়া হারাম, তবে যদি বিকল্প না থাকে সেটা ভিন্ন কথা। হাদীসে অন্যান্য ধর্মের প্রতীক যেমন পৈতা পরা, ক্রুস পরিধান করা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু অন্য যেকোন ধর্মের পদ্ধতি যদি সেটা ইসলামী শরীয়াহর বাইরে না যায় তাহলে নিয়তকে ঠিক রেখে সে পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। যদি কোন ধর্মের বিশেষ দিনে বিশেষ রীতিতে আলু খাওয়া হয়, সেক্ষেত্রে আলু খাওয়া যাবে। কেননা আলু খাওয়া ইসলামে হারাম নয়। কিন্তু কোন ধর্ম যদি বলে মূর্তির সামনে সেজদা করলে ঐ রোগটি ভাল হবে। এ পদ্ধতি পালন করা যাবে না।

প্রশ্ন ঃ ৫৮। টাকার উপর বিভিন্ন ছবি, যেমন মূর্তির ছবি, মানুষের ছবি ইত্যাদি থাকে। প্রশ্ন হল পকেটে টাকা রেখে নামাজ পড়া কি হারাম?

উত্তর ঃ পকেটে টাকা রেখে নামাজ পড়তে কোন সমস্যা নেই। টাকা না দেখা গেলেই হল। মাথার সামনে, নামাজের স্থানে টাকাটা এমন অবস্থায় রাখা হল যে ছবি দেখা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে নামাজ পড়া যাবে না। কেউ বলতে পারে নিয়ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শুধু নিয়ত নয় সাথে কাজ ঠিকমত হওয়া জরুরি। কেউ যদি মূর্তির সামনে সিজদাহ দিয়ে বলে 'আমার নিয়ত হল আল্লাহকে সিজদা করা' সেটা ভুল। সুতরাং টাকা এমন স্থানে রাখতে হবে যেখানে টাকাটা দেখা যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে নামাজ হবে।

প্রশ্ন ঃ ৫৯। বাড়ী তৈরি করার সময় কি আর্কিটেক্ট ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর ঃ আর্কিটেকচারে শরীয়াহ্ বিরোধী কিছু না থাকলে সেটা ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন ঃ ৬০। কোন ব্যক্তি যদি মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে কি তাকে কোন প্রকার শাস্তি দেওয়া যাবে?

ডা. জাকির : আমি যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, একজন ব্যক্তি যে ইন্ডিয়া সরকারের গোপনীয় বিষয়, যেমন– সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী বা অন্য পক্ষের নিকট প্রকাশ করে দেয় আর তা যদি প্রমাণিত হয়, সে ব্যক্তি ধরা পড়ে তাহলে কি ইন্ডিয়া সরকার তাকে শাস্তি দিবে না? নির্দিষ্ট অভিযোগ এবং প্রমাণসহ তাকে ধরতে পারলে এমন অপরাধের জন্য অবশ্যই সে শাস্তি পাবে। সে রাষ্ট্রের সাথে প্রতারণা করলে অবশ্যই তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

একইভাবে কোন ব্যক্তি যদি এমন প্রতারণা করে বিশ্বাস ঘাতকতা করে এবং কারও সম্পর্কে বানোয়াট কিছু বলে এবং তা প্রমাণ করা যায় তাহলে আমি মনে করি তাকে শাস্তি দেওয়া দরকার। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৬১। ডা. জাকির নায়েক, কোন ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে কি শাস্তি দেওয়া যাবে?

ডা. জাকির: হ্যাঁ, প্রশ্ন হলো আমরা এ ধরনের শাস্তি দিতে পারবো কি না? ধরুন প্রত্যেক Crime এর জন্য শাস্তির বিধান আছে এবং এ শাস্তি বিভিন্ন রকম হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলবো, ধরুন আপনি কোন কারণ ছাড়াই ট্রেনের চেন টানলেন, তার জন্য পাঁচশত রূপি জরিমানা হবে অথবা তিন মাসের জেল হবে। আপনি এই অপরাধ করে ধরা পড়লেন তারপর একটিবারে আপনাকে কেবল পাঁচশত রূপি জরিমানা করলো, অথবা অন্য বিচারক আপনাকে পাঁচশত টাকা জরিমানার সাথে ১ মাসের জেল আবার অন্য বিচারক আপনাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে। অপরাধের শাস্তির রায় বিচারক পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এক এক বিচারপতি এক এক রকম শাস্তি দিতে পারেন।

এখন আসুন Religions Fundamentalism ধর্মীয় মৌলবাদ Blasphame (আল্লাহ বা রাসূলের বিরুদ্ধে বিষোদাগার) এর বিষয়ে কি বলেছে তা আলোচনা করি– (Blaspheme) ব্লাস ফেমির বিরুদ্ধে কুরআন কি বলে? আমি কুরআন থেকে উল্লেখ করছি– কুরআন এর সূরা মায়েদার ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

অর্থ: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"

এটি হলো কুরআনের আইন, এ বিষয়ের জন্য কুরআনের আইন।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ـ

অর্থ: "আপনি পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন, জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।" (সূরা নাহল, আয়াত নং ১২৫)

আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি তাসলিমা নাসরিনের ক্ষেত্রে কি করবো, তাহলে আমি বলবো- যেহেতু কুরআন আমাকে সুযোগ দিয়েছে তাই তাকে আমি এ ধরনের পাবলিক ডিবেটের জন্য আমন্ত্রণ জানাবো।

প্রশ্ন ঃ ৬২। আমাদের প্রশ্ন হলো, সে এমন অপরাধ করলে তার শাস্তি কি হবে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক : শাস্তির মাত্রা অবশ্যই বিচারকের উপর নির্ভর করবে। আপনাদের জানা আছে, যে তথ্য প্রমাণসহ অভিযোগের ক্ষেত্রে বিচারের শাস্তি এক এক সময় এক এক জন বিচারকের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আপনি যদি ধর্মীয় মৌলনীতি বিষয়টি অধ্যয়ন করেন তাহলে- 'বাইবেল' এ বিষয়ে কি বলেছে?

বাইবেল বলে, আমি যদি ভুল বলি তাহলে এখানে উপস্থিত 'ফাদার' সঠিকভাবে বলতে পারবেন, ওল্ড টেস্টামেন্টের ৩য় খণ্ডের চ্যাপ্টার নং ২৪; আয়াত নং ১৬ এ বলা হয়েছে।

"যদি কোন ব্যক্তি প্রভুর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে, অবশ্যই তাকে হত্যা করা হবে।"

একজন ফান্ডামেন্টালিস্ট খ্রিস্টান অবশ্যই খৃষ্টধর্মের পূর্ণ অনুসারী হয়। তাহলে Book of Leviticus -ch,. 24. N. 16 তে পড়ে থাকবেন যেখানে খোদা সম্পর্কে কটূক্তির বিষয়ে বিধান দেওয়া হয়েছে।

Anyone who blasfimate the name the lord he shall certainly before to death. And all congregation shall surely told name. And even the stranger blaspheme before to death."

সুতরাং আপনি যদি একজন একনিষ্ঠ খ্রিষ্টান হন এবং খোদার বিরুদ্ধে ব্লাকফিমেট করেন তাহলে বাইবেল অনুযায়ী আপনাকে হত্যা করা হবে।

বাইবেলে অন্য বিধান দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেসব বিধানের একটি হলো এই বিধান।

প্রশ্ন ঃ ৬৩। যদিও ডা. জাকির নায়েকের অনেক বিতর্কে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তারপরও আমি তার নিকট থেকে "হ্যাঁ অথবা না" এমন উত্তর জানতে চাই। তসলিমা নাসরিন এর বিরুদ্ধে যে বিষয়ে ফতোয়া হয়েছে, আপনি কি তার বিরুদ্ধে এমন অমানবিক ফতোয়া সমর্থন করেন, না করেন না? এক কথায় উত্তর দিবেন।

উত্তর ঃ ডা: জাকির নায়েক : আমার এই ভাইটি প্রশ্ন করেছেন, তাসলিমা নাসরিনকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, যা কয়েক ব্যক্তি ঘোষণা করেছে বা দুইজন বা তিনজন বা চারজন হোক, তারা যে তাসলিমার মাথা নেওয়ার শাস্তি দিয়েছে আমি তা সমর্থন করি কি না? তা এক কথায় বলতে হবে। বিশ্বাস করুন ভাই, আমি একজন মুসলিম মৌলবাদী। ইসলামী মূলনীতি আমাকে এই প্রশ্নের জবাব এক কথায় উত্তর দেওয়ার জন্য অনুমতি দেয় না। এটা অবশ্যই অনুমোদিত নয়। আমি অবশ্যই এর উত্তর দিব, তার আগে আমি অবশ্যই এ বিষয়ে কি বিধি-বিধান আছে তা উল্লেখ করবো? তারপর এ আলোকে তাকে মূল্যায়ন করবো।

প্রশ্ন ঃ ৬৪। আমি ফুলটাইম সাংবাদিক নই, ডা: নায়েক, আমি জানতে চাই যেসব লোক তাসলিমার জন্য শাস্তি ঘোষণা করেছে, তাদের কি এমন করার কোন সুযোগ আছে? আপনি কি মনে করেন?

উত্তর ঃ ডা: জাকির নায়েক: আমার এই ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, যে সকল লোক তাসলিমার জন্য শাস্তি অনুমোদন করেছে তারা কি তাসলিমাকে তার নিজের অবস্থান পরিষ্কার করার কোন সুযোগ দেবে কি না? আমি জানি না, বিশ্বাস করেন, আমি জানি না। দিতে পারে আর নাও দিতে পারে, আমি জানি না। আমি তো এসব খবর কাগজের মাধ্যমে জানলাম কে সত্য বলছে তা আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি না। যে সব পত্রিকাতে তার সম্পর্কে পড়লাম তার একটিতে লিখেছে তার বয়স ২৯ বছর। একটি পত্রিকা লিখেছে তার বয়স ৩১ বছর। অন্য একটি পত্রিকা লিখেছে ৩৯ বছর। একটি পত্রিকা লিখেছে সে কেবল MBBS ডাক্তার। অন্য পত্রিকা লিখেছে সে গাইনোলজিস্ট, আবার অন্য পত্রিকা লিখেছে অন্যটা, যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন সে আসলে কি? তাহলো আমি বলবো, আমি জানি না।

প্রশ্ন ঃ ৬৫। আমি ডা: ভিয়াসকে একটি প্রশ্ন করতে চাই?

আপনি বলেছেন যে, ডা: জাকির নায়েক কি তাকে এখানে ডাকতে পারবে? তসলিমা নাসরিনকে প্রত্যেক বিষয় জিজ্ঞেস করতে পারবে? তার পেশা সম্পর্কে জানতে জিজ্ঞেস করবে কি? এমনকি ডা: জাকির নায়েক তাকে (তাসলিমাকে) মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দিতে পারবে কি? অথবা তার শরীরের কোন অঙ্গ কেটে ফেলতে পারবে কি না, ইত্যাদি?

উত্তর ঃ ডা: জাকির নায়েক : এমন করতে পারবে না। আমার সে কর্তৃত্ব নেই। আমি কেবল 'ফতোয়া' দিতে পারি। অনুগ্রহ করে উত্তেজিত হবেন না। আমাকে ফতোয়ার অর্থ বলতে দিন। আমি আবারও আরবি শব্দ ফতোয়ার অর্থ আপনাদের স্পষ্ট করে বলতে চাই। আরবি শব্দ 'ফতোয়া' এর অর্থ হলো মতামত, মন্তব্য। কিন্তু আমার মতামতের আপনি গ্রহণ নাও করতে পারেন।

যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেকের তার নিজের মত প্রকাশের অধিকার আছে, আমারও আছে, ভাই আপনারও আছে। (তসলিমাকে) তার মত প্রকাশের অধিকার আছে। আমরা এ বিষয়ে অভিযোগ করতে পারি এ বিষয়ে আপত্তি করতে পারি। কিন্তু আমি তাকে শাস্তি দিতে পারি না। একমাত্র কাজী (বিচারক)-র অধিকার আছে তার বিচার করার। উদাহরণ স্বরূপ একজন আইনজীবী যেমন বিচারকের নিকট তার Verdict জানাতে পারে তার মতামত জানাতে পারে কিন্তু বিচারক আইনজীবীর থেকে ভিন্ন রায় দিতে পারে। 'ফতোয়া' অবশ্যই Judgement হওয়ার দরকার বা প্রয়োজন নেই। আশা করি ভাই, আপনি এটা মনে রাখবেন। আমি যদিও একজন বিশেষজ্ঞ নই, আমি কেবল একজন ডাক্তার, তাই আমি ইসলামী বিষয়ে কোন 'ফতোয়া' দিতে পারি না। 'ফতোয়া' তা যদি আমার ব্যক্তিগত মতামত হয়, তাহলে আমি তা দিতে পারি কিন্তু বিশেষজ্ঞ হিসেবে অবশ্যই তা আমি পারি না এবং আমি কোন রায়ও দিতে পারি না। কেননা আমি কোন জজ নই। আপনার সংক্ষিপ্ত প্রশ্নানুযায়ী, আপনি জানতে চেয়েছেন, একই অপরাধের জন্য কি ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি হতে পারে? অথবা বিভিন্ন ধরনের শাস্তি হতে পারে কি? সঠিক নয় কি? আপনি কি আপনার প্রশ্নটি আবার উল্লেখ করবেন?

প্রশ্ন ঃ ৬৬। বিভিন্ন দেশে আইনের বিভিন্ন ধারা আছে উদাহরণস্বরূপ ইন্ডিয়ার কথা বলি। ইন্ডিয়াতে আইনের শাসনে আইন প্রণয়নের জন্য বোর্ড গঠন করা হয়। যেমন– পারিবারিক আইন, সম্পত্তি আইন, ইত্যাদি এইসব আইনের আওতায় শাস্তিও ভিন্ন রকম। আমি সারা বিশ্বের ক্ষেত্রে বলি।

ডা: জাকির নায়েক : ভাই, আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে ভিন্ন কোন শাস্তির বিধান করা যায় কিনা?

প্রথমে ইন্ডিয়ার কথা বলবো, তারপর বাংলাদেশের কথায় আসবো। আমি দুঃখিত, আমি ইসলামী আইন ভেবেছিলাম। আমাদের ইন্ডিয়াতে মুসলিম ব্যক্তিদের নিয়ে

যে ল'বোর্ড গঠন করা হয় তারা কেবল ব্যক্তিগত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। তারা শুধু ব্যক্তিগত বিষয়ে রায় প্রদান করে থাকেন। যেমন– তালাক, বিবাহ, ওয়ারিশ সংক্রান্ত (In heritence) ইত্যাদি। তারা ফৌজদারী কোন আইন প্রণয়ন করতে পারেন না। কারণ, আমাদের ইন্ডিয়াতে কমন ফৌজদারী আইন রয়েছে। সুতরাং আপনার প্রশ্ন ভিত্তিহীন। এবার বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলি। আমি এ বিষয়ে ভাল জানি না, আপনারা এমনটা ভাববেন না যে, আমি আপনার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছি। আমি জানি যে বাংলাদেশে কত ধরনের বিচারালয়, কোর্ট রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি ইসলামের প্রথম যুগের কথা বলেন, তাহলে বলবো তখন খিলাফত ছিল। তখন যিনি খলিফা ছিলেন তিনি ছিলেন সর্বপ্রধান, খেলাফত ব্যবস্থায় খলিফা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। তখন নিম্ন আদালত ছিল। নিম্ন আদালতের বিষয় নিষ্পত্তির জন্য উচ্চ আদালতে যেতে পারতো, আবার তা সুপ্রিম কোর্টেও যেতে পারত। যিনি খলিফা হিসেবে নিয়োগ পেতেন তিনিই প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োজিত থাকতেন। কোন নিম্ন আদালত ডিফল্টার (বিচারে ব্যর্থ) হলে যে কেউ সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারতেন। খলিফা ছিলেন সুপ্রিম জজ। কিন্তু বর্তমানে সে খিলাফাত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের বিচার পদ্ধতি রয়েছে তা নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্ট ইত্যাদি, তা আমরা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস থেকে জানতে পারি। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৬৭। একটি বিষয় আপনার থেকে জানতে চাই, যে বিষয়ে আপনার কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়। তাহলো, বাংলাদেশের যেসব মাওলানা যারা সামাজিকভাবে অনেক সম্মানিত, মর্যাদাবান, সম্মানিত, তারা তো সে দেশের কোন নিম্ন আদালত বা উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ পায়নি। কিন্তু তারা তো জন সম্মুখে 'তাসলিমার' জন্য শাস্তি ঘোষণা করেছে। আমার প্রশ্ন হলো– তাদের এ 'তাসলিমা নাসরিনের' মাথার জন্য এমন ঘোষণা দেওয়ার অধিকার আছে কি?

ডা: জাকির নায়েক: আপনি যদি আগের প্রশ্নের উত্তর মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকেন তাহলে সেখানেই আমি এর জবাব দিয়েছি। আমি সেখানে বলেছি, আমি আপনিসহ প্রত্যেকের 'ফতোয়া' দেওয়ার অধিকার আছে। ফতোয়া অর্থ হলো 'মতামত' সে (মাওলানা) 'ফতোয়া' দিতে পারে। সে তাসলিমা নাসরিনের মাথা কেটে নেওয়া হবে এমন মতামত দিতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ৬৮। তাই বলে কি সে (মাওলানা) পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘোষণা করবে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ৫০ হাজার টাকার বিষয়টি আমাকে আগে জিজ্ঞেস করা হয়নি। প্রশ্ন করার সময় এ টাকার কথা বলেন নি। এ বিষয়টি এইমাত্র বলছেন, তবুও আমি এর উত্তর দিব।

কারও কি অধিকার আছে যে অন্য কারও মাথার মূল্য ঘোষণা করা? কারও স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার দেওয়ার পর কেউ কি অন্যের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে পারবে? অন্যের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া, মানহানিকর কোন বক্তব্য দেওয়ার অধিকার আছে কি? যে কারও ফতোয়া বা মত প্রকাশের অধিকার থাকলেও আপনি নিশ্চয় অন্যের বিরুদ্ধে মানহানিকর কিছু বলতে পারেন না, অন্যের বিরুদ্ধে অপবাদ রটাতে পারেন না। এটা যদি কোন ইসলামী রাষ্ট্রে ঘটে থাকে, তাহলে তাসলিমা নাসরিনের এ অধিকার আছে যে সে ঐ মাওলানাকে বিচারের সম্মুখীন করবে। তাসলিমা নাসরিন মাওলানাকে ইসলামী কোর্টের আওতায় নিতে পারে।

তাসলিমা তার বিরুদ্ধে ইসলামী কোর্টে বিচার চাইতে পারে। কোন ইসলামী রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি যদি তাসলিমা নাসরিনকে অপবাদ বা মানহানি করে তাহলে সেখানে তাসলিমা নাসরিনের এই অধিকার আছে যে, সে ঐ ব্যক্তিকে ইসলামী কোর্টের বিচারের মুখোমুখি করবে। সে ইসলামী আদালতে তার বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারবে, বিচার চাইতে পারবে। কিন্তু আমি জানি না, বাংলাদেশ কতটুকু ইসলামী রাষ্ট্র? সেখানে কি পরিমাণ ইসলামী আইন অনুসরণ করা হয়? তারা হয়তো ইসলামী আইন অনুসরণ করে হয়তো বা করে না। আমি জানি না। ভাই আপনারা আমাকে আমার উত্তর শেষ করতে দিন। আমি কোন দেশের আইনের কথা বলছি না। আমি কেবল ইসলামের সাধারণ যে বিধান রয়েছে তাই বলছি। সুতরাং তাসলিমা নাসরিন যদি মনে করে মাওলানা তার বিরুদ্ধে মাথা কেটে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে তার মাথার যে মূল্য ঘোষণা করেছে তা অন্যায়, তাহলে তার অধিকার আছে সে (তাসলিমা) ঐ ব্যক্তিকে ইসলামী আদালতের বিচারের সম্মুখীন করার।

যদি কেউ এমন থাকে এবং তাকে অবশ্যই আদালতের সম্মুখীন করতে পারবে। কিন্তু আমাকে আমার উত্তরের সাথে ফাদার পেরেরার মন্তব্যের সাথে সংযুক্ত করতে চাই। তিনি বলেছেন যে, যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে 'ব্লাসফেমি' আইন প্রণয়ন করা খুবই সহজ এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া খুবই সহজ। তিনি এর স্বপক্ষে তাসলিমা নাসরিনের উদাহরণ দিয়েছেন। আসলে এ বিষয় এত সহজ নয় যতটা সহজ বলেছেন ফাদার পেরেরা। কারণ, আপনি যদি কোন অভিযোগের জন্য ইসলামী আদালতে সাক্ষী উপস্থাপন করতে চান তাহলে ছোট অপরাধের জন্য কমপক্ষে দুইজন সাক্ষী উপস্থাপন করতে হবে আর বড় বা গুরুতর অপরাধের জন্য কমপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে।

আর যদি চারজন সাক্ষীর কোন একজন ভুয়া প্রমাণিত হয়, আদালতে সাক্ষীগণের জেরা করার সময় কোন একজন ভুয়া প্রমাণিত হয় তাহলে চারজনের প্রত্যেককে আশিটি করে চাবুক মারা হবে। প্রত্যেককে ৮০টি চাবুক গ্রহণ করতে হবে। এটা খুবই সহজ নয়। এটা ইন্ডিয়ার আদালতের শপথ করা। "আমি যাহা বলিব সত্য বলিব" এমন শপথ করার মত সহজ নয়। ইন্ডিয়া সরকারের আদালতে গিয়ে

"আমি যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না" বলে শপথ করার মত সহজ নয়। আপনি যদি ভুয়া প্রমাণিত হন তাহলে আপনাকে ৮০টি চাবুক সহ্য করা সহজ নয়, অত্যন্ত কঠিন। ফাদার পেরেরা যতটা সহজভাবে উল্লেখ করেছেন তেমন সহজ নয়। আশা করি, ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৬৯। ডা. জাকির নায়েক, আমি সাজিদ রশিদ, উর্দু টাইমস্ থেকে এসেছি। আমরা এমন দেশে বসবাস করছি যেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ একত্রে বসবাস করছি এবং এই দেশের যে সংবিধান রয়েছে সেখানে জনগণের শাস্তির বিধানের জন্য সাধারণ আইনও আছে। যা সব জনগণের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এখন এমন একটি দেশে বসবাস করে কোন ব্যক্তি যদি কুরআনকে অস্বীকার করে বা কুরআনের অবমাননা করে তাহলে এমন অপরাধের জন্য ইসলামী আইনে যে শাস্তির বিধান রয়েছে সেসব শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য আপনি কি কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিবেন? যেখানে এমন একটি দেশের যার নিজস্ব সংবিধান রয়েছে সেক্ষেত্রে কুরআন অবমাননার জন্য ইসলামী আইনের বিধান মতে ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়া আপনার জন্য কি যথার্থ হবে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন করেছেন। যদিও আমরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক একসাথে বসবাস করছি তারপরও কি আমরা প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব আইন মেনে চলছি? ধরুন, আপনাদের কেউ কুরআনের অবমাননা করলো, আপনি কি ইসলামের আইন মেনে চলতে পারবেন? ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করতে পারবেন? আমাকে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝতে দিন সে যে কোন দেশেই হোক তা সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, আমেরিকা বা ইংল্যান্ড বা ইন্ডিয়া সব দেশের ফৌজদারী (Criminal law) আইন সকলের জন্য সমান। সেখানকার (Criminal law) কেবল পরিবর্তন হতে পারে। সৌদি আরবের (Criminal law) সকলের জন্য একই রকম হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম। এই ইন্ডিয়াতেও ফৌজদারী আইন (Criminal law) মুসলিম বা অমুসলিম সবার ক্ষেত্রে একই রকম। সুতরাং এক্ষেত্রে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন ফৌজদারী আইন (Criminal law) থাকতে পারে না। এক এক সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন রকম ফৌজদারী আইন (Criminal law) থাকতে পারে না। আপনি সেখানে আপনার মতামত জানাতে পারেন, আপনি বলতে পারেন তার জন্য এক/দুই বা তিন বছর ইত্যাদি রকম শাস্তির জন্য মতামত দিতে পারেন। আপনি এমন মন্তব্য করতে পারেন কিন্তু কোনভাবেই তা প্রাকটিস করতে পারবেন না। কারণ, আপনাকে অবশ্যই সাধারণ যে ফৌজদারী আইন (Criminal law) রয়েছে তাই প্রাকটিস করতে হবে। হ্যাঁ, আপনি যদি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই কুরআনের বিধান মেনে চলতে হবে। কোনভাবেই আপনি কুরআনের

আইনের বাইরে যেতে পারবেন না। কুরআনের বিধানের থেকে দূরে যেতে পারবেন না। যেহেতু ইন্ডিয়া ইসলামিক রাষ্ট্র নয় তাই আপনি এখানে কুরআনের আইনের বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। আপনি এখানে কেবল এখানকার সাধারণ ফৌজদারী আইন (Common Criminal law) মেনে চলতে হবে। আশা করি, আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৭০। আমি মারিয়া, আমি খৃষ্ট ধর্মপ্রচারক সিস্টার। আমার প্রশ্ন মি. অশোক সাইনির কাছে। আপনি কেন তসলিমার বই 'লজ্জা' মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করলেন?

উত্তর ঃ অশোক সাইনি ঃ যে কারণে আমি এই বই অনুবাদ করেছি তার প্রথম কারণ হলো, আমি এই বই পছন্দ করি। অন্য কারণ হলো যে ধরনের বই হোক তা একটি বিশাল অর্জন। কারণ, তাসলিমার সেই সাহস আছে যেখানে একটি মুসলিম প্রধান দেশে সংখ্যালঘুদের ধারাবাহিক নির্যাতন দুঃখ কষ্টের কথা লিখেছেন। তার এগুলো লেখার সাহস আছে এবং সে লিখেছে। একই ঘটনা আমাদের দেশে গত ডিসেম্বর– জানুয়ারি মাসে ঘটেছে বোম্বের দাংগায় অনেক সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হয়েছে। অথচ কোন মহৎ ব্যক্তি এ বিষয়ে সাহসিকতার কাজটি করেন নি। কেউ বলেনি যে এ ঘটনা আমাদেরকে বড় একটা লজ্জার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু তাসলিমা এই সাহস দেখিয়েছে এবং সে লিখেছে। কাজ করে দেখিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ৭১। আমার প্রশ্ন ডা. জাকির নায়েককে। বাংলাদেশের মৌলবাদীরা নিজেরাই তসলিমা নাসরিনের মাথার মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘোষণা করে তাকে লাইম লাইটে (আলোচিত) আনার জন্য দায়ী। যদি তারা (মৌলবাদীরা) তার এ বিষয়টি আলোচনায় না আনতো এবং সে যা লিখেছে তা অবহেলায় রাখতো তাহলে আমরা কি আজকের এ সমাবেশে একত্রিত হতাম?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি ভাল একটি প্রশ্ন করেছেন। যদি তথাকথিত মুসলিম মৌলবাদী আমি তাদেরকে তথাকথিত মৌলবাদী মুসলিম বলবো। তারা যদি তাসলিমা নাসরিনের মাথার দাম ঘোষণা না করতো তাহলে আমরা আজকের এই সমাবেশে জমায়েত হতাম না। ভাই, আমি আপনার সাথে একমত, কিন্তু আপনি যেমন মুসলিম মৌলবাদীদেরকে দোষারোপ করছেন তেমনি আমি দোষারোপ করি মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যমকে। এখানে আমাদের মতভেদ যদি এই রকম একটি অখ্যাত, প্রভাবহীন অগুরুত্বপূর্ণ একটি সংগঠন যেমন BSSP বাংলাদেশ সাহাবা সৈনিক পরিষদ যাকে বলতে গেলে কেউই চিনতো না। বলেন, কে এই সংগঠনকে চেনেন? কে এই সংগঠন কে জানতেন? নিশ্চয়ই কেউ জানতেন না, চিনতেন না, যাইহোক, যদি এই সংগঠনের প্রধান মাওলানা হাবিবুর

রহমান যাকে আমি চিনি না, যদিও কেউ কেউ তার শাস্তি ঘোষণা করেছে, যদি এমন একজন অখ্যাত ব্যক্তি এবং গুরুত্বহীন, প্রভাবহীন একটি সংগঠন এমন শাস্তি ঘোষণা করেই থাকে তাহলে ইন্ডিয়ার মিডিয়াগুলো কেন এমন হৈ চৈ করছে? সংবাদ মাধ্যমগুলো কেন তা ফলাও করে প্রচার করছে? তার এ বিষয়টি ফ্রন্ট পেজে স্থান পাচ্ছে। ইন্ডিয়ার পত্রিকাগুলো এই খবরটি তাদের প্রথম পাতায় নিউজ করছে। ইন্ডিয়াতে বাংলাদেশের হাই কমিশনারের ভাষ্য মতে, এটি আমি দিল্লির পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করছি, বাংলাদেশের হাইকমিশনার বলেন, ইন্ডিয়ার নিউজ পেপারগুলো তাসলিমা নাসরিনকে নিয়ে যত খবর প্রকাশ করছে তা এমন যে,

বাংলাদেশের নিউজ পেপারগুলোতে যত নিউজ হয় তা ইন্ডিয়ার পেপারগুলোতে প্রকাশিত নিউজের এক পারসেন্টও হবে না। আপনি অভিযোগ করেছেন, দোষারোপ করেছেন এবং আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, মুসলিম মৌলবাদীরাই দায়ী এবং তারা অভিযুক্ত হতে পারে। হয়তো হয়ে থাকবে, আপনি তাদেরকে অভিযুক্ত করেন বা না করেন সেটা আপনার বিষয় কিন্তু আমি বলবো এর জন্য ইন্ডিয়ার মিডিয়া, ইন্ডিয়ার সংবাদপত্রগুলো অনেক বেশি দায়ী। যদি তারা (মিডিয়া) তাকে ফলাও করে প্রচার না করতো তাহলে এখানে আলোচনাও করতে হতো না।

প্রশ্ন ঃ ৭২। আমার কথা হলো ইন্ডিয়ার মিডিয়া এই বিষয়টি এই জন্য হাইলাইট করছে যে, ইন্ডিয়ান মিডিয়া তার (তসলিমা) জীবন রক্ষার চেষ্টা করছে। কেননা সে এখন নিঃসঙ্গ অসহায় ধর্মান্ধ কতগুলো উগ্র লোকদের সামনে অসহায় এই নারীকে বাঁচানোর জন্যই ইন্ডিয়ার মিডিয়ার এই চেষ্টা।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আমার এই ভাই বলেছেন, ইন্ডিয়ান মিডিয়া অখ্যাত এক সংগঠন ও অপরিচিত গুরুত্বহীন মাওলানা হাবিবুর রহমান থেকে তাসলিমাকে রক্ষা করার জন্য এই ইস্যুটি হাইলাইট করছে। আজ যদি সে বলে আমি প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করবো তাহলে কি এটা আগামীকালের পেপারে হেড লাইন হবে? এখন আপনাদের অনেকে আমার কথার মাঝে মন্তব্য করছেন, যারা করবেন তারা আগে আমার কথা শেষ করতে দিন। এটা কেবল আমার মতামত। এখানে উপস্থিত শ্রোতাদের কারও নিকট আমার মতামত ভাল লাগলে সে তা গ্রহণ করবে আর কারও ভাল না লাগলে সে তা গ্রহণ করবে না। আমার মত প্রকাশের তো স্বাধীনতা আছে। আমি মনে করি যদি কোন অখ্যাত সংগঠন এখন ঘোষণা করে তাহলে তা নিয়ে হৈচৈ করার কিছু নেই। হ্যাঁ, যদি কোন নেতৃস্থানীয় বা Leading organinzation এমন ঘোষণা দিতো তাহলে সে ভিন্ন কথাটা সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে বা তারা সঠিক করলো বা ভুল করলো সে বিষয়ে মন্তব্য করছি না, আমি কেবল বলবো কেন এমন অখ্যাত সংগঠন বিষয় হেড লাইন হবে?

বৃহত্তর স্বার্থে আমার কোন মন্তব্য নেই। আপনার যদি পছন্দ হয় তাহলে আপনি গ্রহণ করতে পারেন আর যদি পছন্দ না হয় তাহলে এটা বর্জন করতে পারেন আমার কোন মন্তব্য নেই।

ড. আশোক সাইনি ঃ আমার একটি সংশোধনী আছে। তাসলিমা নাসরিনের মস্তকের জন্য যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘোষণা করা হয়েছে তার যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে তা একটি গুরুত্বহীন ও অখ্যাত সংগঠনের পক্ষ থেকে করা হয়েছে বলে ডা. জাকির নায়েক যে মন্তব্য করেছেন তা আসলে ঠিক নয়। এই ঘোষণা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর অফিসিয়াল ঘোষণা।

প্রশ্ন ঃ ৭৩। আমি প্রফেসর হামজা ইবনে রামীম। আমি অশোক সাহানীকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। আপনি বলেছেন যে সাংবাদিকরাই তসলিমা নাসরিনের জীবনকে সংকটাপন্ন করে তুলেছেন। আবার ঐ ভাই বলেছেন যে, ইন্ডিয়ান মিডিয়া তাসলিমা নাসরিনের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছে। আমি জানি না আপনি সাংবাদিক কিনা, সাংবাদিকদের কথা বলেছেন, কিছু সাংবাদিক তাসলিমা নাসরিনের জীবনকে বিপদাপন্ন করে তুলেছেন এবং ঐ ভাই বলছেন যে সাংবাদিকরাই তার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। আমি জানতে চাই কোনটি সঠিক, তারা কি তাসলিমাকে বিপদে ফেললো না তাকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে।

উত্তর ঃ অশোক সাইনি ঃ সমস্যাটি অবশ্যই খুব সামান্য নয়। এটা একটা জটিল সমস্যা। সেই অনেক দিন থেকে যখন সে ভার বক্তব্য দিয়েছে তার শুরু থেকেই বাংলাদেশের মৌলবাদীরা তার মস্তকের দাম ঘোষণা করেছে। প্রশ্নের বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো তারা অতি মাত্রায় জাতীয়তাবাদ দ্বারা বিভ্রান্ত। তাসলিমা প্যারিস থেকে ঢাকা ফেরার পথে কলকাতা অবস্থানের সময় বলেছে কলকাতা আমার দ্বিতীয় দেশ (2nd Home) একইভাবে বোম্বের শিবসেনার সমস্যায় ইমরান খান বলেছে বোম্বে আমার অনেক পাকিস্তানী উত্তেজিত হয়েছে এবং আলোচনাও করেছে। এমন কি সুনীল গাভাস্কার যখন ব্যক্তিগতভাবে ক্যান্সার হাসপাতালের কার্যক্রমের জন্য পাকিস্তান গেল তখন পত্রিকাতে গোলমালের অনেক খবর বের হয়েছিল। কেন গাভাস্কার সেখানে গেল এটা একটা সমস্যা বটে এবং সবই তো একই রকমের সমস্যা। কিন্তু আমি বলবো এমনটা বলার জন্য কোন প্রকাশ্য ক্ষমা চাওয়ার জন্য বলা হবে এবং তারা তাদের এ মন্তব্যের জন্য প্রকাশ্য ক্ষমা চেয়েছে তাতে আমার ভিন্ন মত আছে।

প্রশ্ন ঃ ৭৪। আমার প্রশ্ন ডা. জাকির নায়েককে ঃ তাসলিমা নাসরিন একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা হলো, তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর।' এ বিষয়ে আপনার কোন মতামত আছে কি? থাকলে কি মন্তব্য করবেন? ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ হ্যাঁ আমিও একমত, যে তাসলিমা নাসরিন তার বিতর্কিত লেখায় উল্লেখ করেছে যে, কুরআন বলছে স্বামীদের জন্য স্ত্রীগণ হলো শস্যক্ষেত্র For husbands women are farmland" কুরআন Farmland

বলেনি, কুরআন বলেছে 'Tilt' যদিও Farmland এবং Tilt এর অর্থ প্রায় কাছাকাছি। তথাপি তাসলিমা কুরআনের সঠিক উদ্ধৃতি দেয়নি, সে ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছে। তাসলিমা কুরআনের ভুল উদ্বৃতি দিয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে Tilt কিন্তু সে বলেছে Farmland. সে কুরআনের কথা বলেছে ঠিকই কিন্তু কোন রেফারেন্স দেয়নি। সে বলছে "For the husband the wife is the farmland, you can approach them as you like" অর্থাৎ স্বামীদের জন্য স্ত্রী হলো শস্যক্ষেত্র তোমরা যখন ইচ্ছা তাদের ব্যবহার করতে পার। সে আরো বলেছে "The women are considered as properties" অর্থাৎ নারীকে সম্পদ (Properties) হিসেবে বিবেচনা করা হয় সে কুরআনে যে উদ্ধৃতি দিয়েছে তা সূরা আলে ইমরানের একটি। যদিও সে রেফারেন্স করেনি। এখানেও সে কুরআনের ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছে। সে কুরআন থেকে পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি দেয়নি। আংশিক উল্লেখ করেছে। কুরআনের সূরা আলে ইমরান-এর ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে তা হলো–

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ـ

অর্থ ঃ "মানবকূলের নিকট প্রিয় করা হয়েছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু, আল্লাহর নৈকট্যই হলো উত্তম আশ্রয়।"

কোরআন বলেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত গুণাবলীসম্পন্ন অশ্ব এবং শস্যক্ষেত্রসমূহের মালিক হলে কে না গর্বিত হয়? আপনিই বলেন ভাল স্তরের জন্য কোন ব্যক্তি আনন্দিত, গর্বিত হয় না, কুরআন নারীর কথা বলেছে, যেখানে স্ত্রী ও মেয়েকে বুঝায়। বলেন কোন পিতা তার সুপুত্রের জন্য গর্বিত হয় না? কোন স্বামী তার উত্তম স্ত্রীর জন্য গর্বিত হয় না? একইভাবে, কোন স্ত্রী তার উত্তম স্বামীর জন্য গর্বিত হয় না? এসব যদি ভাল হয় তাহলে অবশ্যই তার জন্য গর্ববোধ করাটা স্বাভাবিক। তাহলে কোরআন কেন তাদেরকে সম্পদ (Properties) হিসেবে গণ্য করবে না।

আপনার প্রথম প্রশ্নের বিষয়ে বলছি – "কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র।" সে কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বলেনি যে, সে কুরআনের কোথায় এ আয়াত পেয়েছে পুরো কুরআনের কোথায়

একথা বলা হয়েছে, যেখানে স্ত্রীদেরকে পুরুষদের শস্যক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেছে। সে (তাসলিমা) কুরআনের সূরা আল বাকারা এর ২২৩ নং আয়াতকে নির্দেশ করেছে। প্রকৃত অর্থ এবং উত্তর জানার জন্য আপনাকে এই আয়াতের পূর্ববর্তী ২২২ নং থেকে পড়তে হবে। তারপর আপনি ২২৩ নং আয়াতে আসবেন, ২২২নং আয়াতে এরশাদ হচ্ছে :

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

অর্থঃ "আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করবে হায়েজ (ঋতু) সম্পর্কে, বলে দাও তা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাক। ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর, তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।"

আমি কুরআনের যে আয়াত বললাম তাতে Period চলাকালীন সময়ে স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। মেডিকেল সাইন্স বলে যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীর Period (ঋতু) চলাকালীন স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তা স্ত্রীর জন্য অনেক ক্ষতিকর এবং পরবর্তীতে অনেক রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেকোনো ডাক্তার আপনাকে এই একই কথা বলবে। এটা স্ত্রীর জন্য ক্ষতিকর তেমনি স্বামীর জন্যও। সুতরাং কুরআন বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই নির্দেশ দিচ্ছে। যখন তোমাদের হায়েজ (ঋতু) চলে তখন তাদের সাথে সহবাস করা থেকে বিরত থাক। এই আয়াতের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ২২৩ নং আয়াত–

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জ্ঞান রাখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাৎ করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও।"

কুরআন বলেছে তোমরা হায়েজ চলাকালীন তোমাদের শস্যক্ষেত্রের নিকটবর্তী হয়ো না, তাছাড়া অন্য সময় তোমরা যখন চাও তার নিকটবর্তী হও, যদি তারাও তোমাদের কাছে আসে। এখানে সমস্যা বা ক্ষতি কোথায়? সে তো কুরআনের অপব্যাখ্যা দিয়েছে এবং কুরআন থেকে ভুল উদ্বৃতি দিয়েছে। যেমন– নারীদেরকে সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনার বিষয়টিও। এই আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কিত, যে আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি নারী/স্ত্রী যদি ঋতুবর্তী হয় তাহলে তার নিকটবর্তী হয়ো না। কুরআন বলছে, না তুমি স্ত্রীর নিকটবর্তী হয়ো না, এটা স্বামী–স্ত্রী উভয়ের জন্য ক্ষতিকর।

আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৭৫। আমি মিসেস ভাবনা আনসারী। আমি আগে কিছু কথা বলব। এগুলো প্রথমে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আমার জন্ম হয়েছে একটি জৈন পরিবারে, বড় হয়েছি হিন্দু পরিবেশে, পড়াশুনা করেছি খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানে। আর বিয়ে করেছি একজন মুসলিমকে। আমি ইন্ডিয়ার বিবাহ আইন অনুযায়ী বিয়ে করেছিলাম। আর আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত আছি। গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি ইসলামকে যেন আমার হৃদয়ে ধারণ করতে পারি। আর এখানেই আপনার লেকচার শুনলাম আপনি যা কিছু বললেন ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে। সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি অনেক কিছু জেনেছি। অনেকটা পুনর্জন্ম। তবে আপনি যেসব কথা বললেন আর ইসলামও যেগুলো বলছে। মাফ করবেন, আমি দেখি যে, মুসলিমদের বেশির ভাগই এগুলো মেনে চলে না। তারা আমাকে আকৃষ্ট করছে না। আপনি কি কোন সমাধান দিতে পারবেন? কারণ আপনি যখন ইসলামের মৌলবাদ নিয়ে বললেন, সেটা পজেটিভ। যখন অসহিষ্ণুতা নিয়ে বললেন সেটাও পজেটিভ। কিন্তু বাস্তবে এমনটা দেখি না। এ ব্যাপারে কি কিছু বলবেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আর প্রথমেই আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই, আপনাকে স্বাগত জানাই। আপনি বললেন রিবর্ট। ইসলাম ধর্মে সঠিক শব্দটা হলো রিভার্ট। আমাদের নবীজি হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন প্রত্যেক শিশু দীন আল ফিতর নিয়ে জন্মায়। সে জন্মায় মুসলিম হয়ে। মুসলিম মানে যে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে। প্রত্যেক শিশুই যখন সে জন্ম গ্রহণ করে সে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। এরপর নবী ﷺ বলেছেন তাকে প্রভাবিত করে বাবা মা, গুরুজনেরা, তার শিক্ষকরা, তারপর সে হয়ে যায় অগ্নি উপাসক, ভুল পথে চলে যায়। তাই কেউ একজন যদি ফিরে আসে তার পুরোনো ধর্মে দীন আল ফিতরাতে তখন সঠিক শব্দ কনভার্ট হবে না

রিবর্ট হবে না হবে রি- ভার্ট। তাই আপনাকে এ শান্তির ধর্মে ফিরে আসার জন্য অভিনন্দন। যাতে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারেন। এবারের প্রশ্নটা নিয়ে বলি আমার লেকচার শুনেছেন, তার কিছু পয়েন্টে আপনি একমত। আপনি এ সম্পর্কে পড়েছেন। তবে এখানে আপনার আপত্তিটা হলো যে, মুসলিম বা আপনার মতে মুসলিম তারা ইসলামের শিক্ষা মেনে চলছে না। এখানে সমাধানটা কি? বোন আমি আপনার সাথে একমত। এব্যাপারে আমি একমত যে, অনেকেই নিয়মগুলো মানে না। তবে পরিসংখ্যান বলছে যে ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দিক থেকে। আপনারা মাথা হিসাব করেন সংখ্যার দিক থেকে।

সংখ্যার দিক থেকে প্রথম অবস্থানে আছে খ্রিস্টানধর্ম, এ ধর্মে প্রায় দুইশ কোটি মানুষ। ইসলাম ধর্মে ১৩০ কোটি থেকে ১৪০ কোটির মত। তবে যদি দেখেন কতজন তাদের ধর্মটা পালন করে। আমি আপনাদের সাথে একমত যে, জনসংখ্যার দিক থেকে বেশির ভাগ ইসলাম হচ্ছে এক নম্বর। কারণ প্রায় ১৩০ কোটি মুসলিম। এখানে যদি পার্সেন্টেজ করেন সেটাও হবে কয়েক লক্ষ। এই মুসলিমরা তাদের ধর্ম পালন করে না। সেজন্য ইসলামকে বুঝতে চাইলে মুসলিমদের দেখবেন না প্লিজ। আমি সবসময় বলি কোন ধর্মকে বুঝতে চাইলে তার অনুসারীদেরকে দেখলে হবে না। দেখতে হবে- সেই ধর্মের ধর্ম গ্রন্থগুলোকে। প্লিজ আমাকে দেখবেন না। আপনাদের আশেপাশের মুসলিমদের দেখবেন না। আপনাদেরকে একটি গাড়ি এবং ড্রাইভারের উদাহরণ দিয়েছিলাম আমি। একটা গাড়ি কত ভালো সেটা জানার জন্য এমন একজন লোককে গাড়িতে বসালেন; যে গাড়ি চালাতে জানে না। তারপর সে গাড়িটা নিয়ে এক্সিডেন্ট করল। দোষ দিবেন কাকে, গাড়িকে না ড্রাইভারকে? ড্রাইভারকে দোষ দিবেন। তাই প্লিজ মুসলিমদের কাছ থেকে ইসলামকে বিচার করবেন না। সেজন্য এ লেকচারটা হচ্ছে মুসলিম এবং অমুসলিম সবার জন্য। যেসব মুসলিম দিশেহারা আমরা তাদের সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছি। কারণ হয়ত তারা নামেই মুসলিম। আমরা চাই তারা ধর্মের নিয়ম পালন করুক।

একই সাথে ইসলাম ধর্মের বাণী আমরা অমুসলিমদের কাছে প্রচার করছি। যাতে তারা এ ধর্মটাকে বুঝতে পারে। তারপর ধরেন আপনি জন্মেছেন, হতে পারে জৈন পরিবারে। আপনার চারপাশে অনেক মুসলিম ছিল। বিয়ে করেছেন এক মুসলিমকে। হয়ত আজকে আমার লেকচার শুনার পর ইসলাম সম্পর্কে জানার পর আপনি এ বিশ্বাসে ফিরে আসবেন। আপনি আরো বললেন যে, আপনার ক্ষেত্রে তখন শুধু নাম রাখার জন্য। আপনার নামের পরে আনসারী লিখেছেন, কিন্তু এখন আপনি এই বিশ্বাসে ফিরে এসেছেন। সেজন্য অভিনন্দন জানাই। আর প্লিজ বোন যদি কোন মুসলিমকে দেখে ইসলামকে বুঝতে চান। সেরা দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমাদের নবীজি হযরত মুহাম্মদ ﷺ। এ পবিত্র কুরআন আর নবীজির কথাগুলো এখানে

মানব জাতির সব সমস্যার সমাধান। মুসলিমদেরকে দেখবেন না। কিছু মুসলিম পালন করে আর কিছু মুসলিম ধর্ম পালন করে না। তাই দেখবেন এ পবিত্র কুরআন বুঝে পড়েন, মেনে চলেন ইনশাআল্লাহ্ আপনি ইহকালে শান্তিতে থাকবেন আর পরকালেও শান্তি পাবেন।

প্রশ্ন ঃ ৭৬। আমার নাম প্রফেসর সেটি। আমি পেশায় একজন ইঁনিয়ার। এছাড়া আমি শিক্ষকতাও করে থাকি। আল্লাহ্র রহমতে অংকে আমার মাথা খুব ভালো। প্রথমেই আমি আপনার জ্ঞানের প্রশংসা করছি। প্রার্থনা করি আল্লাহ্ যেন আপনাকে দীর্ঘায়ু করেন। আর এখনকার সব মুসলিমকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়ার জন্য। স্যার আমি ভগবত গীতা পড়েছি, রামায়ণ পড়েছি, যেহেতু আমি হিন্দু। আমি মাঝে মধ্যে মন্দিরেও যাই। আমার ভগ্নিপতি একজন মুসলিম। তার কুরআনটা নিয়ে আমি দুইবার পড়েছি। এখানে দেখলাম যে, আপনারা কুরআনের কথাগুলো মেনে চলছেন। আমি নামাজের দোয়াগুলো অনুবাদ করেছি। দয়াময় পরম আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা এবং কর্মফল দিবসের মালিক। আমি এভাবেই দশবার, পনের বার বিশবার পড়ি। তখন আমি সময়ের কথা না ভেবে ঈশ্বরের প্রার্থনা করি। আর এটা আমার খুব ভালো লাগে। আমার আয়ের উৎসটা নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন আছে। যেহেতু আমি অংকে ভালো, তাই স্টক মার্কেট নিয়েও অ্যানালাইসিস করি। এরেভেনিও মার্কেটও আমি বেশ বুঝি। যেমন ফিউচার এন্ড অপশন। আমি জানি না মানুষ স্টক মার্কেট কতটা বুঝে। যেহেতু আমি হিসাব করি, ইনভেস্ট করি তাই সব সময় আমার কিছু লাভ থাকে। মাস শেষ হয় ভালো করেই। এটা একটা অংকের খেলা। এটা অনেক মানুষই বুঝে না। এভাবে আয় করার অনুমতি কি আছে? গত তিন বছর এটা নিয়ে ভাবছি। আমি চাইলে স্টক মার্কেট দিয়ে অনেক টাকা আয় করতে পারি। তবে আমি হারাম আয় চাই না। এটা নিষিদ্ধ হলে আমি আর এটা কখনোই করব না। তাহলে আমি শুধু শিক্ষকতাই করে যাব।

একটা কথা বলি স্যার। আপনার মত আমি কাউকে দেখিনি। আর আল্লাহ্ যদি চান আমিও আপনার মত একদিন হব, ঈশ্বর যদি চান।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ্ আগে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই। তারপর এ সম্পর্কে উত্তর দেই। আমাকে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি স্টক মার্কেটে ব্যবসা করেন। সেখানে বিভিন্ন হিসেব নিকেশ করা হয়। আর আপনি এ গাণিতিক বিশ্লেষণে এতটাই ভালো যে, প্রতি মাসেই আপনার কিছু লাভ থাকে। আপনার প্রশ্নটা হালাল না হারাম। স্টক মার্কেটের কথা যদি বলতে হয়।

স্টক মার্কেট এইটা হারাম না। আপনি যে স্টক নিয়ে ব্যবসা করছেন সেটা ইসলাম ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী হতে হবে। ইসলাম ধর্মে যেটা হারাম সেটা হচ্ছে রিবা অর্থাৎ সুদ। পবিত্র কুরআনে সব মিলিয়ে আট জায়গায় বলা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলছেন, রিবা হচ্ছে হারাম। সূরা আলে ইমরানের ১৩০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা নিসা-এর ১৬১ নম্বর আয়াতে আছে, সূরা বাকারার ২৭৫ নম্বর আয়াতে আছে তিনবার, সূরা বাকারার ২৭৬ নম্বর আয়াতে, এছাড়াও সূরা বাকারার ২৭৮ নম্বর আয়াতে আছে। এখানে বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর সুদের বকেয়াটা ছেড়ে দাও।" তোমরা যদি সুদের বকেয়াটা ছেড়ে না দাও, সূরা বাকারার ২৭৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও।" তাহলে সুদের কারবার করা হারাম। তবে শেয়ার মার্কেট। এখানে ইসলামের কিছুটা নিয়ম মেনে চলা হয়। সেখানে লাভ বা ক্ষতি হতে পারে। শেয়ার মার্কেটে ব্যাংক থেকে লোন দেয়ার ব্যাপারে আমরা তখন অংশীদার হই। কারণ, ব্যাংকিং সিস্টেমে ধনী লোক আরো ধনী হয়, গরিব মানুষ আরো গরিব। এভাবে সমাজে নতুন কালচার দেখা যায়। যেমন– মেয়েদের টিজ করা। তারপর বিভিন্ন জুয়ার আসর, মদ খাওয়ার আসর। ইসলামে নিয়মনীতি আলাদা। তাহলে ইসলাম আমাদেরকে লাভ করতে উৎসাহিত করে, স্টক মার্কেটে আপনি কি করেন? শেয়ার কিনেন। এভাবে আপনি সেই কোম্পানির সদস্য হয়ে গেলেন। হোক ওয়ান পার্সেন্ট, টেন পার্সেন্ট, পয়েন্ট জিরো টু পার্সেন্ট, পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্ট। তাহলে ব্যবসায় লাভ বা ক্ষতি ইসলামে এটার অনুমতি আছে। তাই আপনি যদি শেয়ারের ব্যবসা করেন। আর সেই ব্যবসা যদি ইসলামিক শরীয়াহর নিয়মগুলো মেনে করেন। যদি আপনি এমন কোন কোম্পানির শেয়ার না কিনেন, যারা এলকোহল বিক্রি করে, যারা সুদের কারবার করে, ফাইনানশিয়াল লিজিড কোম্পানি। যেসব কোম্পানি অশ্লীল ছবি বানায় বা পর্নোগ্রাফি করে। সমাজের জন্য এসব ক্ষতিকর জিনিস। কোন কোম্পানি যদি এসবে ইনভেস্ট করে তাহলে আপনি জায়গায় যাবেন না।

এলকোহলিজম বা ড্রাগস বা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো ঠিক আছে। ড্রাগস মানে কোকেন, ব্রাউন্স সুগার অথবা নেকেট সিনেমা বানায়। যেমন– ফিল্ম কোম্পানি। আপনি যদি এমন কোন কোম্পানির শেয়ার কিনেন এটা হারাম। দ্বিতীয়ত, আপনি যদি অনুমান করে থাকেন যে, এটা জুয়াখেলা। আপনিতো শেয়ার মার্কেটে আছেন। লোকে শেয়ার কিনে দুই সপ্তাহ পরে সেগুলো আবার বিক্রি করে দেয়। হয়ত আগে থেকে জেনে অথবা অন্য কোন কারণে। আর ইসলামে জুয়াখেলা হচ্ছে হারাম। তাহলে আপনি যদি স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করতে চান কোন সমস্যাই নেই। সেখানে ব্যবসা করেন। এভাবে স্টক মার্কেটে আপনি ব্যবসা করতে পারেন।

এবারে ফিউচার অপশন নিয়ে বলছি যে, আপনি কিছু শেয়ার কিনে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিলেন। এরপর সেই শেয়ার থেকে কিছুটা রেখে বিক্রি করে দিলেন। আমি জানি আপনি বিক্রি করতে পারেন, কিছু অংশ রাখতেও পারেন। তারপর আবার কিছু শেয়ার কিনতে পারেন সেটা বিক্রি করতে পারেন আমি এটা জানি। আমি হয়ত আপনার মত Expert না, তবে আমি এ নিয়ে বলতে পারব ভবিষ্যতের কথা যদি বলেন এটার অনুমতি নেই। এটা হারাম। মার্জিন ট্রেডিং যেটা দেখবেন রিয়েল স্টেট ব্যবসায়। আপনি টেন পার্সেন্ট কিনলেন সেটার দাম বেড়ে গেল। কারণ, কোন প্লট কিনতে গেলে টাকা দিবেন কিস্তিতে। কিস্তির মেয়াদ দুই বছর। এখন টেন পার্সেন্টি দিলেন পরে টুয়েন্টি পার্সেন্ট দিলেন, তারপর দাম বাড়ল আপনি বিক্রি করে দিলেন, ঠিক আছে। শেয়ারের ক্ষেত্রে এমনটা হয় না। স্টকের ক্ষেত্রে এমনটা হয় না। এ ক্ষেত্রে জিনিসটা আপনার হাতে নেই।

আপনি আংশিক টাকা দিয়েছেন। তারপর অন্য কেউ আপনার পিছনে আসল। এটা যদি পড়ে যায় তাহলে হেজ পয়েন্ট থাকে। হেজ পয়েন্ট জানেন? ইসলামে এসব জিনিসের অনুমতি নেই। তবে পিউর স্টক যদি সেটাই আপনার ব্যবসা হয়ে থাকে, সেটা ইসলামিক হলে অনুমতি আছে। আর এ কারণে শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ আর মাত্র কয়েক মাস এর মধ্যেই আমরা ইন্ডিয়ায় একটা ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড চালু করব। সেখানে আমরা সবাইকে সুযোগ দিতে চাই। কারণ, অনেক মুসলিমই জানেন যে, রিবা হারাম বা সুদ হারাম। কিন্তু তাদের সামনে কোন উপায় নেই। অনেকেই শেয়ারের ব্যবসা করে, কিন্তু জানে না এটা হালাল নাকি হারাম? তারপর তারা ব্যাংকের শেয়ার কিনে। অন্যান্য হারাম শেয়ার কিনে। যেমন– মিডিয়া, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি। প্রধানত এদেরকে পথ দেখানোর জন্য ইনশাআল্লাহ তাদের হালাল আয় করার সুযোগ দিতে চাই।

আর সে সময় ইনশাআল্লাহ আপনার জ্ঞান কাজে লাগলে আপনার পরামর্শও নিব। ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা আমাদের জ্ঞানকে ভালো কাজে লাগাব। এরপর আপনি আরো বলেছেন শেয়ারের ব্যবসায় করে আপনি অনেক টাকা জমিয়েছেন। এটার অনুমতি না থাকলে আপনি বাদ দিবেন। এখানে আসল কথা হল আমরা শান্তি চাই ইহকালে আর আখেরাতে। পরকালের যে শান্তি সেটা দীর্ঘস্থায়ী শান্তি। যদি হালাল উপার্জন করেন ইনশাআল্লাহ আপনি ইহকালেও ভালো থাকতে পারবেন পরকালেও ভালো থাকবেন। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যেন শান্তি পান পৃথিবীতে। এছাড়া পরকালেও শান্তি পান। আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৭৭। আমার নাম অভি শেখ। আমি ১৪ বছর বয়সে বাসায় ঝগড়া করে পালিয়ে গিয়েছিলাম। সৌদি আরবের এক লোক আমাকে তখন নিয়ে যায়। তার কাছেই প্রথম ইসলাম সম্পর্কে জেনেছি। দুই বছর আগে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমি এখন সব দর্শক শ্রোতার সামনে সাক্ষ্য

দিচ্ছি আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

উত্তর ঃ ডা. জাকির ঃ হ্যাঁ ভাই। আপনাকে অভিনন্দন জানাই, আপনাকে স্বাগত জানাই এ শান্তির ধর্মে। আর আপনিও সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, সৌদিরা তরবারি ব্যবহার করেনি, আপনাকে কি জোর জবরদস্তি করা হয়েছিল?

প্রশ্নকর্তা ঃ না, আমি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছি।

ডা. জাকির ঃ মাশাআল্লাহ উনি স্বেচ্ছায় মুসলিম হয়েছেন। আপনাকে কুরআনের একটা অনুবাদ দিতে চাই। আপনি কি মঞ্চে আসবেন?

প্রশ্নকর্তা ঃ আমি একটি পেয়েছি। আমি এ মঞ্চে এসেছিলাম আটদিন আগে, সে দিনও এক বোন ইসলাম গ্রহণ করেছিল, আমি তাঁর চেহারাটাও দেখতে পাইনি। আমি শুধু বাম দিকে মাইকের প্রশ্নকর্তাদের চেহারাটা দেখতে পাই। বাম দিকের মাইক ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাই না। প্রথম দিনের সে মহিলাকেও আমি দেখিনি। আর শনিবারে IBS-এ প্রশ্ন করল গোয়েন্দারা। যে সেই মহিলা কোথায়? বললাম আমিতো তাকে চিনি না, আপনারা হয়ত টিভিতে তাকে দেখেছেন। এখানে অনেক মানুষ আছেন। টেলিভিশনে দেখলে হয়ত আপনারা সেই মহিলাকে চিনতে পারেন। আপনি এখানে সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, আপনাকে জবরদস্তি করা হয়নি, এখানে জবরদস্তি করা যায় না, মুসলিম বানানো যায় না, স্বেচ্ছায় করলে হতে পারেন। আমাদের এ দেশ, আমাদের এ ইন্ডিয়া।

পৃথিবীতে এমন দেশ খুব কমই দেশ আছে যে দেশের সংবিধানে লেখা আছে যে, প্রত্যেক নাগরিকেরই তার ধর্ম প্রচার ও পালন করার ন্যায্য অধিকার আছে। এটা গণতান্ত্রিক দেশ। এ জন্য আমি গর্বিত। কারণ, এ দেশে মানুষ তার নিজের ধর্ম পালন ও প্রচারের অধিকার রাখে। জবরদস্তি করে কোন ধর্মে বাধ্য করা এটা নিষিদ্ধ। ইন্ডিয়ার সরকারের আইন অনুযায়ী এটা নিষিদ্ধ। আর ইসলাম অনুযায়ীও এটা নিষিদ্ধ। জবরদস্তি করে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করানো যাবে না। আপনি তাকে বুঝান সে যদি বুঝে তাহলে খুব ভাল। আর রাজি না হলেও কোন সমস্যা নেই। তবে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর কাছে একথা বলতে পারব যে, আমি আপনাদের মাঝে ধর্ম প্রচার করেছি। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ঃ ৭৮। Good evening sir. আমি ডঃ পূজা। আমি একজন ফিজিওথ্যারাপিস্ট। স্যার আপনি আপনার লেকচারে এ কথাগুলো বলেছিলেন আমি সেইগুলো আরেকবার বলছি। আপনি বলেছেন যে, সব মুসলিম যদি চরমপন্থী হয় তাহলেই মানুষের সমস্যাগুলোর সমাধান হবে। আমি ছোট একটা কারেকশন করেছি। আপনার চাইতে আমি অনেক

ছোট। সেজন্য ক্ষমা চাইছি। তবে আমার কাছে মনে হয় যে, আপনি যদি এভাবে বলতেন তাহলে কথাটা আরো গ্রহণযোগ্য হত। যদি সব মানুষ চরমপন্থী হয় তাহলে মানুষের সমস্যাগুলোর সমাধান হবে। হতে পারে সেই মানুষ মুসলিম বা হিন্দু বা খ্রিষ্টান বা অন্য ধর্মের।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ডঃ পূজা খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমি ভুল বলে থাকলে সেটা স্বীকার করাতে কোন আপত্তি নেই। এ প্রশ্নগুলোর পর্বটা সে জন্যই। যদি বলি দুই যোগ দুই সমান পাঁচ। আপনি সাদরে বা ঠিক করে দিতে পারেন পাঁচ না চার। আমি একজন মানুষ, আমি কম্পিউটার না আর আমারও ভুল হতে পারে। সেজন্য প্রশ্নোত্তর পর্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আপনার মন্তব্যটা সম্পর্কে বলি। আমি বলেছি সবাই যদি চরমপন্থী মুসলিম হয়, সব সমস্যার সমাধান হবে। আপনি সেটা ঠিক করে দিয়ে বললেন যে, আমি যদি এখানে বলতাম যে, সব মানুষ যদি চরমপন্থী হয় সব সমস্যার সমাধান হবে। চরমপন্থী হবে কোন ক্ষেত্রে?

বোন যদি আমার লেকচারটা শুনে থাকেন। আমি বলেছি যে, চরমপন্থী মুসলিম সেই হতে পারে, যে চরম দয়ালু, চরম ক্ষমাশীল, চরম পরোপকারী, চরমভাবে সৎ, চরম ন্যায়বান। একজন ডাকাত তো চরমপন্থী হতে পারে, যে ডাকাতি করে। ধর্ষকও চরমপন্থী হতে পারে, যদি বলি সবাই চরমপন্থী হলে সমাধান, তাহলে সেই ধর্ষক খুশি হবেন। সেতো একজন চরমপন্থী ধর্ষক তাই না? অথবা একজন চরমপন্থী সন্ত্রাসী এটা অন্য অর্থে। অপরাধীদের সন্ত্রাস তো করার কথা এখানে বলছি না। নিরীহ মানুষকে সন্ত্রস্ত করার কথা এখানে বলছি। কারণ, সাধারণত সন্ত্রাসী বলতে বুঝানো হয় যারা নিরীহ মানুষকে সন্ত্রস্ত করে। এদিক থেকে কোন মুসলিমেরই সন্ত্রাসী হওয়া উচিত না। বোন, আমি যদি পুরো ব্যাপারটা অনুবাদ করি তাহলে আপনি ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। আমি যেটা বলেছিলাম প্রত্যেক মানুষ যদি চরমপন্থী মুসলিম হয়। অর্থাৎ যদি প্রত্যেক মানুষ একেবারে চরমভাবে শান্তিকামী হয়। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাহলে মানুষের সব সমস্যার সমাধান হবে। যেহেতু আরবি শব্দটা ব্যবহার করেছি, এটা আবার অনেকে হজম করতে পারে না, আপনার কথা বলছিনা বোন। আমি মিডিয়ার কথা বলছি। ইসলাম অথবা মুসলিম তারা হজম করতে পারে না, তাই আমি এ কথাগুলো অন্যভাবে বলছি। যাতে করে অমুসলিমরাও এটা বুঝতে পারে। যদি প্রত্যেক মানুষ একেবারে চরমভাবে শান্তিকামী হয়, আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে, মানুষের সব সমস্যার সমাধান হবে। বোন, আপনি বলেন হোক সে মানুষ মুসলিম, হিন্দু বা খ্রিস্টান?

এরপরও যদি বলেন হোক সে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, ধর্ষক, ডাকাত তাহলে কোন কাজ হবে না বোন। কারণ মুসলিম মানে, যে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। তাকে মুসলিম হতেই হবে।

প্রশ্ন ঃ ৭৯। হিন্দু যদি কেউ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাহলে কি সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না? না সেটা আবার কিরকম কথা।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আমাকে বলতে দেন। পরে প্রশ্ন করেন, তখন উত্তর দিব। আপনি ঠিকই বলেছেন। হিন্দু শব্দটার মানে কি জানেন আপনি? হিন্দু হলো একটা ভৌগোলিক অবস্থান, হিন্দুমানে সেই মানুষগুলো যারা থাকে ইন্ডিয়ায়। এভাবে বললে আমিও একজন হিন্দু। বোন, আমিও একজন হিন্দু মুসলিম ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে। তবে এ হিন্দু, শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছে আরবরা; যখন তারা ইন্ডিয়ায় এসেছিল। যখন সৌদি আরবে গিয়েছিলাম তখন তারা বলে যে, হিন্দিয়া, হিন্দিয়া, হিন্দু। এটা জানেন, হিন্দু বলতে ভৌগোলিক অবস্থানকে বুঝানো হয়। কিন্তু এখন শব্দটাকে ভুল অর্থে প্রয়োগ করা হয় একটা ধর্মকে বুঝানোর জন্য। স্বামী বিবেকানন্দের কথা অনুযায়ী, তিনি বলেছেন এ ধর্মের অনুসারীদের বলা উচিত বেদান্তবাদী। কারণ, তারা বেদের কথা মেনে চলে।

হিন্দু শব্দটা একটা মিশ্রমার। বিশেষজ্ঞদের জিজ্ঞেস করেন, আপনি বললেন একজন হিন্দু কি মুসলিম হতে পারে? ভৌগোলিক অবস্থান বললে আমি একজন হিন্দু, আমি ইন্ডিয়াতে বাস করি, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, আমি একজন শান্তিকামী মানুষ। তবে প্রত্যেক মানুষ আমেরিকানরাও ভালো মানুষ হতে পারে, ইংরেজরাও ভালো মানুষ হতে পারে, যদি বলি পৃথিবীর সব মানুষ ইন্ডিয়ায় থাকবে সেটা এখানে সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে সবাই হিন্দু হতে পারছে না। আপনি যে শব্দটা বলেছেন সেটার অর্থ জানা উচিত। যদি পৃথিবীর সবাই ইন্ডিয়ায় থাকে, ইন্ডিয়ার সরকার সমস্যায় পড়ে যাবে। তারা বলে হামদো, হামারেদো এক্কেবাদ আবী নেহি, দুকেবাদ কাবী নেহী। ফেমেলি প্ল্যানিং-এর কথা বলে।

আমরা দুইজন সন্তান দুইজন হামদো হামারেদো, এক্কেবাদ আবীনেহি, দুকেবাদ কাবী নেহি এক সন্তানের পরে একটু বিরতি, দ্বিতীয় সন্তানের পরে আর কোন সন্তান নিবেন না। ফেমেলি প্ল্যানিং এ সম্পর্কে বলেছি কুরআনের মডার্ন সায়েন্সে। তাই বোন আপনি যে শব্দটা বলেছেন সেটার অর্থ না জানলে আপনি ভুল বুঝতে পারেন। আপনি যদি একজন হিন্দু হন, ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এরপর যদি বেদ মেনে চলেন, আমার লেকচার যদি দেখে থাকেন ইসলাম ধর্ম আর হিন্দুইজমের মধ্যে সাদৃশ্য নিয়ে। বেদ বলছে তোমরা এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবে। যদি বেদের কথা মানেন উপনিষদে উল্লেখ আছে Chardogya upanishad এর ৬ নম্বর অধ্যায়ের ২ নম্বর অনুচ্ছেদের ১ নম্বর পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে এক কাম ইবিদিগম – ঈশ্বর কেবল একজন, দ্বিতীয় কেউ নেই। বেদে উল্লেখ করা হয়েছে Yujurved এর ৩২ নম্বর অধ্যায়ের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে আছে নাতাস্তি প্রতিমা আস্তি – ঈশ্বরের কোন আকার নেই।"

প্রতিমা মানে ছবি, মূর্তি, ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফ। বেদের কথা অনুযায়ী মহান সৃষ্টিকর্তার কোন ছবি নেই, কোন ফটোগ্রাফ নেই, কোন ভাস্কর্য নেই, কোন মূর্তি নেই। যদি এমনি হিন্দু হয়ে থাকেন, বেদে উল্লেখ আছে যে, আরেকজন অবতর পৃথিবীতে আসবে, সর্বশেষ রাসূল তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ ﷺ। একথা বলা হয়েছে 'কলকি অবতরে' ২ নম্বর অধ্যায়ের ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে ৭ অনুচ্ছেদে, ৯ অনুচ্ছেদে, ১১ অনুচ্ছেদে, ১৫ অনুচ্ছেদে যে, এ কলকি অবতর অবস্থান করবে শান্তি নগরে একটি শহরে। অর্থাৎ মক্কায়, তাঁর বাবার নাম হবে বিষ্ণুইয়াশ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার ভৃত্য আরবিতে আব্দুল্লাহ। আর নবীজি ﷺ-এর বাবার নামও ছিল আব্দুল্লাহ, তাঁর মায়ের নাম হবে সুমতি অর্থাৎ শান্তিপ্রিয়, প্রশান্ত আরবিতে বললে হবে আমিনা। আর আমাদের নবীজির মায়ের নামও ছিল আমিনা। সে জন্মাবে মাধব মাসের দ্বাদশ দিনে নবীজি ﷺ ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে জন্মেছিলেন, তাঁর চারজন সঙ্গী থাকবে, উনারা হলেন খোলাফায়ে রাশেদীন। আমি এভাবে আরো বলে যেতে পারি। আমি এখানে সংক্ষেপে হিন্দুইজম আর ইসলামের সাদৃশ্যগুলো বললাম।

আমি আপনাকে যেটা বলব আসুন এটা মেনে নেই। অন্তত একটা বই ঈশ্বর পাঠিয়েছেন হিন্দুরা বলবে যে, বেদ হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী। খ্রিস্টানরা বলবে বাইবেল ঈশ্বরের বাণী মুসলিমরা বলবে কুরআন ঈশ্বরের বাণী। ধর্মগ্রন্থগুলোতে সে কথাগুলো এক। আসুন সেই সাদৃশ্যগুলো দেখি। "এসো সেই কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক", এখন যেখানে সাদৃশ্য নেই, সেটা নিয়ে এখন লড়াই করব না। পরে কোন একদিন করব। হ্যাঁ! আসুন আগে আমরা এটা মানি যে সব ধর্মগ্রন্থ, সব প্রধান ধর্মগ্রন্থ। হোক সেটা বাইবেল, হোক সেটা বেদ, হোক সেটা কুরআন, হোক ফার্সি ধর্মগ্রন্থ, হোক শিখধর্ম গ্রন্থ – সবাই বলছে ঈশ্বর কেবল একজনই।

বেশিরভাগ প্রধান ধর্মগ্রন্থই একথা বলেছে যে, শেষ একজন নবী আসবেন। বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে Book of Deuteronomy-এর ১৮ নম্বর অধ্যায়ের ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে, Book of Deuteronomy-এর ১৮ নম্বর অধ্যায়ের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদ, Book at Isaiah-এর ২৯ নম্বর অধ্যায়ের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদের, Song of Soluman-এর ৫ অধ্যায়ের ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদের, এরপর New testament-এ Gospel of John এর ১৪ নম্বর অধ্যায়ের ১৬ অনুচ্ছেদে, Gospel of John ১৫ নম্বর অধ্যায়ের ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদে, Gospel of John ১৬ নম্বর অধ্যায়ের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে, Gospel of John ১৬ নম্বর অধ্যায়ের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে, Gospel of John ১৬ নম্বর অধ্যায়ের ১২ নম্বর থেকে ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, "যীশুখ্রিস্ট বলেছেন তোমাদের আমি অনেক কথাই বলব। কিন্তু তোমরা সবকিছু বুঝতে পারবে না। কারণ, যখন সত্যের বার্তাবাহক আসবে, সে তোমাদের সত্যের পথে পরিচালিত করবে, সে তাঁর নিজের কথা

বলবে না- যা শুনবে তাই বলবে।" তাহলে বিভিন্ন প্রধান ধর্মগ্রন্থ থেকে যেটা জানতে পারি, আমরা বিশ্বাস করব এক ঈশ্বরে। তাঁর কোন ছবি নেই, তার কোন প্রতিমা নেই। আমরা বিশ্বাস করব সর্বশেষ আর চূড়ান্ত নবীকে।

আসুন এগুলো মেনে নেই। আমরা অমিলগুলো নিয়ে কথা বলব না। আসুন আমরা সেটা মানি যেটা হিন্দু ধর্মগ্রন্থে, ফার্সি ধর্মগ্রন্থে এবং খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থেও এক। আপনি বললেন হিন্দু ও মুসলিম। আমি ফার্সি ধর্মের কথাও বলছি। আমি ইসলামের কথা বলছি। যেগুলো এক সেগুলো আমরা মেনে নেই। আর ইনশাআল্লাহ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারা যদি এটা মানে যে ঈশ্বর একজন, তাঁর কোন প্রতিমূর্তি নেই। আর যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষই হবে চরমভাবে শান্তিকামী মানুষ, আল্লাহর কাছে নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে সমর্পণ করবে। তাহলে মানুষের সব সমস্যার সমাধান হবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৮০। হ্যাঁ Good evening ডা.। আমার নাম জায়জাদিজিয়া। আমি এ বছর ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছি। আর প্রথমেই বলি, আমি এ প্রথম বারের মত আপনার লেকচার শুনতে এসেছি। আর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের উপর আপনার দখল সত্যিই প্রশংসনীয়। আপনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। আর অনেক মুসলিম আছেন, তারা আপনার কথা মানেন। এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা হল আপনি মুসলিম ভাই-বোনদের এ উপদেশ দিবেন যে, তারা মহাত্মা গান্ধীর নীতিগুলো অনুসরণ করবে। যেমন ধরেন – অহিংস আন্দোলন ও সত্যগ্রহ আন্দোলন। এ সব আন্দোলনের মাধ্যমেই আমরা বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছি। আমি সব ধর্ম গ্রন্থকেই শ্রদ্ধা করি। যেমন- কুরআন, গীতা, বাইবেল। তবে আমার মনে হয়, আমার প্রথম পরিচয়টা হলো আমি একজন ইন্ডিয়ান। তাহলে মুসলিম ভাইবোনদের কি উপদেশ দিবেন? মহাত্মা গান্ধীর যে কোন নীতিগুলোকে অনুসরণ করতে? যেমন- অহিংস আন্দোলন সত্যগ্রহ অথবা মহাত্মা গান্ধীর অন্য যেকোন নীতি।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি বললেন নীতিগুলো। মানে সব নীতি। তারপর বললেন যেকোন নীতি। আমি দুটোই উত্তর দিব। মহাত্মা গান্ধীর যে নীতিগুলো আছে সেগুলো যদি কুরআনের সাথে মিলে যায়, আল্লাহর কথার সাথে মিলে, আমাদের নবীজির কথার সাথে মিলে যায় আমার কোন আপত্তি নেই। মুসলিমদেরকে বলব সেই নীতিগুলো পুরোপুরি মেনে চলেন। যেমন- ধরেন সত্যগ্রহ আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন। একই কাজ নবীজিও করেছিলেন। এমন না যে তিনি মহাত্মা গান্ধীকে

অনুসরণ করেছেন। মহাত্মা গান্ধী নবীজিকে অনুসরণ করেছেন। এ ব্যাপারে পরে বলছি।

আমাদের নবীজির নবুওয়াত লাভের পরবর্তী সময়টা যদি দেখেন তখন আনুমানিক ১৩টা বছর তিনি মক্কায় ছিলেন। তিনি অনুসারীদের বললেন খুনাখুনি নয়। অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যারা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তিনি বললেন, "তোমাদের জিহাদ হলো সবর।" সবর মানে ধৈর্য ধরা। অনেক মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছিল। মক্কার পৌত্তলিকরা দুর্বল মুসলিমদেরকে টার্গেট করত। তাদের অত্যাচার করত, তাদের মেরে ফেলত। যাদের শক্তি ছিল তারা ক্ষেপে গেল। তারা বলল যে, আমাদের ভাইকে খুন করেছে, আমরা এখন প্রতিশোধ নিব। নবী (স) বললেন, "তোমাদের জিহাদ হল সবর।" দেখবেন কারো হয়ত শক্তি আছে লড়াই করার, সে যদি লড়াই করে সেটা ভালো। কিন্তু কারো লড়াই করার শক্তি আছে তখন বলা হলো তোমরা লড়াই করো না, তারা নিজেদের সামলে রাখল, এটাই শ্রেষ্ঠ জিহাদ।" আরবি জিহাদ শব্দটার অর্থ সংগ্রাম করা। এর অর্থ চেষ্টা করা। তখন আমাদের নবীজী (স) বলেছিলেন- খুনাখুনি নয়, তারা রাস্তায় নেমে পড়তেন, আর বলতেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই আর হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। মানুষ পাথর মারল, তাঁরা তাদের কিছু বলল না, তাদের অত্যাচার করা হলো, কিন্তু তাদের কিছু বলা হল না। নবীজি 'তায়েফে' গেলেন লোকে পাথর মারল, তিনি কিছুই বললেন না। তাহলে এটা হল একটি পদ্ধতি। তবে এই পদ্ধতিটাই সব নয়।

মহাত্মা গান্ধীর নীতি। এ অহিংস নীতি অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগবে, কিন্তু যদি এখন ইন্ডিয়া সরকারকে বলেন যে, এ লোকটা ডাকাতি করছে, এটা অপরাধ। একে গ্রেফতার করবেন না, এ লোকটা ধর্ষণ করছে এটা অপরাধ কিন্তু একে গ্রেফতার করবেন না, ইন্ডিয়া সরকার কি এটা মানবে? সবদেশেই দেখবেন যে, পুলিশ বাহিনী আছে। এ পুলিশ সেদেশে শান্তি আর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মাঝেমধ্যে তারা বল প্রয়োগ করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে, যাতে শান্তি বজায় থাকে। আপনি ইন্ডিয়ার সরকার কিংবা মুম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনারকে বলতে পারবেন না যে, দেখেন মহাত্মা গান্ধী অহিংসার কথা বলেছেন, তাই যে ডাকাতি করছে তাকে করতে দিন, তাকে শুধু বলেন ডাকাতি করবেন না। ধরুন- কেউ আপনার বোনকে ধর্ষণ করেছে শুধু বলেন ধর্ষণ করবেন না, এটা হচ্ছে অহিংস নীতি। এ নীতিতে সব কাজ হয় না। ইসলাম ধর্মে জুলুম বলে একটা শব্দ আছে। জুলুম আরবিতে এ শব্দটার অর্থ হতে পারে উৎপীড়ন। আর যে এ উৎপীড়ন করে তাকে বলা হয় জালিম। আর কোন লোকটা বেশি জালিম? যে মানুষ এ উৎপীড়ন বন্ধ করতে পারে কিন্তু তারপরও বন্ধ করে না।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, সহীহ মুসলিমে উল্লেখ আছে, "যদি খারাপ কাজ হতে দেখ তোমার হাত দিয়ে তা থামাও, যদি হাত দিয়ে থামাতে না পার, তাহলে তোমার মুখ দিয়ে থামাও, যদি মুখ দিয়ে থামাতে না পার তাহলে মনে মনে অভিশাপ দাও আর মনে মনে অভিশাপ দিলে তুমি হবে সবচেয়ে নিচু স্তরের মু'মিন, সবচেয়ে নিচু স্তরের মুসলিম।" যদি আপনি দেখেন যে, কেউ ধর্ষণ করছে, মহাত্মা গান্ধী বলেছেন ধর্ষণ করবেন না। তখন যদি আপনার তাকে থামানোর সামর্থ্য থাকে– আপনার হাত দিয়ে তাকে থামান, সে হয়তো আপনার বোন না, হয়ত আপনার মা না। যদি সেটা না পারেন, যদি দুবর্ল হন, শরীরে শক্তি না থাকে মুখে বলেন ভাইসাব ধর্ষণ করবেন না, বলাৎকার করবেন না। ভাই ধর্ষণ করবেন না– আপনার মুখ দিয়ে তাকে বলেন। যদি ভাবেন আমি মুখে বারণ করলে লোকটা আমাকে মেরে ফেলবে, অন্ততঃপক্ষে মনে মনে অভিশাপ দেন। তাহলে পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে কাজের পদ্ধতিও বদলাবে। নবীজি ﷺ যখন মদিনায় গেলেন। একসময় শান্তি বজায় ছিল। তারা হুদায়বিয়ার সন্ধি করল।

মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদের সাথে একটা চুক্তি করল। মুশরিকরা চুক্তিভঙ্গ করল। তারপর যুদ্ধ বেধে গেল। আল্লাহ্ তায়ালা তখন বললেন, "যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাফেরদের দেখলে ভয় পেয়ো না, তোমরা লড়, হত্যা কর। পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের কথা অনুযায়ী মাইকেল এইচ হার্ট, তাঁর একটা বইতে–তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রভাবশালী ১০০ মানুষের কথা বলেছেন। এক নম্বরে তিনি বলেছেন– হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর কথা। শুধু এ জন্যই কথাটা বলছি না। তিনি এখানে আরো বলেছেন– মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে। মাইকেল এইচ হার্ট খুব বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ইতিহাসের একজন প্রভাবশালী মানুষের কথা বলার পর তিনি সেখানে বেশ কিছু কথা বলেছেন। এখানে তিনি তখন মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে বলেছেন। তিনি লিখেছেন যে, মহাত্মা গান্ধীর এ সত্যগ্রহ আন্দোলন, যেটা ছিল তখনকার গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। এটার জন্যই নাকি বৃটিশরা তখন ফিরে গিয়েছে। কিন্তু তিনি বলেছেন, যদি এ আন্দোলনটা না হত তারপরও ইন্ডিয়া ঠিকই স্বাধীন হয়ে যেত। এটা বলেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাইকেল এইচ হার্ট। তাহলে যেটা বুঝতে পারি, পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে কাজের পদ্ধতিটা ঠিক করতে হবে। সবসময় অহিংসা নীতি চলবে না।

মাঝেমধ্যে দেশে শান্তি বজায় রাখার জন্য আমাদের বল প্রয়োগ করতে হয়। যেমন দেখেন প্রত্যেক দেশেই পুলিশ বাহিনী থাকে, আইন প্রয়োগ করে। কেউ যদি কোন কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, ধর্ষণ করে, ডাকাতি করে, নিরীহ মানুষদের ক্ষতি করে তখন শেষ উপায় হিসেবে প্রত্যেক দেশের পুলিশ যেমন বল প্রয়োগ করে, একইভাবে ইসলাম বলছে যে শেষ উপায় হিসাবে, শেষ অবলম্বন হিসাবে

মাঝেমধ্যে শান্তি বজায় রাখার জন্য বল প্রয়োগ করতে হয়। আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন। আর কিছু বলতে চাইলে এখন বলতে পারেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ না স্যার উত্তরে আমি সন্তুষ্ট। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক ঃ সেজন্য আমি বলেছিলাম বাধা দিবেন না। এটা আমার পেশা, আমি এ কাজটাই করি। পুরো উত্তরটা শুনলে তারপর বুঝতে পারবেন। আমি শুরু করলেই যদি হাত তোলেন, যখনই আপনি আপনার হাতটা তুলছেন আপনার মাথায় তখন প্রশ্নটা ঘুরছে–আমার উত্তরটা শুনছেন না। যখন আপনি শুনেছেন মনোযোগ দিয়ে শোনেন, ইনশাআল্লাহ তাহলে বুঝতে পারবেন, না পারলে ইনশাআল্লাহ আপনি আরো সুযোগ পাবেন।

প্রশ্ন ঃ ৮১। আমি এখানে উপস্থিত সব মুসলিম ভাই-বোনদের অনুরোধ করব। আপনারা ডা. জাকির নায়েকের মত একজন অসাধারণ মানুষ পেয়েছেন। দয়া করে আপনারা সবাই তাকে অনুসরণ করবেন। অবশ্য এমন অনেক মানুষই আছে, যারা ঠিক পুরোপুরি মেনে চলে না, আশা করি সেই মুসলিম ভাই-বোনেরা ইসলাম ধর্ম পালন করবে পুরোপুরি। আর ইন্ডিয়াকে গর্বিত করবে।

জাকির ভাই, আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। এখানে যেসব মুসলিম ভাই ও বোনেরা আছেন তাদের অনুভূতিতে আঘাত লাগলে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আমার নাম মোহেশ মেহতা। আর আমি ব্যবসা করি। আপনাদের পবিত্র কুরআন এটা আল্লাহর পাঠানো আসমানী কিতাব না। কেন? কারণ হলো আগে যে তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এসেছে। তাওরাত মুসা (আ)-এর ওপর নাযিল হয়েছিল, যাবুর, দাউদ (আ)-এর ওপর নাযিল হয়েছিল। আর যীশুর ওপর নাযিল হয়েছিল ইঞ্জিল। এ কিতাবগুলো বিকৃত হয়ে গেছে। আপনারা মুসলিমরা বলেন যে তিনটা কিতাবই বিকৃত হয়ে গেছে।

এ ছাড়াও আপনারা দেখবেন কুরআনে আহলে কিতাব বলে সম্বোধন করা হয়েছে ইহুদি ধর্মের অনুসারীদের, আর খ্রিস্টানদেরকে। তাহলে যে বইটা মানে পবিত্র কুরআন আল্লাহ লিখেছেন– সেখানে তিনি বলবেন শ্রীকৃষ্ণের মত যেমন ভগবত গীতাই এটা কর আর ওটা করো না। তাই এ কিতাবটা একজন মানুষই লিখেছে। এখানে পঁচিশজন নবীর নাম আছে, এগুলো বাইবেলেও আছে, এ নবীগণের নামগুলোই কুরআনে আছে। তাই আমার মনে হয় যে, আল্লাহ তো অনেক বড়। তিনি পুরো বিশ্বজগৎ বানিয়েছেন। তিনি কখনোই এভাবে বলবেন না যে, এরা ইহুদি বা এরা খ্রিস্টান। কারণ ইহুদি বা খ্রিস্টানরা তো তারই সৃষ্টি। আমার মনে হয়, এ পবিত্র কুরআন কোন মানুষই লিখেছেন। ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আমি অনুরোধ করবো মুসলিম ভাই-বোনকে। আপনারা অনুসরণ করবেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে। আর সর্বশেষ আসমানী কিতাব এ পবিত্র কুরআনকে। এখানে ভাই আপনি বললেন যে, মুসলিমদের উচিত আমাকে অনুরসণ করা, আমি বলব তখনই আমাকে অনুসরণ করবেন যখন আমি কুরআন ও সহীহ্ হাদীস মেনে চলব। তাই আমি বলব আমাকে অনুসরণ করার কথা বললেন, আমাকে অনুসরণ করবেন কুরআন ও সহীহ্ হাদীস এর সাথে মিললে। যদি কুরআন আর সহীহ্ হাদীসের সাথে না মিলে তাহলে ডা. জাকির নায়েকও জিরো। জাকির নায়েকেরও তখন কোন মূল্য নেই। আমি যা বলছি সেটা যদি চূড়ান্ত আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআনের সাথে মিলে আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর কথার সাথে মিলে তাহলে অনুসরণ করবেন। আমি অনুরোধ করব, আমার কথার সাথে কুরআন ও হাদীস এর মিল থাকলে তবেই অনুসরণ করবেন।

ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন। আর সত্যি বলতে আমি মোহেশ ভাইকে চিনি সেই ১৯৯১ সাল থেকে। তিনি IRF থেকে মুসলিমদের থেকেও বেশি ভিডিও ক্যাসেট নিয়েছেন। তাই IRF এর ভিডিও ক্যাসেট আর লিটারেচারের লিস্টে তার নাম সবার আগেই আছে। মোহেশ ভাই প্রশ্ন করলেন যে, আগের আসমানী কিতাবগুলো কুরআন যেমন বলছে তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল দেয়া হয়েছিল মুসাকে, দাউদকে আর যীশুখ্রিস্টকে। মুসলিমরা বলে এগুলো বিকৃত হয়ে গেছে। তাহলে পবিত্র কুরআনে যখন ইহুদিদের কথা বলা হয়েছে যে, হে কিতাবিগণ! ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা যখন তাদের এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, তাহলে কুরআনও কি কোন মানুষ লিখেছে? ঠিক? আপনার প্রশ্নটা হলো ইহুদি আর খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে কেন? আপনি যদি আমার আগের লেকচারটা শুনে থাকেন ইজ দ্য কুরআন গডস ওয়ার্ড।

সেখানে আমি বিস্তারিতভাবে বলেছি। এখন আর সেগুলো রিপিট করব না। সেখানে বলেছি যে, মানুষ কিভাবে অভিযোগ করে যে নবীজি ﷺ এটা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন আর কেন লিখেছেন, ক্ষমতা বা অন্য কিছু ইত্যাদি। লেকচারটা ছিল দুই ঘণ্টা, সেগুলো রিপিট করব না। তবে আপনার মূল প্রশ্নে আসি। কুরআন বলছে যে, হে কিতাবিগণ এর মানে দাঁড়াচ্ছে কুরআন লিখেছে একজন মানুষ। ভাই কুরআন পড়লে দেখবেন, আর আপনি ঠিকই বলেছেন– কুরআনে পঁচিশজন নবীর নাম বলা হয়েছে। আর এখানে যতজন নবী রাসূলের নাম বলা হয়েছে তারা সবাই ইহুদি। দেখবেন যে, এ নামগুলো বাইবেলেও বলা হয়েছে। কুরআনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশে ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেন? এটা উদাহরণ যে, আল্লাহ তায়ালা সুবিধা দিয়েছিলেন ইসরাইলের মানুষদের।

হে বনী ইসরাইল! আমি একসময় তোমাদের অনুগ্রহ করেছিলাম, কিন্তু তোমরা তখন এ কাজগুলো করেছ। পবিত্র কুরআনে এ উদাহরণগুলো দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা যে, তাঁরা নবী ছিলেন। যারা আগে এসেছিলেন এ মানুষদের কাছে। কিছু মানুষ নবীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, কিছু মানুষ নবীকে গ্রহণ করেছিল। এখানে উদাহরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "কুল ইয়া আহলাল কিতাব"–বল হে কিতাবীগণ! এসো সেই কথা যেই কথা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে এক।" তাহলে কুরআনে কেন মুসলিমদের বলছে যে, তোমরা কিতাবীদের সাথে এ বিষয়ে কথা বলবে? কিতাবীগণ মানে যারা আসমানী কিতাব পেয়েছে। এখানে পবিত্র কুরআন পরিষ্কারভাবে বলেছে, যখন কুরআনে আহলে কিতাব বলা হচ্ছে ইহুদি এবং নাসারাদের বলা হচ্ছে। ইহুদি আর খ্রিস্টানদের। তাহলে আল্লাহ বলেছেন মুসলিমদের কিতাবীদের সাথে কথা বলতে। আল্লাহ আরো বলেছেন, ইয়া আহলাল কিতাব অর্থাৎ, হে কিতাবীগণ। তার মানে কুরআন এখানে শুধু মুসলিমদের বলছে না, শুধু আরবদের বলছে না, কুরআন এখানে কিতাবীদেরও বলছে।

সেজন্যই আমি বলেছি যে, সর্বশেষ এই চূড়ান্ত আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআন। এটা শুধু মুসলিম বা আরবদের জন্য নাযিল হয়নি। নাযিল হয়েছে পুরো মানুষ জাতির জন্য। যদি কুরআন কোন মানুষ লিখত, আপনি যেটা বললেন তাহলে আল্লাহ কখনই বলতেন না যে– যাও ইহুদি আর খ্রিস্টানদের বল তাদের ধর্মগ্রন্থে এটা আছে। আর সেই সময় অনেক মানুষই এটা জানত না যে– অতীতে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের কি হয়েছিল? যখন তারা চেক করল দেখা গেল সত্যি। এরপর কুরআনে অনেক ভবিষ্যৎবাণীও করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে ভবিষ্যতে কি ঘটবে? তাহলে এ সমস্ত কথা, এগুলো কোন মানুষ লিখতে পারে না। বিস্তারিত জানার জন্য আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখেন 'ইজ দ্য কুরআন গডস ওয়ার্ড?' আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৮২। আমি পঞ্চান্নটা দেশেরও বেশি দেশ ভ্রমণ করেছি। সেখানে দেখেছি আপনাদের কুরআন আর হাদীস মূর্তি পূজাকে নিষিদ্ধ করেছে। তবে আপনি অন্য ধর্মগুলো দেখেন, খ্রিস্টানধর্ম অথবা ধরেন বৌদ্ধধর্ম, চাইনিজধর্ম, জৈন ধর্ম অন্য সব ধর্মেই দেখবেন মূর্তি পূজা আছে। আপনারা মুসলিমরা পৃথিবীর সংখ্যায় মাত্র পনের থেকে বিশ পার্সেন্ট হবেন সব মিলিয়ে। এটা শতকরা হিসাব। তাহলে অন্যরা কি ভুল করছে? খ্রিস্টান ধর্মটা দেখেন। এক মিনিট। যেকোন আমেরিকান চার্চ অথবা রাশিয়ান অর্থোডকস অথবা গ্রিক অর্থোডকস ক্যাথলিক বা প্রটেস্টেন্ট। চীনে দেখেন অনেক বড় মূর্তি ঈশ্বরের। তাহলে এরা সবাই ভুল?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ খুবই সুন্দর প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন পৃথিবীতে মুসলিম আনুমানিক ১৫% থেকে ২০% কেউ বলে ২৫% সে যাই হোক। আপনি

বললেন ১৫% থেকে ২০% আচ্ছা মেনে নিলাম। আপনি বললেন যে, খ্রিস্টানরা তারা মূর্তিপূজা করে। আমিও একমত। আপনি বললেন যে, বুদ্ধরা বিশাল মূর্তি বানায়। তারা কি সবাই ভুল? ভাই ইসলামে সংখ্যাগুরু হলেই জেতা যায় না। ইসলামে সত্য সবার উপর। বেশির ভাগ মানুষ এ কয়েকশ বছর আগেও মনে করত পৃথিবী সমতল। এটা কি জানেন? ভাই মহেশ পৃথিবী কি সমতল? না। না–তাহলে বেশির ভাগ মানুষের ভুল হতে পারে। ইসলাম ধর্মে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সূরা ইসরা-এর ৮১ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন–

وَقُلْ جَاۤءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ـ

অর্থ ঃ "বল সত্য উপস্থিত হয়েছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে।"

কারণ মিথ্যা প্রকৃতিগত কারণেই বিলুপ্ত হবে। সেজন্য ইসলাম ধর্মের সংখ্যাগুরু হলেই জেতা যায় না। যদি আমেরিকায় যান সেখানে দেখবেন পর্নোগ্রাফী। এটা নিষিদ্ধ না। আপনি এটা বিশ্বাস করেন? না আমি বিশ্বাস করি না। আপনি তো খুব ভালো মানুষ। আপনাকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষই পর্নোগ্রাফীতে বিশ্বাস করে। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, আপনি কি পর্নোগ্রাফী দেখবেন? না। আপনি খুব ভালো ছেলে। আপনি সত্যের কাছাকাছি আছেন। সংখ্যাগুরু হলেই জেতা যায় না। আপনি তখন বললেন খ্রিষ্টান ধর্মে সবাই মূর্তিপূজা করে। খ্রিস্টান ধর্মে আসলে মূর্তিপূজা নেই, কিছু খ্রিস্টান মূর্তি পূজা করে। যেমন– কিছু মুসলিম ভুল কাজ করে। যদি খ্রিস্টানদের বাইবেল পড়েন। আর আমিও নিশ্চিত যে আপনি বাইবেল পড়েছেন।

বাইবেলে উল্লেখ করা আছে Book of Deuteronomy ৫ অধ্যায় ৭ ও ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "তোমরা আমার কোন প্রতিমূর্তি তৈয়ারি করবে না।" মহান স্রষ্টা তিনি বলেছেন Old testament-এ আছে, "তোমরা আমার কোন প্রতিমূর্তি তৈরি করবে না।" কোন কিছুই না, যেটার সাথে মিল আছে আকাশমণ্ডলের কিছু, পৃথিবীর কিছু অথবা পৃথিবীর নিচের কিছু। তোমরা তাদের সেবা করবে না, তাদের কাছে নতজানু হবে না। কারণ আমি তোমাদের ঈশ্বর এবং প্রভু খুবই প্রতিহিংসাপরায়ণ। একথা আবারও আছে Book of Exodus-এর "বিশ" নম্বর অধ্যায়ের ৩-৫ নং অনুচ্ছেদে যে, "তোমরা আমার কোন প্রতিমূর্তি তৈরি করবে না, কোন কিছুই না, যার সাথে মিল আছে না আকাশের কিছুর– না পৃথিবীর কিছুর অথবা না পৃথিবীর নিচের কিছুর? তোমরা এদের সামনে নতজানু হবে না, সেবা করবে না। কারণ আমি তোমাদের ঈশ্বর এবং প্রভু খুবই প্রতিহিংসাপরায়ণ।" তাহলেও Old testament অনুযায়ী মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ কাজ।

আর যীশুখ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, এটা আছে Gospel of Matthew-এর ৫ নম্বর অধ্যায়ের ১৭ থেকে ২০ নং অনুচ্ছেদে "মনে করো না আমি নবীদের আইন বাতিল

করতে এসেছি, এগুলোকে বাতিল করতে আসিনি পূরণ করতে এসেছি। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কোন একটা আইন ভাঙ্গে আর অন্যকেও ভাঙতে বলে, সে তাহলে সরকার, রাজ্যে বাস করতে পারবে না। আর যে এ আইনগুলো মেনে চলবে সে সরকার, রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। যদি তাদের ন্যায়নিষ্ঠা তাদের গ্রন্থে বলার থেকে বেশি না হয় তাহলে তারা সরকার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।" যীশুখ্রিস্টের কথা অনুযায়ী আপনি যদি সরকার রাজ্যে প্রবেশ করতে চান, আপনাকে তাহলে Old testament-এর সব আইন মানতে হবে, মুসা নবীর আইন মানতে হবে। স্রষ্টার কোন প্রতিমা বানাবেন না, তারপরও মানুষ বানায়। কেন? সব খ্রিস্টান কিন্তু বানায় না, Protestant রাও কিন্তু বানায় না। খ্রিস্টানধর্ম সম্পর্কে আপনার জ্ঞান খুব কম। আপনি এখনও ছাত্র। ক্যাথলিকরা এটা করে, তারা মূর্তি বানায়। এজন্যই Protestant-রা Protest করেছিল যে, আপনাদের কাজটা ভুল। তাহলে বাইবেলের কথা অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার কোন প্রতিমা বানাতে পারবেন না। আপনার কথা মানি। বেশিরভাগ হিন্দু মূর্তি পূজা করে। আমি আগেও বলেছিলাম "নাতাস্তি আতিমা প্রতিস্তি" মহান সৃষ্টিকর্তার কোন প্রতিমা নেই, কোন ছবি নেই, কোন ভাস্কর্য নেই, তাঁর কোন মূর্তি নেই। আপনি কি মূর্তি পূজা করেন? হ্যাঁ আমি করি।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আচ্ছা তাহলে তো বেদ মানছেন না। এবার আপনার অন্য প্রশ্ন করুন।

প্রশ্ন ঃ ৮৩। আমি আসলে সব ধর্মই মানি। সব ধর্মই এক। কারণ মহান ঈশ্বর সব ধর্ম সম্পর্কেই জানেন। আমি আপনাকে বলি ঈশ্বরতো ঘুমাচ্ছেন না। তিনি সবই জানেন, তিনি তো সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সবকিছু। তাই তিনি সব ধর্ম সম্পর্কেই জানেন, যেমন ইসলাম।

উত্তর ঃ ডা. জাকির ঃ ভাই আপনি যদি সব ধর্ম বিশ্বাস করেন। তার মানে আপনি অন্য ধর্ম পালন করছেন কিনা জানি না, তবে আপনি হিন্দুধর্ম পালন করছেন না।

আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, ঈশ্বর কি ঘুমাচ্ছেন? আল্লাহ এই কথার উত্তর দিয়েছেন পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলছেন যে, "আল্লাহ অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর নিদ্রার প্রয়োজন হয় না, তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না আর বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না।" আমাদের ঘুমানোর প্রয়োজন হয়। আমাদের বিশ্রাম নেয়ার প্রয়োজন হয়, আল্লাহ তায়ালার বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "তিনি যদি চাইতেন তাহলে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষকে বানাতে পারতেন মুসলিম হিসেবে।" আল্লাহ তায়ালার পক্ষে খুব সোজা। শুধু তিনি "কুন ফায়াকুন" বললেই হয়ে যেত। আর এ জীবনটা পরকালের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করছেন আমাকেও পরীক্ষা করছেন। আল্লাহ যদি চান আপনি আর মূর্তিপূজা করবেন

না, তাহলে তো পরীক্ষাটা থাকল না। পরীক্ষাটা হচ্ছে আল্লাহ আপনাকে কিছু আইন দিয়েছেন। এখন আপনি সেগুলো মানবেন কি মানবেন না? আপনি নাকি সব ধর্মই মানেন। কিন্তু আপনি তো হিন্দু ধর্ম মানছেন না, আপনি তো ইসলাম ধর্ম মানছেন না, আপনি তো খ্রিস্টানধর্মও মানছেন না, শিখধর্মও মানছেন না, বৌদ্ধধর্মও মানছেন না।

আমাকে এমন কোন কথা দেখান যেখানে ধর্মপট বলছে, বৌদ্ধ যেকোন গ্রন্থ বলছে যে, বুদ্ধ তাঁর মূর্তি বানাতে বলছে। তিনি কখনোই বলেননি। বৌদ্ধ কোথায় বলেছে? আগামী কাল ধরেন কোন মুসলিম নবীজি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মূর্তি বানালো। সে যদি মূর্তি বানিয়ে তাঁর পূজা করে, আমি বলব সেটা ভুল। নবীজি ﷺ কখনোই তাঁর মূর্তি বানাতে বলেননি। এখন কিছু মানুষ যদি কোন ভুল কাজ করে থাকে। হোক তারা সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু। সেটা তখন সত্যি হয়ে যায় না। গৌতম বুদ্ধ কখনোই তাঁর মূর্তি বানাতে বলেননি। এখন কেউ এ মূর্তিগুলোর বিরুদ্ধে-সে আসলে বৌদ্ধদের ধর্ম পালনে সাহায্য করছে। শুধু বৌদ্ধের একটা বিশাল মূর্তি বানিয়েছে বলেই তাঁরা বৌদ্ধকে মানে এমনটা কিন্তু ঠিক না। সেজন্যই আমি বলেছি, যদি কোন ধর্মকে বুঝতে চান তাহলে তাঁর অনুসারীদের দেখবেন না। ভাই মোহেশ আমাকে দেখবেন না, ধর্মগ্রন্থগুলোকে দেখেন।

পবিত্র কুরআন দেখেন, পবিত্র কুরআন পড়েন, আপনাদের বেদ পড়েন। যেগুলো কমন সেগুলো মেনে চলুন। আর যেগুলো কমন না সেগুলো পড়ে দেখবেন। আপনি নাকি সব ধর্মই মানেন। আপনি তো হিন্দুধর্ম মানছেন না, খ্রিস্টানধর্ম মানছেন না, ইসলাম ধর্মও মানছেন না। সবই তো পড়ার কথা। আমি আপনাকে বলছি অন্তত কমন জিনিসগুলো মেনে চলুন। যেগুলো কমন না সেগুলো নিয়ে পরে কথা বলব। আপনি তো কমন জিনিসগুলো মেনে চলছেন না। সব মানা তো পরের কথা। যেদিন আপনি মূর্তিপূজা বন্ধ করবেন সেদিন আমি একথা বলতে পারব যে, আপনি সব ধর্মের সবচেয়ে প্রধান কথাটা মানছেন। যেদিন আপনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী হিসেবে মানবেন সেদিন আমি বলতে পারব আপনি বেশির ভাগ ধর্মের প্রধান দুটো কথার একটি মানছেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৮৪। আসসালামু আলাইকুম। আমি ভাগসী শ্রাবন্ত। আমি অমুসলিম। এখানে সবার সামনে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। কারণ আমি চাই কিয়ামতের দিন আপনারাও আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ মাশায়াল্লাহ বোন। এখন আমি বলছি। আর আমার সাথে সাথে আপনিও বলুন।

"আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।"

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর নবীজি মুহাম্মদ ﷺ হলেন মহান আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত পুরুষ।" শান্তির ধর্মে আপনাকে স্বাগতম বোন। আমাদের এ এগজিবিশন এবং কনফারেন্সে এ দশ দিনে অনেক মানুষই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আমাদের বক্তাদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়েছে। তাঁরা বুঝেছেন যে, এটাই হচ্ছে একমাত্র সমাধান মানুষের জন্য। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বোন। আর আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যেন আপনি জান্নাতে যেতে পারেন, পৃথিবীতে শান্তি পান আর পরকালেও শান্তি পান ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন ঃ ৮৫। প্রশ্নটা আমার অমুসলিম বান্ধবীর। সে তার পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। আমার বান্ধবী একজন MBA-এর ছাত্রী। তার প্রশ্ন হলো আল্লাহকে কেন আল্লাহ বলে ডাকা হয়? অন্য কোন নামে ডাকা হয় না কেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি প্রশ্ন করলেন যে, আল্লাহকে কেন আল্লাহ নামে ডাকা হয়, অন্য নামে কেন ডাকা হয় না? এর উত্তর আছে পবিত্র কুরআনে সূরা ইসরার ১১০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى ـ

অর্থ ঃ "তোমরা তাঁকে ডাক আল্লাহ বলে অথবা রহমান বলে। তোমরা তাঁকে যে নামেই ডাক না কেন সকল সুন্দর নামগুলো তো তাঁরই।"

আপনি মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালাকে ডাকতে পারেন যে কোন নামে সেটা হতে হবে সঠিক নাম, সেটা হবে বিশুদ্ধ নাম, এমন নাম হবে যেটা তিনি নিজেই দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসে আল্লাহর নাম উল্লেখ আছে ৯৯টি। আর রাহমান, আর রাহিম, আল ক্বারীম, আল হাকীম, পরম দয়ালু, পরম করুণাময়, পরম জ্ঞানী সব মিলিয়ে ৯৯টি। আর সবার উপর সেটা 'আল্লাহ'। আর এ কথাটা যে সুন্দর নামগুলো আল্লাহর এটা সূরা ইসরার ১১০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে, এছাড়াও সূরা "ত্বহার' ৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা আ'রাফ এর ১৮০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে, সূরা হাশরের ২৪ নম্বর আয়াতে আছে। এখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى ـ

অর্থ ঃ "সুন্দর নামগুলো সেগুলো আল্লাহর।"

আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নাম আল্লাহ। এখন আমরা মুসলিমরা কেন আল্লাহ তায়ালাকে আরবিতে আল্লাহ বলে ডাকি? কেন ইংরেজি God বলে ডাকি না। আসলে এর কারণটা হচ্ছে অন্যসব নাম আর শব্দগুলোকে আমরা বিকৃত করতে পারি। যেমন–

ধরেন ইংরেজিতে God এরপর একটা s লাগালে এটা হবে Gods যা ঈশ্বরের বহুবচন। আল্লাহর কোন বহুবচন হয় না। "কুলহু আল্লাহু আহাদ" অর্থাৎ বল তিনি আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। যদি God-এর পরে dess যোগ করেন এটা হবে Goddess অর্থাৎ মহিলা ঈশ্বর। ইসলামে পুরুষ আল্লাহ্ বা মহিলা আল্লাহ্ বলে কিছু নেই। আল্লাহ্ তায়ালার কোন লিঙ্গ নেই। যদি God-এর পরে father যোগ করেন তাহলে God father অর্থাৎ সে আমার অভিভাবক। ইসলাম ধর্মে আল্লাহ আব্বা বা আল্লাহ্ father বলে কিছু নেই। যদি God-এর পরে mother যোগ করেন সেটা হবে God mother; ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্ mother বা আল্লাহ্ আম্মি বলে কিছু নেই। যদি God-এর পূর্বে তিন শব্দটা জুড়ে দেন তাহলে হবে তিন God। তিন আল্লাহ বলে কিছু নেই ইসলামে। আর এ জন্যই আমরা মুসলিমরা আল্লাহ তায়ালাকে আরবি শব্দ আল্লাহ্ বলেই ডাকি। কারণেই আল্লাহ শব্দটা বেশির ভাগ প্রধান ধর্ম গ্রন্থগুলোতে দেখতে পাবেন। যদি শিখধর্ম গ্রন্থ পড়েন সেখানে মহান সৃষ্টিকর্তার একটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যে আল্লাহ।

যদি খ্রিস্টানদের বাইবেল পড়েন Gospel of Mark-এর ১৫ নং অধ্যায়ের ৩৪ নম্বর অনুচ্ছেদে আছে, Gospel of Mother ২৭ অধ্যায়ের ৪৬ নম্বর অনুচ্ছেদে আছে বলা আছে যে, "যীশুখ্রিস্টকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হলো। তিনি বলেছিলেন, এল্লাই এল্লাই লামা সাবাকতানি'– ঈশ্বর ঈশ্বর কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করলে।" এ এল্লাই এল্লাই লামা সাবাকতানি শুনে কি মনে হয় ঈশ্বর কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করলে? না। তবে যদি এর আরবি করেন এটা হবে এল্লাই এল্লাই লামা তারাকতানি" একই রকম। এ হিব্রু এবং আরবি ভাষা দুটো একই রকম। আর আপনারা ধর্মীয় ডিকশনারিতে দেখবেন সেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ বা এল্লাই। একই কথা Allah তাহলে আল্লাহ্ শব্দটি বাইবেলেও আছে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থেও আছে, বেদেও উল্লেখ করা আছে। একটা আলাদা উপনিষদ আছে। যার নাম আল্লাহ উপনিষদ। তাহলে আল্লাহ শব্দটা উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রধান ধর্মগ্রন্থে। এটাই হলো স্রষ্টার সব চাইতে সঠিক ও শুদ্ধ নাম। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৮৬। স্যার আমার নাম গিল রয়। মুম্বাইতে থাকি। আমি ব্যবসা করি। আমাকে সুযোগ দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। প্রশ্ন করার জন্য অনুষ্ঠানটা বেশ উপভোগ করছি। এ প্রথম এসেছি। আমার প্রশ্নটা ধর্মান্তরিত হওয়া প্রসঙ্গে। ইসলামে আসা অথবা বের হয়ে যাওয়া। এখন অনেক মুসলিম দেশেই ইসলাম থেকে কেউ অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারে না। কিছু দেশে জবরদস্তি করা হয় বা মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তবে ভুল হলে শোধরে দিবেন, আমি ঠিক জানি না। তবে যে দেশে অমুসলিমের সংখ্যা বেশি, সেখানে অন্য ধর্ম থেকে ইসলামে আসতে বাধা দেয়া হয় না। এখন ইসলাম ধর্মে সঠিক নিয়মটা কি? কারণ আপনার লেকচারেই বললেন ইসলাম ধর্মে কোন

জবরদস্তি নেই। আর পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। তাহলে ধর্মান্তরিত হতে বাধা দেয়া হচ্ছে কেন? তারা কি ঠিক করছে? এখানে অনুমতি দিলে অসুবিধা কোথায়? কেউ যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে চায়, তাকে বাধা দেয়া হবে কেন? আপনি আমেরিকাকে দেখেন, সেখানে বেশির ভাগ মানুষ খ্রিস্টান, তাদের বেশির ভাগই খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। যদি তারা ধর্ম পরিবর্তনে বাধা দেয়, যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধা দেয় সে রকম হলে আপনি কি বলবেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নটার দুটি অংশ প্রথম অংশে আপনি বলেছেন যে, কিছু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে কেন ধর্ম পরিবর্তন করতে দেয়া হয় না? সেখানে অন্য ধর্ম প্রচার করতে পারবে না, ধর্মান্তরিত নিষিদ্ধ। সেখানে কোন মুসলিম তাঁর ধর্ম পরিবর্তন করতে পারে না মূল প্রশ্ন। এটা প্রথম অংশ। দ্বিতীয় অংশে ধর্মান্তরিত হলে মৃত্যুদণ্ড কেন? আমেরিকাতে যদি এখন ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়, ধর্মান্তর নিষিদ্ধ হয় তখন আমি কি বলব? খুব সুন্দর প্রশ্ন। ভাই আপনি যদি কোন ধর্ম প্রচারের কথা বলেন।

এমন কিছু দেশ আছে যেমন– ধরেন সৌদি আরব। সেখানে অন্য ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ। আমার জানামতে একটা দেশই আছে যেখানে অন্য ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ, সেটা সৌদি আরব। এর কারণ হলো যে, ধরেন ভাই আপনি একটা স্কুল শুরু করেছেন। স্কুল চালু করতে গিয়ে আপনি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন একজন অংকের টিচারের। যখন আপনি অংকের টিচারদের ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, আপনি প্রশ্ন করলেন দুই যোগ দুই সমান কত? একজন অংকের টিচার বলল দুই যোগ দুই সমান তিন, পরের জন এসে বলল দুই যোগ দুই সমান চার। আর পরের জন এসে বলল দুই যোগ দুই সমান পাঁচ। অনেক মানুষ বলে এখানে সমস্যা কোথায়? আপনি আপনার ধর্ম প্রচার করেন, যারা গ্রহণ করতে চায় তারা গ্রহণ করবে। আমি আপনাকে বলি, আপনার স্কুলে অংকের টিচার কেমন রাখবেন? সে বলে দুই যোগ দুই সমান তিন, নাকি তাকে রাখবেন যে বলে দুই যোগ দুই সমান পাঁচ। আমি বলব না আমিও অংক জানি। আমি এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত অংকে দুই যোগ দুই সমান চার। আর কিছুই না। তাহলে ধর্মের কথা অনুযায়ী সৌদি আরব তাঁরা একেবারে নিশ্চিত। আর মেনে নিয়েছে কুরআনের এই আয়াতটা। সূরা ইমরানের ১৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ -

অর্থ ঃ "আল্লাহর কাছে একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম।"

তারা সৌদি আরবে ভুল কোন কিছু প্রচার করতে দিবে না। তবে বিজ্ঞান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তারা আমেরিকানদের স্বাগত জানিয়েছে, আপনারা চলে আসেন। স্বাগত জানিয়েছে ইংল্যান্ডের মানুষদের, স্বাগত জানিয়েছে ইন্ডিয়ার মানুষদের সমস্যা নেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তারাই উপরে আছে। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তারা বিশেষজ্ঞ আনছে আমেরিকা থেকে, ইংল্যান্ড থেকে, সিঙ্গাপুর থেকে, ফিলিপাইন থেকে, ইন্ডিয়া থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে। কিন্তু যদি ধর্মের কথা বলা হয় তাঁরা একেবারেই নিশ্চিত, তারা পুরোপুরিই শিউর এটা সত্যি। একইভাবে আপনিও নিশ্চিত যে দুই যোগ দুই সমান চার। আপনি অংকে ভুল শিখাতে দিবেন না। একইভাবে সৌদি আরবে এমন। আমি বিভিন্ন ধর্মের ওপর একজন ছাত্র। পবিত্র কুরআন বাদে এ পৃথিবীতে আর একটা ধর্ম গ্রন্থও পাবেন না; যেটা বলছে যে এটাই হচ্ছে সত্যিকারের ধর্ম। আপনি হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলো পড়ে দেখেন, আপনি খ্রিস্টানদের পবিত্র বাইবেল পড়ে দেখেন, বাইবেলেও বলা হয়নি যে, খ্রিস্টানধর্মই সঠিক। খ্রিস্টানদের বাইবেলে খ্রিস্টান শব্দটি নেই, এটা কি আপনি জানেন? পবিত্র বাইবেলে খ্রিস্টান বলে কোন শব্দ পাবেন না। এরপর হিন্দু শব্দটা আপনি বেদে পাবেন না। এটা কি জানেন? বেদের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, এটাই হলো একমাত্র সঠিক ধর্ম। বাইবেলের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, এটাই হচ্ছে সঠিক ধর্ম। কুরআন হলো এ পৃথিবীর বুকে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ, যেখানে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "ইন্নাদ্বিনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম।" অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম। তাহলে যদি ধর্ম প্রচারের কথা বলি, অন্য কোন ধর্ম প্রচারের কথা বলি এটুকু বলতে পারি যে, এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত, তারা সেখানে অন্য কাউকে অন্য ধর্ম প্রচার করতে দিবে না।

এ ইন্ডিয়া একটি ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। এটা কোন হিন্দু রাষ্ট্র না, এদেশের সংবিধান সেটাই বলছে। এখানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু আছে। আমি একজন ইন্ডিয়ান। ভৌগোলিকভাবে আমি হিন্দু। কারণ, আমি ইন্ডিয়ান। তবে আমি ইসলাম ধর্ম পালন করি, ইসলাম ধর্ম আমি মানি। এটা আমার জন্মগত অধিকার যে, আমি ধর্ম প্রচার, প্রসার এবং পালন করতে পারব। ইন্ডিয়ার সংবিধান সেটাই বলছে। আগে তাহলে সংবিধানটা বদলাতে হবে। আমরা সবাই জানি যে, আমেরিকা একটা গণতান্ত্রিক দেশ, তাদের সংবিধানে এটা আছে যে, বাক স্বাধীনতা থাকবে। আপনি আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে, আমেরিকায় যদি ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে বাধা দেয় তাহলে আমার কেমন লাগবে? এটা তো তাদের খ্রিস্টানধর্ম গ্রন্থে নাই। আমি বলব তারা খ্রিস্টানধর্ম মানছে না, তারা তো বাইবেল মেনে চলছে না। আপনি বলবেন, এটা একটি হিন্দু রাষ্ট্র। আসলে কিন্তু তা নয় এটা ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। হিন্দুরাষ্ট্র কোথাও বলা হয়নি, আপনি তো খ্রিস্টান। আপনি আমাকে

বাইবেল থেকে মাত্র একটা কথা দেখান যেটা বলছে যে খ্রিস্টানধর্মই একমাত্র সঠিক ধর্ম। হ্যাঁ বলেন।

"তখন বাইবেলে এরকম ব্যাখ্যা করা হয়েছিল– Old আর New testament-এ তখনকার দিনের খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞরা বাইবেলের ব্যাখ্যা করেছিল যে, বাইবেল বলছে কেউ যদি খ্রিস্টান ধর্মত্যাগ করতে চায় তাকে তখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। অনেক আগে স্পেনে খ্রিস্টানরা এরূপ করেছিল। সেটা প্রায় ৫০০ বছর আগে। তবে এখন মানুষ অনেক উন্নত হয়েছে। আমি এমন কোন খ্রিষ্টান সংখ্যাগুরু দেশের কথা জানি না যারা এটাতে বাধা দেয়। আমি ধর্ম প্রচারের কথা বলছি না, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা বলছি। ধরেন একজন মুসলিম। কোন একটা মুসলিম দেশে যদি ধর্ম ত্যাগ করতে চাই তাহলে কি হবে?"

ভাই এটাতো আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় দিক। এজন্যই বলছি আগে উত্তরটা শেষ করতে দিন, আপনি কি করছেন। আপনি হাত ওপরে তুলছেন। আমি তো শুরুতেই বলছি আপনার প্রশ্নটার দুটো ভাগ আছে। প্রথম অংশের উত্তর দিয়েছি। আর আপনি শুরু করলেন। যখন আপনি হাত ওপর তুললেন তখন আমি কি বুঝি আপনি আমার উত্তরটা মনোযোগ দিচ্ছেন না ঠিক? আমরা আপনাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিয়েছি, আমাকে উত্তর দেবার সুযোগটা দেন। ঠিক আছে?

আমি তো বলেছিলাম আপনার প্রশ্নের দুটো ভাগ আছে। আর আমার উত্তর শেষ করার আগে আপনি হাত শুধু উপরে তুলছেন। আমি যদি কথা বলে যাই অন্য সবাই বুঝবে আপনি বুঝবেন না। আমিতো চাই আপনিও সেটা বুঝেন, আমিতো চাই আপনি যেন শান্তির ধর্ম গ্রহণ করেন। ঠিক আছে ভাই?

এবারে প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে আসি। যদি কেউ অন্য ধর্মে যেতে চায়, যদি কেউ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে চায় পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে সূরা বাকারায় ২৫৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ـ

অর্থ ঃ "দ্বীন সম্পর্কে কোন জবরদস্তি নেই, সত্য হচ্ছে সুস্পষ্ট মিথ্যা থেকে।"

তাহলে কোন মানুষ যদি ইসলাম ধর্ম থেকে অন্য কোন ধর্মে যেতে চায়- ভালো। কিয়ামতের দিন সে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে থাকবে। আর মৃত্যুদণ্ডের কথা যদি বলেন তাহলে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন যদি সেই লোক ধর্মান্তরের পরে যদি তার নতুন ধর্ম প্রচার করতে থাকে আর ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। আর এ একই রকম আইন, প্রায় একই রকম আইন পৃথিবীর সব দেশেই দেখবেন, ইন্ডিয়াতেও দেখবেন। এখানে আপনি দেশের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবেন না। ইন্ডিয়াতে ধরেন কোন

একজন লোক সে দেশের কোন তথ্য বিক্রি করল কোন শত্রুর কাছে ঠিক আছে? তার তথ্যগুলো সত্যিও হতে পারে, হয়ত কোন ব্লুফিল্ম কিছু দেশ মৃত্যুদণ্ড দিবে অন্যরা দিবে যাবত জীবন কারাদণ্ড, যদিও সে সত্যি কথা বলেছে। নিজস্ব আইন প্রত্যেক দেশেরই আছে। তাহলে ইসলামে যদি কোন মুসলিম ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করে। তারপর সেটা প্রচার করে, ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে, যদি সেটা কোন ইসলামিক দেশ হয়, যদি ইন্ডিয়ায় কেউ এমনটা করে কেউ তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে না। যদি সে এমন দেশে থাকে যারা ইসলামিক শরিয়াহ মেনে চলে। এখানে সে কি করছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে সে তাহলে সেই দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। এমন অবস্থা হলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

সব মুসলিম দেশ কিন্তু ইসলামিক শরিয়াহ মেনে চলে না। এ কথাটা জেনে রাখেন। হাতেগোনা কয়েকটা দেশ কেউ এই আইনগুলো মানেন, কেউ ঐ আইনগুলো মানেন না। আমি এমন দেশের কথা জানি না যারা ১০০% ইসলামী শরিয়াহ পালন করেন। তাহলে আপনার এ কথা বুঝতে হবে সেই মুসলিম দেশে ইসলামিক শরিয়াহ প্রচলিত আছে। আর তেমন দেশে যদি এরকম কোন ঘটনা ঘটে, যেমন ইন্ডিয়ায় কেউ যদি দেশের গোপন তথ্য বিক্রি করে দেয়, তাহলে তাকে কারাদণ্ড দেয়া হবে কত বছরের আমি জানি না। মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে, আমেরিকার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। সেই একইভাবে এ মুসলিম দেশের আইন হলেও এটা, সে দেশে ইসলামিক আইনে শাসন কাজ চালানো হয়। তাহলে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৮৭। আসসালামু আলাইকুম জাকির ভাই। আমার নাম নিলম শেঠী। আমার জন্ম হিন্দু পরিবারে। আমি একদিন আজাদ ময়দানে হিন্দুইজম ও ইসলামিক সাদৃশ্য নিয়ে আপনার লেকচারটা শুনেছিলাম। সেই দিন থেকেই আমি ইসলাম পছন্দ করি। আজকে সবার সামনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ মাশায়াল্লাহ বোন আপনাকে অভিনন্দন, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আপনাকে অভিনন্দন। তিনি বললেন কয়েক বছর আগে মুম্বাইয়ের আজাদ নগরীতে প্রথম আমার লেকচার শুনেছিলেন। বিষয় ছিল হিন্দুইজম ও ইসলামের মধ্যে সাদৃশ্য। আর সেই দিন থেকেই তিনি ইসলাম ়ছন্দ করেন। আর আজকে সবার সামনে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আপনাকে এ শান্তির ধর্মে স্বাগত জানাই। আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি রহমত দান করেন। আর ইনশাআল্লাহ আপনি জান্নাতে যাবেন, ইহকাল ও পরকালে শান্তি পাবেন। ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ঃ ৮৮। হ্যাঁ। আমি ছিলাম সন্ধ্যা। এখন আমি জারা বিলাল খান। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আপনি আপনার লেকচারে বললেন যে,

ইসলাম মূর্তি বা মূর্তি পূজা বিশ্বাস করে না। তবে কেরালায় এমন একটা জায়গা আছে সেখানে একটা মূর্তি দেখা যায়। যেটা পাথর থেকে উঠে এসেছে। আর এটা বাড়ছে। এটা তাহলে এরকম কেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনি প্রশ্ন করলেন ইসলামে মূর্তিপূজা নেই। কিন্তু তিনি জানেন কেরালার কোন একটা জায়গায় সেখানে কোন একটা পাহাড়ের ভেতর থেকে মূর্তি বের হয়ে আসছে আর সেটা বাড়ছে, কিভাবে সেটা বাড়ছে? আপনার প্রশ্ন। তার মানে মূর্তিটার ভেতর কিছু একটা আছে। বোন আপনি কি জানেন যে পাহাড়ও বড় হয়? এটা কি জানেন। হ্যাঁ এটা যদি জানেন তাহলে মূর্তিওতো বেড়ে উঠতে পারে। তার মানে এ নয় যে, সেই মূর্তির ভেতর জীবন আছে।

আপনি বললেন, "মূর্তিটা পাথরের ভেতর থেকেই এসেছে। ওখানে আগে কোন মূর্তি ছিল না। পাথরের মধ্যে থেকেই মূর্তিটা বের হয়েছে।"

আমি সে কথাটাই বলছি মূর্তিটা পাথরের মধ্যে থেকে বের হয়েছে। পাহাড়-পর্বততো আকারে বড় হয়। কিভাবে সেটা বাড়ে আমরা তা Geology-তে পড়েছি। যে পাহাড় পর্বত বাড়ে। এমন অনেক উদাহরণ আছে। যেমন– ধরেন এ কয়েক বছর আগে শুনা গেল যে গনেশের মূর্তি দুধ খাচ্ছে। এটা একটা সহজ বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। অ্যাফসিস এটা একটা সহজ ব্যাপার। আপনি একটি জগ ভর্তি দুধে একটা চারাগাছ রাখেন তাহলে সেই চারাগাছ দুধ শুষে নিবে এটা অ্যাফসিস। তার মানে এ না যে সেই মূর্তি দুধ খাচ্ছে। তখন অনেক টিভি চ্যানেলেই এটা দেখানো হয়েছিল। এখানে আপনাকে বুঝতে হবে যে এগুলো হলো সব জড় বস্তু। বেদে পরিষ্কার করেই বলা আছে– Yajurved এর ৩২ অধ্যায়ের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ "নাতাস্তি প্রতিমা আস্তি" মহান স্রষ্টার কোন প্রতিমা নেই।" তাঁর কোন ছবি নেই, তাঁর কোন মূর্তি নেই, তাঁর কোন ভাস্কর্য নেই, কোন ফটোগ্রাফ নেই। আপনি আরো দুটি প্রশ্ন করলেন যে, পাথরটা এরকম আকার পাচ্ছে কোথা থেকে? পাথরটার আকার তাহলে একটা মূর্তির মত হচ্ছে কেন?

আমি বলছি : বোন। আজকের কথা যদি বলেন, তাহলে মানুষও কোন আকার দিতে পারে যন্ত্রপাতি দিয়ে, প্রাকৃতিকভাবে কোন আকার তৈরি হতে পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক। এমনও অনেক কথা শুনা যায় যে, একটা গাছ আছে দেখলেন লেখা আছে "ওম" অথবা কোন গাছে লেখা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এ সমস্ত ব্যাপার আসলে একেবারেই গুরুত্বহীন। আমরা এখানে কথা বলছি সত্য নিয়ে। বোন অনেক পাহাড় আছে দেখতে অনেকটা মানুষের মুখের মতন এমনটা দেখেছেন আপনি? এটা প্রকৃতির খেলা। পাথরের আকার মানুষের মত থাকলেই এটা অলৌকিক হয়ে যায় না। আমরা মেনে চলব বেদের কথা, কুরআনের কথা,

বাইবেলের কথা যেটা বলছে সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি নেই। পাথরত একটা মানুষের মত হতে পারে, তার মানে এই না সেটা ঈশ্বর। ধন্যবাদ ঠিক আছে প্রশ্নকর্তী। আর এসব পাথর দেখবেন বিভিন্ন ছবি, মূর্তি এগুলো পড়ে গেলে ভেঙ্গে যায়। যখন সে নিজেকে সাহায্য করতে পারে না তখন সে কিভাবে আমাদেরকে সাহায্য করবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৮৯। Thank you sir. আমি ডঃ রাজেস। একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। আমার প্রশ্ন দুইটা। আমি পড়েছি যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ হলেন সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী। এ সর্বশেষ আর চূড়ান্তের ওপর এত জোর দেয়া হচ্ছে কেন? আপনারা নতুন কোন নবীকে কি ভয় পাচ্ছেন? আল্লাহ যদি নতুন কাউকে মনোনীত করে পাঠান তাকে কি মেনে নিবেন না? আর আমি যদি সৃষ্টিকর্তাকে দেখতে চাই, ইসলাম এ ক্ষেত্রে কি বলে? ধন্যবাদ স্যার।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই দুটো প্রশ্ন করেছেন। প্রথম প্রশ্নটার ওপর এত জোর দিচ্ছি কেন যে তিনিই শেষ নবী। আল্লাহ আরেকজন নবী পাঠাতে চাইলে কি পারতেন না? আর শেষ প্রশ্ন যদি আমি আল্লাহকে দেখতে চাই তাহলে আমি কি করব? আপনার এ প্রশ্নে আমি পরে আসছি। প্রথম অংশটা যে জোর দিচ্ছি কেন? যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ শেষ নবী। শুধু আমি জোর দিচ্ছি না বেদও জোর দিচ্ছে, কুরআনও জোর দিচ্ছে, বাইবেলও জোর দিচ্ছে। আর কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে জোর দিচ্ছে। পবিত্র কুরআনে সূরা আহযাবের ৪০ নম্বর আয়াত–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ـ

অর্থ ঃ "মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি হলেন আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রাসূল, তিনি নবুয়তের শেষ সীলমোহর। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে জানেন।"

এখন আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ নতুন কাউকে পাঠাতে চাইলে পাঠাতে পারতেন। তবে আল্লাহ কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। পবিত্র কুরআনে একথা উল্লেখ করা আছে সূরা আহযাবের ৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, তিনিই হলেন শেষ নবী। তাই আল্লাহ জানেন। যদি নতুন কাউকে পাঠাতেন তাহলে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে শেষ নবী উল্লেখ করতেন না। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে শেষ নবী বলা হয়েছে, আমি বিশ্বাস করেছি। আর আল্লাহ তায়ালাতো ভবিষ্যৎও জানেন। আপনি আমি জানি না। তিনি বলেছেন মুহাম্মদই শেষ নবী। সেজন্য আমি সেটা বিশ্বাস করি। এখন আমাদের যেটা প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালা ঠিক সেটাই দিয়েছেন আমাদের। কিছু মানুষ বলেন আল্লাহ নবীকে কেন সৃষ্টির প্রথম দিনই পাঠালেন না।

আমার ছেলে কয়েকদিন আগে বলছিল, আমাকে প্রথমেই কেন মেডিকেল কলেজে ভর্তি করলেন না। বললাম আগেতো স্কুলে যেতে হবে ক্লাস ওয়ান, ক্লাস টু, ক্লাস থ্রি, কলেজ তারপর মেডিকেল ঠিক আছে। তাই মানুষের সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে আল্লাহ বিভিন্ন রাসূল পাঠিয়েছেন। আমরা চারটা কিতাবের নাম জানি। এছাড়াও আরো অনেক আছে।

তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এগুলোর নাম জানি। এরপর আল্লাহ তায়ালাই ঠিক করলেন যে, ১৪০০ বছর আগে মানুষ পবিত্র কুরআন বুঝার পর্যায়ে এসেছে। তখন তিনি পাঠালেন তাঁর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে এবং চূড়ান্ত কিতাব হলো কুরআন। এখন আল্লাহ চাইলে নতুন কাউকে পাঠাতে পারেন। তবে যেহেতু তিনি বলেছেন আর কাউকে পাঠাবেন না, তাই পাঠাবেন না। এ দ্বীন তিনি সম্পূর্ণ করেছেন। আগের ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পূর্ণ ছিল না। সূরা মায়েদার ৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থ ঃ "আজ এ দ্বীন তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম আর তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহগুলো সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে আমি মনোনীত করলাম।"

ইসলামকে সম্পূর্ণ করার পর এখানে নতুন কিছু যোগও হবে না অথবা এখান থেকে বাদও দেয়া যাবে না, এটা সম্পূর্ণ। আর সেজন্য যদি আজকের দিনে কেউ বলে যে, সে আসমানী কিতাব পেয়েছে আর যদি সে বলে সে আল্লাহর রাসূল তাকে মানসিক ডাক্তার দেখাতে হবে। এখন অনেক মানুষই নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করে, অনেকে ঈশ্বরের নবী বলে দাবি করে। মানসিক ডাক্তার দেখাতে হবে তাকে। কারণ, কুরআনের পরে নতুন কোন আসমানী কিতাব আসবে না, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরে নতুন কোন নবীও আসবে না। এবার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর নিন।

আল্লাহকে দেখতে চাইলে তখন আপনাকে কি করতে হবে? এ পৃথিবীতে আল্লাহকে দেখতে পাবেন না। পবিত্র কুরআনে বলা আছে যে, মূসা (আ) আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ তাকে বলেছিলেন পাহাড়ের দিকে তাকাও। আমি এ পাহাড়ে আমার একটা ঝলক দেখাব। সেই পাহাড়ের তখন কি অবস্থা হল। সেই পাহাড়ের আগুন থেকে মূসা নবীর চোখ ধাঁধায় গেল। পৃথিবীতে দেখতে পাবেন না, তবে পরকালে দেখতে পাবেন, যদি আপনি জান্নাতে যান। সবকিছুই সেখানে পাবেন, খাবার সবকিছুই, লোকজন– হাদীসে লেখা আছে। তখন তারা আল্লাহকে দেখার জন্য অনুনয় বিনয় করবে। যদি আপনি আল্লাহ তায়ালাকে দেখতে চান

তাহলে আল্লাহর এ চূড়ান্ত আসমানী কিতাব পড়তে হবে, পবিত্র কুরআনের কথাগুলো মেনে চলতে হবে এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর কথাগুলো মেনে চলবেন। যদি হযরত মুহাম্মদ ﷺ আর কুরআনের কথাগুলো আপনি মেনে চলেন ইনশাআল্লাহ আপনি জান্নাতে যাবেন। যদি আমি মানি তাহলে আমিত জান্নাতে যাব। আর ইনশাআল্লাহ আমরা আল্লাহর আইন মেনে চললে জান্নাতে যাব। আর ইনশাআল্লাহ আমরা সেখানে আল্লাহকে দেখতে পাব। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন। ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ঃ ৯০। আমার নাম কিশোর। আমি মণিপুর থেকে এসেছি। ইন্ডিয়ার দক্ষিণ থেকে। আপনারা জানেন যে, কাশ্মীরে যেমন আপনাদেরকে সবাই সন্ত্রাসী বলে তেমনি মণিপুরে আমরা যারা স্থানীয় আমরা ওখানে কাজগুলো করছি সেজন্য আমাদেরও সবাই সন্ত্রাসী বলে ডাকে। এ কারণে গত ১৫ দিন যাবত আমি এইখানেই আছি। মণিপুরে খবর ছড়ানো হয়েছে যে, আমি মারা গেছি। আমার মা বাবাও জানে যে, আমি মারা গেছি। আসলে সেই ভয়েই আমি মুম্বাইতে চলে এসেছি। আর মণিপুরে এখন পর্যন্ত আমরা কেউ পিস টিভি দেখিনি। বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে আমার আগ্রহ আছে বলে বেশ কিছুটা জানি। আমি গুরু দুয়ারাতে গেছি, চার্চে গেছি। তারপর বাইবেল পড়েছি। সব জায়গাতেই গেছি। তবে আমি এখন পর্যন্ত এটা জানি না যে, মুসলিমরা কেন দাঁড়ি রাখে? আর ইসলাম ধর্মে কি আছে সেটা কোন হিন্দি বইতেও পাইনি, ইংরেজি বইতেও পাইনি, মণিপুরেও পাইনি। তাই আমি বলব আপনারা যদি এই বইগুলো মণিপুরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তাহলে খুব ভালো হয়। আর আমি যদি এখানে হিন্দি বা ইংরেজিতে কোন বই পাই তাহলে আমি সেটা কিনতে রাজি আছি।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, কাশ্মীরে যেমন মুসলিমরা জিহাদ করছে। একইভাবে মণিপুরের অধিবাসীরাও লড়াই করছে। উনি মণিপুর থেকে এখানে চলে এসেছেন। মণিপুরের বিভিন্ন ঝামেলার কারণে ১৫ দিন এখানেই আছেন। তিনি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান। আর উনি জানতে চেয়েছেন মণিপুরে কেন পিস টিভি দেখা যায় না। আর জানতে চেয়েছেন যে মুসলিমরা কেন দাঁড়ি রাখে। আপনার প্রশ্ন দুটো। ভাই কাশ্মীরের কথা আমি আগেও বলেছি যে, সবাই জিহাদ করছে আমি এ কথা বলব না। সবাই কিন্তু জিহাদ করছে না।

প্রশ্ন ঃ ৯১। এক মিনিট, এক মিনিট। আমার কথাটাকে ভুল বুঝেছেন। আমি বলছি আপনারাই ঠিক করছেন।

উত্তর ঃ ডা. জাকির আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি ভাই। আমি কখনই বলিনি আপনি ভুল। আর আপনার প্রশ্নটাও খুব সুন্দর। তবে এটাও পরিষ্কার করি। কাশ্মীরে

যেসব মানুষ যুদ্ধ করছে, অনেকেই হয়ত সত্যিকারের জিহাদ করছে না। কেউ কেউ নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য খারাপ কাজ করছে। যারা আল্লাহ তায়ালার আদেশ নির্দেশ মেনে যুদ্ধ করছে তাদের যুদ্ধকে বলতে পারেন "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ"। আমি ঢালাওভাবে বলতে পারি না যে, কাশ্মীরে সব মুসলিম জিহাদ করছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। এবারে মণিপুরের বিষয়টা নিয়ে বলি। আমি জানি যে মণিপুরে এখন খুব যুদ্ধ চলছে আর সেই যুদ্ধের কারণেই আপনি এখানে। হতে পারে এটা আল্লাহর ইচ্ছা, হয়ত এমনটা আল্লাহর ইচ্ছা। যুদ্ধের কারণে আপনি এখানে এসেছেন। হয়ত এ দুনিয়ায় শান্তিতে থাকার পাশাপাশি পরকালেও শান্তিতে থাকবেন। ঠিক আছে। আপনি আমার লেকচার শুনলেন শান্তির ওপর। পৃথিবীর শান্তিটা হলো সাময়িক, চিরস্থায়ী না। কিন্তু পরকালের শান্তিটা হলো চিরস্থায়ী।

এবারের প্রশ্নে আসি আমরা দাড়ি রাখি কেন? আর মণিপুরে পিস টিভি দেখতে পারেন না কেন? মণিপুরে পিস টিভি দেখার প্রসঙ্গে বলি। আপনি ফ্রিকোয়েন্সিটা চেক করে দেখতে পারেন। যদি ডিশএন্টেনা লাগান। হতে পারে আপনাদের ডিশ অপারেটররা চ্যানেলটা আনেনি। একটা ডিশএন্টেনা কিনতে কয়েক হাজার টাকা লাগবে। এন্টেনাটা এখন পূর্ব দিকে ৬৮ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দেন। আর ফ্রিকোয়েন্সিটা টিউন করেন ইনশাআল্লাহ পিস টিভি দেখতে পাবেন। আপনাদের ক্যাবল অপারেটরকে বলে দেখেন। আমরা মণিপুরে গিয়ে তাদের বাধ্য করতে পারি না। এবার বলি মুসলিমরা কেন দাঁড়ি রাখে? আমি এখানে বলব যে, পোশাকে আপনার যে উদ্দেশ্য বুঝাবেন সেই পোশাকই আপনি পরেন। একটা লেকচারে বলে দিলাম, "ইফ দি লেভেল শো'জ ইওর ইনটেন্ট ওয়ার ইট"। যেমন– ধরেন যদি কোন কনফারেন্সে যান, দেখবেন তাঁরা লেভেল পরেছেন আমি ডাক্তার অমুক, আমি ইঞ্জি নিয়ার, আমি একজন বিজ্ঞানী এটা হলো অনুষ্ঠান ছাড়াই পরিচয়। যদি আপনি শুধু ডাক্তারদের কোন কনফারেন্সে যান তাদের স্পেসালিটি লেখা আছে– যেমন ডা. অমুক, কার্ডিওলোজিস্ট, নিউরোলজিস্ট, নেফরোলজিস্ট। হার্টের সমস্যা হলে কার্ডিওলোজিস্ট। যদি আপনার সমস্যা হয় কিডনিতে তাহলে নেফরোলজিস্ট, যদি ব্রেইনে সমস্যা হয় তাহলে নিউরোলজিস্ট আনুষ্ঠানিক পরিচয়।

পবিত্র কুরআনে সূরা আনআমের ৫৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, "যদি তাদের কাছে আস যারা আমার আয়াতে ঈমান আনয়ন করে তাদের বল সালামালাইকুম। তাদের বল শান্তি বর্ষিত হোক। "ইসলাম আমাদের বলে তোমরা বল আসসালামু আলাইকুম" এটা শান্তির ধর্ম। কমপক্ষে প্রতিদিন প্রত্যেক মুসলিম অন্ততপক্ষে পাঁচবার সালাত আদায় করে। যখন সে দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়ে, যদি সে শুধু ফরজ নামাজগুলো আদায়ও করে, যেটা আবশ্যক। পাঁচবার গুণ দুই। নামাজ আদায় শেষ হলে বলি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমার ডান দিকে যত লোক আছে সবার ওপর

আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমার বাম দিকে যতলোক আছে সবার ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। প্রত্যেক নামাজে দুইবার বলি। কমপক্ষে পাঁচবার নামাজ পড়ি। কমপক্ষে দশবার সালাম দিচ্ছি ডান পাশের মানুষদের আর পাশাপাশি বাম দিকের মানুষদের। যদি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাও পড়ি তাহলে আরো দশবার। এভাবে অন্ততপক্ষে বিশবার আমি সালাম জানাচ্ছি আমার ডান দিকের মানুষদের আর বাম দিকের মানুষদের যদি সাধারণ সুন্নতও পড়ি তাহলে আরো বেশি হবে।

যখনি আমি কোন মুসলিমকে দেখি তাকে বলি 'আসসালামু আলাইকুম'– আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। পবিত্র কুরআনেও সূরা নিসার ৮৬ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, "যদি কেউ তোমাকে অভিবাদন করে অর্থাৎ উত্তম অভিবাদন করে, তুমি আরো ভালোভাবে অভিবাদন কর, অথবা তাঁর সমান।" কেউ যদি আমাকে বলে আসসালামু আলাইকুম। আমি তখন বলব ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেউ আমাকে বলল শান্তি বর্ষিত হোক, আমি তখন বলব শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। কেউ যদি বলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি তখন বলব ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। আরো ভালোভাবে দিব। যদি কেউ বলে যে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি অন্ততপক্ষে একইভাবে বলব ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেউ আমাকে বলল আসসালামু আলাইকুম, আমি বললাম ওয়া আস সালামু আলাইকুম। কথাগুলো একই কিন্তু বললাম হৃদয়ের গভীর থেকে। এমনটা হলেও ভালো।

তেমনি আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন আরো ভালোভাবে অভিবাদন কর। এখন ধরেন ভ্রমণ করছি, মুসলিমদের সাথে দেখা হবে, এটা কিভাবে বুঝব যে, কোন লোকটা মুসলিম? এ জন্য আমাদের লেভেল আছে– দাড়ি। কিন্তু এখন মিডিয়াতে দেখবেন মুখের মধ্যে দাঁড়ি থাকলে আপনি সন্ত্রাসী। যদি শিখরা দাঁড়ি রাখে আর পাগড়ি পড়ে তাহলে বলা হয় ঐতিহ্য মানছে। আর মুসলিমরা দাঁড়ি রাখলে বলা হয় সন্ত্রাসী। খ্রিস্টানরা দেখবেন তারা মাথা ঢেকে রাখে, তাদের বলা হয় তারা ধার্মিক। আর মুসলিমরা মাথা ডেকে রাখলে তাদের বলা হয় নিপীড়িত। মিডিয়া, মিডিয়া। এ দাঁড়ি একটা মাছিরও ক্ষতি করতে পারবে না, আমার মাথার টুপি একটা মাছিরও ক্ষতি করতে পারবে না। কুরআন পড়লে দেখবেন কুরআনের কোথাও দাঁড়ি রাখার কথা বলা হয়নি। কুরআনে দাড়ি নিয়ে একটা আয়াত আছে সূরা ত্বোহার মধ্যে।

এখানে ৯৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, সেখানে মূসা (আ) তাঁর ভাই হারুনের দাঁড়ি ধরেছিলেন। ইহুদিরা বলে এরুন। হারুন তখন বললেন, হে আমার সহোদর, তুমি কেন আমার মুখের দাড়ি ধরেছ।" শুধুমাত্র এ আয়াতটাতেই দাড়ির কথা উল্লেখ আছে। আমাদের প্রিয় নবীজি ﷺ বলেছেন সহীহ বুখারীতে আছে ৭ নম্বর খণ্ডের ৭৮০ এবং ৮১ নম্বর হাদীসে। আমাদের প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন,

"পৌত্তলিকরা যে কাজ করে তার বিপরীতটা কর।" তোমাদের গোঁফ ছোট করে রাখ আর দাড়ি রাখ। যেহেতু এটা নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশ আর আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মান্য কর।" নবীজি ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন আমরাও মানব। আর এ দাঁড়ি থাকলে আমরা সহজেই চিনতে পারি। অনেক লোক বিভিন্ন সময়ে আমি যখন রাস্তায় হাঁটি, আমি যখন বিদেশ যাই, তারা আমার টুপি এবং দাড়ি দেখে আসসালামু আলাইকুম বলে এটা অনানুষ্ঠানিক পরিষ্কার আমি শান্তি প্রচার করছি। আমাদের বুঝতে হবে যে, এটা একটা অনানুষ্ঠানিক পরিচয়। আর একটা উদাহরণ দেই, একটা গাড়ি কিনলেন। আপনি যদি ডাক্তার হন, তাহলে গাড়িতে ক্রস লাগানো থাকে। কেন? এটা বুঝাতে যে, গাড়ির মালিক একজন ডাক্তার। যদি আপনার ইমার্জেন্সি কাজ থাকে তাহলে গাড়ি থামাতে পারেন। তারপর সাহায্য চাইতে পারেন, সেখানে যদি কারো মুখে দাড়ি দেখেন আর মাথায় টুপি দেখেন তাহলে বুঝবেন যে, সে মুসলিম।

আমার মনে আছে দাদা-নানাদের জিজ্ঞেস করলে জানবেন, তাদের জিজ্ঞেস করলে দেখবেন পঞ্চাশ বছর আগে, একশ বছর আগে তারা আপনাকে বলবে যে অমুসলিমরা তারা যখন কোন ট্যাক্সি ভাড়া করতে চাইত তখন একজন এমন ড্রাইভার খোঁজ করত যার মাথায় টুপি আর মুখে দাড়ি আছে। মুসলিম ড্রাইভার এ লোক আমাকে ঠকাবে না। যদি তারা মুদি দোকানে কেনাকাটা করতে যেত তারা এমন লোকের কাছ থেকে জিনিস কিনত যার মালিকের মুখে দাড়ি আছে অর্থাৎ মুসলিম। এ লোক ঠকাবে না কিন্তু এখন যদি মাথায় টুপি থাকে মুখে দাঁড়ি তার মানে এ লোক সন্ত্রাসী। তাহলে ইসলাম সম্পর্কে অনেক বদনাম। এখন আমাদেরকে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। ঠিক? এটা আমাদের একটা লেভেল, এটা আমাদের নবী ﷺ এর নির্দেশ। তিনি বলেছেন সেজন্য আমরা এটা করি এতে একটা মাছিরও ক্ষতি হবে না, এটা অনানুষ্ঠানিক পরিচয়ের একটা মাধ্যম যে আমরা মুসলিম, যাতে সালাম জানাতে পারি। আর যদি কোন সমস্যায় পড়ি, যদি সাহায্যের দরকার হয় প্রতিবেশীকে সাহায্য করা মুসলিমদের কর্তব্য। সাহায্য চান তার কাছে যান যার মুখে দাঁড়ি, মাথায় টুপি। ইনশাআল্লাহ আপনি সাহায্য পাবেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৯২। আমি ডাক্তার বলবন্ত শাস্ত্রী। বিহারে সরকারি ডাক্তার হিসেবে ছিলাম। আমি মুম্বাইতেও অনেক দিন যাবৎ আছি। এখানকার অনেক অতিথিকেই আমি ব্যক্তিগতভাবেই চিনি। তাদের সাথেও কথা হয়। আপনাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরেছি বলে আমি সবাইকে হাত জোড় করে নমস্কার জানাচ্ছি। আমি এখানে আপনার কাছে শুধু একটা ব্যাপারেই জানতে চাইব। হিন্দু দর্শনে একটা কথা আছে বাসুবেই বা কুটুম্বাকাম। পুরো পৃথিবীই আমার আত্মীয়, পরিবার। হিন্দু দর্শনে আমরা

এমনটাই দেখি। আর স্বর্গে ভবান্তসুখী না ভবান্ত নিরাময়, সবাই সুখে থাকুক সবাই আনন্দে থাকুক, সবাই ভালোভাবে জীবিকা অর্জন করুক, সবাই ভালো থাকুক, হিন্দু দর্শন থেকে আমরা এমনটাই জানতে পারি। আমার ধারণা আপনাদের ইসলাম ধর্মে দর্শনে এরকম কোন কথা আছে? আর এ কথাগুলো আপনারা মানুষের কাছে প্রচারও করে থাকেন। তবে অত্যন্ত আশ্চর্যের সাথে আমি দেখছি। আর আপনাকেও একথাটা বলছি। এ ব্যাপারে আপনারা পবিত্র কুরআনের অর্থ ঠিকভাবে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে পারেননি। এখন কুরআনের এ কথাগুলো আর আপনাদের কথা মানুষতো তাহলে ভুল বুঝবে। এখন আপনি দেখবেন যে পুরো পৃথিবী জুড়েই যেভাবে সব মিডিয়ায় কুরআন আর ইসলাম সম্পর্কে যেসব খারাপ খবর শুনা যায়, এগুলো আগে তেমনটা শুনা যেত না। যেমন- ধরেন কট্টরপন্থী, চরমপন্থী, আতংকবাদী। এটা সব জায়গায়ই। তাহলে আমি কি বুঝব এখানে আপনার কথার মাঝে ভুল আছে, নাকি মানুষ কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করছে, নাকি আমাদের সামনে যে খবর তুলে ধরা হচ্ছে সেটা ভুলভাবে তুলে ধরা হচ্ছে? ইসলামতো সব সময় শান্তির কথা বলে। কিন্তু এখন পৃথিবীর সামনে ইসলামের ইমেজ খুব খারাপ। ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই সুন্দর আর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। আপনি বললেন যে, হিন্দু দর্শনে আপনারা মানেন যে, পুরো পৃথিবীর মানুষ পরিবারের মত। এ পরিবারের সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করবে আর আনন্দ করবে, উপভোগ করবে, এটাই উনার প্রশ্ন। ইসলামেও কি এমন কিছু আছে? উনি বললেন যে, ইসলামেও ঠিক একই রকম কথা আছে। তারপরও তিনি আমাকে প্রশ্নটা করলেন যে, এ কুরআনের কথা সব মানুষের কাছে পৌঁছানো উচিত। এখন মুসলিমরা কি পবিত্র কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করছে, নাকি মানুষজনই পবিত্র কুরআনের কথাকে ভুল বুঝছে? এখন আমরা দেখি মুসলিমদের সবাই বলছে সন্ত্রাসী, মৌলবাদী, চরমপন্থী, এখানে আসলে সমস্যাটা কোথায়? আপনার প্রথম প্রশ্নের সাথে আমি একমত যে হিন্দুধর্মে আছে পুরো পৃথিবীর মানুষ একই পরিবারে থাকবে, তারা সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করবে, ইসলামও এরকমই কথা বলছে শুধু শেষেরটা আলাদা। আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা হুজরাতের ১৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ـ

অর্থ ঃ "হে মানুষজাতি! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি, বিভিন্ন জাতি আর গোত্রে যাতে তোমরা অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার।"

এজন্য না যে, একে অন্যকে ঘৃণা করবে তাহলে কুরআন বলছে যে, পৃথিবীর সব মানুষ তাদের পূর্ব পুরষ তাদের সবার আর আমাদের সবার পুরুষ একজন আদম ও হাওয়া। আল্লাহ তাদের শান্তিতে রাখুন। পরে আল্লাহ তায়ালা আমাদের ভাগ করেছেন বিভিন্ন জাতি আর গোত্রে, রং আলাদা, ভাষা আলাদা, যাতে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারি। আর আল্লাহ তায়ালা যেটা দিয়ে আমাদের বিচার করবেন সেটা আমাদের সম্পদ না, গোত্র না, বর্ণ না, গায়ের রং না, আমাদের লিঙ্গ না সেটা হলো 'তাকওয়া'। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে এ সূরা হুজরাতের ১৩ নম্বর আয়াতে বলেছেন–

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন সেই ব্যক্তি যার তাকওয়া আছে।"

আল্লাহ তায়ালা যে জিনিস দিয়ে সবার বিচার করবেন। ভাই কথা বললে আমার উত্তরটা শুনতে পাবেন না। আপনি আরেকটা প্রশ্ন করবেন? ভাই আমাকে আগে উত্তর দিতে দেন। আপনি এখন আপনার প্রশ্নটা নিয়ে আরেকজনের সাথে কথা বলছেন। এটা আমার পেশা ভাই। আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন আমি এখনো শেষ করিনি। সবে শুরু করেছি, আমি শেষ করলে আপনি বুঝতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ ৯৩। আমি বলছি। আমি ইংরেজি ভাষা বেশি বুঝি না। আমি অনুরোধ করব যে, আপনি তো যথেষ্ট জানেন। আপনার পাশে যদি আর কেউ থাকে যে হিন্দিতে ব্যাখ্যা করে দিবে অথবা উর্দুতে ব্যাখ্যা করবে তাহলে আমার পক্ষে সেটা বুঝা সহজ হবে।

উত্তর ঃ ডা. জাকির ঃ ভাই আপনার বুঝার জন্য হিন্দিতে বলতে পারি। কিন্তু হিন্দিতে যদি আমি উত্তর দেই অন্যদের সাথে অবিচার করা হবে। আপনি তো আপনার প্রশ্নটা হিন্দিতে করেছেন। সেটার তরজমা করে আমি ইংরেজিতে উত্তর দিচ্ছি। যদি বুঝতে না পারেন পরে ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন অথবা পরে অন্য কাউকে বলে দিব তিনি আপনাকে উত্তরটা হিন্দিতে বুঝিয়ে দিবেন। ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে?

তাহলে কি দিয়ে আল্লাহ আমাদের বিচার করবেন? হিন্দু ধর্মে উনি বললেন যে, আমরা জীবন যাপন করব সুখের সাথে, আয় করব, ইসলাম ধর্মেও আমরা সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করব। তবে সেটার ভিত্তি হলো তাকওয়া। যেটা দিয়ে আপনি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারেন সেটা তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা আল্লাহকে মেনে চলা। সম্পদ না, লিঙ্গ না, গোত্র না, বর্ণ না। আপনি প্রশ্ন করেছেন যে কুরআন এত ভালো কথা বলে তাহলে এখানে কুরআনের ব্যাখ্যায় কি সমস্যা হচ্ছে, মুসলিমরা কি ভুল ব্যাখ্যা করছে নাকি আমরাই কুরআনের কথা ভুল বুঝছি? এজন্যই আমরা

এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। ইসলাম কি মানুষ জাতির জন্য সমাধান? সমস্যা হলো মিডিয়া এভাবে তুলে ধরছে ইসলামকে। আমরা মুসলিমরা দোষটা আমাদের। আমি আপনার সাথে একমত। আমরা মিডিয়ার ব্যাপারে পারদর্শী নই। দোষটা আসলে মুসলিমদেরই। আর এটা প্রত্যেক মুসলিমেরই দায়িত্ব সে ইসলাম ধর্ম প্রচার করবে, কুরআনের কথাগুলো প্রচার করবে পুরো মানুষ জাতির জন্য। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি, চেষ্টা করছি, যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এখন সাধারণ মানুষকে জানানোর ভালো উপায়। এখানে দেখেন কত মানুষ, হাজার হাজার মানুষ আজ এ অনুষ্ঠানে। আমি জানি না কত জন, তবে আমাদের এ সংখ্যাটা অনেক কম। এক লাখ মানুষ সেটাও আমার জন্য অনেক কম।

আমার দরকার লক্ষ লক্ষ দর্শক। সেজন্য স্যাটেলাইট চ্যানেলে সরাসরি অনুষ্ঠান করি, সেখানে দর্শক প্রায় ৬ কোটি। এক লাখ বা দুই লাখ মানুষতো নসিব। আমি আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সাক্ষ্য দিতে পারি মানুষের কাছে ইসলামের বাণী আমি পৌঁছে দিয়েছি। আর ৬ কোটি হলো মাত্র ১%। এটা আসলে কম। পৃথিবীর জনসংখ্যার ১%। মোট জনসংখ্যা ৬০০ কোটি। যেটা করতে হবে আমাদের মুসলিমকে এখন মিডিয়ার সামনে আসতে হবে। আরো চ্যানেল খুলতে হবে, প্রচারের পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে। আর আমি আপনার সাথে একমত মানুষের মধ্যে কিছু ভুল ধারণা আছে। আর সেজন্যই আপনি যেমন বললেন মুসলিমদের এখন বলা হচ্ছে চরমপন্থী বলা হচ্ছে মৌলবাদী, সন্ত্রাসী। আর আমার লেকচারটাও এটা নিয়েই যে কি উত্তর দিবেন যদি কেউ আপনাকে বলে আপনি চরমপন্থী, আপনি সন্ত্রাসী, আপনি মৌলবাদী? আশা করি এ লেকচারটা শেষ হওয়ার পরে আপনি হিন্দিতে উত্তরটা পাবেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৯৪। হ্যাঁ গুরু। আমার নাম বিলাস কারাত। আমি নায়ার মেডিকেল হসপিটালের ছাত্র। আমার মতে আমরা খুবই ভাগ্যবান যে মানুষ হিসাবে জন্মাতে পেরেছি। প্রাণী হিসাবে আমরা আলাদা। লক্ষ লক্ষ বছর বিবর্তনের মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়েছে। তাই আপনার মতে আমাদের এ মূল্যবান জীবন কোন কাজে লাগানো উচিত। মানে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা কি? আমাদের এ জীবনের আসল উদ্দেশ্যটাই কি হওয়া উচিত? এছাড়া আমরা তরুন, তাহলে কোন কাজটা করা উচিত?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই বললেন আপনি নায়ার মেডিকেল হসপিটালের একজন ছাত্র। আপনাকে বলি আমিও নায়ার হসপিটাল থেকে পাস করেছি ১৯৯১ সালে। আনুমানিক ১৮ বছর আগে। ভাই প্রশ্ন করলেন যে, আমরা এ মানুষের জীবন পেয়েছি। এখন এ জীবনটাকে কিভাবে কাজে লাগাবো। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন সূরা যারিয়াতের ৫৬ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, "আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য" ইবাদত মানে তাঁকে

মেনে চলা। তাই পৃথিবীতে আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশগুলো মেনে চলা। যাতে শান্তিতে থাকতে পারি ইহকালে এবং পরকালে। মানুষ জাতির যিনি স্রষ্টা তিনিই এ প্রশ্নটার সঠিক উত্তর দিতে পারবেন। পবিত্র কুরআনে সূরা মূলকের ২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, "আল্লাহ্ তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু এবং জীবন"পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম?" পৃথিবীতে আমাদের এ জীবন এটা পরকালের জন্য পরীক্ষা। আমরা সবাই পরীক্ষা দিচ্ছি। আর আপনি যদি আল্লাহ্ তায়ালার আদেশগুলো মানেন এবং তাঁর কথামত যদি জীবনযাপন করেন, আর শান্তি বজায় রাখেন, আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করেন তাহলে আপনি ইহকালেও সফল হবেন পরকালেও সফল হবেন।"

আপনি বলেছেন তরুন হলে কি করবেন? আপনারা এ কুরআন পড়বেন। পবিত্র কুরআন পড়েন, পবিত্র কুরআনের কথাগুলো নিজের জীবনে প্রয়োগ করেন। যদি আপনারা বেদ পড়েন তাহলে বেদেও দেখবেন যে বলা হয়েছে এক ঈশ্বরের কথা, মূর্তিপূজা চলবে না। পবিত্র বেদ বলছে ভবিষ্যতে একজন ঋষি আসবেন, ভবিষ্যতে কলকি অবতার আসবেন, সবাইকে ভালো কথা বলবেন। এ কলকি অবতার হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ। এ কুরআন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানী কিতাব। নাযিল হয়েছে শেষ ও চূড়ান্ত নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর। এ কুরআন পড়েন, মেনে চলেন তাহলে শান্তিতে থাকতে পারবেন ইহকালে আর পরকালেও শান্তিতে থাকতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ ৯৫। আমার নাম আরেথী। আমি একজন অমুসলিম। আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা হলো, তার আগে আমি আপনাকে এ জ্ঞানপর্ব অনুষ্ঠানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আজকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি। আপনার লেকচার শুনেছি। আমি যতখানি বুঝেছি আর ইসলাম এমনটা ধর্ম যেটা বিশ্বাস করে শান্তি, সাম্যবাদ এবং বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদী চিন্তায়। একটা যদি হয়ে থাকে তাহলে ইসলাম কিভাবে আল্লাহর ধারণায় বিশ্বাস করে অথবা ইসলাম কিভাবে বেহেশত বা দোযখে বিশ্বাস করে? যদি সেটা যুক্তিবাদী হয়।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনার এটা ভালো লেগেছে যে ইসলাম একটা শান্তির ধর্ম, এটা একটা বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম, যুক্তির ধর্ম। তারপর বললেন যদি ইসলাম যুক্তির ধর্ম হয়ে থাকে তাহলে ধর্মটা কিভাবে বিশ্বাস করে ঈশ্বরে, কিভাবে বিশ্বাস করে বেহেশত আর দোযখে। বোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারবেন বিজ্ঞানের মাধ্যমেই। যদি কোন নাস্তিককে প্রমাণ দেখাতে চাই, কুরআনের সত্যতা যদি প্রমাণ করতে চাই তাহলে বিজ্ঞানের সাহায্য নিব। বর্তমানে এটা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায়। আগেকার দিনে এটা ছিল অলৌকিক কাজ ও সাহিত্য আর কবিতার যুগ। প্রত্যেক যুগেই কুরআন হলো অলৌকিকের ও অলৌকিক। কুরআন সব

সময়ের জন্য অলৌকিক। এ কারণে বলছি, আমার কথা শুনলেই বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে যদি সে নিরপেক্ষ হয় তাহলে সে মানতে বাধ্য হবে যে কুরআন হল আল্লাহর বাণী। যদি সে বিজ্ঞান বিশ্বাস না করে, যদি সে নিরপেক্ষ না হয়, যদি বুঝতে না চায় তাহলে সম্ভাবনা বেশি যে, সে পবিত্র কুরআন বিশ্বাস করে না। সেজন্য আমি বলেছি যে আজকের বিজ্ঞান ঈশ্বরকে বাতিল করছে না, ঈশ্বরের কিছু ধারণাকে বাতিল করছে। আপনি যদি বিজ্ঞানের কথা বলেন, ঈশ্বরের কথা যদি বলেন, বেশির ভাগ বিজ্ঞানী ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এখন।

আগেকার দিনে Francies Drake-এর মতে তিনি বলেছেন যে, বিজ্ঞান সম্পর্কে অল্প জ্ঞান থাকলে আপনি হবেন নাস্তিক; তবে বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক জ্ঞান থাকলে আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করবেন। এরপর বেহেশত আর দোযখ নিয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেই। আপনি কুরআন পড়লে দেখবেন কুরআনে বিজ্ঞান সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, আনুমানিকভাবে বলতে পারেন যে বিজ্ঞান সম্পর্কে এসব কথার ৮০% একেবারে ১০০% সঠিক হয়েছে। বিশ্বজগৎ কিভাবে সৃষ্টি হলো, পৃথিবীর আকার কেমন, চাঁদের আলোর কথা, সূর্য তাঁর নিজের চারপাশে ঘুরে, পানিচক্র, ভূগোল ইত্যাদি। বিজ্ঞান সম্পর্কে কুরআনের এসব কথার ৮০% একেবারে ১০০% সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কুরআনের বাকি ২০% সেটা এখনো প্রমাণিত হয়নি, সঠিক না ভুল। আমার যুক্তি বলে যখন ৮০% সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কুরআনের বাকি ২০% সেটা এখনো প্রমাণিত হয়নি সঠিকও না, ভুলও না। আমার যুক্তি বলে যখন ৮০% একেবারে পুরোপুরি সঠিক আর বাকি ২০% সঠিকও না ভুলও না। এ ২০% এ পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টও ভুল প্রমাণিত হয়নি। আমার যুক্তি বলে যে ইনশাআল্লাহ আল্লাহর ইচ্ছা বাকি ২০%-ও সঠিক হবে। তাহলে বেহেশত আর দোযখ।

ফেরেশতা, জ্বিন, বিজ্ঞান এখনও ততটা উন্নত হয়নি, বিজ্ঞান হয়ত এতটা উন্নত হয়েছে যে, কুরআনের ৮০% বৈজ্ঞানিক কথাগুলো যাচাই করে দেখতে পারবে আর আগামী ৫০ বছর অথবা ১০০ বছর বা ২০০ বছর পরে বিজ্ঞান হয়তবা বেহেশত নিয়ে কথা বলবে। দোযখ নিয়ে কথা বলবে, জ্বিন নিয়ে কথা বলবে। আমার বিচার বুদ্ধি বলে এটা কোন অযৌক্তিক বিশ্বাস না, বিশ্বাস হলো যুক্তিসঙ্গত। যখন ৮০% পুরোপুরি সঠিক বলে প্রমাণিত বাকি ২০% এর পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টও ভুল বলে প্রমাণিত হয়নি। কোন বিজ্ঞানই প্রমাণ করতে পারবে না যে, বেহেশত বলে কিছুই নেই, দোযখ বলে কিছু নেই। বিজ্ঞান এটাও প্রমাণ করতে পারবে না যে, এগুলো বলতে কিছু নেই শুধু বলতে পারবে আমি জানি না, থাকতেও পারে, আবার না থাকতেও পারে, এটা প্রমাণিত হয়নি। আমার যুক্তি বলে এ ২০% এখনো ভুল বা সঠিক প্রমাণিত হয়নি। বাকি ৮০% পুরোপুরি সঠিক হওয়ার কারণে একজন বিজ্ঞানসম্মত মানুষ হিসাবে একজন যুক্তিবাদী মানুষ হিসাবে আমি বলব

ইনশাআল্লাহ আল্লাহর ইচ্ছায় বাকি ২০%-ও সঠিক হবে। সেজন্য আমি বিশ্বাস করি দোযখে, বিশ্বাস করি বেহেশতে। এছাড়াও আমি ফেরেশতা ও জ্বিন বিশ্বাস করি। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

আমার কিছু ব্যাপার পরিষ্কার করা প্রয়োজন, কিছু ব্যাপারে জানা দরকার।

প্রশ্ন ঃ ৯৬। হ্যাঁ স্যার। আপনি এখন বললেন যে বিজ্ঞানও আল্লাহর ধারণাই বিশ্বাস করে, ইসলামও সেটাই বিশ্বাস করে। সেখানে এসব ব্যাপার নিয়ে কি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে? আল্লাহ আর বেহেশত দোযখ সম্পর্কে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনি আমার পুরো লেকচার শুনেছেন? মহিলা– হ্যাঁ। আপনি কি আমার গত লেকচারটা শুনেছেন 'ইজ দ্যা কুরআন গডস ওয়ার্ড?' মহিলা- না স্যার। আজকেই প্রথম এসেছি। আচ্ছা। এখানে আমি পনের মিনিট সেই কথাগুলো বলেছি যেটা আসলে দুই ঘণ্টার লেকচার। আপনাকে আমি অনুরোধ করব আপনি আমার ভিডিও ক্যাসেটা জোগাড় করেন 'ইজ দ্যা কুরআন গডস ওয়ার্ড?' সেখানে প্রমাণ করেছি যে কুরআন আল্লাহর বাণী। নাস্তিকের সামনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সেখানে প্রমাণ করেছি। সেই কথাগুলো এখানে সংক্ষেপে বলেছি আমি। সেখানে আমি প্রমাণ করেছি যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। যদি স্রষ্টা বলে কেউ না থাকত তাহলে কুরআন কে লিখেছে? ১৪শ বছর আগে এ কুরআন কে লিখেন।

প্রশ্ন ঃ ৯৭। Good evening sir. আমার নাম সুভাস কামরে। আমি ক্যামেস্ট্রি বিভাগের লেকচারার থানা কলেজের। আপনার লেকচারের শুরুতেই আপনি বললেন যে, কুরআন মানুষ জাতির জন্য শান্তির কথা বলে। আর আমার প্রশ্নটা হলো ইসলাম যদি শান্তির কথা বলে তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তরুণ সব মুসলিম সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে কেন? এসব করেছে জিহাদের নামে। এ জিহাদ বিষয়টা আসলে কি? ধন্যবাদ স্যার।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে, ইসলাম আর কুরআন যদি শান্তির কথা বলে মানুষের জন্য তাহলে বিভিন্ন দেশে কেন তরুণ মুসলমানরা আর বিভিন্ন বয়সের মুসলিমরা যুদ্ধ করছে। আর জিহাদের কথা বলছে। এই জিহাদ কথার অর্থ কি।

এ জিহাদ কথাটার যদি অর্থটা জানতে চান। জিহাদ এসেছে আরবি শব্দ জাহাদা থেকে। যার অর্থ চেষ্টা করা, এর অর্থ সংগ্রাম করা। তাহলে জিহাদ শব্দটার অর্থ চেষ্টা আর সংগ্রাম করা। জিহাদের অর্থ পবিত্র যুদ্ধ না। পবিত্র যুদ্ধ এটার আরবি শব্দ হচ্ছে হারবুন মুকাদ্দাসা। পবিত্র কুরআনের কোথাও হারবুন মুকাদ্দাসা পাবেন না আর হাদীসেও লেখা নেই। এটা একটা ভুল অনুবাদ যেটা করেছে মিডিয়া,

পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা। পবিত্র যুদ্ধ শব্দটা নেই। জিহাদের অর্থ পবিত্র যুদ্ধ না। জিহাদ অর্থ চেষ্টা আর সংগ্রাম করা। এরপরে ইসলামিক পরিভাষায় এর অর্থ চেষ্টা আর সংগ্রাম করা মানুষ জাতির উন্নতির জন্য, এর অর্থ চেষ্টা আর সংগ্রাম করা পৃথিবীর মানুষের শান্তির জন্য। আরেকটা অর্থ আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে চেষ্টা আর সংগ্রাম করা। আরেকটা অর্থ অত্যাচারের বিরুদ্ধে চেষ্টা আর সংগ্রাম করা।

জিহাদের অর্থ হচ্ছে চেষ্টা আর সংগ্রাম করা। এভাবে আপনার প্রশ্নটাতে আমি যাই যে, তাহলে এসব তরুণ মুসলিমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ করছে। এক নম্বর পয়েন্ট এমন সম্ভাবনা আছে। আর কথাটা সত্যি যে, কিছু মুসলিম আছে যারা আসলে বিপথগামী। তারা বিপথে চলে গেছে। তারা বলে যে, ইসলামে যুদ্ধের অনুমতি আছে, প্রসঙ্গ ছাড়াই উদ্ধৃতি দেয়। তবে এদের সংখ্যা খুবই কম। আমার মতে প্রধান কারণটা হল মিডিয়াও আমাদের এভাবে দেখাচ্ছে। যেমন– ইন্ডিয়ায় খবরের কাগজগুলোতে আমরা প্রায়ই দেখি যে, কাশ্মীরের মুসলিম সন্ত্রাসীরা অনেক মানুষ মেরেছে হেড লাইন। প্রত্যেক দিন দেখবেন আমি কাশ্মীরে প্রথম গিয়েছিলাম ২০০৩ সালে। তখন ভাবছিলাম আমি যাব কি যাব না, ওখানে অনেক গোলযোগ।

প্রথম বারের মত কাশ্মীরে ১৪ বছর পরে কাশ্মীরের সরকার কোন পাবলিক লেকচারের অনুমতি দিল। সেই লেকচারে অনেক মানুষ ছিল প্রায় এক লক্ষ মানুষ। সেখানে পলো গ্রাউন্ডে সেটা ছিল শ্রীনগরে। আর যখন সেখানে গেলাম দেখলাম চারপাশে বন্দুক নিয়ে দেহরক্ষী। ভাবলাম এটা আবার কি? তবে সেখানে কোন সমস্যা হয়নি। পরের বছর আসামে গেলাম। যখন এয়ারপোর্টে নামলাম। বন্দুক হাতে চার দেহরক্ষী আসল। বললাম এটা আবার কি? অবস্থা ভাল না এ আসামে। কেন? কি হয়েছে? সেখানে দেহরক্ষী না থাকলে আজ আমি এখানে থাকতাম না। কিন্তু খবরের কাগজে আমরা কি দেখি যে, আসামে হত্যা আর অরাজকতা চলছে? কাশ্মীরের চাইতে আসামে অনেক বেশি মানুষ মারা গেছে। এলটিটিই এর ব্যাপারে কি বলে? এলটিটিই চিনেন? তামিল। তাদের বলা হয় তামিল টাইগার। কিন্তু তাদের সন্ত্রাসী বলা হয় না। কিন্তু কেন? যখন কাশ্মীরের মুসলিমরা করে তখন তারা বলে মুসলিম সন্ত্রাসী, যখন আসামের হিন্দুরা করে তখন সেটা স্থানীয় সমস্যা, যদি এলটিটিই করে তাহলে স্থানীয় সমস্যা।

ইন্ডিয়ার অবস্থা জানেন এমন কাউকে জিজ্ঞেস করেন সে আপনাকে বলবে বেশির ভাগ হত্যা সেটা করেছে মাউহিস্ত্রিরা। এদের কথা কাগজে কতবার দেখি আমরা। এদের খবরটা হয়ত আসবে ছোট করে যে, এতজন লোক আসামে মারা গেছে, ছোট করে। মুসলিমরা যদি করে হেডলাইন। কেন? সব জায়গাতে কিছু কুলাঙ্গার থাকে। একবার একজন আমাকে বলেছিল, কাশ্মীরের ব্যাপারটা এটা আসলে আমাদের দেশের জন্য সমস্যা। আসাম কি দেশের জন্য সমস্যা না? শুধু কাশ্মীরই

কি দেশের জন্য সমস্যা? দুই জায়গাতেই স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছে। আর নিরীহ কাশ্মীরীরা নাজেহাল হচ্ছে। সব জায়গায় তারা অপদস্ত হচ্ছে। যদি আফগানিস্তানে যান সেখানে আপনি কি দেখবেন? আমেরিকানরা সেখানে গেল আর তাদের বলা হল, সন্ত্রাসী তারপর আপনি দেখেন প্যালেস্টাইন।

ইহুদিরা হিটলার তাদেরকে বের করে দিয়েছিল, জার্মানি থেকে তাড়িয়ে দিল। প্যালেস্টানিরা আরব জ্ঞাতি ভাইয়েরা তারা বলল আহলান ওয়া সাহলান, "আমাদের ঘরে আপনাদের স্বাগতম"। চিন্তা করুন একজন লোকের ঘর নেই, মাথায় ছাদ নেই, আপনি তাকে আপনার ঘরে নিয়ে আসলেন, কয়েকদিন পর সে আপনাকে তাড়িয়ে দিল। আপনি দরজায় দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন ও আমার ঘর কেড়ে নিয়েছে, আমার ঘর ফিরিয়ে দাও তখন আপনি সন্ত্রাসী। এটা কি? দেখতেই পাচ্ছেন এ হলো মিডিয়া। এটা মিডিয়া। তাহলে দেখবেন বসনিয়াদের কি হয়েছিল। মুসলিমদের হত্যা করা হলো। আমি আপনার সাথে একমত মুসলিমরা সেখানে যুদ্ধ করছিল, কিন্তু তাদের ওপর অবিচার হয়েছে। মানবতা বলে কিছু নেই। প্যালেস্টাইনের ঘটনার কি উত্তর দিবেন? অথবা ধরেন ইরাক তাদের নাকি রাসায়নিক অস্ত্র আছে। আমি সাদ্দাম হোসেনের পক্ষে বলছি না আমি তাকে ভালো মুসলিম মনে করি না। তবে সাদ্দামের সময় ইরাকে কিছু সমস্যা ছিল, আমেরিকানরা আসার পরে সেগুলো অনেক গুণ বেড়ে গেছে? সেই রাসায়নিক অস্ত্র কোথায় গেল? যেহেতু জর্জ বুশ বলেছে যাও আক্রমণ কর, তাই আক্রমণ। যে লোকটা মানুষের মৃত্যুর জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী সে হল জর্জ বুশ। এক নাম্বার সন্ত্রাসী হল জর্জ বুশ।

তাহলে আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এটা মিডিয়ার খেলা। মুসলিমদের অপদস্ত করা হচ্ছে অত্যাচার করা হচ্ছে তাদেরকে বলছেন সন্ত্রাসী। আমি সেজন্যই বলছি, মুসলিমদের মধ্যেও কিছু কুলাঙ্গার আছে। তবে কুলাঙ্গারের সংখ্যা অনেক কম। পুরোটাই মিডিয়ার কারসাজি। IRP এর নাম শুনছেন আইরিশ রিপাবলিকান পার্টি ইংল্যান্ডে। এটা আসলে ক্যাথলিক আর Protestain দের ভেতরে লড়াই। তাদের কেউ ক্যাথলিক সন্ত্রাসী বলে না। কেন? একশ বছরেরও বেশি।

তবে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার মুসলিম সন্ত্রাসীদেরকে বেশি ভয় করছেন। IRP নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন চিন্তা নেই যারা এখন পর্যন্ত অনেক মানুষ মেরেছে, অনেক বোমা ফাটিয়েছে। কিন্তু এরা দরজা বন্ধ করে মিটিং করে কিভাবে মুসলিম সন্ত্রাসীদেরকে থামাবো? ব্যাপারটা খুবই কমন। কোন রাজনীতিবিদের ভোটের দরকার হলেই নতুন প্রধানমন্ত্রী আসলেন আর তখনই ঘটল গ্লাসকো বন্দী। সাবিল আহমেদকে চিনেন? সাবিল আহমেদের নাম শুনেছেন? খুব ভালো। আমি নাম পেপারে শুনেছি। কখনো দেখিনি। ইন্ডিয়ার পেপারে এসেছিল। এ সাবিল আহমেদ কে? সাবিল আহমেদ হল ডা. জাকির নায়েকের ভক্ত। আর ব্যাঙালোরে ডা.

জাকিরের লেকচারের অর্গানাইজার ছিল। পুরো আর্টিকেলটাই সন্ত্রাসের ওপর। তারপর সাবিল আহমেদের নাম তারপর ডা. জাকির নায়েকের নাম। কেন? কারণ জাকির নায়েক জনপ্রিয়। আর্টিকেলটার গুরুত্ব বেড়ে যাবে। তারপর সেখানে লেখা আছে যদিও ডা. জাকির নায়েক পুরোপুরিভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। এ আর্টিকেলে আমার নামটা জুড়ে দিল।

আপনারা কি লাল মসজিদের ঘটনা জানেন? পাকিস্তানে। সেখানে জাকির নায়েকের চিঠি পাওয়া গেছে। তাহলে তো খুশি হবেন। যখন ইন্ডিয়ান প্রেস বলছে ডা. জাকির নায়েক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, তাহলে তো খুশি হবেন– সাবিল আহমেদের কাছে আমার চিঠি আছে, লাল মসজিদে আমার চিঠি আছে। আমি যদি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে থাকি তাহলে এটাও ভাবেন যে হাজার হাজার মুসলিম সন্ত্রাসী কাজ করছে তারা যেহেতু আমার ভক্ত তারা এগুলো বাদ দিবে। তালেবান ওয়েবসাইটে যান। সেখানে ডা. জাকির নায়েকের নাম আছে। হয়ত দেখবেন আল কায়দা ওয়েবসাইটেও আমার নাম দেয়া আছে। কেউ অসুস্থ হলে সেতো ডাক্তারের কাছে যাবে ঠিক, এটা বলতে পারবেন না শুধু অসুস্থরাই হাসপাতালে যায়। অসুস্থ হলে তো হাসপাতালে যাবেই।

যদি ধরে নেন এরা সবাই সন্ত্রাসী আমার লেকচার শুনে ইন্ডিয়ার সরকারও খুশি হবে। ডা. জাকির নায়েক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলে। তাদের খুশি হওয়া উচিত যে, এ লোকগুলো আমার কথা শুনছে। আমি হয়ত সবাইকে বুঝাতে পারব না। তবে কিছু লোককে তো বুঝাতে পারছি। কিন্তু সেই আর্টিকেলে আমার নামটা লেখে গুরুত্ব পাওয়ার জন্য। আসলে ব্যাপারটা কি যদি ইসলামের বিরুদ্ধে লেখেন আপনার আর্টিকেলটা তাহলে চোখে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। এটা খুবই কমন। খুশবন্ত সিংয়ের একই অবস্থা। খুশবন্ত সিংকে চিনেন? এখনকার বয়স ৯৪। তিনি আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন আর্টিকেল লিখেছেন। কয়েক সপ্তাহ আগে এ নভেম্বরেও আমার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। তিনি বলেছেন প্রথম আর্টিকেলে তিনি লিখেছেন যে, আমি ডা. জাকির নায়েকের প্রোগ্রাম প্রতিদিন মনোযোগ দিয়ে দেখি। তিনি আমার প্রশংসা করলেন, আমার স্মরণ শক্তির কথা বললেন, তারপর তার নিজের স্টাইলে সমালোচনা করলেন।

এরপর আর্টিকেলটা লিখলেন যে, "দিল্লিতে একটা বই মেলা হয়েছিল সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে ডা. জাকির নায়েকের বই। যেখানে অমুসলিমদের করা ২০টা কমন প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে।" এ লোকের স্মরণশক্তি অসাধারণ ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে আমি তার চারটা প্রশ্নের উত্তর দিব। তারপরে বললেন শূকরের মাংস, এলকোহল, বহু বিবাহ আর পর্দা নিয়ে (হিজাব)। সেই আর্টিকেলটা পড়ে দেখেন। এখানে বিস্তারিত বলার মত সময় নেই।

শূকরের ব্যাপারে বলেছি এটা নির্লজ্জ প্রাণী, সত্তরটার বেশি রোগ ছড়ায়। আর শূকর হলো যথেচ্ছা যৌনাচারের একটা প্রতীক। আমি বলেছিলাম শূকরের মাংস খেলে আপনার ব্যবহার শূকরের মত হবে। এ শূকরের মাংস হচ্ছে যথেচ্ছ যৌনাচারের একটা প্রতীক। তিনি বললেন, আমি এটা জানতাম না। তারপর বললেন যে, পশ্চিমা দেশগুলোতে সবাই শূকরের মাংস খায় সেখানেও তো কাউকে অসুস্থ হতে দেখি না। দেখেন ডাক্তাররা আমাদের বলে পতিতালয়ে গেলে এইডস হতে পারে, তবে পতিতালয়ে যারা যায় তাদের সবার এইডস হয় না। পার্সেন্টেস খুবই কম, খুব কম মানুষেরই সেটা হয়। একইভাবে শূকরের মাংস যারা খায় তাদের সবারই এ রোগগুলো হয় না। তবে এখন আমেরিকানদেরও অর্ধেক মানুষ হাইপারটেনশনে ভুগছে। এর একটা কারণ শূকরের মাংস খাওয়া।

তারপর এলকোহল নিয়ে ডা. জাকির নায়েক বলেছেন, এলকোহল খেলে এ রোগগুলো হতে পারে। তিনি বলেন যে, কুরআন আসলে এলকোহলের বিরুদ্ধে না। কুরআন আসলে মাতাল হওয়ার বিরুদ্ধে। এখন তিনিই কুরআনের ব্যাখ্যা করছেন। এ হলো মিডিয়া। তিনি লিখলেন আমার বয়স এখন ৯৪ বছর। আমার জীবনে আমি প্রত্যেক দিনই মদ খেয়েছি। আমি কখনই মাতাল হইনি, কখনও অসুস্থ হয়নি। আর আমি কখনই কোন মানুষকে আহত করিনি। এখন উনার এ কথাগুলো ৯৪ বছর বয়স জীবনে কখনও মাতাল হননি।

আমি এখন অনেকের কথা জানি যারা আমাকে বলেছে যে, মদ খেয়ে অনেকেই আমরা মাতাল হতে দেখেছি। জীবনে কখনও অসুস্থ হননি। হয়ত ভুলে গেছেন ৯৪ বছর বয়স। কখনও কাউকে আহত করেননি আহত করেছেন আমাকে। তাহলে বুঝতেই পারছেন আপনি যদি ইসলামের বিরুদ্ধে আর্টিকেল লেখেন। বিখ্যাত কারো বিরুদ্ধে লেখেন। আর্টিকেলটা গুরুত্ব পাবে। লোকজন খবরটা পড়বে। একইভাবে এটাও দেখেন পৃথিবী জুড়ে মুসলিমদের ইমেজ হলো তারা সন্ত্রাসী। কেউ কেউ হয়ত স্বাধীনতা যুদ্ধ করছে। কিন্তু করেন যদি আপনাকে বলি ব্রিটিশ সরকার বলেছে ভগত সিংহ সন্ত্রাসী। কিন্তু ভগত সিংহ সন্ত্রাসী? আপনার মতে কি সন্ত্রাসী? না। তবে কাজটা সন্ত্রাসীর মত। আমার মতেও তিনি সন্ত্রাসী ছিলেন না। যেহেতু ব্রিটিশ সরকার বলেছে ভগত সিং একজন সন্ত্রাসী। তার মানে এই না যে, সে কথাটাও আমাদের মেনে নিতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে এটা আসলে মিডিয়ার একটা কারসাজি। সে জন্য আজকের লেকচারের Topicটা সে রকম ছিল; যেন শান্তিতে থাকতে পারি। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৯৮। আসসালামু আলাইকুম ডা. নায়েক। আমার নাম নিতা। আমি মিডিয়ায় কাজ করি। আমার প্রশ্নটা হলো পূজার প্রস্বাদ খাওয়া কি মুসলিমদের জন্য হারাম? আর যদি হারাম হয় কেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনি প্রশ্ন করলেন পূজার প্রস্বাদ খাওয়া কি মুসলমানদের জন্য হারাম? প্রস্বাদ এ খাবারটা দেওয়া হয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। হিন্দুরা বিভিন্ন মূর্তির উদ্দেশ্যে প্রস্বাদ দেয়। পবিত্র কুরআনে মোট চার জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে সূরা বাকারার ১৭৩ নম্বর আয়াতে সূরা মায়িদার ৩ নম্বর আয়াতে সূরা আন-আমের ১৪৫ নম্বর আয়াতে। এছাড়াও সূরা নাহলের ১১৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ . وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ .

অর্থ ঃ "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস খাওয়া। আর যে পশু জবাই করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে?"

তাহলে যে পশু জবাই কালে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয় সেটা আমাদের জন্য হারাম। আর এ কারণেই পূজার প্রস্বাদ নিয়ে খাওয়া হারাম ইসলামে। আপনি বেদেও দেখবেন বেদও এ কথাই বলছে। কারণ, বেদ পরিষ্কারভাবেই বলেছে, "নাতাস্তি প্রতিমা আস্তি" "মহান স্রষ্টার কোন প্রতিমূর্তি নেই"। তাঁর কোন ছবি নেই, তাঁর কোন মূর্তি নেই, তাঁর কোন ভাস্কর্য নেই, তাঁর কোন ফটোগ্রাফ নেই, কোন পেইন্টিং নেই, তাই বেদ অনুযায়ী ঈশ্বরকে খাওয়া দেয়া নিষিদ্ধ। তাহলে দেখছেন যে, বেদও এর বিরুদ্ধে কথা বলছে। এটা ভুল। মূর্তির উদ্দেশ্যে খাবার দেয়া ভুল। একইভাবে যেহেতু কুরআন নিষেধ করেছে। মুসলিমদের নিষেধ করেছে নেয়া যাবে না, খাওয়া যাবে না। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৯৯। স্যার, আমি একজন শিখ। মাঝেমধ্যেই গুরু দুয়ারায় যাই। গুরু দুয়ারাতে কোন মূর্তি নেই। মূর্তিপূজা হয় না। গুরু দুয়ারাতেও প্রস্বাদ বিলানো হয়। এটাকে বলে কানা প্রস্বাদ। এ প্রস্বাদও খাওয়া যাবে না। এ রকম করার কারণটা কি?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। বোন আমি আপনাদের গুরুগ্রন্থেরই একজন ছাত্র। আর দেখবেন যে, শিখদের কথা অনুযায়ী ধর্মগ্রন্থ প্রথমে আদি গ্রন্থ, গুরুগ্রন্থ। এখানে ঈশ্বরের একত্ববাদ নিয়েই বলা হয়েছে। সেখানে বলা আছে যে, মহান স্রষ্টার কোন মূর্তি নেই, ছবি নেই। মহান স্রষ্টাকে সেখানে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে। রাহীম, কারীম, আল্লাহ অনেক নামেই। এখানে আমাদের মিল আছে। তবে দূর্ভাগ্যজনকভাবে যখন গুরু দুয়ারায় যাবেন। যদিও শিখরা এমন কোন স্রষ্টাকে বিশ্বাস করে না, যার কোন ছবি আছে। তারপরও

তারা উপাসনা করে গ্রন্থকে মনে করে গুরু। কারণ, গুরু এখন নেই আর সেখানে যে প্রস্বাদ দিচ্ছেন সেটা পরোক্ষভাবে একই জিনিস। শিখধর্ম গ্রন্থ বলছে মূর্তিপূজা করা নিষেধ। এখানে তারা পরোক্ষভাবে খাবারগুলো স্রষ্টাকে দিচ্ছে। আর এমনকি গুরুগ্রন্থ বলছে- স্রষ্টার খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তাহলে আপনারা স্রষ্টার সামনে কেন খাবার দিচ্ছেন। পবিত্র কুরআনে সূরা আনআমের ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ -

অর্থ ঃ "আল্লাহ সবাইকে খাওয়ান, কিন্তু তাঁর খাওয়ার প্রয়োজন হয় না।"

তাহলে স্রষ্টাকে খাবারগুলো কেন দিচ্ছেন? তাহলে বোন আপনারা আদিগ্রন্থ মেনে চলছেন না, আপনারা গুরুগ্রন্থও মেনে চলছেন না। মহান স্রষ্টার কোন খাবারের প্রয়োজন হয় না। তিনি কোন খাবার ছাড়াই টিকে থাকবেন। তিনি সবাইকে খাবার জোগাড় দেন। আশাকরি উত্তরটা পেয়েছেন।

উপস্থাপক ঃ আমি দর্শকদের আরো কিছুক্ষণ ধরে বসে থাকতে বলব। কারণ মঞ্চে আসছেন আমন্ত্রিত অতিথিরা যারা এসেছেন আমেরিকা-কানাডা আরো বিভিন্ন দেশ থেকে। আমরা সবাই তাদের একটু এক নজর দেখতে চাই। তাই আমি অতিথিদের অনুরোধ করব ইয়াসির কাসাদা, শেখ জাফর ইদ্রিস দয়া করে আপনারা মঞ্চে উঠে আসুন। দর্শক শ্রোতারা আপনাদের দেখবেন। এসব বিখ্যাত বক্তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন। তারা ডা. জাকির নায়েকের চাইতে অনেক বিখ্যাত। এই কয়দিন তাঁরা এখানেই ছিলেন। অনেক দর্শকই হয়ত তখন তাদেরকে দেখেননি। তাই ভক্তদের অনুরোধ করছি। আমি দর্শকদের অনুরোধ করব একটু ধৈর্য ধরে বসেন। আমরা এখনি অনুষ্ঠান শেষ করব।

মঞ্চে আসছেন ডা. বেলাল ফিলিপস্, ইয়াসির ফাজাগা। শেখ জাফর ইদ্রিস, ডা. ওসমান সিদ্দিকী আলি ক্বারী, ক্বারী শেহেরজা এবং ডা. মামদু মুহাম্মদ, আসুন মুম্বাইয়ের পক্ষ থেকে আমরা এ বিখ্যাত বক্তাদের অভিনন্দন জানাই। আল্লাহু আকবার।

জাযা কুমুল্লাহ খায়ের। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। গত দশ দিন ধরে এসব বক্তাগণ আমাদের এখানে বিভিন্ন লেকচার দিয়েছেন প্রতিদিন। আমাদের এখানে তাদেরকে পেয়ে আমরা আসলেই গর্বিত। তাদের সাথে আমাদের সময়টা আমরা সবাই উপভোগ করছি। আমরা এ এগজিবিশন আর কনফারেন্সে ইসলাম ধর্মের কথাগুলো সবার কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছি। আর ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণাগুলো দূর করে দেয়ার চেষ্টা করেছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আমরা।

এখন ডা. জাকির নায়েককে অনুরোধ করব আমাদের পক্ষ থেকে এ অতিথিদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য। ডা. জাকির এবার অনুষ্ঠান শেষ করবেন।

ডাক্তার জাকির নায়েক ঃ প্রথমেই আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই যে, আমরা এ দশদিনে ইসলামিক কনফারেন্সটা সফলভাবে শেষ করতে পেরেছি। আল্লাহ্ সাহায্য করেছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এরপর আমি ধন্যবাদ জানাব বিজ্ঞ বক্তা আর বিশেষজ্ঞদের, যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে, যেমন– আমেরিকা, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, তারপর মালয়েশিয়া, এরকম বিভিন্ন দেশ থেকে। তারা না থাকলে অনুষ্ঠানটার আয়োজন করা সম্ভব হত না। আর যদিও তাঁরা খুবই ব্যস্ত মাশাআল্লাহ। অনেকেই পুরো দশদিনই ছিলেন। আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আর ইনশাআল্লাহ আল্লাহ্ তাদের রহমত করছেন। দোয়া করি আল্লাহ তাদের জান্নাতে পাঠান। আর অন্যান্য সবার পাশাপাশি আমি ধন্যবাদ জানাব এখানে উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের। এছাড়াও মুম্বাইয়ের মানুষদের ধন্যবাদ জানাই। ইন্ডিয়ার মানুষদের ধন্যবাদ, যারা আজকের এ অনুষ্ঠানে এসেছেন। ধৈর্য ধরে লেকচার শুনলেন। শান্তির ধর্মের কথা শুনলেন। সবাইকে ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ঃ ১০০। আমার নাম জেরি থমাস। আমি ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটিতে সাংবাদিকতার ওপর রিসার্চ করছি। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা ওয়েব সাইট খুলেছি তার নাম Shakkitime. com. আপনার কাছে আমার প্রশ্ন– আমি সব সময় জানতাম যে, হাদীস ছাড়া কোরআন অসম্পূর্ণ। এখন আপনি অন্য ধর্ম গ্রন্থের কথাও বললেন। আপনি বাইবেলের কথাও বললেন। কিন্তু বাইবেল বলছে– যে যিশু খ্রিস্ট বিশ্বাস করে না সে খ্রিস্টবিরোধীদের শামিল হয়। এটা একটা ভবিষ্যৎবাণী। আমি এমনও শুনেছি যে, হাদীস বলছে মুহাম্মদ যাদুবিদ্যার সাহায্য নিয়েছিল। এখানে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ ভাই, আপনি প্রশ্ন করলেন আর বেশ কিছু মন্তব্যও করলেন। আপনি বললেন যে, আপনি জানেন হাদীস ছাড়া কোরআন অসম্পূর্ণ। এখানে আপনি অন্য ধর্মগ্রন্থের কথাও শুনলেন। তার মানে ওনার কথা হলো বাইবেলের উদ্ধৃতি দিলে সে কথা মানতে হবে। আর বাইবেল বলছে, যিশু বা ঈসা (আ)-কে যে বিশ্বাস করবে না সে দোজখে যাবে। এখানে আমার মন্তব্য কি? প্রথমত, হাদীস ছাড়া কোরআন অসম্পূর্ণ নয়। কোরআন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ। তবে কোরআনের কথাগুলো বুঝতে হলে এর ব্যাখ্যাগুলো পড়ে দেখতে হবে। আর হাদীস হলো পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা। যে কথাগুলো বলে গিয়েছেন নবীজি ﷺ। পবিত্র কোরআন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ। তবে যদি আপনি কথাগুলো ভালোভাবে বুঝতে চান, আপনি পড়বেন যে কথাগুলো বলে গেছেন মুহাম্মদ ﷺ অর্থাৎ আমরা যেগুলোকে বলি সহীহ হাদীস। একটা কথা বলি, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছি তার মানে এটা না যে, আমি মানি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোও আল্লাহর বাণী। প্লিজ

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি এখানে কোরআনের কথামত কাজ করেছি। সূরা আলে–ইমরানের ৬৪নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ .

অর্থ : "এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক।"

আমি সাদৃশ্যের কথা বলছি। সূরা রাদের ৩৮নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, "প্রত্যেক যুগেই আমি কিতাব নাজিল করেছি।" আল্লাহ তায়ালা অনেক কিতাব নাযিল করেছেন। পবিত্র কোরআনে চারটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এবং কোরআন। তাওরাত মূসা (আ)-এর ওপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাব। দাউদ (আ)-এর ওপর নাযিল হয়েছে যাবুর, ইঞ্জিল নাযিল হয়েছে ঈসা (আ)-এর ওপর আর কোরআন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানী কিতাব কোরআন নাযিল হয়েছে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর।

আগের সব আসমানী কিতাবই এসেছিল নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ওপর। আর সেই কিতাবের নির্দেশগুলো ছিলো একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। তাই আল্লাহ তায়ালা চাননি যে, এ কিতাবগুলো অবিকৃত অবস্থায় থাকুক। কোরআন হলো সর্বশেষ আসমানী কিতাব। সূরা হিজরের ৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ .

অর্থ : "আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই সংরক্ষণ করে রাখবো।"

কোরআন হল একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ যেটা এখনো অবিকৃত অবস্থায় আছে। শুধু আমি বলছি না। ধর্মের ওপর যত বিশেষজ্ঞ আছেন সবাই বলছেন। তাদের একজন উইলিয়াম মুর। তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করতেন। তিনি একজন খ্রিস্টান ছিলেন। ২০০ বছর আগে তিনি বলেছেন, আর কোন ধর্মীয় গ্রন্থ নেই যেটা এখনো অবিকৃত অবস্থায় আছে ১২০০ বছরের বেশি সময় ধরে। একজন খ্রিস্টান এবং ইসলামের তীব্র সমালোচক হয়েও তিনি সত্য কথাটা স্বীকার করেছেন। অন্য সব ধর্মগ্রন্থের কথাগুলো বদলে গেছে। এমনকি বাইবেলও। আমি বাইবেলকে আল্লাহর বাণী বলে মানি না। আমরা মুসলিমরা সেই কিতাবে বিশ্বাস করি যেটা দেয়া হয়েছিল ঈসা (আ)-কে। আর সেটা হলো ইঞ্জিল। এখন আমরা যেই বাইবেল দেখি সেটা একটা মিশ্রণ। এখানে আল্লাহর বাণী থাকতে পারে। কোরআনের সাথে মিললে আমিও আপত্তি না করে মেনে নেবো এটা আল্লাহর বাণী। এছাড়াও নবীগণের বলা কথা আছে এখানে, ঐতিহাসিকদের বলা কথাও আছে। দুঃখের সাথে জানাচ্ছি বাইবেলে পর্নোগ্রাফিও আছে। আমি উদ্ধৃতি দিতে পারবো না। বাইবেলে আছে অনেক পরস্পর বিরোধী কথা। বৈজ্ঞানিক ভুল, গাণিতিক ভুল। সেগুলোর কথা এখানে বলছি না। আমি বিতর্ক করেছিলাম ড.

উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের সাথে। ইনি ইসলামের বিরুদ্ধে একটা বই লিখেছেন। তার নাম– "কোরআন, বাইবেল ইন দি লাইট অব হিস্ট্রি এন্ড সাইন্স।" তিনি বলেছিলেন, তোমাদের একটা বৈজ্ঞানিক ভুল আছে। আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম সেখানে আমরা বিতর্ক করেছিলাম ২০০১ সালের এপ্রিলে আর টপিক ছিল 'কোরআন, বাইবেল ইন দি লাইট অব হিস্ট্রি এন্ড সাইন্স।' আমি তার সব অভিযোগের উত্তর দিয়েছিলাম। তারপর আমি যখন বাইবেলের ৩৮টা ভুলের কথা বললাম। তিনি সেগুলোর উত্তর দিতে পারেননি। সূরা বাক্বারার ৭৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, দুর্ভোগ তাদের যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে আর বলে এটা আল্লাহর ওহী। উচ্চমূল্য পাওয়ার জন্য তারা এ কথা বলে, যা লিখেছে সে জন্য শাস্তি তাদের এবং যা উপার্জন করেছে সেজন্যও শাস্তি তাদের। তাই বর্তমানের বাইবেল, হয়ত জানেন এ বাইবেল শব্দটা বাইবেলের মধ্যে কোথাও নেই। এটা এসেছে গ্রিক শব্দ "বিবলস" থেকে। অর্থাৎ অনেক বই মিলে একটা বই। আর বিশেষজ্ঞরা এখন বলেন, এ বাইবেল লিখেছে অনেক লেখক। এটা খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞদের মত। তাই বর্তমান বাইবেলকে আমি আল্লাহর বাণী মনে করি না। একইভাবে যদি জিজ্ঞেস করেন, বেদ, বৌদ্ধ বা পারসি ধর্মগ্রন্থগুলোকে আল্লাহর বাণী মনে করি কি না? আমি এখন বলব, হতে পারে আল্লাহর বাণী আবার নাও হতে পারে। আল্লাহ্ অনেক ওহী নাযিল করেছেন অনেক কিতাব নাযিল করেছেন। তাই আমি বলব হতে পারে।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলো, পারসি ধর্মগ্রন্থ হতে পারে এগুলো আল্লাহর বাণী। কিন্তু আসমানী কিতাব হলেও সেগুলো নির্দিষ্ট জাতি আর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এখন আপনি মানবেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব কোরআনকে। তাই কোন মানুষ হোক সে যে কোন দেশের সবাই সর্বশেষ আসমানী কিতাব কোরআন ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে মেনে চলবে।

আমি বলছি না যে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো আল্লাহর বাণী আর হলেও সেগুলো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জাতির জন্য ছিল। হিন্দু বিশেষজ্ঞরা বলেন তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোও পরিবর্তন হয়েছে। একমাত্র ইসলাম ছাড়া সব ধর্মের বিশেষজ্ঞরাই বলেন যে, তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো পরিবর্তন হয়েছে। তারপরও তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই যে সেগুলো আল্লাহর বাণী, তাহলে সে কথাগুলো তাদের অক্ষরে অক্ষরে মানা উচিত। হিন্দুরা যদি বলে তাদের গ্রন্থ আল্লাহর বাণী, বৌদ্ধরা যদি বলে তাদের ধর্মগ্রন্থ আল্লাহর বাণী, খ্রিস্টানরা যদি বলে তাদের ধর্ম গ্রন্থ আল্লাহর বাণী তাহলে সবাইকেই ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর কথা মেনে নিতে হবে। কারণ আপনাদের ওই গ্রন্থগুলোতেই তা বলা আছে। আপনি তো মনে করেন এটা আল্লাহর বাণী, আমি মনে করি এটা হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে।

আপনি মনে করেন সেটা আল্লাহর বাণী, তাহলে আপনি সেটা মেনে চলেন। সর্বশেষ আর চূড়ান্ত নবীকেও আপনি বিশ্বাস করেন। আমি আগেও বলেছি, পবিত্র বাইবেলে গসপেল অব জন-এর ১৬নং অধ্যায়ের ১২-১৪নং অনুচ্ছেদে বলা আছে ঈসা (আ) বলছেন, আমি তোমাদের অনেক কথা বলতে চাই, কিন্তু তোমরা সেটা এখন বুঝবে না। কারণ সত্যের আত্মা তোমাদের কাছে আসবে এবং তোমাদেরকে সত্যের পথে নিয়ে যাবে। সে তার নিজের কথা বলবে না, সে যা শুনবে তাই বলবে। সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা বলবে আর আমাকে মহিমান্বিত করবে। সেটা কে? সে হল হযরত মুহাম্মদ ﷺ। মুহাম্মদ ﷺ ছাড়া আর কোন নবী ঈসা (আ)-কে মহিমান্বিত করেছেন?

আপনি ঠিকই বলেছেন যে, যে ঈসা (আ)-কে অস্বীকার করবে সে নরকে যাবে। আমি আপনার সঙ্গে একমত। সেই মুসলিম আসলে মুসলিম না, যে ঈসা (আ)-কে বিশ্বাস করে না। আমরা এখানে বলি আলাইহিস সালাম আর আপনি বলেন যীশু। আমি যদি ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করি আমাকে আলাইহিস সালাম বলতেই হবে। যদি আমি এ আলাইহিস সালাম না বলি আমাকে বের করে দেয়া হবে। অনভিজ্ঞ লোক এটা বলতে পারে, কিন্তু আমাকে আলাইহিস সালাম বলতেই হবে। তাহলে সেই মুসলিম আসলে মুসলিম না, যে ঈসা (আ)-কে বিশ্বাস করে না। আমরা স্বীকার করি যে, ঈসা (আ) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।

আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি অলৌকিকভাবে জন্মেছিলেন কোন পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই। যেটা অনেক আধুনিক খ্রিস্টানরাই বিশ্বাস করে না। আমরা মানি যে, তিনি আল্লাহর আদেশে মৃত মানুষকে জীবিত করেছিলেন এবং জন্মান্ধ আর কুষ্ঠ রোগীদের সুস্থ করেছিলেন। মুসলিম আর খ্রিস্টানরা এখানে এক। তবে আমি জানি আপনি কি বোঝাচ্ছেন?

আপনি যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করা বলতে তাকে ঈশ্বর হিসেবে বিশ্বাস করা বুঝিয়েছেন, তাই না?

ভাই, আপনি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিলেন। আপনি যেটা বললেন, সেটা গসপেল অব জনের ১৪নং অধ্যায়ের ৬নং অনুচ্ছেদে আছে। আর আপনি বলেছেন– ঈসা (আ) বলেছেন যে তিনি ছিলেন ঈশ্বর। আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে আমি একটা কথা বলে নিই। গোটা বাইবেলের কোথাও এ রকম একটা কথাও বলা নেই যে, ঈসা(আ) বলেছেন আমি ঈশ্বর আর আমার উপাসনা কর। যদি কোন খ্রিস্টান দেখাতে পারে যে, বাইবেলের কোথাও পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে, ঈসা (আ) বলছেন, আমি ঈশ্বর আর আমার উপাসনা কর– তাহলে আমি ডা. জাকির নায়েক আজকেই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করব। আমি অন্য মুসলিম ভাইদের পক্ষে এ কথা বলছি না। আমি আমার মাথাটা তরবারির নিচে রাখছি। আমি বিভিন্ন ধর্মের ওপর একজন ছাত্র। আপনি বাইবেল পড়েছেন আর আমিও পড়েছি। ঈসা (আ)

বলেছেন, সত্যকে খোঁজ, সত্যই তোমাকে মুক্ত করবে। ইনশা-আল্লাহ আজ আপনি সত্য দেখবেন। আমি আবারো বলছি, গোটা বাইবেলের কোথাও নেই যে, ঈসা (আ) বলছেন যে, আমি ঈশ্বর আর আমার উপাসনা কর। আপনারা যদি বাইবেল পড়েন তাহলে দেখবেন, ঈসা (আ) বলছেন, গসপেল অব জন-এর ১৪ নং অধ্যায় ২৮ নং অনুচ্ছেদে আছে, আমার পিতা আমার চাইতেও মহান। গসপেল অব জন-এর ১০নং অধ্যায়ের ২৯ অনুচ্ছেদে বলেছেন, আমার পিতা সবার চাইতে মহান। গসপেল অব ম্যাথিউ-এর ১২ নং অধ্যায়ের ২৮ নং অনুচ্ছেদে বলেছেন, আমি ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে শয়তানকে তাড়িয়ে দিই। গসপেল অব জন-এর ৫ নং অধ্যায়ের ৩০ নং অনুচ্ছেদে বলেছেন, আমি নিজে থেকে কিছুই করতে পারি না। আমি এখানে বিচার করি। আর বিচার সঠিক কারণ আমি আমার ইচ্ছায় কাজ করি না, আমার পিতার ইচ্ছায় কাজ করি। যদি কেউ বলে সে আল্লাহর ইচ্ছায় কাজ করে সে একজন মুসলিম। ঈসা (আ) একজন মুসলিম। তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলেননি।

বুক অব এ্যাক্টস-এর ২য় অধ্যায়ের ২২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, হে ইসরাইলের সন্তানরা এ কথা শোন নাজারাত শহরের যীশু ঈশ্বর প্রেরিত একজন মানুষ তোমাদের মাঝে, সে অনেক অলৌকিক কাজ করবে, এগুলো তাকে ঈশ্বর করাবে না, আর তোমরা তার সাক্ষী থাকবে। তাই বাইবেল স্পষ্ট করে বলছে যে, ঈসা (আ) ছিলেন একজন মানুষ, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, কিন্তু আল্লাহ নন। গোটা বাইবেলের মধ্যে এটা একবারো পরিষ্কার করে বলা নেই যে, ঈসা (আ) বলছেন তিনি ঈশ্বর আর আমার উপাসনা কর। আপনি একটা উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন। গসপেল অব জন-এর ১৪ নং অধ্যায়ের ৬ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে, যীশু বা ঈসা (আ) নিজেই বলেছেন, আমি সত্য বা জীবনের একমাত্র পথ, আমি ছাড়া আমার পিতার কাছে কেউ পৌঁছাতে পারবে না। এখানে প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। লোকজন কোরআনের আয়াত নিয়ে প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি দেয় দুর্নাম করতে। একইভাবে খ্রিস্টান মিশনারীরাও প্রসঙ্গ ছাড়া বাইবেলের উদ্ধৃতি দেয়।

আপনাকে একটা সত্য কথা বলি, আপনারা বাইবেলটা খোলেন যদি সন্দেহ থাকে। প্রসঙ্গ জানতে ১নং অনুচ্ছেদটা পড়েন। গসপেল অব জন-এর ১৪ নং অধ্যায়ের ১নং অনুচ্ছেদে আছে, ঈসা (আ) বলেছে যে, তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? যদি তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর তাহলে আমাকে বিশ্বাস কর। আমার পিতার রাজ্যে অনেক প্রাসাদ আছে। আমি সেখানে গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা তৈরি করব। আমি যখন যাব, তখন বলব। শিষ্যরা বলল আপনি কোথায় যাবেন? তোমরা জান না আমি কোথায় যাব? তারা বলল, না। তখন শিষ্যরা বলল যে, আমাদের পথ দেখান। তখন যিশু বললেন, আমি সত্য এবং জীবনের একমাত্র পথ। শিষ্যরা তখন ঈসা (আ)-কে বলল, আমাদেরকে সেই পথ দেখান। ঈসা (আ) বললেন,

আমি সত্য এবং জীবনের একমাত্র পথ, আমাকে ছাড়া আমার পিতার কাছে কেউ যেতে পারবে না।

আমরা মানি যে, নবীগণ যখন এসেছিলেন প্রত্যেক নবী ছিলেন সত্য এবং জীবন দেখানোর পথ। সেই নবী ছাড়া কোন মানুষই আল্লাহর কাছে যেতে পারত না। আর যীশু খ্রিস্টের সময়ে তিনি ছিলেন সত্য এবং জীবনের একমাত্র পথ। তার শিক্ষা ছাড়া তখন কোন মানুষই আল্লাহর কাছে যেতে পারতো না। মুসা (আ) নবীর সময়ে তিনিই ছিলেন সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ। তার শিক্ষা ছাড়া কোন মানুষই আল্লাহর কাছে যেতে পারত না। গসপেল অব জন-এর ১৬ নং অধ্যায়ের ১২-১৪ নং অনুচ্ছেদে ঈসা (আ) বলছেন, আমি তোমাদের অনেক কথা বলতে চাই। কিন্তু তোমরা এখন তা বুঝবে না। কারণ, যখন সেই সত্যের আত্মা আসবে সেই তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবে। সে তার নিজের কথা বলবে না, সে যা শুনবে তাই বলবে। সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা বলবে আমাকে মহিমান্বিত করবে।

আর এখন ভালো করেই দেখবেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সত্য ও জীবনের একমাত্র পথ। তিনি যা শিখিয়েছেন সেগুলো ছাড়া কেউ আল্লাহর কাছে যেতে পারবে না। আর হযরত মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন সর্বশেষ আর চূড়ান্ত নবী। এখন পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের জন্য হযরত মুহাম্মদ ﷺ হলেন সত্য আর জীবনের পথ। তিনি যা শিখিয়েছেন সেগুলো ছাড়া কেউ আল্লাহর কাছে যেতে পারবে না। আর সব ধর্মগ্রন্থই এমন কথাই বলছে।

প্রশ্ন ঃ ১০১। আমার নাম এল রবি শংকর শ্রীধর। আমি বর্তমানে বিইদি কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে আছি। আমি অন্য ধর্ম গ্রন্থগুলোও পড়েছি। এছাড়া আমি মুসলমানদের নামাজ পড়ার নিয়মও শিখেছি। একটা হাদীসে বলা আছে যে, মুহাম্মদ ﷺ এক সিরিয়ানকে বলেছেন যে, ধর্ম বদলানোর দরকার নেই। আর তুমি কালিমাও বলো না। তখন প্রয়োজন ছিল। তবে এখন দেখি যে, পৃথিবী অনেক বদলে গেছে। আমাদের সমাজ ও সামাজিক অবস্থান বদলেছে। আরেকটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছি যে, এমন কি কোন ছাড় দেয়া আছে যে, কেউ ইসলাম পালন করতে চায়। আমরা জানি ইসলাম ধর্মের কিছু ব্যাপার ফিজিক্সের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন বিজ্ঞানী ক্যাপ্রা আর স্টিফেন হকিং, যেমন সময় ও বিশ্ব জগৎ কিভাবে সৃষ্টি হলো। এখন আনাল হক বা আমিই খোদা, এ ধরনের কোন ধারণার স্থান আছে? পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লাম, ধর্ম মানলাম, এরপর আমরা অন্য সময় কি বলতে পারি যে, আনাল হক?"

উত্তর ঃ আমি জানি না আপনি কোন হাদীসের কথা বলছেন। একটি হাদীস বলছে যে, জোরে আল্লাহু আকবার বল না। এটা বলা হয়েছিল কারণ, যুদ্ধের সময় তারা

লুকিয়ে আছে। জোরে আল্লাহু আকবার বললে শত্রুরা টের পেয়ে যাবে। আরেকটা হাদীস বলছে জোরে বল যাতে অন্যান্য মুসলিমরা উৎসাহিত হয়। তাই পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। নবীজি ﷺ একবার যুদ্ধের ময়দানে বলেছেন, বল আল্লাহু আকবার। এতে মুসলিমদের সাহস বাড়বে। কিন্তু অন্য সময়ে যখন লুকিয়ে আছেন, তখন শত্রুরা টের পাবে। তাই এক এক পরিস্থিতিতে একেক রকম কাজ।

ইসলামের পাশাপাশি অন্য জিনিস মানা যাবে কি না? যেমন সক্রেটিস বা অন্য কোন বিজ্ঞানীর কথা। এছাড়াও "আনাল হক"। ইসলামের পাশাপাশি অন্য বিষয়ের ব্যাপারে বলি, যদি সেগুলো কোরআন এবং হাদীসের বিরুদ্ধে না যায় তাহলে কোন সমস্যা নেই। কোরআন-হাদীসের সাথে মিলে গেলে সেটা মানতে হবে। সেটা যে কোন বিষয় হতে পারে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, হিন্দুইজম বা যে কোন কিছু। যদি সে কথাটার উল্লেখ কোরআনে না থাকে আর কোরআনের বিরুদ্ধে না যায়, তবে সেটা মানা না মানা ঐচ্ছিক। কিন্তু যদি কোরআনের বিরুদ্ধে যায়, তবে সেটা হারাম বা নিষিদ্ধ।

তারপর আপনি বললেন, ইসলাম 'আনাল হকে' বিশ্বাস করে কি না? আনাল হক বা নিজেকে আল্লাহ দাবি করা এটা শিরক। এটা তৌহিদের বিরুদ্ধে যায়। এটা বলতে পারেন না যে, আপনি তৌহিদ মানেন আবার একাধিক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। দুটোই আসলে বিপরীত। যদি কেউ এমন মনে করে যে, সে আল্লাহর একটা অংশ, সে তৌহিদ মানতে পারে না এবং মুসলিম নয়। কিন্তু অন্য ব্যাপার কোরআনের সাথে মিললে সমস্যা নেই; কোরআনের বিরুদ্ধে না গেলে সমস্যা নেই।

প্রশ্ন ঃ ১০২। আমি পেশায় একজন শিক্ষিকা। এছাড়াও ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর রিসার্চ করি। আমার নাম নিলীমা। আপনার লেকচারের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে আমি কিছু ব্যাপারে একটু জানতে চাই। যেমন— আপনি ভবিষ্যৎ পুরাণের কথা বললেন, তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের ৫-৮ নং শ্লোকে, (আমি আরেকটা ব্যাপার জানিয়ে রাখি যে, হয়ত আপনিও জানেন, ঈশ্বর যে নবীকে পৃথিবীতে পাঠান সে নবী তার উদ্দেশ্যে বলা ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূরণ করবেন। যদি সে নবী অর্ধেক বা তার কম ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করেন তাহলে তাকে নবী বলা যাবে না। এটা একটা সাধারণ যুক্তির ব্যাপার।) আপনি যে ম্লেচ্ছ নেতার কথা বললেন আর বললেন তিনি নবী মুহাম্মদ ছাড়া আর কেউ নন। আমি আপনার কথার প্রথম অংশটা মেনে নিচ্ছি; কিন্তু পরের অংশটা ব্যাখ্যা করে বলেননি। এখন আপনাকে বলি, ম্লেচ্ছ একটা সংস্কৃত শব্দ। আর সংস্কৃত অভিধান অনুযায়ী ম্লেচ্ছ শব্দটার অর্থ অনার্য, পাপী অথবা খারাপ লোক। তাহলে কি বলা যায়

মুহাম্মদ ﷺ ছিল পাপী অথবা খারাপ লোক? আরেকটা ব্যাপার হল– এ ভবিষ্যৎ বাণীর দ্বিতীয় শর্ত সেটা হল তিনি একটা মরুস্থলে জন্মাবেন। 'মরুস্থল' এর অর্থ মৃতদের স্থান। কারণ, মরু শব্দটা এসেছে সংস্কৃত ম্রু থেকে যার অর্থ মৃত্যু।

তাই এখানে অবশ্যই আরবের মরুভূমির কথা বলা হচ্ছে না। কারণ, সেটা ছিল অনুর্বর ভূমি আর যুদ্ধক্ষেত্র। এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, এ ম্লেচ্ছ নেতা গোসল করেন পঞ্চগাভিয়া আর গঙ্গা নদীতে। আর আমরা সবাই জানি যে, গঙ্গা নদী আরবে নয়। এবার পঞ্চগাভিয়ায় গোসল করা সম্পর্কে বলি। পঞ্চগাভিয়া মানে গরু থেকে উৎপন্ন পাঁচটা উপাদান। এ উপাদানগুলো হল, দুধ, দই, ঘি, প্রস্রাব আর গোবর। এখন ভবিষ্যৎ বাণীটাকে সত্যি হতে হলে এ কথাটাকে সত্যি হতে হবে। আপনি কি আমাকে দেখাতে পারেন যে, কোরআনের কোথাও উল্লেখ আছে যে, মোহাম্মদ গোসল করেছিল গঙ্গা নদীতে বা পঞ্চগাভিয়া দিয়ে? তাহলে আজকেই ইসলাম গ্রহণ করব।

উত্তর ঃ আমি আপনার সাথে একমত। যে ভবিষ্যদ্বাণীর অর্ধেকের সঠিক হয় না সেটা ভুল। আমি আপনার তিনটা প্রশ্নের উত্তর দিব, দেখা যাক আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন কিনা? এটাও হতে পারে যে, আপনি আমার সাথে একমত হবেন না।

ম্লেচ্ছ শব্দটার তিনটা অর্থ আছে, এর একটা অর্থ অনার্য বা বিদেশী, আরেকটা পাপী, আরেকটা হলো খারাপ লোক। খেয়াল করলে দেখবেন ইন্ডিয়ায় হিন্দুরা মুসলমানদের সাধারণত বলে থাকে ম্লেচ্ছ। তারা যখন এভাবে বলে তারা আসলে বোঝায় পাপী আর খারাপ লোক। কিন্তু এর আরেকটা অর্থ হলো বিদেশী। একটি শব্দের যদি অনেক অর্থ থাকে, ধরুন একটা শব্দের চারটি অর্থ আছে ব্যাপারটা এরকম না যে এখানে তিনটা অর্থ খাটে। মাত্র একটা ঠিক হলেও অর্থ সঠিক হতে পারে। যেমন, ধরুন কোরআন বলছে, তোমরা শূকর খেয়ো না। আজকে যদি অভিধান খোলেন দেখবেন এ শূকর শব্দটার একটা অর্থ হলো পুলিশ। তাহলে একটা অর্থ শূকর আরেকটা অর্থ পুলিশ অফিসার। তবে কোরআন বাইবেল এটা বুঝায়নি। বাইবেলের বুক অব লেভিটিকাস-এর ১১ নং অধ্যায়ের ৭-৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বুক অব ডিউটোরনমী-এর ১৪ নং অধ্যায়ের ৮ নং অনুচ্ছেদে, বুক অব আইজা-এর ৬৫ নং অধ্যায়ে ২-৫ নং অনুচ্ছেদে আছে যে, তোমরা শূকর খেয়ো না। কিন্তু পুলিশকে বুঝায়নি বাইবেল। যদি আপনি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্রী হয়ে থাকেন কোন শব্দের ১০টা অর্থ থাকলেও সেখানে ১টা অর্থ খাটলেও দেখতে হবে সেটা সঠিক কিনা। ২টা সঠিক হতে পারে, ৩টি সঠিক হতে পারে, সবই সঠিক হতে পারে। কিন্তু যদি একটা অর্থও সঠিক হয়, এতে ভবিষ্যদ্বাণীটা ফলে যেতে পারে।

আমি আপনার সাথে একমত যে, ম্লেচ্ছ-এর একটা অর্থ অনার্য। ইন্ডিয়ানদের দিক থেকে বিদেশী। আর আমি আমার লেকচারে বলেছিলাম ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ বিদেশী। আর আপনি ভুল পথে গিয়ে বলছেন ম্লেচ্ছ মানে পাপী। আপনি আসলে ভুল বুঝেছেন। যদি আপনি বলেন কোরআন আর বাইবেল বলছে পুলিশদের খেয়ো না তাহলে আপনি বিভিন্ন ধর্মের ওপর ছাত্রী নন। আপনি তাহলে একপেশে।

আরেকটা বলেছেন মরুস্থল। আমিও একমত এর একটা অর্থ মৃতদের স্থান। তবে সংস্কৃতিতে মরুস্থল শব্দের আরেকটা অর্থ হলো বালিময় স্থান। আমি এটা মানছি যে, এর একটা অর্থ হচ্ছে মৃতদের স্থান আরেকটা অর্থ হলো বালিময় স্থান। কিন্তু ভুল অর্থটা আপনি নিচ্ছেন কেন ? তাহলে তো আপনি ভুল পথে চলে যাবেন। যদি Permutation আর Combination দেখেন অন্য যে পয়েন্টগুলো বলেছি সেগুলো পুরোপুরি সঠিক। এখানে আপনাকে সঠিক অর্থটা বেছে নিতে হবে।

এবার আপনার তৃতীয় প্রশ্নে আসি। আশা করি আপনি আজ ইসলাম গ্রহণ করবেন। আমি যে ভবিষ্যদ্বাণীটা করেছি যে, মুহাম্মদ ﷺ পঞ্চগর্ভে গোসল করেছিলেন, গঙ্গা নদীতে। এখানে বুঝে নিতে হবে যে হিন্দুদের রীতি অনুযায়ী যে কেউ গঙ্গায় বা পঞ্চগর্ভে গোসল করবে তার অর্থ বিশুদ্ধ হবে। একটা অর্থ শারীরিকভাবে গঙ্গায় ডুব দিলেন। আমারো মনে হয় না যে, নবীজি ইন্ডিয়ায় এসে গঙ্গায় ডুব দিয়েছিলেন। এর আরেকটা অর্থ বিশুদ্ধ হওয়া। তখন ব্যাখ্যা করিনি কারণ লেকচারটাই অনেক লম্বা ছিল। এখানে পঞ্চগর্ভে গোসল করা মানে হলো বিশুদ্ধ হওয়া। এখানে প্রসঙ্গটা বুঝতে হবে। শারীরিকভাবে গোসল করা বোঝানো হয়নি। আর আপনি গঙ্গার পানিতে ডুব দিলেই বিশুদ্ধ হয়ে যাবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। বিশুদ্ধ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এটা হচ্ছে হিন্দুদের রীতি অনুযায়ী বলা। তাই বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ ﷺ পঞ্চগর্ভে গোসল করেছিলেন। তার মানে এ না যে তিনি এখানে এসেছিলেন। মানে হলো আল্লাহ তাকে বিশুদ্ধ করেছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর সব নবীই হোক মুসা বা ঈসা, তারা সকলেই ছিলেন মানুষ। তারা ছিলেন নিষ্পাপ, ছিলেন বিশুদ্ধ। তাহলে আল্লাহ যাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তারা সকলেই নিষ্পাপ, মাসুম ও বিশুদ্ধ। তাহলে আপনি আপনার উত্তরটাও পেলেন।

আশা করি আপনি ইসলাম গ্রহণ করবেন বোন।

প্রশ্ন ঃ ১০৩। আমার নাম প্রেম আদভানি। আমি নয়া দিল্লি থেকে এসেছি। রিটায়ার্ড চাকরিজীবী আর অমুসলিম। আমার প্রশ্ন হলো ইসলামের ইতিহাস খুব গৌরবের। বর্তমানেও ইসলাম ধর্মের মাথা উঁচু করে থাকার কথা ছিল। আমার মনে হয় মুসলিমদের কাজ কর্মের মধ্যে স্বচ্ছতা থাকা উচিত। অন্য মানুষদের জানতে দেয়া উচিত যে তারা কি কি কাজ করেছে–

মাদ্রাসা, মসজিদ ইত্যাদি জায়গায়, যাতে করে মানুষ যেন জানতে পারে যে, এসব জায়গায় কী হচ্ছে? তখন ব্যাপারটা অনেক স্বচ্ছ হবে। কেউ তখন আর ভুল বুঝবে না।

উত্তর ঃ ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন, তবে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে আগের বোন যে প্রশ্ন করেছেন সে ব্যাপারে কিছু কথা বলে নিই। এখানে আমার মেয়ে রুশদা নায়েকের গানের কথাগুলো মনে পড়ল। শেষ গানটা যে, Dont talk to me about Muhammad (Sm), আর Co-ordinator বলেছিলেন গানের কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আপনারা যদি কথাগুলো শুনে থাকেন, এটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি সীরাত। একদিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেটে যাচ্ছিলেন, তখন এক পথচারীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কথা বলতে লাগলো যে, এ নবী মুহাম্মদ, তাঁর সঙ্গে কথা বল না, সে খুবই খারাপ লোক। সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কথা বলছে সে জানে না। সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বলতে লাগল, তাঁর সাথে কথা বলো না, তার কথা শুন না। শুনলে বিপর্যয় হয়ে যাবে। গানটাতে এ কথাগুলোই বলা হয়েছিলো। লোকটা নবীজিকে বলল, তবে আপনি খুব ভাল মানুষ। আর আপনাকে সাবধান করছি ওই মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটার কথা শুনবেন না। সে ভণ্ড (নাউজুবিল্লাহ), সে খুব খারাপ মানুষ (নাউজুবিল্লাহ)। এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল আপনার নামটা জানতে পারি? নাম শুনে সে বলল, কি? আপনি কি বললেন? আমি কি ঠিক শুনছি? আপনার নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? তখনই সে ইসলাম গ্রহণ করল। যখনই সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে চিনতে পারলো তখনই সে ইসলাম গ্রহণ করল। তাই আমার প্রিয় বোন, উনি একটু আগে যখন প্রশ্নগুলো করেছিলেন তখন আমার মেয়ের গানের কথাগুলো মনে পড়েছিল।

ভাই, আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আর বললেন যে, ইসলামের অতীত ইতিহাস খুবই গৌরবের। তারপর বলছেন যে, স্বচ্ছতা থাকার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে মাদ্রাসাগুলোতে। কে আপত্তি করবে? আমি একমত ভাই। আমি সম্পূর্ণ একমত। কে বলছে যে, স্বচ্ছতা থাকবে না? আমি শুধু স্বচ্ছতাই নয়, আমি চাই অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরাও মাদ্রাসায় লেখাপড়া করুক। আমি এটাও জানি যে, আপনি এখানে মিডিয়ার কথাগুলো বলছেন। মিডিয়া বলছে মাদ্রাসা হলো সন্ত্রাসবাদের আখড়া। মিডিয়া বলছে, আপনি না। মাদ্রাসা আরবি শব্দটার অর্থ যেখানে শিক্ষা দেয়া হয়। আরেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত। স্কুল বলতে পারেন, কলেজ বলতে পারেন, ইউনিভার্সিটিও বলতে পারেন। তবে মিডিয়া মাদ্রাসাগুলোকে এমনভাবে তুলে ধরে যে, যদি কোন মাদ্রাসায় যান, আপনি সন্ত্রাসী হয়ে যাবেন। মিডিয়া বলে, আপনি না। একটা প্রশ্ন করি, এ পৃথিবীর ইতিহাসে যে লোকটা সবচেয়ে বেশি হত্যা করেছে সে পড়েছে কোন মাদ্রাসায়? তারপর মাফিয়া, পৃথিবী জুড়ে যারা চোরাচালান করে,

এ স্মাগলারদের যারা জেলে যায়, তাদের কতজন মাদ্রাসায় পড়েছে? থাকতে পারে, খুব কম। বেশির ভাগই ভার্সিটিতে পড়েছে। কোন ভার্সিটি? আধুনিক ভার্সিটি স্কুল, কলেজ। তাহলে কি বলবেন স্কুল বন্ধ করে দাও? এটা কি বলব যে, আজকে থেকে স্কুল কলেজ বন্ধ? বি.এ, বি.এস.সি, বি.কম পড়া বন্ধ? না, কারণ আমি তো স্কুলে পড়াশোনা করেছি। স্কুলে শেখানো হয় না যে, ডাকাতি করবেন, চোরাচালানি করবেন, দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। এ লোকগুলো স্কুলে পড়শোনা করেছে, কিন্তু তারা স্কুলগুলোর কুলাঙ্গার, আর হিটলার ও আধুনিক শিক্ষা পেয়েছিল, আমি নিশ্চিত যে, তার স্কুল তাকে শেখায়নি যে, তুমি ৬০ লক্ষ ইহুদি হত্যা কর।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, এরা কুলাঙ্গার এ দেশে প্রতিবছর হাজার-হাজার ছাত্র মাদ্রাসা থেকে পাস করে। নাদভা থেকে, দেওবন্দ থেকে হাজার হাজার ছাত্র। আপনি কি বলবেন এরা সবাই মানুষ মারছে? মোটেই তা নয়। মিডিয়া ব্যাপারটা এভাবে তুলে ধরছে। গত বছর বা তার আগের বছর সরকার নাদভা মাদ্রাসায় গিয়েছিল। তারা মাদ্রাসায় গিয়ে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট বের করল। চেক করবে। আর আলী মিয়া নাদভী (র) বললেন, ঠিক আছে, আপনারা চেক করেন। তারা সেখানে কিছুই পায়নি। এখন হঠাৎ করে একদিন, লাখে একবার, হাজার বারের মধ্যে একবার, কোটি বারের মধ্যে একবার হতে পারে যে মাদ্রাসা থেকে পাস করার পর কেউ বিপথে চলে গেছে; তার মানে এ না মাদাসা সন্ত্রাস শেখায়; বরং দেখবেন যারা স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তারাই তুলনামূলক বেশি অপরাধ করে। আপনি যদি স্বচ্ছতার কথা বলেন, আমিও একমত। কোন মাদ্রাসায় একথা বলবে না যে, আপনারা এখানে চেক করবেন না।

আমাদের মাদ্রাসাগুলো উন্মুক্ত। আমাদের স্কুলগুলোও। আমাদের স্কুলে আমরা শিখাই, বিভিন্ন ধর্মের ওপর শিক্ষা দিই। আমার স্কুলের ছাত্ররা তারা সাধারণ হিন্দুদের চাইতে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বেশি জানে, সাধারণ খ্রিস্টানদের চাইতে খ্রিস্ট ধর্ম সম্পর্কে বেশি জানে, সাধারণ মুসলমানের চাইতে মুসলিম ধর্ম সম্পর্কে বেশি জানে। কারণ, এখানে সব ধর্মের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তাহলে ভাই আপনি যদি স্বচ্ছতার কথা বলেন, আমি একমত। আপনার সঙ্গে আছি। একথা আপনাকে কেউ বলবে না, আমাদের পরীক্ষা করতে পারবেন না। আসেন, তবে নিন্দা করবেন না। নেগেটিভ মন নিয়ে আসবেন না, খোলা মনে আসেন, কে জানে আল্লাহ হয়ত আপনাকে হেদায়াত করবেন।

প্রশ্ন ঃ ১০৪। আমি স্বচ্ছতা বলতে বোঝাতে চেয়েছি যে অমুসলিমরা এখানে এসে নিজের চোখে দেখে যাবে কি হচ্ছে? যাতে মানুষের মনে কোন সন্দেহ না থাকে যে, মাদ্রাসায় খারাপ কাজ হচ্ছে না সন্ত্রাসী বানানো হচ্ছে?

উত্তর ঃ ভাই, খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। মাদ্রাসাগুলোকে স্বচ্ছ বানাবো যাতে অমুসলিমরা এসে পড়তে পারে ভাই। প্রথমে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে, আপনার

ছেলেমেয়েকে। আইআরএফ-এ আসেন। আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আর ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনে একটা লাইব্রেরি আছে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের ওপর সংগ্রহের দিক থেকে ইন্ডিয়ার মধ্যে একটা প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরি। আমাদের লাইব্রেরিতে দু'শোরও বেশি আলাদা আলাদা বাইবেল আছে। বাইবেলের পঞ্চাশটা এডিশান আছে। শুধু ভগবত গীতার অনুবাদই আছে পঞ্চাশটা। বেদের অনেক অনুবাদ আছে। ঋগবেদ, অথর্ববেদ, যজুর্বেদ, হয়ত সরকারি লাইব্রেরিতেও এতগুলো পাবেন না। হতে পারে আপনার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে এ বইগুলো পাবেন না, আমরা উৎসাহ দেই পড়েন আর সত্যের পথে আসেন। আর অন্যদের কথা বাদ দেন। আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে, আপনার ছেলে-মেয়েদের, আপনাদের প্লেনের টিকিটও দেব ফ্রি। IRF-এ আসেন, আপনাকে আমরা স্বাগত জানাব, পড়েন তাহলে সত্যটা জানতে পারব একসাথে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন ঃ ১০৫। ডা. জাকির নায়েক। আমার নাম ভেঙ্কাটামা। আমি গত কয়েক বছর ধরে এক মুসলিম মহিলার সাথে আছি। আমার প্রশ্ন হল সবাই বলে কোন ধর্মই খারাপ কথা বলে না। কিন্তু মুসলিমরা কেন অন্য ধর্মের লোকদের ইসলাম গ্রহণ করতে বলে?

উত্তর ঃ বোন আপনি বললেন যে, আপনি একটা মুসলিম পরিবারের সঙ্গে থাকেন অনেক বছর ধরে। তারপর বললেন যে, সব ধর্মেই ভালো কথা থাকে, কিন্তু মুসলিমরা আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলে কেন?

অন্য যেসব ধর্ম আছে সেগুলো যেসব কথা বলে তার বেশিরভাগ ভালো। তবে ইসলাম ভাল কথার পাশাপাশি আপনাকে দেখাবে কীভাবে সেটা অর্জন করতে হয়। আমি উদাহরণ দেখিয়েছি। যেমন– সব ধর্মে বলে চুরি কোরো না। ইসলামও একই কথা বলে। তবে ইসলাম আপনাকে দেখিয়ে দেয়, কীভাবে সেই অবস্থানে যাবেন যেখানে কেউ চুরি করে না। যাকাত দেন, সাহায্য করেন। এরপর কেউ চুরি করলে তার হাত কেটে ফেলেন। তাহলে চুরি বন্ধ হয়ে যাবে। কোন অপরাধ থাকবে না। এজন্যই আমি বলেছিলাম যে, ইসলাম ভাল কথার পাশাপাশি আপনাকে দেখিয়ে দেবে কিভাবে সেটা অর্জন করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন ছাত্র হিসেবে বলছি– যদি আপনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো মেনে চলেন, যদি একজন ভাল হিন্দু হন, আপনাদের ধর্মগ্রন্থগুলোই বলছে ঈশ্বর মাত্র একজন। আপনাদের ধর্মগ্রন্থ বলছে মূর্তি পূজা করবে না। ভগবত গীতার ৭ নং অধ্যায়ের ২০ নং অনুচ্ছেদে বলছে, জাগতিক আকাঙ্ক্ষা যাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে তারা নকল ঈশ্বরের পূজা করে, তারা মূর্তি পূজা করে। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে। আজকে আমার লেকচারে বলেছিলাম বিশ্বাস করতে হবে অন্তিম ঋষিকে। কলকি অবতার। যার বাবার নাম হবে বিষ্ণুইয়াস আব্দুল্লাহ, যার

মাতার নাম হবে সুমতি–আমেনা, তিনি জন্ম নিবেন আম্বালা নামক গ্রামে, মক্কা, তিনি জন্ম নিবেন আম্বালা শহরের প্রধানের ঘরে– মক্কার প্রধানের ঘরে।

তিনি হবেন পুরো মানব জাতির পথ প্রদর্শক, তিনি আলোকপ্রাপ্ত হবেন রাতের বেলায়, একটা গুহায়। তিনি উত্তর দিকে গিয়ে আবার ফিরে আসবেন। ঈশ্বর তাকে আটটা গুণ দেবেন। তিনি একটা ঘোড়ায় চড়বেন, ডান হাতে থাকবে একটা তরবারী, চারজন সহচর থাকবে তার। তাকে বিভিন্ন সময়ে ফেরেশতাগণ সাহায্য করবেন, এরকম আরো অনেক অনেক। যদি ভালো হিন্দু হয়ে থাকেন তাহলে আপনি এ অন্তিম ঋষিকে বিশ্বাস করবেন। তা নাহলে আপনি ভালো হিন্দু নন। যদি ভালো হিন্দু হয়ে থাকেন তাহলে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করবেন। তাহলে আপনি মূর্তি পূজা করবেন না। মহান ঈশ্বরের কোন প্রতিমূর্তি নেই, ফটোগ্রাফ নেই, কোন ভাস্কর্য নেই। আমি বিতর্ক করেছি পণ্ডিতদের সাথে, হিন্দু পণ্ডিত। তারা শংকরাচার্য। সেখানে আমি এ কথা বলেছি। কোন শংকরাচার্য আমাকে বলেননি ভাই আপনি ভুল বলেছেন, কেউ না।

একটা বিতর্ক করেছিলাম শ্রী শ্রী রবিশংকরের সাথে ২১ জানুয়ারি। তিনি ইন্ডিয়ায় হিন্দুদের মাঝে খুবই জনপ্রিয়। আর্ট অব লিভিং। আমি তাকে বলেছিলাম আর্ট অব লিভিং-এর শ্রেষ্ঠ বই হলো এ পবিত্র কোরআন। আমি তাকে মুসলিমদের এ আর্ট অব লিভিংয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। আমরা সংখ্যায় এখন একশ তিরিশ কোটি মুসলিম। আমি তাকে বলেছিলাম, যদি তিনি ধর্মগ্রন্থগুলো মানেন, তিনি বেদের উপর একজন বিশেষজ্ঞ, তাকে এটা মানতেই হবে। একইভাবে বোন আপনাকে বুঝতে হবে, অন্য ধর্মগ্রন্থগুলো হয়ত আল্লাহর বাণী। কিন্তু সময় বদলানোর সাথে সাথে সেগুলোও বদলে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন বেদের ৯৯ ভাগই হারিয়ে গেছে। বাকি যে একভাগ আছে সেটা আমাদের কঠোরভাবে মানতে হবে। কঠোরভাবে মানে, অন্তিম ঋষিকেও মানতে হবে। তাহলে কঠোরভাবে মানলে আপনি মুহাম্মদ ﷺ কেও মানবেন। কোরআনকেও মানবেন। আর আমি আপনাকে এ শান্তির ধর্মে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যাতে আপনি আল্লাহর কাছাকাছি আসতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ ১০৬। আমি অ্যান্থনি, ফিলোসফির একজন ছাত্র। আপনার লেকচার থেকে আজকে যা শিখলাম যে, সব ধর্মই কমন কথা বলে। এমনকি মুহাম্মদ ﷺ ও কমন। কিন্তু পবিত্র কোরআন কোন দিক থেকে আলাদা? কোরআন এমন কি বলছে যেটা অন্য ধর্মে বলা নেই? যেমন– ধরেন মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর কথা সব ধর্মের বইতেই তো বলা হয়েছে।

উত্তর ঃ ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আপনি বললেন যেটা কমন সেটা মেনে চলতে। সব ধর্মই বলে মুহাম্মদ ﷺ-এর কথা আর কোরআনও একই কথা বলে। কিন্তু এখানে নতুন কি আছে?

অন্য সব ধর্ম বলে যে, পরবর্তীতে একজন নবী পৃথিবীতে আসবেন আর বাইবেলও বলছে। সম্ভবত আপনি বাইবেল পড়েছেন। গসপেল অব জন-এর ১৬ নং অধ্যায়ের ১২-১৪ নং অনুচ্ছেদে আছে, ঈসা (আ) শিষ্যদের বলছেন, আমি তোমাদের অনেক কথা বলতে চাই, কিন্তু তোমরা এখন তা বুঝবে না। কারণ, যখন সত্যের আত্মা তোমাদের সামনে আসবে সে তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবে। সে তার নিজের কথা বলবে না, যা শুনবে সে কথাগুলোই বলবে। সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা বলবে, সে আমাকে মহিমান্বিত করবে।" তার মানে সব ধর্মগ্রন্থই বলছে একজন নবী পৃথিবীতে আসবেন।

কিন্তু কোরআন বলছে ইনিই সেই নবী যার ওপর কোরআন নাজিল হয়েছে। সেই নবী চলে এসেছেন। যখন আপনি ক্লাস ওয়ানে পড়ছেন আপনার স্কুলে, সবার ওপরে ক্লাস টেন। আর টু'তে উঠলেন তখনো লক্ষ্য ক্লাস টেন। এভাবে ক্লাস নাইন পর্যন্ত আপনার টেনই লক্ষ্য। যখন ক্লাস টেনে উঠবেন, তারপর এসএসসি পরীক্ষা দেবেন; ঠিক? তার মানে এটা না যে, ক্লাস ওয়ান আর ক্লাস টেনের পড়াশোনা এক। আপনি ক্লাস টেনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। চৌদ্দশ' বছর আগে আল্লাহ এ নবীকে পাঠিয়েছেন। কারণ, যিশু খ্রিস্ট বলেছেন, আমি তোমাদের এমন কথা বলতে চাই, কিন্তু তোমরা এখন তা বুঝতে পারবে না। কারণ সত্যের আত্মা যখন আসবে, তোমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে। তাহলে আল্লাহ বুঝেছিলেন, চৌদ্দশ' বছর আগে সেটাই সঠিক সময়। এখন পৃথিবীর মানুষ এ কথাগুলো বুঝতে পারবে। অর্থাৎ পবিত্র কোরআন।

অন্যান্য সব ধর্মে বলা হয়েছে যে, মহান ঈশ্বর একজন, বর্ণনাগুলো হয়ত আলাদা; কিন্তু সব ধর্মই বলছে এক স্রষ্টার কথা। আমরা মানব নবীদের আর চূড়ান্ত নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে। সারমর্ম একই, বর্ণনাগুলো হয়ত আলাদা। পবিত্র কোরআনের সূরা মায়িদা ৩নং আয়াতে বলা হয়েছে, আজ এ দিনে আমি তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম ইসলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, পুরো মানুষ জাতির জন্য।" পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পর নতুন কিছু যোগ দেয়া যাবে না, কিছু বাদ দেয়া যাবে না। আপনারা তো বলেন ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট; কিন্তু পবিত্র কোরআন হলো লাস্ট টেস্টামেন্ট। তাহলে সারমর্ম হলো এ পবিত্র কোরআন হলো শেষ কিতাব আল্লাহর নাযিলকৃত লাস্ট টেস্টামেন্ট। অন্য সব ধর্মগ্রন্থ বলছে একটা বইয়ের কথা, সেটা হলো কোরআন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ক্ষেত্রেও একই কথা। অন্য ধর্মগ্রন্থগুলো বলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসবেন। আর ইসলাম আমাদের শেখায় আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আর নবীজির হাদীসের মাধ্যমে যে, এটাই হল চূড়ান্ত ধর্ম। পুরো মানব জাতির জন্য, একেবারে আদম (আ) থেকে আজ পর্যন্ত এখনো আছে শেষদিন পর্যন্ত থাকবে। সব ধর্মই বলছে এক ঈশ্বরের কথা, বলছে যে শেষ নবী

আসবেন। আপনাকে এটা মানতে হবে। এটা মানতে হবে প্রয়োগ করতে হবে। তাহলে সত্যিকারের খ্রিস্টান হতে পারবেন। এজন্য আমি বলি যে, আমরা মুসলিমরা খ্রিস্টানদের চাইতেও অনেক বেশি খ্রিস্টান। খেয়াল করে দেখবেন, আমরা যিশু খ্রিস্টকে সাধারণ খ্রিস্টানদের চাইতে অনেক বেশি মানি।

প্রশ্ন ঃ ১০৭। আমি লক্ষ্মী আইয়ার। স্যার আমি হিন্দু তবে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করি। আমি ইসলাম বিশ্বাস করি কারণ আমি সে রকম কিছু প্রমাণ পেয়েছি। আপনি বললেন আল্লাহ্ একজন, ধর্মও এক। এখন আমি তিনজন মানুষের উদাহরণ দেই, একজন মুসলিম, একজন হিন্দু ও একজন খ্রিস্টান। এখন তাদের শরীর যদি কেটে ফেলা হয়, সেখানে আপনি কী দেখতে পাবেন? শুধু রক্ত, শুধুই রক্তই পাবেন। দুধ পাবেন না, পানি পাবেন না। এখন সব মানুষের শরীরে যদি একই রক্ত থাকে তাহলে মৃতদেহ সৎকারের নিয়মটা আলাদা কেন? মুসলিমরা কবর দেয় আর আমরা হিন্দুরা মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলি। ফেলি কেন?

উত্তর ঃ বোন, বললেন আপনি ইসলাম ধর্ম পছন্দ করেন, আপনাকে অভিনন্দন আর এ শান্তির ধর্মে আপনাকে স্বাগতম। সত্যের পথে আপনাকে স্বাগতম। আপনি প্রশ্ন করলেন, সবার শরীরে একই রক্ত আর একই উপাদান থাকে, তবে হিন্দুরা কেন পুড়িয়ে ফেলে আর মুসলিমরা কেন কবর দেয়? আসুন আমরা ভালো করে দেখি, কোন পদ্ধতিটা ভাল।

হিন্দু ধর্মে কবর দেয়ার অনুমতিও আছে, শিশুদের ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক লোক মারা গেলে তারা বলেন পুড়িয়ে ফেলতে হবে। অবশ্য হিন্দুদের কেউ কেউ বলেন কবর দিতে হবে।

প্রথমত দেখুন, যখন আপনি মৃতদেহ পোড়াবেন তখন পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। মৃতদেহ পোড়ালে পরিবেশ দূষণ হয়। ইসলাম ধর্মে আমরা কবর দিই। এখন আমরা জানতে পেরেছি যে, মাটিতে যে উপাদান আছে তার কম-বেশি আমাদের শরীরেও আছে। আমরা মাটি থেকে এসেছি, মাটিতেই ফিরে যাবো। এটি বিজ্ঞানসম্মত।

দাহ করলে পরিবেশ দূষণ হয় আর কবর দিলে মাটি উর্বর হয়। পোড়ানো হয় না বলে পরিবেশ দূষণ হয় না।

দ্বিতীয়ত, মৃতদেহ পোড়াতে হলে আপনাকে গাছ কাটতে হবে। গাছপালা কমে যাবে। পরিবেশের অবস্থা তখন খারাপ হয়ে যাবে। ইসলাম অনুযায়ী আমরা কবর দিই, জমি উর্বর হয় আরো গাছ জন্মায়। এটা তখন হয়ে যায় সার। এখানে গাছ কাটার দরকার নেই, পরিবেশের জন্যেও ভালো। আমাদের সরকার এখন বলে গাছ কাটবেন না। গাছ না কাটলে মৃতদেহগুলো পোড়াবেন কিভাবে?

তৃতীয়ত, পোড়ালে খরচ বেশি। ইন্ডিয়ার পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিদিন, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে শুধু গাছের পিছনে। ইসলাম অনুযায়ী আমরা কবর দিই ফ্রি।

চতুর্থতঃ মৃতদেহ পোড়ালে গাছের কাঠ পুড়ে হয়ে যায় ছাই। ইসলাম অনুযায়ী একটা জায়গায় কাউকে কবর দিলে কয়েক বছর পর আরেক জনকে কবর দেয়া যাবে। এটা সব সময় চলবে। আপনি রিসাইকল করতে পারবেন। একই জমি মৃতদেহের হাড়গোড় আলাদা হয়ে গেলে আবার কাউকে কবর দিতে পারবেন। তাহলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিন্তা করলে কবর দেয়া অনেক ভাল, অনেক মানবিক।

প্রশ্ন ঃ ১০৮। আমার নাম রামকৃষ্ণ। আমি ফিজিওথেরাপীর ছাত্র। আমার প্রশ্ন হলো আল্লাহর আদম-হাওয়ার সৃষ্টির কি দরকার ছিল? অথবা এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টির কারণ কি? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো– সবকিছুই কেউ সৃষ্টি করেছে, তাহলে ঈশ্বরের স্রষ্টা কে? আল্লাহ শব্দটার অর্থ কি?

উত্তর ঃ ভাই, আপনি তিনটা প্রশ্ন করেছেন। আল্লাহ কেন আদম হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন? বিশ্বজগৎ সৃষ্টির কারণ কি?

আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আদম আর হাওয়াকে যাতে করে মানবজাতি আসতে পারে। তারা আমাদের সবার পূর্বপুরুষ। পবিত্র কোরআনের সূরা হুজুরাতের ১৩নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, "হে মানব জাতি, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে। তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্নজাতি আর গোত্রে, যেন তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। এজন্য নয় যে, অন্যকে ঘৃণা করবে। আর তাকওয়াবান ব্যক্তি হল আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান। আল্লাহ যেটার মাধ্যমে মানুষের বিচার করেন। টাকা পয়সা নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নয় সেটা হল তাকওয়া। সেটা হল আল্লাহকে মানা, ন্যায়পরায়ণতা, ধার্মিকতা। তাহলে আদম আর হাওয়া (আ) তারা আমাদের সবার পূর্বপুরুষ। আপনারও পূর্বপুরুষ, আমার পূর্বপুরুষ, সবারই পূর্ব পুরুষ। সেজন্য আপনাকে ভাই বলে ডেকেছি। সব মানুষ ভাই-ভাই। সূরা ইসরা ৭০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সব আদম সন্তানকেই মর্যাদা দিয়েছেন। হোক আপনি জন্ম নেন ইন্ডিয়া, আমেরিকা, হিন্দু বা খ্রিস্টান পরিবারে। আল্লাহ বলেছেন, তিনি সব মানুষকেই মর্যাদা দিয়েছেন। মানুষ হয়ে জন্মালে আল্লাহ তাকে মর্যাদা দেবেন। তা হোক আপনার নাম জাকির, রহমান, শংকর, সামু। মানুষ হয়ে জন্মালেই আল্লাহ মর্যাদা দেবেন।

আপনার প্রশ্নে আসি। কেন আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করলেন? আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন কারণ আল্লাহ বলেছেন মানুষ হল সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তারা আল্লাহকে মানে। ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ যে আদেশ দেন ফেরেশতাগণ সেই আদশেই পালন করেন। তাদের নিজস্ব ইচ্ছা নেই। মানুষ হল

আল্লাহর এমন সৃষ্টি যার নিজের ইচ্ছা আছে। আমরা তার কথা মানতে পারি নাও মানতে পারি। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমরা হলাম সৃষ্টির সেরা। তবে আমরা আল্লাহ তায়ালার কথা মানতে পারি নাও মানতে পারি। যদি আল্লাহর আদেশ মানেন তাহলে বেহেশতে বা স্বর্গে যাবেন। যদি আদেশ না মানেন তাহলে জাহান্নামে বা নরকে যাবেন। তাহলে এ জীবনটা পরকালের জন্য পরীক্ষা। সূরা মূলক এর ২নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে– আল্লাহ জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য। সূরা যারিয়াতের ৫৬নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার ইবাদত করে।" তাই আমাদের উচিত আল্লাহর আদেশ নিষেধগুলো মেনে চলা। তাহলে আমরা আল্লাহ তায়ালার অন্য রকম সৃষ্ট যার নিজস্ব ইচ্ছা আছে। পবিত্র কোরআন বলছে অন্যান্য সব সৃষ্টি আল্লাহর সামনে নতজানু হয়, সিজদা করে এবং আল্লাহকে মানে। কিন্তু মানুষই একমাত্র জীব যার নিজস্ব ইচ্ছা আছে। সে আল্লাহকে মানতেও পারে নাও মানতে পারে। আপনার স্বাধীন ইচ্ছা নিয়ে যদি আল্লাহকে মানেন, তবে ফেরেশতাদের উপরও চলে যাবেন। আর আল্লাহকে না মানলে তখন হবেন শয়তানের সহযোগী। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন পরকালের পরীক্ষার জন্য।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন, সবকিছুর স্রষ্টা আছে তাহলে আল্লাহকে বানিয়েছে কে? যদি কেউ বলে সব কিছুর স্রষ্টা আছে, কথাটা ঠিক নয়। সব সৃষ্টি জিনিসের স্রষ্টা আছে। আল্লাহ তায়ালার সংজ্ঞা হচ্ছে তাকে কেউ সৃষ্টি করে নি। যখনি বলবেন কে আল্লাহকে বানিয়েছেন সে আল্লাহ নয়। আল্লাহ তায়ালার সংজ্ঞা হচ্ছে তিনি সৃষ্টি হননি।

ধরেন, এক লোক আপনাকে বলল যে, ভাই আমার বন্ধু জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। সে একটা বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। বলতে পারবেন এ বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে? বলতে পারবেন? চেষ্টা করেন। পারবেন না, কেন?

পুরুষ লোক বাচ্চার জন্ম দিতে পারে? এখানেই আপনি ভুল করেছেন। একইভাবে ভুল করেছেন যখন বললেন কে আল্লাহকে বানিয়েছেন? পুরুষ লোক বাচ্চার জন্ম দিতে পারে না, তাহলে তার ছেলে বা মেয়ে হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এখন কি আপনি বুঝতে পেরেছেন? আল্লাহর সংজ্ঞা হচ্ছে তিনি সৃষ্টি হননি। যখনই প্রশ্ন করবেন কে আল্লাহকে বানিয়েছে, সে আল্লাহ নয়। তার সমতুল্য কেউ নেই।

এবার আপনার শেষ প্রশ্নে আসি। আল্লাহর সবচেয়ে সেরা সংজ্ঞা আছে পবিত্র কোরআনের সূরা ইখলাসে। সূরা ইখলাসের ১নং থেকে চার নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, "বল! আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী। তিনি জন্ম নেননি কাউকে জন্ম দেননি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। এ হল চার লাইনের সংজ্ঞা। যদি কোন লোক এ চারটা শর্ত পূরণ করতে পারে, তবে আমাদের

মুসলিমদের কোন আপত্তি থাকবে না তাঁকে আল্লাহ বলে মেনে নিতে। চার লাইনের সংজ্ঞা। এটাই হল ধর্মের লিটমাস টেস্ট। আল্লাহ তায়ালার সংজ্ঞা প্রথম হল– বল তিনি এক ও অদ্বিতীয়। দ্বিতীয়– আল্লাহ অবিনশ্বর চিরস্থায়ী। তৃতীয়– তিনি জন্ম নেননি এবং জন্ম দেননি। চতুর্থ– তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েন সেখানেও একই রকম কথা বলা হয়েছে। ছান্দগ্য উপনিষদের ৬ নং অধ্যায়ের ২নং অনুচ্ছেদের ১নং পরিচ্ছেদে ঈশ্বর মাত্র একজন, দ্বিতীয় কেউ নেই। ভগবত গীতার ১০ নং অধ্যায়ে ৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–আমাকে বলা হয় এ বিশ্ব জগতের প্রভু, জন্ম নেয়নি, কোন শুরু নেই। শ্বেতাশ্বেত্র উপনিষদের ৬নং অধ্যায়ের ৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, মহান ঈশ্বরের কোন বাবা নেই কোন মা নেই।

শ্বেতাশ্বেত্র উপনিষদের ৪নং অধ্যায়ের ১৯ নং অনুচ্ছেদে আছে, এ ছাড়াও যজুর্বেদ ৩২নং অধ্যায়ে ৩য় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, মহান ঈশ্বরের কোন প্রতিমা নেই, ফটোগ্রাফ নেই, কোন মূর্তি নেই, কোন ভাস্কর্য নেই।

যদি কোন লোক দাবি করে যে সে আল্লাহ এবং সে এ চারটা শর্ত পূরণ করতে পারে আমরা মুসলিমরা কোনরকম আপত্তি ছাড়াই তাকে আল্লাহ বলে মেনে নেব। যেমন– ধরেন কিছু লোক বলে ভগবান রজনী ছিলেন মহান ঈশ্বর। আমি কখনোই বলি না হিন্দুরা ভগবান রজনীশকে ঈশ্বর বলে মানে, আমি বলেছি কিছু লোক তাকে ঈশ্বর বলে মানে। আসুন দেখি রজনীশকে আমরা টেস্ট করি। প্রথম টেস্ট হলো আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। রজনীশ কি এক, অদ্বিতীয়? সেই কি একমাত্র লোক যে নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেছিল? এরকম অনেক মানুষ ছিল আর এদেশে হাজার হাজার লোক নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেছে। রজনীশ একমাত্র নয়, তবে রজনীশ ভক্তরা বলে, না না উনি একটু আলাদা।

এবার পরের টেস্ট। আল্লাহ অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী। রজনীশ কি অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী? আমরা তার আত্মজীবনী থেকে জানি, রজনীশ ভুগছিলেন অ্যাজমা, ডায়াবেটিস আর পিঠের ব্যথায়। চিন্তা করেন মহান ঈশ্বরের হয়েছে অ্যাজমা, ডায়াবেটিস, পিঠের ব্যথা।

তৃতীয় টেস্ট– তিনি জন্ম নেননি, কাউকে জন্ম দেননি। ভগবান রজনীশ জন্মেছিলেন মধ্য প্রদেশে। তার বাবা-মাও ছিলেন। ১৯৮১ সালে তিনি আমেরিকায় গেলেন তখন হাজারো আমেরিকান তার ভক্ত হয়ে গেল। তারপর আমেরিকার অরিগন প্রদেশে বানালেন একটা সেন্টার আর তার নাম দিলেন রজনীশ পুরম। পরবর্তীতে আমেরিকান সরকার তাকে অ্যারেস্ট করে কারাবন্দী করে রাখল। রজনীশ বলতো যে, আমেরিকান সরকার তাকে স্লো পয়জনিং করেছে। চিন্তা করেন মহান ঈশ্বরকে স্লো পয়জনিং করা হয়েছে। ১৯৮৫ সালে আমেরিকান সরকার তাকে বের করে

দিলে সে ইন্ডিয়ায় চলে আসে তারপর এখানে পুণায় আরেকটা সেন্টার খোলা হল তার নাম দিল "উশকমেয়ুন"। যদি রজনীশের সমাধির কাছে কখনো যান, তার সমাধির ওপর লেখা আছে, ভগবান রজনীশ পোষ, কখনো জন্মাননি কখনো মরেণনি, তবে পৃথিবীতে ভ্রমণ করেছেন ১৯৩১ সালের ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত; কিন্তু তার সমাধিতে এটা লিখতে ভুলে গেছে যে, পৃথিবীর ২১টা দেশ তাকে ভিসা দেয়নি।

মহান ঈশ্বর আসলেন এ পৃথিবীতে, বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করার জন্য, তার নাকি ভিসাও লাগে। তখন গ্রিসের আর্চবিশপ বলেছিলেন, যদি রজনীশকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে না দেয়া হয়, তবে আগে তার ঘর পোড়াব পরে ভক্তদের ঘর পোড়াব।

শেষ টেস্ট– তার সমতুল্য কেউ নেই। পরীক্ষা এতই কঠিন যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই পাস করবে না। যখনই আল্লাহর সাথে কারো তুলনা করবেন, সে আল্লাহ নয়। এখন ভগবান রজনীশ অন্য অনেক মানুষের মত মুখে দাঁড়ি ছিল, দুটা চোখ, নাক, দুটা হাত। যদি কেউ বলে যে, আল্লাহ তায়ালা হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী, আপনারা কি শোয়ার্জনিগারের নাম শুনেছেন? এ লোকের নাম কখনো শুনেছেন? এ লোক একসময় ছিল মিস্টার ওয়ার্ল্ড, মিস্টার ইউনিভার্স। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী লোক। যখনই কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে তুলনা করবেন, হোক সেটা আরনল্ড শোয়ার্জনিগার, হোক দারা সিং, হোক সেটা কিং কং, হোক সেটা হাজার গুণ বা লক্ষ গুণ। যখনই আল্লাহর সাথে পৃথিবীর কোন কিছুর তুলনা করা হবে– সে আল্লাহ নয়। তার সমতুল্য কেউ নাই। এ হল আল্লাহর চার লাইনের সংজ্ঞা। আপনি যে ঈশ্বরের পূজা করছেন সেই ঈশ্বরকে সূরা এখলাস দিয়ে টেস্ট করুন যদি পাস করে তাহলে সত্যিকারের ঈশ্বর, তা না হলে নকল ঈশ্বর।

প্রশ্ন ঃ ১০৯। ইসলাম ধর্মে পাপের সংজ্ঞাটা কি? পাপের প্রকারভেদ কি? আর এ পাপের সাথে হিন্দু বা খ্রিস্টান ধর্মে যে পাপের কথা বলা হয়েছে তার পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, ইসলাম ধর্মে পাপের সংজ্ঞাটা কি? আর হিন্দু ধর্ম বা খ্রিস্টান ধর্মের সাথে এ পাপের পার্থক্যটা কোথায়?

এক কথায় পাপ মানে আল্লাহর আদেশগুলো অমান্য করা। আল্লাহ আমাদের যা নির্দেশ দিয়েছেন, যদি তার বিরুদ্ধে যান সেটাই পাপ। যেমন– আল্লাহ বলেছেন, তোমরা প্রার্থনা কর। যদি প্রার্থনা না করেন তাহলে পাপ করছেন। আল্লাহ বলেছেন, তোমরা মদ খেয়ো না। যদি খান তাহলে পাপ করছেন। তাহলে আল্লাহর আদেশ অমান্য করাই পাপ। আর সব ধর্মে পাপের সংজ্ঞা এটাই। হিন্দু আর খ্রিস্টান ধর্ম একই কথা বলছে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১১০। আজকে এ অনুষ্ঠানে আসতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। আপনার এ মূল্যবান কথাগুলো সবার কাজে আসবে। আমরা আপনার লেকচার শুনে খুবই মুগ্ধ হয়েছি। অনেকের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলেছে। আমার নাম রামদাস। ইলেকশন বোর্ডের পার্সেস অফিসার। আমি একজন হিন্দু তারপরও ইসলাম ধর্মকে অনেক শ্রদ্ধা করি আর ভালোবাসি। আমি আপনার কথার সাথে একমত যে হিন্দু ধর্ম কখনোই মূর্তি পূজার কথা বলে না। আসলে আমাদের হিন্দু ধর্মকে প্রভাবিত করেছে তথাকথিত ধর্মীয় নেতারা। তারা মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। শতকরা নব্বই ভাগ হিন্দু ভুল পথে চলে যাচ্ছে। বেদ আর উপনিষদ কখনই মূর্তি পূজার কথা বলে না। যেটা বলা হয়েছে সেটা রুহ। রুহ, এটার কথা বলা হয়েছে "রুহ খোদাকি এনায়েতে হ্যায়"। এ রুহকে খ্রিস্ট ও হিন্দু ধর্মে বলা হয় আত্মা আর ইসলাম ধর্মে বলা হয় রুহ। এটা খুবই দুর্ভাগ্য যে, সব ধর্মের ধর্মীয় নেতাই মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করছে এবং করেছে। আপনি একজন যথেষ্ট জ্ঞানী মানুষ।

আপনার কাছে আমার প্রশ্ন- আমার আগে এক ভদ্রলোক ঠিক কথাই বলেছিলেন যে ইসলামের অতীত খুব গৌরবের; তবে বর্তমানে ইসলাম সবার কাছে একটা হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছে। এর কারণ ইসলামের নেতারা ঠিক হিন্দু নেতাদের মতই তাদের অনুসারীদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। ভুল জিনিস শিখাচ্ছে। ধরুন, কোন হিন্দু কোন মুসলিমকে কিংবা কোন মুসলিম কোন হিন্দুকে যদি রক্ত দেয়, তবে তার জীবন বাঁচলো, এখানে কি এটা হতে পারে যে, হিন্দু-মুসলিমের রক্ত নিলে সে মুসলিম হয়ে যাবে, কিংবা মুসলিম কোন হিন্দুর রক্ত নিলে সে হিন্দু হয়ে যাবে? এটা আমার প্রথম প্রশ্ন। এখানে যার জীবন বাঁচল, সে তো দোয়া করবে আস বাবা আস আমার জীবন বাঁচিয়েছ। এখানে তো জীবন বাঁচানোর প্রশ্ন। এখানে কি ধর্মের গুরুত্বটা বেশি। আর এখানকার লোকজন আল্লাকে চিনতে চায় না। বস্তুর চাহিদা মিটলেই তারা খুশি।

ইসলাম সবাইকে ভালোবাসার কথা বলে। সব ধর্মই ভালোবাসার কথা বলে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম সেই ভালোবাসা অর্জনের কথা বলে। এজন্য ইসলামে যাকাত আছে যা দিয়ে গরিব ও প্রতিবেশীকে সাহায্য করা হয়। গরিবের মেয়ে বিয়ে হচ্ছে না বিয়ে দিয়ে দাও, গরিবকে সাহায্য করা। অন্য কোন ধর্মই ইসলামের মত এত মহান নয়। এটা খুবই মহান ধর্ম। দুর্ভাগ্যের কথা, বাস্তবে এর কোন প্রয়োগ হচ্ছে না। তাই আগের ভদ্রলোক বললেন মাদ্রাসাগুলো স্বচ্ছ হওয়া উচিত। সত্যি বলতে ধর্মীয় নেতাদের বোকামির

কারণে ইসলাম ধর্ম উপরে উঠছে না। বরঞ্চ বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। খ্রিস্টান ধর্ম তারা পৃথিবীতে রাজত্ব করতে চায়, তারা ইসলামের ক্ষতি করতে চায়। ইসলামের প্রতি খ্রিস্টানদের মনোভাব বিরূপ। হিন্দু ধর্ম এখানে ঠিক থাকতে চায়। এরাই ধর্মীয় নেতা। তারা জানে না রুহ্ কি। রুহ্ হল আল্লাহর দয়া। উপনিষদে আছে, ইসলামে আছে, বাইবেলে আছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন– হিন্দু ধর্ম নারীকে খারাপ চোখে দেখে। ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মও খারাপ চোখে দেখে। যে পুরুষকে জন্ম দিচ্ছে একজন নারী, সেই পুরুষই নারীকে ছোট করছে। সে হোক হিন্দু, খ্রিস্টান বা মুসলিম। এভাবে দেখবেন সব ধর্মেই একই রকম অবস্থা চলছে। সব ধর্মই এখন ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। নারীকে কোন ধর্মেই সম্মানের চোখে দেখা হয় না। পৃথিবীর সব ধর্মই নারীকে সব সময় খারাপ চোখে দেখে। ইসলাম কি বলে? যে দিন কেয়ামত হবে তার মানে মহাপ্রলয়, ইসলাম ধর্ম কেয়ামত সম্পর্কে কি বলছে?

উত্তর ঃ ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ এ ছোট্ট লেকচারের জন্য। ভালো কথাগুলোর জন্যও ধন্যবাদ। আপনি বললেন আমার কথা আর ইসলাম ধর্মের কথা। আমার কথা যদি বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার। বললেন আমি জানি, অনেক জানি। কিন্তু আমি নিজেকে একজন ছাত্র মনে করি বিভিন্ন ধর্মের ওপর। আপনি দুটো প্রশ্ন করলেন প্রথমটা রুহ্ নিয়ে, এরপর নারী নিয়ে, এ ছাড়াও আপনি বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। আপনি বললেন তথাকথিত ধর্মীয় নেতারা এ সমস্যা তৈরি করছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি একমত। এ ছাড়াও আপনি মন্তব্য করলেন যে, ইসলামের বদনাম করা হচ্ছে। ইসলামের ধর্মীয় নেতাদের কারণে এটা হচ্ছে। ইসলামের বদনাম ছড়াচ্ছে এদের কারণেই। অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় নেতাদের কথা বলি, তারা তাদের অনুসারীদের ধর্মগ্রন্থ পড়তে দিতে চায় না। সামগ্রিকভাবে ইসলামের কথা বললে, আমি ইসলামের ধর্মীয় নেতাদের ওপর দোষ চাপাব না। সামান্য কিছু কুলাঙ্গার থাকতে পারে, খুবই সামান্য।

হাতে গোনা কয়েকজন নেতা থাকতে পারে যারা ভুল পথে নিচ্ছে, কিন্তু এরা সংখ্যায় অনেক কম। মিডিয়া তাদের বেছে নেয় আর এমনভাবে তুলে ধরে যেন ইসলামের প্রত্যেক ধর্মীয় নেতাই এরকম। তাই ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন নেতা, বিশেষজ্ঞ, ওলামার কথা যদি বলতে হয়, তাদের ভালোবাসি, তাদের শ্রদ্ধা করি। হাতেগোনা কয়েকজন খুবই সামান্য তারা, এরাই মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়; তবে সামগ্রিকভাবে তারা ভালো কথা বলেন, তারা ইসলামের কথা বলেন, আমরা তাদের ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। অন্য ধর্মের ছবিটা আলাদা।

অন্যান্য ধর্মের অধিকাংশ ধর্মীয় নেতারা তাদের অনুসারীদের ধর্মীয় গ্রন্থ পড়তে দিতে চায় না। যেমন– আপনি বললেন হিন্দু ধর্মে মূর্তি পূজার কথা বলে না; কিন্তু

৯০ ভাগ হিন্দু মূর্তি পূজা করে। কারণ এরা চায় না যে, অনুসারীরা তাদের ধর্মগ্রন্থ পড়ুক। আপনার কথায় আসি। বললেন যে, কোন হিন্দু এক মুসলিমকে রক্ত দিল, সেই মুসলিমের জীবন বাঁচল। জীবন বাঁচানোই বড় কথা, এখানে সমস্যা কি? সেই মুসলিম কি হিন্দু হয়ে যায় বা হিন্দুকে রক্ত দিলে কি সেই হিন্দু মুসলিম হয়ে যায়?

সূরা মায়িদার ৩২নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

অর্থ : "যদি কেউ কোন মানুষের জীবন বাঁচায়, তবে সে যেন গোটা মানব জাতিকে বাঁচাল।"

তাহলে যদি কেউ কারো জীবন বাঁচায়, মুসলিমকে হিন্দুকে রক্ত দিক বা মুসলিম রক্ত দিক, সে যেন পুরো মানব জাতিকেই বাঁচাল। আয়াতটা আরো বলেছে, যদি কোন মানুষ কাউকে হত্যা করে আর সেটা হত্যার বা বিশৃঙ্খলা তৈরির অপরাধ না হয়, সে যেন পুরো মানুষ জাতিকেই হত্যা করল। কিন্তু কোন মানুষের জীবন বাঁচানো খুব ভালো কাজ, উঁচুমানের কাজ; কিন্তু কারো আখেরাত বাঁচানো সেটা আরো ভালো কাজ। আর সেই জন্যই আমি আগে ডাক্তার ছিলাম। এটাই হলো শ্রেষ্ঠ পেশা। মানুষের জীবন বাঁচানো। আমি ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম ভেবেছিলাম এটা মহান পেশা। আসলেও তাই। তবে এর চাইতেও ভালো আছে– পবিত্র কোরআনের সূরা ফুসিলাতের ৩৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা আছে, "কোথায় সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করে, যে সৎকর্ম করে আর বলে যে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত যে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে।"

তাই একজন শরীরের ডাক্তার থেকে হয়েছি আত্মার ডাক্তার। এটা আরো ভালো পেশা। তাহলে রক্ত দিয়ে কারো জীবন বাঁচানো ভালো কথা, তবে কাউকে সত্যিটা জানানো তার আখেরাত বাঁচানো আরো ভালো। আমার কাজ হলো সব মানুষের কাছে ধর্ম প্রচার করা। মুসলিমদের বলি কোরআন মেনে চলুন, অনুসরণ করুন আর শেষ নবীকে মেনে চলুন। আমি বলি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানদের যেটা কমন অন্তত সেটা মেনে নেন। আমাদের মাঝে যেগুলো কমন সেটা মেনে নেন। যেগুলো আলাদা সেটা নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। আমি বাঁচাতে চাইছি তার আখেরাতকে। আখেরাতকে বাঁচানো ইহকালের জীবন বাঁচনোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ জীবনটাও ভালো গুরুত্বপূর্ণ, যখন দোয়া করি দুটোর জন্যই করি। হে আল্লাহ! আমাকে ইহকাল ও পরকালে ভালো রাখ এবং আমাকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করো। তবে পরকাল অনেক উপরে এ জীবনের চাইতে। সূরা তাহরিমের ১১ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ۔

অর্থ : "ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আছিয়া (রা), তিনি আল্লাহর কাছে বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি এ পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদের বিনিময়ে জান্নাতে একটি ঘর চাই, তোমার কাছে।"

তাহলে পৃথিবীর সবচাইতে ধনী লোকের স্ত্রী তার সব সম্পদের বিনিময়ে চাচ্ছেন আখিরাত। আপনার সঙ্গে একমত, মানুষকে ভালোবাসতে হবে। এটা খুব ভালো কাজ। তবে কারো পরকালের জীবন বাঁচানো সেটা আরো ভালো কাজ। আমি এখানে কি করছি–মানুষকে বলছি, সাদৃশ্যগুলো দেখেন, যেগুলো কমন সেগুলো অন্তত মেনে চলেন, যেগুলো আলাদা সেগুলো বাদ দেন। যেগুলো কমন সেগুলো মেনে চলেন, যেমন– মূর্তি পূজা করা যাবে না, আল্লাহ কেবল একজন, অন্তিম ঋষিকে মানতে হবে। তাহলে আমরা এক হবো। নাম দিয়ে কেউ কখনো মুসলিম হয় না। আব্দুল্লাহ, জাকির, সুলতান। মুসলিম মানে যে আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে। আগে এক বোনকে আমি বলেছিলাম, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করুন, এখন আপনাকেও বলছি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করুন। আর আল্লাহ তায়ালার লাস্ট টেস্টামেন্ট হলো পবিত্র কোরআন। এটার কথা আপনাদের ধর্মগ্রন্থে আছে, সেটার কথা মানতে হবে। বাইবেলেও আছে সেটাও মেনে চলতে হবে। আমি অনুরোধ করব, আসেন, আমরা সবাই মিলেমিশে থাকি, সবাই একসাথে থাকি আর আল্লাহ তায়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করি। মানুষ সাধারণত লেবেল জিনিসটা পছন্দ করে না। যেন লেবেলটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সূরা ইমরানের ১৯নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۔

অর্থ : "আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম।"

যদি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেন আপনার পরকালের জীবনটা বেঁচে যাবে। তারপর আপনি নারীদের কথা বললেন। বললেন সব ধর্মই নারীদের খারাপ চোখে দেখে। হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম। ইসলামের কথাও বললেন। সবাই খারাপ চোখে দেখে। হিন্দুরা খারাপ চোখে দেখে, খ্রিস্টানরা খারাপ চোখে দেখে, মুসলিমরাও খারাপ চোখে দেখে। মুসলিম মানে যে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে। আর সত্যিকারের মুসলিম কখনো নারীর দিকে খারাপ চোখে তাকাবে না। যদি কেউ করে সে মুসলিম নয়। পবিত্র কোরআনের সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষ শুধু নারীর হিজাবের কথা বলে। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে শুরুতেই বলেছেন পুরুষের হিজাবের কথা–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ـ

অর্থ : "মুমিন পুরুষদের বল!, তারা যেন দৃষ্টি সংযত আর লজ্জাস্থান হেফাজত করে।"

যখন কোন পুরুষ কোন নারীর দিকে তাকাবে, তার মনে কোন খারাপ চিন্তা আসলে সে দৃষ্টি নিচু করবে। আপনাদের বেদেও একথা আছে। ঋগবেদের ৮নং গ্রন্থের ৩৩ নং অনুচ্ছেদের ১৯নং মন্ত্রে বলা হয়েছে, ব্রাহ্ম তোমাদের নারী বানিয়েছেন। সুতরাং দৃষ্টি নিচু কর আর মাথার ওপর কাপড় দাও। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো নারীদের সম্মান করে তবে নারীদের ছোট করে এমন কথাও আছে, সেগুলো বলতে চাই না। যদি মনু স্মৃতি পড়েন, সেখানে নারীদের বিরুদ্ধে অনেক কথা আছে, আমি সেগুলো এখানে বলতে চাই না। কারণ আমি চাই না কেউ বলুক ডাঃ জাকির নায়েক হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করছেন। পবিত্র বাইবেলেও নারীদের সম্পর্কে ভালো কথা আছে আবার খারাপ কথাও আছে। ভালো কথাগুলো এখানে বলতে পারি, খারাপ কথাগুলো এখানে বলতে চাচ্ছি না।

আমি চ্যালেঞ্জ করছি, পবিত্র কোরআনের এমন একটা কথা দেখান যেটা নারীদের বিরুদ্ধে বলছে। একটা সহীহ হাদীস দেখান যেটা নারীদের বিরুদ্ধে বলেছে। হ্যাঁ! প্রত্যেক সম্প্রদায়ে কিছু কুলাঙ্গার দেখতে পাবেন। এমন কিছু মুসলিম আছে তারা শুধু নামেই মুসলিম। তারা মেয়েদের দিকে তাকাতে পারে, মেয়েদের উত্যক্ত করতে পারে। তবে তারা সত্যিকারের মুসলিম নয়। আপনি বললেন, ইসলাম আর মুসলিমরা মেয়েদের খারাপ চোখে দেখে। যদি এ কথাটা বলে থাকেন, ভুল বলেছেন। যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, নারীদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলে, আমি মেনে নেব। যদি বাইবেলে নারীদের বিরুদ্ধে বলা কথাগুলোর উদ্ধৃতি দেন, আমি মেনে নেব। তবে আমি চ্যালেঞ্জ করছি, পবিত্র কোরআনের এমন একটা কথা দেখান যেটা নারীদের বিরুদ্ধে কথা বলে।

এমন একটা সহীহ হাদীস দেখান যেটা নারীদের বিরুদ্ধে বলেছে। সত্য কথা হলো, হযরত মুহাম্মদ ﷺ পৃথিবীর প্রথম মানুষ যিনি নারীদের উপরে তুলেছেন। আর তাদের সমান অধিকার দিয়েছেন। আপনি যখন বললেন, ইসলাম নারীদের অসম্মান করে, কথাটা ঠিক নয়। তবে, কিছু লোক আছে যারা এগুলো করতে পারে। এখন ধরেন– মার্সিডিজ গাড়ি কত ভালো এটা জানার জন্য ড্রাইভারের সিটে যদি এক আনাড়ি লোককে বসান আর গাড়িটা যদি একসিডেন্ট করে, কাকে দোষ দেবেন? গাড়ি, না ড্রাইভারকে? ড্রাইভারকে দোষ দেবেন। মার্সিডিজ গাড়ি কত ভালো এটা জানতে যদি চান চেক করেন সেখানে কি কি আছে, এভারেজ স্পিড কেমন,

পিকআপ কেমন, গিয়ার রেসিও কেমন, নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো কি কি? তাহলে ইসলামকে বিচার করতে চাইলে– পবিত্র কোরআন আর সহীহ্ হাদীস পড়েন। মুসলিমদের দেখবেন না। যদি গাড়িকে পরীক্ষা করতে চান তাহলে পাকা ড্রাইভারকে বসান। শ্রেষ্ঠ মুসলিমের দৃষ্টান্ত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাইবেলের বুক অব জেনেসিস তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬ অনুচ্ছেদে মহান ঈশ্বর বলেছেন, তোমরা নারী, তোমরা খুব যন্ত্রণা পেয়ে সন্তানের জন্ম দেবে। এটা নারীদের প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপ, গর্ভধারণ নারীদের শাস্তি। ইসলাম ধর্মে গর্ভধারণ নারীদের জন্য সম্মানের। সূরা নিসার ১নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, গর্ভধারিণী মাকে সম্মান করো। সূরা লোকমানের ১৪নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ .

অর্থ : "আমি মানুষকে তাদের বাবা-মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে।"

মা অনেক কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে গর্ভধারণ করেন। অনেক কষ্ট পেয়ে সন্তানের জন্ম দেন। নবীজি বলেছেন, তোমরা যদি তোমাদের মাকে সোনার পাহাড় এনে দাও তারপরও তোমাকে গর্ভধারণের ঋণ শোধ হবে না। ইসলাম এ কথাই বলছে।

সহীহ্ বুখারীর ৮ খণ্ডের বুক আদাব ২য় অধ্যায়ের ২নং হাদীসে উল্লেখ আছে, একবার এক লোক নবীজির কাছে আসল। হে নবী! এ পৃথিবীতে কাকে সবচেয়ে বেশি সম্মান দেখাব? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মা। লোকটা বলল এরপর কাকে? নবীজি বললেন, তোমার মা। লোকটা বলল, এরপর কাকে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মা। লোকটা বলল, এরপর কাকে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তোমার বাবা।" তার মানে চার ভাগের তিন ভাগ পাচ্ছেন মা আর বাবা পাচ্ছেন এক ভাগ। এক কথায় মা গোল্ড মেডেল পাচ্ছেন, সিলভার পাচ্ছেন এবং ব্রোঞ্জ মেডেলও পাচ্ছেন। আর বাবা একটি সান্ত্বনা পুরস্কার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। ইসলাম আমাদের এমনটাই শেখায়। তবে আপনার কথা মানি। পশ্চিমা বিশ্ব–নারীদের ছোট করছে। পশ্চিমা বিশ্ব নারীদের স্বাধীনতার কথা বলে। আসলে তারা স্বাধীনতার কথা বলে শারীরিক অত্যাচার করে। তাদের সম্মান কেড়ে নেয়, আত্মার অবমাননা করে।

পশ্চিমা বিশ্ব বলে তারা নারীদের উঁচুতে বসিয়েছে। আসলে নিচে নামিয়েছে। তাদেরকে বানিয়েছে উপপত্নী, রক্ষিতা আর সমাজের প্রজাপতি। যারা রয়েছে আর্ট আর কালচারের রঙিন পর্দার আড়ালে। আর্ট আর কালচারের দোহাই দিয়ে তারা কি করছে? তাদের মেয়েদের বিক্রি করছে। বিক্রি করছে তাদের মায়েদের। তারা নাকি মেয়েদের উপরে তুলছে। সাধারণত বেশিরভাগ বিজ্ঞাপনেই দেখবেন নারী আছে। পণ্যটার সাথে হয়ত নারীর কোন সম্পর্কই নেই। মোটর সাইকেলের

বেশির বিজ্ঞাপনেই দেখবেন মেয়ে আছে। কতজন মেয়ে মটর সাইকেল চালায়? কিন্তু অ্যাডে মেয়ে থাকবেই। তারপর মোটর গাড়ির অ্যাডে। সেখানেও মেয়েদের দেখবেন। আমার এক বন্ধু একবার বলেছিল, বিএমডব্লিউর একটা বিখ্যাত অ্যাড মার্সিডিজ বেঞ্জ খুব ভাল গাড়ি। তো তরুণদের প্রিয় হলো বিএমডব্লিউ। এর স্পিড বেশি। পিকআপ ভালো। তো বিএমডব্লিউর একটা অ্যাডে বিকিনি পরা একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর নিচে লেখা "এখনি চালানো শুরু করুন।" কাকে মেয়েটা না গাড়িটা? বিক্রি করছে মেয়েদের, বিক্রি করছে মায়েদের। ইসলাম ধর্ম নারীদের সম্মান করে, মায়েদের সম্মান করে। বোনদের সম্মান করে। তাদের শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি।

প্রশ্ন ঃ ১১১। আমার নাম বিনয় কুমার। আমি একজন পেইন্টার। আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করব। মুহাম্মদ ﷺ বাইবেল বা অন্য বই থেকে কপি করা নিয়ে আপনার ওয়েবসাইটে দুটো যুক্তি দেখিয়েছেন। সেখানে উত্তর দিতে গিয়ে আপনি বলেছেন যে, নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর সময়ে বাইবেলের কোন আরবি অনুবাদ ছিল না। কিন্তু সহীহ্ আল বুখারী ৬ খণ্ডের ৬০ নং গ্রন্থ ৪৭৮ নম্বর হাদীস বলছে যে গসপেলগুলো আরবিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন বারাকা। এখানে আরেকটা ব্যাপার হলো, আপনি বললেন মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন নিরক্ষর, সেজন্য তিনি বই পড়তে পারতেন না। যেমন– পবিত্র বাইবেল। কিন্তু আমি এ উত্তরে সন্তুষ্ট নই। কারণ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোর কথা ধার করার জন্য মুহাম্মদ ﷺ-কে শিক্ষিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সেখানে প্রয়োজন ছিল মুহাম্মদ শুনবেন আর নিজের ইচ্ছেমত বেছে নিবেন। এ কথাগুলো শোনার পর মুহাম্মদ ﷺ সেগুলো সংশোধন করেছেন। তারপর তিনি ধর্মীয় আবরণে সেটাকে ঢেকে দিয়েছেন। আর দাবী করেছেন এটা আল্লাহর আসমানী কিতাব।

উত্তর ঃ ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়েছেন শুনে খুব ভালো লাগছে। ইনশাআল্লাহ্ আপনি সত্যের পথে আসবেন। আমার ধারণা আপনি খ্রিস্টান। আপনার নাম হলো বিনয় কুমার। ভাই বললেন, আমি দুটো যুক্তি দেখিয়েছি। দুটো না, অনেক যুক্তি দেখিয়েছি। আপনি বেছে নিয়েছেন ওই দুটো। আপনার চোখে পড়েছে ওই দুটো। তবে আমি দুটো যুক্তি দেখাইনি। এ দুটো ছাড়া আরও যুক্তি দেখিয়েছি। একটি যুক্তি দেখিয়েছিলাম যে, নবীজি ﷺ ছিলেন উম্মী।

সূরা আনকাবুতের ৪৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ.

অর্থ : "আমি সর্বশেষ নবীকে পাঠিয়েছি নিরক্ষর যাতে করে মিথ্যাচারীরা কোন রকম সন্দেহ পোষণ না করে।"

একজন নিরক্ষরের জন্য কাজটা অত্যন্ত কঠিন, এটা অবশ্যই মানবেন। আরো কঠিন হবে। আর যে লোক পড়তে পারে– তার পক্ষে নকল করা সহজ কাজ। কারণ, সে পড়তেও পারে, শুনতেও পারে। যে মানুষটা শুধু নিরক্ষর সে শুধু শুনতে পারে। তাহলে তর্কের খাতিরে অন্তত এটুকু মেনে নেবেন যে কাজটা কঠিন। এটা মানেন? তাহলে আমি অনেক পয়েন্ট বলেছিলাম, এটা একমাত্র পয়েন্ট না। অনেক পয়েন্টের মধ্যে এটা একটা। এরপর আরো পয়েন্ট আছে। আপনি বললেন যে, আমি বলেছি তখন বাইবেলের আরবি সংস্করণ ছিল না। আমি এখনো সেই কথাই বলছি। আপনি সহীহ্ বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বারাকার কথা বললেন, হ্যা–বারাকা গসপেল সম্পর্কে জানতেন। কিন্তু কোথাও বলা নেই তিনি অনুবাদ করেছিলেন। ভাই আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি। আমি খ্রিস্টানদের কথাই বলছি। প্রথমবার বাইবেল লেখা হয়েছিল দশম শতাব্দীতে। তার মানে খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞরা অনেক দেরি করে লিখেছেন। আর বাইবেলের প্রথম আরবি অনুবাদ সেটা নবীজির কয়েকশ' বছর পরের কথা। বারাকা আসলে বনী ইসরাঈল ছিলেন। খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে সে সময় জানতেন। আরবিও জানতেন। তিনি আসলে অনুবাদ করেননি। হয়ত কিছু নোট লিখেছিলেন। তবে পুরো বাইবেলের অনুবাদ অসম্ভব।

সহীহ বুখারীর কোথাও উল্লেখ নেই যে, বারাকা বাইবেল অনুবাদ করেছেন। আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি। এটা বলা আছে যে, বারাকা খ্রিস্টানদের আইন আর বাইবেল সম্পর্কে জানতেন। হয়ত কিছু নোটও লিখেছেন। সালমান রুশদীর কথা তো শুনেছেন? সালমান রুশদীর বইতেও কোরআনের আয়াত আছে, কিন্তু বইটাকে তো কোরআন বলা যাবে না। সালমান রুশদী বই লিখেছেন কোরআনের বিরুদ্ধে। আর সে বইতে পবিত্র কোরআনের আয়াত ছিল। তার মানে এই না যে, সেটা কোরআন। এছাড়া আমিও অনেক বই লিখেছি। সেখানে কোরআনের আয়াত দিয়েছি। তার মানে সেগুলোকে কোরআন বলা যাবে না। এটা বলতে পারবেন না যে, ডা. জাকির নায়েক কোরআনের অনুবাদ করেছেন। আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটে গেলে দেখতে পাবেন, সেখানে অনেক কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়েছি। সেগুলোকে কোরআন বলা যাবে না। এগুলো তো উদ্ধৃতি। এ ছাড়াও আরো বললেন যে, নবীজি ভুলগুলোকে শুধরে নিয়েছেন। আচ্ছা আপনার পয়েন্টটা খুব সুন্দর। আমি একটা লেকচার দিয়েছিলাম, "বাইবেল এন্ড কোরআন ইন দি লাইট অব সায়েন্স।" সেখানে প্রমাণ করেছিলাম যে, বাইবেলের অনেক বৈজ্ঞানিক ভুল আছে। যেমন– 'বুক অব জেনেসিসে'র এক অধ্যায়ে বলা আছে, এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টার হিসেবে ছয় দিনে। বলা হয়েছে যে, চাঁদের আলো তার নিজস্ব আলো। বুক অব জেনেসিসের প্রথম অধ্যায় ১৬-১৯ নং অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে, সূর্য

সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী সৃষ্টির পরে। পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে তৃতীয় দিনে আর সূর্য সৃষ্টি হয়েছে চতুর্থ দিনে। এরকম আরো অনেক আছে। আপনি যদি বলেন নবীজি ﷺ এগুলো নিয়ে শুদ্ধ করেছেন যেমন– চাঁদের যে আলো তার নিজস্ব আলো না, প্রতিফলিত আলো; সূরা ফুরকানের ৬১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, চাঁদের আলো প্রতিফলিত আলো। কোরআন বলছে, বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে ছয়টা লম্বা সময়কাল ধরে। আপনি কি তাহলে বলছেন নবীজি এগুলো শুদ্ধ করে নিয়েছেন? তিনি কি বিজ্ঞানী ছিলেন? নাহ। এটা আল্লাহর আসমানী কিতাব। আমার পুরো লেকচারটা শোনেন। কোন একটা অংশ বিশেষ শুনে আমার কথা নিয়ে মন্তব্য করবেন না। যদি তর্কের খাতিরে এটা মেনেও নিই, যে তিনি বাইবেল থেকে অনুবাদ করে পরে শুদ্ধ করে নিয়েছেন, কোন মানুষের পক্ষে এটা কি সম্ভব?

চৌদ্দশ বছর আগে বাইবেলের সব ভুল শুদ্ধ করবেন তিনি? এটা অসম্ভব। এতে প্রমাণ হয় যে, তিনি এটা লেখেন নি। এটা লিখেছেন আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা।

প্রশ্ন ঃ ১১২। আমার নাম ময়ুর। আমি আমার এক অমুসলিম ভাইয়ের পক্ষে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি। সে মাইকের সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। আমি কি প্রশ্ন করবো? আমি মুসলিম হয়েছি। প্রশ্নটা হলো– জাকির ভাই যেসব প্রশ্নের কথা বলেছেন এমন কি হতে পারে এই ভবিষ্যৎ বাণীগুলো পরে কেউ লিখেছে? যাতে ইসলাম ধর্মকে অন্য উপায়ে প্রচার করা যায়।

উত্তর ঃ ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। এটা কি সম্ভব যে এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সব ধর্মগ্রন্থে পরে কেউ লিখেছে? হ্যাঁ, হতে পারে। যদি পরে কেউ না লেখে, যদি ধর্মগ্রন্থগুলো বিশুদ্ধ হয় তাহলে মানবেন যে, এটাই আল্লাহর বাণী, তাহলে নবীজি ﷺকেও মানবেন। যদি বলেন পরে কেউ লিখেছে তাহলে আপনার ধর্মগ্রন্থগুলো অশুদ্ধ। সেগুলোকে বাদ দিতে হবে। আপনার ধর্মগ্রন্থগুলো বাদ দিলে একমাত্র বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো এ কোরআন। দুভাবেই উত্তরটা কোরআন। দুভাবেই আপনি হারবেন।

প্রশ্ন ঃ ১১৩। আমার নাম রমেশ কুমার। নয়াদিল্লি থেকে এসেছি। পেশায় একজন ধর্মযাজক। আপনার লেকচারে বললেন কোরআন হল চূড়ান্ত। আমার একটা প্রশ্ন আছে। ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক কোরআনের হাফেজ মারা গিয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, আবু বকরের সময় পবিত্র কোরআন হারিয়ে গেছে। সহীহ বুখারীর ৬নং খণ্ডের ৫১০নং হাদীস বলছে– ইসলামের তৃতীয় খলিফা ভখন হারেমীয়ার লোকদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। সে সময় তিনি পবিত্র কোরআনের কিছু আলাদা সংস্করণ পেলেন তখন ওসমান কোরআন লিখলেন। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন, আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আমিই সংরক্ষণ করব। কিন্তু কোরআন সংরক্ষিত

হয়নি। আমি জানতে চাই, কোরআন, কখন, কোথায়, কিভাবে, কার মাধ্যমে বিকৃত হয়েছে?

উত্তর ঃ ভাই, আপনি সূরা হিজরের নয় নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি দিলেন যেখানে আল্লাহ বলেছেন, আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমিই সংরক্ষণ করব। তাহলে কোরআন বলছে যে, কোরআন বিকৃত হয়নি। আল্লাহ বলছেন যে, কোরআন বিশুদ্ধ। তাহলে সহীহ বুখারী কেন বলছে যে, কোরআন হারিয়ে গেছে হযরত আবু বকরের সময়ে?

তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান আসলেন, তিনি কোরআনের অনেক সংস্করণ পেলেন। তারপর এটা কিভাবে হল? ভাই, সহীহ বুখারীর যে কথাটা বলছেন সেটা ঠিক। যেটা হযরত ওসমান (রা) পেয়েছেন সেটা হল বিভিন্ন বাচনভঙ্গি। যেমন- ইংরেজ ভাষায় দেখবেন অনেক বাচনভঙ্গি আছে। একই ইংরেজি সাউথ-ইন্ডিয়ানরা একভাবে বলে, ইংরেজরা একভাবে বলে, হায়দ্রাবাদীদের বাচনভঙ্গিটা আলাদা। আমি সে ভাষায় লেকচার দিতে পারব। আমার স্ত্রী একবার আমাকে বলেছিলেন, তুমি হায়দ্রাবাদী ভাষায় লেকচার দাও না কেন? মুম্বাইয়ের ভাষা আবার অন্যরকম। তাহলে একেক জায়গার ভাষা-বাচনভঙ্গি একেক রকম। সেই একইভাবে সে সময় হযরত ওসমান (রা) দেখলেন অনেক বাচনভঙ্গি। আমাদের নবীজি ﷺ সাতটা বাচনভঙ্গির অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই উচ্চারণ করতে গিয়ে ভুল হয়েছিল। এ ভুল শুধরানোর জন্য হযরত ওসমান বললেন এটাকে চূড়ান্ত করো। আমরা এখানে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করব। তাহলে বুঝতে পারলেন যে, তিনি বাচনভঙ্গি শুদ্ধ করেছেন। আমেরিকান বাচনভঙ্গি আলাদা, ব্রিটিশ বাচনভঙ্গি আলাদা, নিউজিল্যান্ডের বাচনভঙ্গি আলাদা। কিছু গ্রহণযোগ্য, কিছু গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে ওসমান (রা) সংশোধন করেছিলেন বাচনভঙ্গি।

মহানবী ﷺ-এর সময় যখন কোরআন নাযিল হত, লেখক থাকতো। নবীজি ﷺ যা শুনেছেন, লেখকদের সেগুলো বলতেন, সাহাবাগণ লিখে নিতেন। নবীজি ﷺ আবার চেক করতেন। যায়েদ বিন ছাবিত ছিলেন প্রধান লেখক। আরো অনেকে ছিলেন। এ ছাড়া অনেক সাহাবী নবীজি ﷺ-এর কাছে আয়াতগুলো শুনতেন আর বাসায় গিয়ে লিখে ফেলতেন। এখানে ধরেন কেউ আমার লেকচার শুনল, তারপর বাসায় গিয়ে লিখলো। এটা ঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে। অবিকল আমার মত হবে না। আমি যদি চেক করে নোট দিই, এটা লিখেন, আবার পড়েন, এটা ভুল হয়েছে শুধরে নেন। তাহলে কোরআনের যে কপিটা আমাদের নবীজির কাছে ছিল সেটা তিনি নিজেই চেক করেছিলেন। এটা দেয়া হয়েছিল তার স্ত্রী বিবি হাফছা (রা)-এর কাছে। তিনি ছিলেন হযরত ওমর (রা)-এর মেয়ে। এটা বিবি হাফছার কাছে ছিল। পরে মানুষজন নিজে থেকেই লেখা শুরু করল। তাদের স্মৃতি থেকে সেখানে ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। পবিত্র কোরআন কিন্তু ভুল নয়। যদিও সেখানে

বেশ কিছু লোকের লেখা নোট ছিল। হযরত ওসমান বললেন এখন তো মানুষ ভুল বুঝতে শুরু করবে। এখন আমি কোরআনের সঠিক কপি করবো তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সেটাকে ছড়িয়ে দেব। আর মুসলিমরা বুঝতে পারবে যে এটাই আসল। কোরআনের পরিবর্তন হয়নি। মানুষজন নোট লেখা শুরু করলো। অন্যরা বুঝতে পারতো না যে, এটাই শুদ্ধ কোরআন না ভুল কোরআন। হযরত ওসমান একটি কমিটি বানালেন ছাহাবাগণকে নিয়ে। তারপর অরিজিনাল থেকে কপি করলেন। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিলেন। এরকম একটা কপি এখনো তাসখন্দে আছে। এছাড়া তুরস্কের কপটাকি মিউজিয়ামে। যদি পরীক্ষা করেন, অবিকল একই কথা। এ ছাড়াও হাফেজরা আছেন। কথার কথা, যদি পৃথিবীর কোরআনের সব কপি পুড়িয়ে ফেললেও পৃথিবীব্যাপী হাজার-হাজার হাফিজে কোরআন আছেন তারা আবার কোরআনের কপি তৈরি করতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ ১১৪। আমার নাম সুতপা সরকার। আমি পেশায় একজন শিক্ষিকা। আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। ইসলাম ধর্ম কর্মে আর মোক্ষলাভ সম্পর্কে কি বলা আছে? আর এ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের ধারণার সাথে পার্থক্যটা কি?

উত্তর ঃ বোন, আপনি প্রশ্ন করলেন ইসলামে কর্ম আর মোক্ষ লাভ সম্পর্কে কি বলা হয়েছে? হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী কর্ম মানে কাজ। আমরা যে কাজগুলো করি, এ কর্ম করতে হবে ধর্ম অনুযায়ী। কিন্তু ধর্মীয় বিশেষজ্ঞরা একটা দর্শনে বিশ্বাস করেন যেটাকে বলা হয় সানসকারা। অর্থাৎ জন্ম আর মৃত্যুর চক্র। জন্ম-মৃত্যু এর পর আবার জীবিত হওয়া। অথবা মানুষের আত্মার ভ্রমণ করার থিওরী। তারা বিশ্বাস করে আপনি ভাল কাজ করলে পরবর্তী জীবনে জন্ম নেবেন কোন উঁচুস্তরে। যদি খারাপ কাজ করেন পরবর্তী জীবনে জন্মাবেন কোন নিচু স্তরে। ভাল কাজ করলে মানুষ হয়ে জন্মাবেন আর খারাপ কাজ করলে পশু হয়ে জন্মাবেন। হয়ত ইঁদুর হবেন, বিড়াল হবেন বা তেলাপোকা হয়ে জন্ম নেবেন। আর যদি ভাল-খারাপ কিছুই না থাকে তবে মোক্ষ লাভ করবেন। জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বের হয়ে আসবেন। এটা হিন্দু বিশেষজ্ঞদের দর্শন। তবে বেদে এর কোন রকম উল্লেখ নেই। বেদ হল হিন্দুদের সর্বোচ্চ ধর্মগ্রন্থ। সেখানে এর উল্লেখ নেই। তারা বলে যে, এ কথাগুলো ভগবত গীতায় আছে।

ভগবত গীতার দুই অধ্যায়ের বাইশ অনুচ্ছেদে বলা আছে যেভাবে একটা শরীর পোশাক বদলায় তারপর নতুন পোশাক পরে একইভাবে আত্মা নতুন শরীরে প্রবেশ করে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে পুনর্জন্ম বলে একটা কথা আছে। ঋগবেদের ১০নং গ্রন্থের ১৬ নং অধ্যায়ের ৪-৫ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে– পুনঃ মানে পরবর্তী, জন্ম মানে জীবন। পরবর্তী জীবন। আমরা পরের জীবনে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা পৃথিবীতে একবার আসব, মাত্র একবারই আসব, আর আল্লাহর

আদেশে মারা যাব। একবারই মারা যাব। পরবর্তীতে আখেরাতে গিয়ে আবার জীবিত হব। তাহলে ইসলাম অনুযায়ী আমরা পৃথিবীতে একবারই আসব তারপর আবার আল্লাহর আদেশে কেয়ামতের দিনে আবার জীবিত হব। কাজের ওপর নির্ভর করে বেহেশত বা দোজখে যাবেন। বেদ এমন কথাই বলছে। কিন্তু হিন্দু বিশেষজ্ঞরা এটা বোঝে না যে, কেন মানুষ ধনী হয়, গরিব হয়, বোবা হয়, কেউবা স্বাস্থ্যবান? ঈশ্বরতো কোন অন্যায় করেন না। তাই তারা একটা দর্শন মানল জন্ম মৃত্যু-জন্ম-মৃত্যু, আত্মার ভ্রমণ করে বেড়ানো। বেদের কোথাও এর উল্লেখ নেই। এমনকি ভগবত গীতাও এমন কথাই বলছে। পুরনো পোশাক বাদ দিয়ে মানুষ যেমন নতুন পোশাক পরে একইভাবে আত্মা পুরনো শরীর বাদ দিয়ে নতুন শরীরে যায়। একবার। একবার মারা যাবেন। একবারই পুনর্জীবিত হবেন। তবে ইসলামে এ প্রশ্নটার উত্তর রয়েছে। হিন্দু বিশেষজ্ঞরা এটা বুঝতে পারে না যে ঈশ্বর কেন এমন করবেন। কিছু মানুষ জন্ম থেকে বোবা, কেউবা স্বাস্থ্যবান, কারো হার্টের সমস্যা, কেউ গরিব আবার কেউ ধনী। কোরআনের সূরা মুলক এর দুই নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ ـ

অর্থ : "আল্লাহ জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য।"

এ জীবনটা পরকালের জন্য পরীক্ষা। কেউ হয়ত জন্মায় গরিব হয়ে আবার কেউ ধনী হয়ে। ধনীদের ক্ষেত্রে কোরআন বলছে যাকাত দিতে হবে। ধনীরা যাকাত দিতে পারে, নাও দিতে পারে, অর্ধেকও দিতে পারে। হয় সে একশতে একশ পাবে, না হয় পঞ্চাশ পাবে, কোন যাকাত না দিলে সে শুন্য পাবে। কিন্তু গরিব লোকের ক্ষেত্রে সে একশতে একশ' পাবে। কারণ, গরিব লোককে আর যাকাতের পরীক্ষা দিতে হবে না। আমাদের নবীজি ﷺ বলেছেন, গরিব লোকের চাইতে ধনী লোকের বেহেশতে যাওয়া কঠিন। ধনীরা ভাববে, আমাকে এত যাকাত দিতে হবে। আমি দিতেও পারি, আবার নাও দিতে পারি। তাই একেক জনের পরীক্ষা একেক রকম। এটা আমরা মানি না যে, আগের জন্মের পাপের কারণে কেউ অন্ধ হয়ে জন্মেছে। এটা পরকালের জন্য পরীক্ষা। হয়ত এটা বাবা-মায়ের জন্য পরীক্ষা। সূরা আনফালের ২৮নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ـ

অর্থ : "আর জেনে রাখ যে, তোমাদের সম্পদ ও সন্তানেরা তোমাদের জন্য পরীক্ষা।"

হয়ত বাবা-মা ধার্মিক কিন্তু দেখা গেল তাদের সন্তান একেবারে জন্ম থেকেই

অসুখ। দেখে কেউ হয়ত বলবে আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি না। যারা ঈমানদার তারা বলবে এখনো আল্লাহকে বিশ্বাস করি। যত কঠিন পরীক্ষা তত বড় পুরস্কার। হয়ত আল্লাহ তাদের দেবেন জান্নাতুল ফেরদৌস। যদি গ্রাজুয়েশন পাস করেন আপনি হবেন বিএ, বিএসসি। আর এমবিবিএস পাস করলে হবেন ডাক্তার। যত কঠিন পরীক্ষা তত মূল্যবান ডিগ্রি। আমরা মানি কেউ পাপী হয়ে জন্মায় না। সবাই মাসুম হয়ে জন্মায়। হিন্দু বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করে এ পৃথিবীতে বারবার আসবেন। ভাল কাজ করলে মানুষ হয়ে আসবেন আর খারাপ কাজ করলে পশু হয়ে জন্মাবেন। এ কথাটা বেদের কোথাও বলা নেই। আর আপনি যদি একটু চিন্তা করেন বোন, অপরাধের মাত্রা বাড়ছে না কমছে? বাড়ছে। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে না কি কমছে? বাড়ছে। তাহলে যুক্তি বলে– অপরাধের মাত্রা যদি বাড়ে তাহলে মানুষ তো কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু কমছে না। এতেই প্রমাণ হয়, এ দর্শনটা ভুল।

প্রশ্ন ঃ ১১৫। আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি সায়মা কাদরী এবং আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কেন ইসলাম ধর্মে কোন নারী নবী আসেনি?

উত্তর ঃ আমার বোন প্রশ্ন করেছেন, কেন ইসলামে নারী নবী আসেনি? যদি নবী বলতে আপনি বোঝেন যে, এমন এক ব্যক্তি যিনি আল্লাহর পক্ষ হতে বাণী গ্রহণ করেন এবং যিনি মানব জাতির নেতা হিসেবে কাজ করেন। সেই অর্থে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, ইসলামে আমরা কোন নারী নবী পাইনি এবং আমি মনে করি এটি সঠিক। কারণ, যদি নারীকে নবী হতে হয় তবে সে সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্ট করে বলা আছে পুরুষ হলো পরিবার প্রধান। সুতরাং যদি পুরুষ পরিবারের প্রধান হয়ে থাকে তবে কিভাবে নারী সমগ্র মানুষের নেতৃত্ব দিবে? এবার দ্বিতীয় অংশে আসি— একজন নবীকে নামাজের জামায়াতে নেতৃত্ব দিতে হয়। আমি পূর্বেই বলেছি নামাজে বেশ কিছু শারীরিক কসরত রয়েছে যেমন– কিয়াম, রুকু, সেজদা ইত্যাদি। যদি একজন নারী নবী নামাজে নেতৃত্ব দিত তবে জামায়াতের পিছনে যে সকল পুরুষ নামাজ পড়ে–তারা এবং ইমাম উভয়ের পক্ষে এটি বেশ বিব্রতকর হত।

এখানে আরো কিছু ব্যাপার রয়েছে। যেমন– একজন নবীকে সকল সাধারণ মানুষের সাথে সর্বদা দেখা সাক্ষাৎ করতে হয়, এটা একজন মহিলা নবীর পক্ষে অসম্ভব। কারণ, ইসলাম নারী-পুরুষ পরস্পরের মেলামেশার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে।

যদি মহিলা নবী হতো এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সে যদি গর্ভবতী হতো, তবে তার পক্ষে কয়েক মাস নবুওয়াতের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হতো না। যদি তার সন্তান হয় তবে তার পক্ষে এটা খুব কঠিন হয়ে যাবে সন্তান পালন করা এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করা।

কিন্তু একজন পুরুষের পক্ষে পিতৃত্ব এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করা একজন মহিলার মাতৃত্ব এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করা থেকে তুলনামূলক সহজ।

কিন্তু যদি নবী বলতে আপনি বোঝেন যে, এমন একজন ব্যক্তি যিনি আল্লাহর পছন্দের এবং যিনি পবিত্র ও খাঁটি ব্যক্তি, তবে সেখানে কিছু নারীর উদাহরণ রয়েছে আমি এখানে উত্তম উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করব বিবি মরিয়ম (আ)-এর নাম। এটি সূরা মরিয়মে উল্লেখ রয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ৪২ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ : ‘যখন ফেরেশতা মরিয়মকে বললেন, ‘আল্লাহ আপনাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন বিশ্বজগতের নারীদের উপর।’ (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৪২)

যদি আপনি মনে করেন নবী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি মনোনীত এবং পরিশুদ্ধ, তবে আমরা বিবি মরিয়মকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। যিনি ছিলেন যিশু খ্রিস্ট বা ঈশা (আ)-এর মাতা। আমাদের আরো উদাহরণ রয়েছে সূরা তাহরীমে। এখানে বলা হয়েছে,

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ـ

অর্থ : ‘আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য ফেরআওনের স্ত্রী (আছিয়া)-এর অবস্থা বর্ণনা করছেন।’ (সূরা তাহরীম ঃ ১১)

তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন–

اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থ : ‘হে আমার রব আমার জন্য বেহেশতের মধ্যে আপনার সন্নিকটে গৃহ নির্মাণ করে দিন, আর আমাকে ফেরআউন হতে এবং তার (কুফুরী) আচরণ হতে রক্ষা করুন, আর আমাকে সমস্ত অত্যাচারী লোকজন হতে হেফাজত করুন।’ (সূরা তাহ্রীম ঃ ১১)

একটু কল্পনা করুন, তিনি ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সম্রাট ফারাও-এর স্ত্রী এবং তিনি আল্লাহর ভালবাসার জন্য স্বীয় সব আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা ত্যাগ করতে চেয়েছেন।

উপরে উল্লিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামে চার জন মহিলা নবী এসেছেন। তারা হলেন, বিবি মরিয়ম (আ), বিবি আছিয়া (আ), বিবি ফাতেমা (রা) ও বিবি খাদিজা (রা)। আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১১৬। আমার নাম সামির, আমি একজন ছাত্র। আমার প্রশ্ন হল, ইসলামে একজন পুরুষকে সর্বাধিক চারটি বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন ১১ জন স্ত্রী গ্রহণ করেছেন– এতে কি তাঁকে উচ্চ যৌন আকাঙ্ক্ষী বলে কটাক্ষ করার সুযোগ থাকে না?

উত্তর ঃ আমি আপনার কথার সাথে একমত যে, পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে সর্বাধিক ৪ জন স্ত্রী রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের অন্যত্র তথা সূরা আহযাবে বলা হয়েছে যে–

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا .

অর্থ : 'হে নবী আপনি এদের ব্যতীত অন্য কোন নারী আপনার জন্য হালাল নয়। আপনার জন্য এও হালাল নয় যে, আপনি (বর্তমান) স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রীগণকে গ্রহণ করেন (অবশ্য পরিবর্তন ছাড়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা বা এদের কাউকে তালাক দেয়া না-জায়েজ নয়।) যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে আকৃষ্ট করে, তবে ঐ সব মহিলা ব্যতীত যারা আপনার মালিকানাধীন।' (সূরা আহযাব ঃ ৫২)

এই আয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুমতি দিয়েছে তার সমস্ত স্ত্রীগণকে রাখতে এবং একই সাথে তাকে নতুন কোন মহিলাকে বিয়ে করতে, তবে তার অধিকারভুক্ত মহিলাগণ বাদ দিয়ে।

এখন যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন কেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নতুন কাউকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি এবং কেন তার বর্তমান স্ত্রীদের ডিভোর্স দেয়ার কথা বলা হয়নি— তখন আপনি অন্য আয়াতে দেখবেন যেখানে বলা হয়েছে যে, নবীর স্ত্রীগণকে হয় তারা তালাকপ্রাপ্ত নয় বিধবা; কেউ তাদের বিয়ে করতে পারবে না। কেননা তারা 'উম্মুল মুমেনিন' বা সকল মুমিনের মা।

সুতরাং কেউ তাদেরকে বিয়ে করতে পারবে না। আর স্বাভাবিক ব্যাপার হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডিভোর্স দিবেন না। যদি আপনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ১১টি বিয়ে নিয়ে বিশ্লেষণ করেন তবে দেখতে পাবেন যে, এগুলো হয় তিনি রাজনৈতিক কারণে, না হয় সমাজ সংস্কারের স্বার্থে করেছেন; তাঁর যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নয়।

তার প্রথম বিয়ে ছিল হযরত খাদিজা (রা)-এর সাথে। তখন খাদিজা (রা) ছিলেন ৪০ বছর বয়স্কা এবং নবীজি ছিলেন ২৫ বছর বয়স্ক।

তদুপরি তিনি ছিলেন দুবারের বিধবা। এখন চিন্তা করুন, তিনি যদি যৌন কামনা পূরণের জন্য বিয়ে করে থাকেন, তবে কেন তিনি পনেরো বছর বেশি বয়সের মহিলা বিয়ে করবেন? অধিকন্তু তিনি ছিলেন দুই বারের বিধবা।

আপনি আরো চিন্তা করুন, যতক্ষণ হযরত খাদীজা (রা) জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি কাউকে বিয়ে করেন নি। যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ৫০ তখন বিবি খাদীজা (রা) মৃত্যুবরণ করেন। কেবল ৫৩ থেকে ৫৬ বছরের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অন্য সব স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। এখন চিন্তা করুন, তিনি যদি অধিক কামাসক্ত থাকতেন তবে কি তিনি তরুণ বয়সে অন্য সব স্ত্রী গ্রহণ না করে ৫৩/৫৬ বয়সে বিয়ে করতেন?

বিজ্ঞান আমাদের বলে 'বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের যৌন ক্ষমতাও কমে যায়।' সুতরাং এটি নির্দিধায় বলা যায়, অধিক কামাসক্ত বলাটা নবীজির প্রতি এক ধরনের কটূক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুটি বিয়ে ছিল স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আর তা হল– বিবি খাদিজা (রা) ও বিবি আয়েশা (রা)-এর সাথে। আর বাকি বিয়ে ছিল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে– হয় সমাজ সংস্কারের স্বার্থে, নয়তো রাজনৈতিক স্বার্থে। আপনি যদি আরো লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন যে, তার স্ত্রীগণের মধ্যে কেবল দুই জনের বয়স ছিল ৩৬-এর নিচে। বাকি স্ত্রীদের বয়স ছিল ৩৬ থেকে ৫০ এর মধ্যে।

আমরা এখন প্রত্যেকটি বিয়ের কারণ উল্লেখ করার চেষ্টা করব।

প্রথমেই বলা যায় বিবি যোহায়রিয়া (রা) সম্পর্কে। তিনি ছিলেন বনু মুস্তালিক গোত্রের, যেই গোত্র তৎকালীন আরবে বেশ শক্তিশালী গোত্র হিসেবে পরিগণিত ছিল। এ গোত্রের সাথে তথা মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রের শত্রুতা ছিল, কিছুকাল পর তারা ইসলামি বাহিনীর কাছে পদানত হয়। তার পরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ে করেন। তিনি বিবি যোহায়রিয়াকে বিয়ে করার পর সাহাবীরা বললেন, আমরা কিভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়দের বন্দী হিসেবে রাখি? তারপর সাহাবীরা তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দুই গোত্র বন্ধু হয়ে গেল।

বিবি মাইমুনা (রা) ছিলেন বনী নাজাদ গোত্রপ্রধানের স্ত্রীর বোন, যে ৭০ জন মুসলিমকে হত্যা করেছে, যাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামি শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাইমুনা (রা)-কে বিয়ে করলেন, তখন বনু নাজাফ গোত্র মদিনার নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দিল এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নিল।

একইভাবে তিনি বিয়ে করেন উম্মে হাবিবা (রা)-কে, যিনি ছিলেন মক্কার অন্যতম প্রধান নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা। আর এ বিয়ে মক্কা বিজয়ে বিশাল অবদান রেখেছিল।

বিবি সাফিয়া (রা) ছিলেন প্রভাবশালী ইহুদি নেতার কন্যা। কিন্তু নবী করীম ﷺ তাঁকে বিয়ের ফলে তিনি মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ বিয়ে করেছিলেন হযরত ওমরের কন্যা হাফসা (রা)-কে। তাঁর সাহাবীদের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে। তিনি সামাজিক সংস্কারের অংশ হিসেবে বিয়ে করেন তাঁর চাচাতো বোন জয়নবকে (রা)। যিনি ছিলেন তালাক প্রাপ্তা।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, তাঁর প্রতিটি বিয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সামাজিক সংস্কার বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তাঁর প্রত্যেকটি বিয়ের ভিত্তি ছিল সমাজের মানুষের মধ্যে তথা গোত্রে গোত্রে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলা— যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নয়।

প্রশ্ন ঃ ১১৭। আমি হাসিনা ফারয়াজী। আমি আইনের ছাত্রী। আমার প্রশ্ন হল– বহুবিবাহ কোন দিক থেকে মহিলাদের জন্য উপকারী?

উত্তর ঃ তিনি প্রথম আমাকে প্রশ্ন করেছেন কেন ও কিভাবে বহুবিবাহ অর্থাৎ একসাথে একাধিক স্ত্রী রাখা মহিলাদের জন্য উপকারী। উত্তরে বলব, যদি একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করে, তবে এটি মহিলাদের এভাবে উপকার করে যে, এটি মহিলাদের সংযত রাখতে সাহায্য করে; কারণ যদি প্রত্যেক পুরুষ একটি মহিলা বিয়ে করে তবে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মহিলা স্বামী খুঁজে পাবে না। তখন তাদের সামনে দুইটি পথ খোলা থাকবে আর তাহলো, হয় এমন একজনকে বিয়ে করবে যার এক বা একাধিক স্ত্রী আছে, না হয় তারা 'পাবলিক প্রোপার্টি' হয়ে যাবে। অর্থাৎ, হয় সতীনের সংসার করবে না হয় জনগণের সম্পত্তি বেশ্যা হয়ে থাকবে। তাই ইসলামে বহু বিবাহের অনুমতি রয়েছে– তাদের সংযত রাখার জন্য, তাদের পাবলিক প্রোপার্টি বেশ্যা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

প্রশ্ন ঃ ১১৮। আমার নাম মোঃ আশরাফ। আমার প্রশ্ন হল– ইসলামে দত্তক নেয়া কি বৈধ?

উত্তর ঃ যদি দত্তক নেয়া বলতে আমরা বুঝি আপনি একজন বাচ্চা ছেলে গ্রহণ করেছেন, যে কিনা গরিব শিশু এবং তাকে আপনার গৃহে থাকা, খাওয়া ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করেছেন; সেক্ষেত্রে ইসলাম আপনাকে অনুমতি দিয়েছে। কুরআনে বারবার বলা হয়েছে, তোমরা গরিব ও অভাবী মানুষদের সাহায্য কর।

আপনি এমনি একটি শিশুকে পিতার আদর দিয়ে আপনার ঘরে পালন করতে পারবেন। কিন্তু ইসলামে এক্ষেত্রে বাধা হলো আপনি আইনগতভাবে তাকে গ্রহণ

করতে পারবেন না। তার নামের সাথে আপনার নাম সংযুক্ত করতে পারবেন না। আইনগত দত্তক নেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ, যদি কেউ এরকম দত্তক নেয় সেখানে বেশ কিছু জটিলতা থাকে। প্রথমতঃ শিশুটি ছেলে হোক বা মেয়ে হোক সে তার পূর্ব পরিচিতি হারাবে। দ্বিতীয়তঃ দত্তক নেয়ার পর আপনার নিজেরও সন্তান হতে পারে। তখন আপনি দত্তক শিশু থেকে নিজের সন্তানের প্রতি অধিক মনোযোগী হতে পারেন। তৃতীয়তঃ যদি আপনার সন্তান জন্ম নেয় এবং দত্তক শিশুটি আপনার নিজের শিশুর বিপরীত লিঙ্গের হয়, তখন তাঁরা খোলাখোলিভাবে একই বাসায় থাকতে পারবে না। কারণ তারা রক্ত সম্পর্কের ভাই বোন নয়।

যদি দত্তক শিশু মেয়ে হয় তাহলে সে বড় হওয়ার সাথে সাথে তাকে তার বাবার সাথে পর্দা করতে হবে। কারণ সে তার রক্ত সম্পর্কের কন্যা নয়।

আর যদি দত্তক শিশু ছেলে হয় এবং সে বড় হওয়ার সাথে সাথে তার সাথে তার কথিত মায়ের পর্দা করতে হবে এবং সে ছেলে যদি বড় হয় এবং বিয়ে করে তবে তার স্ত্রী ও তার কথিত পিতার মাঝে পর্দা থাকতে হবে।

তাছাড়া আরো কতিপয় কারণ রয়েছে– যদি আপনি দত্তক নেন, তবে আপনি আপনার আত্মীয়দের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন।

যদি কারো পিতা মারা যায় তবে তার যতটুকু সম্পদই থাকুক না কেন, কুরআন বর্ণিত নিয়মানুসারে তা তাদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি মারা যান, তার সন্তানও থাকে এবং তার দত্তক সন্তানও থাকে, সেক্ষেত্রে তার সন্তানগণ সম্পত্তির অংশ থেকে কিছুটা বঞ্চিত হবে। যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী, তার মা রেখে মারা যায় যার কোন সন্তান নেই, সেক্ষেত্রে স্ত্রী পাবে তার সম্পত্তির অর্ধেক। আর যদি তার সন্তান থাকে তবে সে পাবে ৬ ভাগের ১ ভাগ, যদি তার সন্তান না থাকে তবে সে পাবে এক তৃতীয়াংশ।

কিন্তু যদি তার দত্তক সন্তান থাকে তবে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তার ভাগের থেকে একটা অংশ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং এই ধরনের জটিলতা নিরসণে ইসলাম আইনত সন্তান দত্তক নেয়া নিষিদ্ধ করেছে।

প্রশ্ন ঃ ১১৯। আস্‌সালামু আলাইকুম, আমার নাম সাবা, আমি একজন ছাত্রী। জাকির ভাইয়ের কাছে আমার প্রশ্ন, পুরুষরা জান্নাতে গেলে সুন্দরী কুমারীদেরকে 'হুর' হিসেবে পাবে। মেয়েরা জান্নাতে গেলে কি পাবে?

উত্তর ঃ ড. জাকির ঃ পবিত্র কুরআনে কমপক্ষে চার জায়গায় 'হুর'-এর কথা বলা হয়েছে। 'হুর' এর কথা উল্লেখ আছে সূরা দুখানের ৫৪ নং আয়াতে, সূরা তূর এর ২০ নং আয়াতে, সূরা আর রাহমানের ৭২ নং আয়াতে এবং সূরা ওয়াকিয়ার ২২ নং আয়াতে। অধিকাংশ অনুবাদে বিশেষ করে উর্দু ভাষায় 'হুর'কে সুন্দরী কুমারী

হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি 'হুর' এর অর্থ সুন্দরী কুমারী হয়, তাহলে মহিলারা জান্নাতে কী পাবে? প্রকৃতপক্ষে, 'হুর' শব্দটি 'আহওয়ার' এবং 'হাওয়ার' এ দুটি শব্দের বহুবচন। 'আহওয়ার' পুরুষের জন্য প্রযোজ্য এবং 'হাওয়ার' মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। আর 'হুর' শব্দটি বৈশিষ্ট্য বহন করে 'হাওয়ার'-এর যা দ্বারা বুঝায় বড়, সাদা, সুন্দর চোখ এবং বিশেষত চোখের সাদা রং-কে বুঝায়।

আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় 'আয্ওয়াযুম মুতাহ্হারিন বলে একই কথা বুঝানো হয়েছে। সূরা বাকারার ২৫ নং আয়াতে ও সূরা নিসার ৫৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে– أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ "আয্ওয়াজুম মুতাহ্হারা", অর্থ হল সঙ্গী, সাথী। মুহাম্মদ আসাদ হুরের অনুবাদ করেছেন 'Spouse' বা বিপরীত লিঙ্গের সাথী আর আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী করেছেন 'Companion' বা সঙ্গী হিসেবে।

সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে হুরের অর্থ হল, সঙ্গী বা সাথী। পুরুষরা পাবে বড় বড় সুন্দর চোখবিশিষ্ট নারী আর নারী পাবে বড় সুন্দর চোখবিশিষ্ট স্মার্ট পুরুষ। আশা করি বিষয়টি এখন স্পষ্ট হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ১২০। আস্সালামু আলাইকুম, আমি সুলতান কাজী, চাকরিজীবী। আমি জানতে চাই, সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এক জন পুরুষের বিপরীতে দুই জন নারী কেন?

উত্তর ঃ ড. জাকির ঃ ভাই সুলতান কাজী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন যে, কেন দুই জন মহিলার সাক্ষ্য এক জন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। ইসলামে সব সময় দুই জন মহিলার সাক্ষ্য এক জন পুরুষের সমান নয়; শুধু কয়েকটি ক্ষেত্রে।

কুরআন শরীফে কমপক্ষে ৫টি আয়াতে পুরুষ অথবা মহিলার উল্লেখ ছাড়াই সাক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতে দুই জন মহিলার সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে,

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى ـ

অর্থ : 'যখন তোমরা অর্থনৈতিক লেনদেন কর ভবিষ্যতের জন্য, তা লিখে রাখ এবং দুইজন পুরুষকে সাক্ষী রাখ। যদি দুইজন পুরুষ সাক্ষী না পাও তাহলে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষী রাখ যেন তাদের (মহিলাদের) একজন ভুলে গেলে অন্যজন ঘটনাটি স্মরণ করে দিতে পারে।'

সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতটি কেবল অর্থনৈতিক বিষয়ে। এতে বলা হয়েছে ২ জন পুরুষের সাক্ষ্য অগ্রাধিকারযোগ্য। কেবল দুইজন পুরুষ সাক্ষ না পাওয়া গেলে

এক জন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরুন, কেউ অপারেশন করতে চায়। সাধারণত সে দুইজন দক্ষ সার্জনের পরামর্শ নেবে। যদি সে দুইজন সাধারণ দক্ষ সার্জন না পায়, তাহলে সে দুইজন সাধারণ এমবিবিএস ডিগ্রিপ্রাপ্ত ডাক্তারের সহযোগিতাসহ একজন দক্ষ সার্জনের পরামর্শ নেবে। কারণ একজন সার্জন সাধারণ এমবিবিএস ডিগ্রিপ্রাপ্ত ডাক্তারের চেয়ে অপারেশনের ক্ষেত্রে অধিক দক্ষ। একইভাবে ইসলামে যেহেতু অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা পুরুষদের কাঁধে দেয়া হয়েছে, তারা মহিলাদের তুলনায় অর্থনৈতিক বিষয়ে অধিক দক্ষ। এজন্যই অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দুইজন পুরুষের সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে এক জন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষী রাখতে হবে। আবার সূরা মায়েদার ১০৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ .

অর্থ : 'যদি কেউ উত্তরাধিকারের উইল লেখে তবে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখবে।'

এখানেও অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

অনেক বিচারক বলেন যে, যখন কোন মহিলা খুনের সাক্ষাৎকার দেন, তখন তার নারী প্রকৃতি তাকে বাধা দিতে পারে এবং তিনি খুনের ঘটনাটি নিয়ে ভীত থাকতে পারেন। এজন্যই খুনের ক্ষেত্রেও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান।

কেবল অর্থনৈতিক লেনদেন এবং খুনের সাক্ষ্য এ দুটি ক্ষেত্রে দুজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। কিছু ইসলামি চিন্তাবিদ এর বিরোধিতা করে বলেন, যেহেতু কুরআনের সূরা বাকারার-২৮২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে, দুইজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান, সেহেতু সকল অবস্থায় সবসময়ই দুজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। চলুন আমরা পবিত্র কুরআনকে সামগ্রিকভাবে দেখি। সূরা নূরের ৬ নং আয়াতে আমরা দেখতে পাই যে,

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاۤءُ اِلَّاۤ اَنْفُسُهُمْ .

অর্থ : 'যদি স্বামী অথবা স্ত্রী একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চায় এবং কোন সাক্ষী না পায় তবে তাদের একক সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে।'

এ আয়াতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, একজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। চন্দ্র দেখার ব্যাপারেও একজন মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কিছু বিচারক বলেন, রমজানের শুরুতে একজন সাক্ষী এবং রমজানের শেষে দুইজন

সাক্ষী দরকার, মহিলা অথবা পুরুষ যাই হোক না কেন। কিছু কিছু ব্যাপারে আবার পুরুষের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য নয়– কেবল মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যেমন– একজন মহিলার মৃত্যুর পর তার গোসলের সাক্ষ্য কেবল মহিলারাই দিতে পারে। কেবল খুব বেশি সংকটের সময় মৃত মহিলার স্বামী গোসল দিতে পারেন। এখানে মহিলাদের সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ১২১। আমার নাম শায়লা। আমার প্রশ্ন হলো, ইসলামে বহুবিবাহের কেন অনুমতি দেয়া হল? একজন পুরুষকে কেন একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে?

উত্তর ঃ ড. জাকির নায়েক ঃ বোন জিজ্ঞেস করেছেন, কেন ইসলামে বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে? বহুবিবাহ মানে হল একাধিক স্ত্রী বা স্বামীকে বিয়ে করা। যদি কোন ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে তবে তাকে বলা হয় 'বহুপত্নীক' বিবাহ। আর যদি কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকে, তবে তাকে বলা হয় বহুপতি বিবাহ। বোন জিজ্ঞেস করেছেন, কেন ইসলামে একজন পুরুষকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে? আমি উত্তর দেব, কেন ইসলামে 'বহুপত্নীক' বিবাহের অনুমতি দেয়া হল, কুরআনই পৃথিবীতে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে বলা হয়েছে, 'কেবল একজনকে বিয়ে কর' অন্য এমন কোন ধর্মগ্রন্থ নেই যাতে বলা আছে 'কেবল একজনকে বিয়ে কর।' গীতা, বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল কোথাও বলা হয়নি 'কেবল একজনকে বিয়ে কর', কেবল কুরআনেই আছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ পড়লে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ রাজাদেরই একাধিক স্ত্রী ছিল– রাজা দশরথ, কৃষ্ণ, এদের একাধিক স্ত্রী ছিল।

১১ শতাব্দীতে ইহুদি আইনে বহুপত্নী বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়। কেবল রাব্বী গার্ডসাম বেঞ্জাহুদা একটি সিগ্নর্ড (Signord) প্রস্তাবে বলেন, 'বহুপত্নীক বিবাহ উঠিয়ে দেয়া উচিত।' ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মুসলিম দেশসমূহে সেপট্রানিক ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুপত্নীক বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইসরাঈলের প্রধান রাবাইনাইট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। খ্রিস্টান বাইবেল বহুপত্নীক বিবাহ অনুমতি দেয়। মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে চার্চ এটি নিষিধ করে। হিন্দু আইনেও একজন পুরুষের একাধিক বিয়ের অনুমতি ছিল। ১৯৫৪ সালে যখন হিন্দু আইন পাস হয় তখন একজন পুরুষের একাধিক বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এক কমিটির 'ইসলামে মহিলাদের মর্যাদা' বিষয়ক প্রতিবেদন অনুযায়ী (১৯৭৫ সালে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৬৬, ৬৭) মুসলমানদের মধ্যে বহুপত্নীক বিবাহের হার ৪.৩১ এবং হিন্দুদের মধ্যে ৫.০৬। চলুন পরিসংখ্যান বাদ দিয়ে আমরা আসল বিষয়ে আসি, কেন ইসলাম বহুপত্নী বিবাহের অনুমতি দিয়েছে? সূরা নিসার ৩নং আয়াতে আছে,

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۔ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ۔

অর্থ : 'তুমি তোমার পছন্দমত মেয়েকে বিয়ে কর। দুইটি, তিনটি অথবা চারটি কিন্তু তুমি যদি ন্যায়বিচার করতে না পার, তবে কেবল একজনকে বিয়ে কর।'

'কেবল একজনকে' বক্তব্যটি কেবল কুরআন শরীফেই আছে, অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে নেই।

ইসলামপূর্ব যুগের আরবে পুরুষদের একাধিক স্ত্রী ছিল। কিছু কিছু লোকের শতাধিক স্ত্রী পর্যন্ত ছিল। ইসলাম একটি সীমা আরোপ করে দিয়েছে– সর্বোচ্চ চার। একের অধিক বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এই শর্তে যে, দুইজন, তিনজন অথবা চার জনের মধ্যে ন্যায়বিচার এবং সাম্য বজায় রাখতে হবে। অন্যথায় কেবল একজন। সূরা নিসার ১২৯ তম আয়াতে বলা হয়েছে। 'স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার বজায় রাখা একজন পুরুষের জন্য খুবই কঠিন কাজ।' তাই বহুপত্নীক বিবাহ হলো ব্যতিক্রম। এটি কোন আইন নয়– যা অনেকে ভেবে থাকেন। ইসলামে পাঁচ প্রকারের আদেশ এবং নিষেধ রয়েছে। প্রথম প্রকার হলো 'ফরয' বা 'আবশ্যকীয়'। দ্বিতীয় প্রকার হলো 'উৎসাহমূলক', তৃতীয় প্রকার হল 'অনুমোদনযোগ্য', চতুর্থ প্রকার হল 'অনুৎসাহমূলক' এবং সর্বশেষ প্রকার হল 'নিষিদ্ধ'। বহুপত্নীক বিবাহ হল তৃতীয় প্রকারের 'অনুমোদনযোগ্য'। কুরআন অথবা হাদীসের কোথাও এরকম কথা নেই যে, যে একাধিক স্ত্রী বিয়ে করেছে, সে যে একজনকে করেছে তার চেয়ে ভাল মুসলমান। চলুন, আমরা দেখি কেন ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক বিয়ে করার অনুমতি দেয়?

প্রকৃতিগতভাবে ছেলে এবং মেয়ে সমানানুপাতে জন্ম নেয়। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞান আমাদের বলে যে, মেয়ে ভ্রূণ ছেলে ভ্রূণের চেয়ে অধিক শক্তিশালী থাকে। ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশু অধিক প্রতিরক্ষাশক্তি পায়– মেয়ে শিশু শক্তিশালী এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে জীবাণু ও রোগের সাথে লড়াই করতে পারে। তাই ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশুর হার বেশি। যুদ্ধের সময় মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরা বেশি নিহত হয়। এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্তানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে প্রায় পনেরো লাখ লোক নিহত হয়– যার অধিকাংশই পুরুষ। পরিসংখ্যান আমাদের বলে যে, মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা দুর্ঘটনায় বেশি নিহত হয়।

মহিলাদের চেয়ে পুরুষরা বেশি নিহত হয় সিগারেট সেবনের কারণে। ফলে পৃথিবীতে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। ভারতেও পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। প্রতিবছর এখানে ১০ লাখেরও বেশি মেয়ে ভ্রূণ হত্যা করা হয়, সে জন্য মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সংখ্যা বেশি। অন্যথায়, এই মেয়ে

শিশুহত্যা বন্ধ করলে কয়েক দশকের মধ্যেই মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যাবে। কেবল নিউইয়র্কেই পুরুষদের চেয়ে ১০ লক্ষ বেশি মহিলা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের চেয়ে ৭৮ লক্ষ মহিলা বেশি। সেখানে আড়াই কোটিরও বেশি সমকামী লোক রয়েছে। তার মানে তারা তাদের পুরুষ সঙ্গী পাচ্ছে না। শুধু ইংল্যান্ডেই পুরুষদের চেয়ে ৪০ লক্ষ বেশি মহিলা রয়েছে। জার্মানিতে ৫০ লক্ষ এবং রাশিয়ায় ৭০ লক্ষ বেশি মহিলা রয়েছে। আল্লাহই জানেন সমগ্র পৃথিবীতে পুরুষদের চেয়ে কত কোটি মহিলা বেশি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে যদি প্রত্যেক পুরুষ এক জন করে মহিলা বিয়ে করে তাহলে অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ মহিলা বাকি থেকে যাবে, যারা বিয়ে করার মতো সঙ্গী পাবে না। ধরুন, আমার বোন সেই ৩০ লক্ষের একজন, যে এখনো কোন সঙ্গী পায়নি।

এখন তার যে উপায়গুলো আছে তা হলো হয় সে এমন একজনকে বিয়ে করবে যার ইতিমধ্যেই একজন স্ত্রী আছে, অথবা গণ-সম্পত্তিতে পরিণত হবে– তৃতীয় অন্য কোন উপায় নেই। বিশ্বাস করুন! আমি এই প্রশ্নটি শত শত অমুসলমানের কাছে করেছি, তারা প্রথম উপায়টি বেছে নিয়েছে, একজনও ২য় টির পক্ষে রায় দেননি। কিছু লোক আছেন যারা বলেন, আমি আমার বোনকে কুমারী রাখাকেই ভাল মনে করব। বিশ্বাস করুন, চিকিৎসাবিজ্ঞান আমাদের বলে যে, কোন পুরুষ অথবা মহিলা সারা জীবন কুমার বা কুমারী থাকতে পারে না। সারা জীবন অবৈধ যৌন সংসর্গ ছাড়া কুমারী থাকতে পারে না। কারণ প্রতিদিন শরীরে যৌন হরমোন তৈরি এবং নিসৃত হচ্ছে। যেসব সাধকেরা নিজেদের কুমার বলে দাবি করেন। পাহাড়ে, হিমালয়ে যাবার সময় পেছনে দেব-দেবীদের নিয়ে যান। এক রিপোর্ট অনুযায়ী ইংল্যান্ডের চার্চের পাদ্রি এবং সন্ন্যাসিনীদের অধিকাংশই ব্যভিচার ও সমকামিতায় লিপ্ত। অন্য কোন উপায় নেই, হয় এমন কাউকে বিয়ে করতে হবে যার ইতোমধ্যেই একজন স্ত্রী আছে অথবা সকলের গণসম্পত্তিতে পরিণত হতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ১২২। কোন্ কোন্ অবস্থায় বহুবিবাহ অনুমোদনযোগ্য? প্রশ্নটি করেছেন বোন সামিয়া।

উত্তর ঃ ড. জাকির ঃ কেবল একটি শর্ত রয়েছে যা পূরণ করলে কেউ একাধিক স্ত্রী বিয়ে করতে পারবে। আর তা হলো তাকে দুই, তিন অথবা চার জন স্ত্রীর মধ্যে ন্যায়বিচার বজায় রাখতে হবে। যদি সক্ষম না হয় তবে কেবল একটি বিয়ে করা উচিত। কিন্তু কতকগুলো অবস্থা আছে যখন একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা একজন পুরুষের উচিত। যেমন– একটি হলো অতিরিক্ত মহিলা, যারা স্বামী পাচ্ছেন না তাদের নৈতিকতা সংরক্ষণের জন্য। আরো অনেক অবস্থা আছে, যেমন– একজন মহিলা বিয়ে করার পর দূর্ঘটনায় প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে। ফলে সে তার স্বামীর চাহিদা

পূরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তখন স্বামীকে হয় প্রথম স্ত্রী রেখে আরেকটি বিয়ে করতে হবে অথবা প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করতে হবে।

ধরুন আপনার বোনের এরকম হলো এবং প্রতিবন্ধী হয়ে গেল– আপনি কোনটিকে গ্রহণ করবেন? আপনি কি আপনার ভগ্নিপতি আপনার বোনকে তালাক না দিয়ে বিয়ে করবে– এটা চাবেন? নাকি তালাক দিয়ে বিয়ে করুক এটা চাবেন? ধরুন আপনার স্ত্রী অসুস্থ হওয়ার ফলে স্বামী ও সন্তানদের দেখাশোনা করতে পারে না। এমতাবস্থায় এটাই ভাল যে, সে আরেকজন স্ত্রী গ্রহণ করবে, যে তার সন্তান-সন্তুতি ও অসুস্থ স্ত্রীর দেখাশোনা করবে। কেউ কেউ বলতে পারেন, পরিচারিকা রাখলেইতো হয়। আমিও তাদের সাথে রাজি আছি যে, পরিচারিকা রাখা যেতে পারে, সে ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকে দেখাশোনা করবে। কিন্তু আপনাকে দেখাশোনা করবে কে? তাই এটিই ভাল যে, আপনি আরেকটি বিয়ে করবেন এবং দু'জনের প্রতি সমান ব্যবহার করবেন। এমনও হতে পারে যে, আপনার বিয়ের বেশ কিছু বছর পরও সন্তান হয়নি এবং স্বামী স্ত্রী দু'জনই সন্তানের জন্য আগ্রহী। স্ত্রী আরেকজনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের অনুমতি দিতে পারেন এবং তারা সন্তান পেতে পারেন। কেউ কেউ বলতে পারেন যে, 'দত্তক গ্রহণ করলেইতো হয়'। অনেক কারণে ইসলাম দত্তক গ্রহণে অনুমতি দেয় না– কারণগুলো (ইতিপূর্বে বলা হয়েছে বিধায়) এখানে বলছি না। ফলে দুটি উপায় থাকে– হয় আগের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিয়ে করবে। অথবা প্রথম স্ত্রীকে রেখেই আরেকজনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন ঃ ১২৩। আমার নাম ইলিয়াস। মহিলারা কি রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারেন?

উত্তর ঃ ড. জাকির ঃ পবিত্র কুরআন শরীফে কোথাও উল্লেখ নেই যে, একজন মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না। কিন্তু অনেক হাদীস আছে, যেমন "একটি হাদীসে আছে, "যে সকল জনতা মহিলাকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা সফল হবে না।"

কিছু চিন্তাবিদ বলেন, 'এটি শুধু একটি বিশেষ সময়কে বুঝিয়েছে যার সাথে হাদীসটি সম্পর্কিত। বিশেষত যখন পারস্য একজন রাণীকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করছে।' অন্যরা বলেন, না, এটা সকল সময়কেই বুঝিয়েছে। চলুন, আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি, একজন মহিলার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া উচিত কিনা? যদি ইসলামি রাষ্ট্রে মহিলা প্রধান হন, তবে তাকে নামাযের ইমামতি করতে হবে। যদি একজন মহিলা নামাযে ইমামতি করে তবে তাকে 'কিয়াম', 'রুকু' ও 'সিজ্‌দা' বা 'দাঁড়ানো', 'নত হওয়া' ও মাটিতে নত হওয়ার মতো বিভিন্ন কাজ করতে হয়। যদি পুরুষদের জামায়াতের সামনে কোন মহিলা এগুলো করে, আমি নিশ্চিত যে, তা নামাযে ব্যাঘাত ঘটাবে। আজকের মতো আধুনিক সমাজে একজন মহিলা রাষ্ট্রের প্রধান হলে তাকে মিটিং-এ উপস্থিত থাকতে হবে, যেখানে পুরুষরাও উপস্থিত

থাকে। অনেক সময় রুদ্ধদ্বার বৈঠক করতে হয়, যেখানে অন্য কেউ উপস্থিত থাকে না এবং ইসলাম কোন পুরুষের সাথে এরকম রুদ্ধদ্বার বৈঠকের অনুমোদন দেয় না।

রাষ্ট্রপ্রধানকে অনেক সময় অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে– যাদের অধিকাংশই পুরুষ– ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হয়, ছবি উঠাতে হয়, করমর্দন করতে হয়– যা ইসলাম অনুমোদন দেয় না। একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে সাধারণ জনগণের সাথে মিশতে হয়। তাদের সমস্যাসমূহের সমাধান করতে হয়। বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, একজন মহিলার মাসিক রক্তস্রাব চলাকালীন সময়ে কতকগুলো আচরণগত, মানসিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক পরিবর্তন দেখা যায়– যৌন হরমোন ইস্টোজেন নিঃসরণের কারণে এবং এ পরিবর্তন তাকে নিশ্চিতভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যার সৃষ্টি করবে। বিজ্ঞান আরো বলে যে, মহিলাদের পুরুষের তুলনায় অধিক কণ্ঠ ও মৌখিক শক্তি রয়েছে এবং পুরুষের রয়েছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কল্পনা করার শক্তি– যা একজন রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর মেয়েদের মৌখিক দক্ষতা তার মাতৃত্বের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

একজন মহিলা গর্ভবতী হতে পারেন এবং তার কয়েকমাসের বিশ্রাম প্রয়োজন হতে পারে– এ সয়মটিতে রাষ্ট্র পরিচালনার কি হবে? মা হিসেবে সন্তানদের দেখাশোনা করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি একই সাথে ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হয়, তবে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের পক্ষেই তা করা অধিকতর সম্ভব– বাস্তবিক কারণেই। সুতরাং, আমিও সেসব বুদ্ধিজীবীদের অন্তর্ভুক্ত যারা বলেন, 'মহিলাদের রাষ্ট্রপ্রধান করা উচিত নয়'। কিন্তু এর দ্বারা এটি বুঝায় না যে, মহিলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তাদের মতামত প্রদান ও আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণের অধিকার আছে। হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় উম্মে সালমা (রা) রাসূল ﷺ-কে সমর্থন ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন– যখন সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় সমস্যায় ছিল। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ১২৪। আমি ভিমলা দালাল। পেশায় আইনজীবী। ইসলাম মহিলাদের অধিকারের কথা বলে, তাহলে কেন তাদেরকে পর্দায় রাখতে চায় এবং কেন পুরুষ এবং মহিলাদের আলাদা রাখতে চায়?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আমি পূর্বেই বলেছি যে, ইসলাম নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাস করে না। কুরআনে 'হিজাবে'র কথা উল্লেখ আছে। সেখানে নারীদের 'হিজাবে'র কথা বলার পূর্বে পুরুষদের হিজাবের কথাও বলা হয়েছে। সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে আছে যে, 'একজন বিশ্বাসীর উচিত দৃষ্টি অবনত রাখা এবং তার পবিত্রতা সংরক্ষণ করা।'

পরবর্তী আয়াতে আছে, 'বিশ্বাসী মহিলাদের বলুন, সে যেন তার চোখ অবনত রাখে। পবিত্রতা সংরক্ষণ করে এবং সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে– যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত এবং ওড়না দ্বারা মাথা ও বুক ঢেকে রাখে– বাবা, ছেলে এবং স্বামী ছাড়া এবং গাইরে মাহরামদের[১] একটি বড় তালিকা, হিজাবের বৈশিষ্ট্যগুলো কুরআন এবং হাদীসে দেয়া আছে। এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য। ১ম, ব্যাপ্তি– যা পুরুষ এবং মহিলার ক্ষেত্রে ভিন্ন। পুরুষকে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জী ছাড়া সমগ্র শরীর ঢেকে রাখতে হবে। ২য়, মহিলাদের কাপড় এরকম টাইট হওয়া যাবে না যার ফলে দেহকাঠামো বুঝা যায়। ৩য়, কাপড় স্বচ্ছ হওয়া যাবে না। ৪র্থ, এরকম আকর্ষণীয় পোশাক পরা যাবে না, যা বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করে। ৫ম, এরকম পোশাক পরা যাবে না যা বিপরীত লিঙ্গের সাদৃশ্য সৃষ্টি করে। ৬ষ্ঠ, সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এরকম পোশাক পরা যাবে না, যা অবিশ্বাসীদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে। এ ছয়টি হল হিজাবের বৈশিষ্ট্য।

এখন প্রশ্নের উত্তরে আসছি– কেন ইসলাম পর্দায় বিশ্বাস করে এবং কেন পুরুষ এবং মহিলাদের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাস করে না। চলুন, পর্দা আছে এবং পর্দা নেই এমন দুটি সমাজকে বিশ্লেষণ করা যাক। যে দেশে সবচেয়ে বেশি অপরাধ হয় সে দেশটি হল যুক্তরাষ্ট্র। এফ. বি. আই (FBI) ১৯৯০ সালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৯০ সালে সেখানে এক হাজার দুইশত পঞ্চাশ জন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে। এটি হল কেবল প্রতিবেদনের তথ্য। ধর্ষণের মাত্র ১৬% রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা হল ৬,৪০,০০০ মহিলা যারা ধর্ষিতা হয়েছে। সংখ্যাটিকে ৩৬৫ দ্বারা ভাগ করলে দেখা যায় প্রতিদিন ১৭৫৬ জন মহিলা আমেরিকায় ১৯৯০ সালে ধর্ষিতা হয়। ১৯৯১ সালে (১৯৯৩ সালের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী) ১.৩ জন প্রতি মিনিটে ধর্ষিতা হয়।

আপনি জানেন, কেন? আমেরিকা মহিলাদের অধিক অধিকার দিয়েছে এবং তারা অধিক হারে ধর্ষিতা হচ্ছে। ১৬% অভিযোগের মাত্র শতকরা ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় যার ৫০%-কে বিচারের আগেই ছেড়ে দেয়া হয়। মানে হল ০.৮% ধর্ষণের মামলা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ একজন একশত বিশটি ধর্ষণ করলে ধরা পড়ার আকাঙ্ক্ষা মাত্র ১ বার। ১২০টি ধর্ষণ করলে একবার মাত্র ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে কে না চেষ্টা করবে। আবার এরও অর্ধেক পরিমাণে মামলার শাস্তি ১ বছরেরও কম। যুক্তরাষ্ট্রের আইনে আছে– 'ধর্ষণের জন্যে যাবৎজীবন কারাদণ্ড, যদি ১ম বার ধরা পড়ে তবে তাকে সুযোগ দেয়া হোক এবং ১ বছরের কম শাস্তি দেয়া হোক।' এমনকি ভারতে, জাতীয় অপরাধ ব্যুরোর প্রতিবেদন অনুযায়ী (১৯৯২ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত) প্রতি ৫৪ মিনিটে ১টি ধর্ষণের মামলা নিষিদ্ধ করা হয়।

প্রতি ২৬ মিনিটে উত্ত্যক্ত করার ১টি ঘটনা এবং প্রতি ১ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে যৌতুকের কারণে মৃত্যুর ১টি মামলা নথিবদ্ধ করা হয়।

আপনি যদি ধর্ষণের মোট সংখ্যা হিসেব করেন, তাহলে প্রতি কয়েক মিনিটেই ১টি হয়ে দাঁড়াবে। আমি একটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব। যদি যুক্তরাষ্ট্রের সকল মহিলা হিজাব পরে তাহলে কি ধর্ষণের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে, বাড়বে, নাকি কমবে? যদি ভারতের সকল মহিলা হিজাব পরে, তাহলে কি ধর্ষণের সংখ্যা বাড়বে, কমবে, নাকি অপরিবর্তিত থাকবে? ইসলামকে সামগ্রিকভাবে বুঝা উচিত। যেখানে মহিলারা হিজাব পরতে এবং পুরুষদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখতে বলা হয়েছে এবং এর পরেও যদি কেউ ধর্ষণ করে, তাহলে তার মৃত্যুদণ্ডকে কি আপনি বর্বর আইন বলতে পারেন?

আমি অনেক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেছি। ধরুন আপনাকে বিচারক বানানো হল। ইসলামি আইন, ভারতীয় আইন কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের আইন বাদ দিন, আপনি বিচারক হলে আপনার বোনের ধর্ষককে আপনি কি শাস্তি দিতেন? সবাই বলেছেন, 'মৃত্যুদণ্ড'। কেউ কেউ বলেছেন, 'আমি মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকব।' আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, যদি ইসলামি শরিয়াহ আইন আমেরিকায় প্রয়োগ করা হয়, তাহলে কি ধর্ষণের সংখ্যা হ্রাস পাবে, সমান থাকবে নাকি বৃদ্ধি পাবে? আসুন আমরা বাস্তবিকভাবে বিশ্লেষণ করি। যারা তত্ত্বীয়ভাবে মহিলাদের অধিকার দিয়েছে, তারা বাস্তবিকভাবে তাদেরকে পরিচারিকা ও উপপত্নীর সম্মান দিয়েছে। ধরুন, একই সৌন্দর্যের অধিকারী দুই বোন একজন হিজাব পরিহিতা অন্যজন শর্ট স্কার্ট পরিহিতা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, রাস্তায় বসা মাস্তানেরা কাকে টিজ করবে? নিঃসন্দেহে শর্ট স্কার্ট পরিহিতাকে। বাস্তবিকভাবেই হিজাব মহিলাদের সম্মান বৃদ্ধি করে এবং পবিত্রতা সংরক্ষণ করে।

প্রশ্ন ঃ ১২৫। আমার নাম বিলাল লালা। আমার প্রশ্ন হল, কেন ইসলাম আহলে কিতাব মহিলাদের বিয়ে করার অনুমতি মুসলিম পুরুষদের দিয়েছে? মুসলিম মহিলাদের কেন আহলে কিতাব পুরুষদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি। আহলে কিতাব মহিলারা কি মুশরিক নয়?

উত্তর ঃ ডা. জাকির ঃ বিলাল ভাই জিজ্ঞেস করেছেন, মুসলিম পুরুষদের যেহেতু আহলে কিতাব মহিলা বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এর বিপরীত কেন দেয়া হয় নি? তিনি সঠিক বলেছেন, সূরা মায়েদার ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে,

حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

অর্থ : আহলে কিতাবদের যেসব মহিলা বিশ্বাসী এবং সতী, তাদেরকে তোমাদের জন্য বিয়ে করা বৈধ করা হয়েছে।

ইসলাম এ কারণে এ অনুমতি দিয়েছে যে, যদি কোন আহলে কিতাবের মহিলা কোন মুসলিম পুরুষকে বিয়ে করে, তাহলে তার স্বামীর পরিবার তাকে তার নবীদের সম্পর্কে অপমানমূলক কিছু বলবে না বা করবে না। কারণ, মুসলিমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সকল নবীর ওপর বিশ্বাস করে। যদি তাদের সম্প্রদায়ের কোন মহিলা আমাদের পরিবারে আসে তবে সে উপহাসের পাত্র হবে না। কিন্তু এর বিপরীতে কোন মুসলিম মহিলা যদি তাদের পরিবারে যায় তবে সে উপহাসের পাত্র হবে। সূরা বাকারার ২২১ নং আয়াতে আছে।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ـ

অর্থ : অবিশ্বাসী মহিলা বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। এমনকি একজন বিশ্বাসী দাসীও অবিশ্বাসী নারীর চেয়ে উত্তম যদিও সে তোমাকে আকৃষ্ট করে।

সূরা মায়েদার ৭২নং আয়াতে আছে–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْاۤ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ

অর্থ : 'যারা বলে যে, মেরীর সন্তান খ্রিস্ট আল্লাহর সন্তান, তারা কুফরী করছে।'

সুতরাং, কুরআন বলছে, আপনি আহলে কিতাবের অনুসারীদের বিয়ে করতে পারেন। যারা বিশ্বাসী, যারা বিশ্বাস করে না যে, খ্রিস্ট প্রভু অথবা প্রভুর ছেলে কিন্তু যারা বিশ্বাস করে যে, তিনি আল্লাহর দূত।

প্রশ্ন ঃ ১২৬। আমি আকিলা ফাতেরপেকার। আমার প্রশ্ন হল, ইসলাম কেন মহিলাদের উইল করতে অনুমতি দেয় না– সে বিবাহিত অবিবাহিত যাই হোক না কেন।

উত্তর ঃ ড. জাকির ঃ ইসলাম মেয়েদের অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে পশ্চিমাদের ১৩০০ বছর আগে। প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন নারীর, সে বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক না কেন, সম্পদের মালিক হওয়া বা পরিত্যাগ করার অধিকার আছে কোন পরামর্শ ছাড়াই। ইসলাম তাকে দান (উইল) করার অধিকার দিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ১২৭। আমার নাম রোসান রংওয়ালা। ডঃ জাকির আপনি বলেছেন, ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে সমানাধিকার দিয়েছে। তাহলে কেন নারীদেরকেও ৪টি বিয়ের অনুমতি দেয়া হল না? পুরুষরা পারলে মহিলারা কি ৪টি বিয়ে করতে পারে না?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ প্রথমে আপনাকে বুঝতে হবে, পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে অধিক যৌনশক্তি সম্পন্ন। দ্বিতীয়ত, একজন পুরুষ জৈবিকভাবে একাধিক স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারে, কিন্তু একজন স্ত্রী একাধিক স্বামীর চাহিদা সন্তোষজনকভাবে পূরণ করতে পারে না। চিকিৎসাবিজ্ঞান আমাদের বলে যে, মাসিকের সময় মহিলারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকাংশ ঝগড়া এই সময় হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের মহিলাদের এক অপরাধ প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেখানকার মহিলাদের অধিকাংশই এ সময়ে অপরাধ বেশি করে থাকে। ফলে একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকলে তার পক্ষে সমন্বয় করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে যে, যদি কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকে, তবে যৌন রোগের সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে, যা একজন স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকলে হয় না। যদি কোন কোন ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে তাদের সন্তানদের পিতা এবং মাতা সনাক্ত করা খুবই সহজ। অন্যদিকে একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকলে আপনি কেবল মাকে সনাক্ত করতে পারবেন, বাবাকে সনাক্ত করা মুশকিল হয়ে যাবে। ইসলাম বাবার সনাক্তকরণের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, 'যদি কোন সন্তান তার বাবার পরিচয় না পায় তাহলে সে মানসিক অশান্তিতে ভোগে। বহুপতি বিবাহ নিষিদ্ধ করার অনেক কারণ আছে, অপরদিকে বহুপত্নী বিবাহের অনুমতির পক্ষে অনেক যুক্তি আছে।

উদাহরণস্বরূপ যদি কোন দম্পতির সন্তান না থাকে তবে একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়। ধরুন যদি পুরুষ বন্ধ্যা হয়, তবে স্ত্রী একাধিক স্বামী বিয়ে করতে পারে? না–পারে না। কারণ, কোন ডাক্তারই ১০০ ভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারে না যে স্বামী বন্ধ্যা। এমনকি শুক্রকীটবাহী নাড়ীচ্ছেদ করলেও কোন ডাক্তার বলতে পারবে না যে, সে পিতা হতে পারবে না। সুতরাং সন্তানের পরিচয় নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। অন্যদিকে ধরুন স্বামী দূর্ঘটনায় পতিত হল অথবা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হল তখন কি স্ত্রী অন্য স্বামী নিতে পারবে না? চলুন আমরা ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করি। যদি স্বামী দূর্ঘটনায় পতিত হয় অথবা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়, সে তার দায়িত্ব পালন করতে অসমর্থ।

প্রথমত, অর্থনৈতিক দিক– সে তার পরিবার, সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীকে দেখাশোনা করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট নাও করতে পারে। প্রথমটির জন্য ইসলাম যাকাতের ব্যবস্থা করেছে। দ্বিতীয়টির জন্য, চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে যে, স্ত্রীর স্বামীর তুলনায় কমই সন্তুষ্টি আসে। কিন্তু স্ত্রী যদি চায়, তবে সে তালাক গ্রহণ করতে পারে। তালাক গ্রহণ উত্তম যদি সে স্বাস্থ্যবতী হয়ে থাকে। অন্যথায় যদি সে স্বাস্থ্যবতী না হয় অথবা প্রতিবন্ধী হয়, তবে কে তাকে বিয়ে করবে?

প্রশ্ন ঃ ১২৮। আমি সরদারি হাকিম। আমার প্রশ্ন হল, আপনি বলেছেন যে, যদি কোন মেয়ে কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করতে না চায় তাহলে সে 'না' বলতে পারে। কিন্তু সে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল। তারা তাকে খেতে দিচ্ছে, দেখাশোনা করছে। 'না' বলার পর কি সে নিরাপদে জীবনধারণ করতে পারে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ কেন পারে না? বিয়ের পূর্বে তার ভরণপোষণসহ সকল দায়িত্ব তার পিতার ও ভাইদের। যদি সে 'না' বলে, তবে তার পিতা ও ভাইদের দায়িত্ব অব্যাহত থাকবে। সে খুব ভালভাবেই 'না' বলতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ১২৯। আমি প্রকাশ লাট। বিশ্বাসী লোকদেরকে ডাকার জন্য আমি এ সংগঠনকে ধন্যবাদ জানাই। ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টান যাই হোক না কেন, সব ধর্মগ্রন্থেই অনেক ভাল বিষয় আছে। কিন্তু হাজার বছর পরে ধর্মের চর্চা মানুষ নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক করে ফেলেছে। কোন ধর্মই এর ব্যতিক্রম নয়। তাই প্রশ্ন হল, বই-এ যা লিখা আছে, বাইবেল, কুরআন অথবা গীতা যাই হোক না কেন, তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, নাকি সমাজে চর্চা করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? যদি অনুশীলন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে কী লেখা রয়েছে তাতে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়? এ বইয়ে কি লেখা আছে, ওই বইয়ে কি লেখা আছে তা বলার চেয়ে কি করা যেতে পারে সেটা বলা দরকার?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই খুব ভাল একটি প্রশ্ন করেছেন– সকল ধর্মগ্রন্থই ভাল কথা বলে, চলুন আমরা দেখি লোকজন কি চর্চা করে। আমাদেরকে তত্ত্বীয় কথাবার্তার চেয়ে অনুশীলনের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে– আমিও তার সাথে একমত। অধিকাংশ মুসলিম সমাজ কুরআন-সুন্নাহ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। আমরা এখানে লোকদেরকে কুরআন-সুন্নাহর নিকটবর্তী হতে আহবান জানাচ্ছি। প্রশ্নের প্রথম অংশ, যেখানে বলা হয়েছে যে, সকল ধর্মগ্রন্থই ভাল কথা বলে। তাই ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কথা বলা অনর্থক – আমি আপনার সাথে একমত নই। 'ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে নারীর মর্যাদা' বিষয়ে আমি একটি বক্তব্য দিয়েছি। আমি ইসলামে নারীর মর্যাদাকে অন্যান্য ধর্মে প্রদত্ত নারীর মর্যাদার সাথে তুলনা করেছি এবং আপনি যদি আমার বক্তব্য শুনে থাকেন, তাহলে আপনি নিজেই বিচার করতে পারবেন যে, কোন্ ধর্ম অধিক মর্যাদা দিয়েছে। এমনকি আপনি যদি একমত হন যে, তত্ত্বীয়ভাবে ইসলাম সবচেয়ে বেশি অধিকার দিয়েছে, তাহলে আমাদেরকে এখন তা অনুসরণ করতে হবে।

ইসলামের কিছু কিছু দিক লোকজন অনুসরণ করছে এবং কিছু কিছু দিক করছে না। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীস থেকে দূরে সরে গেলেও সৌদি আরব ইসলামি আইন বাস্তবায়ন করছে। আমাদেরকে যা করতে হবে তা হল, ফৌজদারি

শাস্তি বিধানের আইনের ক্ষেত্রে সৌদি আরবের বাস্তব উদাহরণ গ্রহণ করতে হবে এবং যদি প্রয়োগযোগ্য হয়, তাহলে সমগ্র বিশ্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর অন্য সমাজে যেখানে সামাজিক জীবনে ইসলামি আইনের প্রয়োগ আছে, সে সমাজ পরীক্ষা করতে হবে। যদি তা সর্বোত্তম হয়, তাহলে তা অন্যান্য সমাজে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা এখানে এটিই বুঝানোর জন্য একত্রিত হয়েছি যে, এ আইন হল সর্বোত্তম আইন, যদি আমরা এর অনুসরণ না করি তবে আমরা নিজেরা দোষী, ধর্ম নয়। এজন্যই আমরা মানুষকে ডেকেছি, যেন তারা কুরআন-হাদীসকে যথাযথভাবে বুঝতে পারে এবং তার অনুশীলন করতে পারে। আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৩০। আসসালামু আলাইকুম, আমি কামার সাইদ। আপনি আপনার মূল্যবান বক্তৃতায় বলেছেন, একজন মহিলাকে যদি তার স্বামী ডিভোর্স দেয় তবে তার 'ইদ্দত' পর্যন্ত তার স্বামী তার ভরণ-পোষণ দেবে। কিন্তু তারপর তার বাবা মা তার ভরণ-পোষণ দেবে। কিন্তু যদি তারা সক্ষম না হয় তখন মেয়েটি কী করবে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন একটি ভাল প্রশ্ন করেছেন যে, যদি কোন মহিলাকে তার স্বামী ডিভোর্স দেয় তখন স্বামীর দায়িত্ব যে তার স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করবে ইদ্দতকালীন পর্যন্ত, যে সময়টা হয় ৩ মাস বা তার বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত। ঐ সময়ের পর তাকে ভরণ-পোষণ করার দায়িত্ব তার পিতা বা ভাইয়ের দায়িত্বে। যদি তার বাবা বা ভাইদের সামর্থ্য না থাকে তবে তার নিকটাত্মীয়দের উচিত তার দেখাশোনা করা। যদি তাদেরও সামর্থ্য না থাকে তবে এ দায়িত্ব এসে বার্তায় মুসলিম উম্মাহর ওপর। তাই আমাদের একটি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে এবং যাকাত সংগ্রহ করে এ ধরনের মহিলাদের দেখাশোনা করতে হবে। যদি এটি সম্ভব না হয় তবে এটি ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদের দেখাশোনা করা– সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে।

তবে এখানে উল্লেখ্য যে, এ জন্যই ইসলাম স্বামীকে তার স্ত্রীর প্রাপ্য মোহর আদায় করতে বলেছে, তবে তাকে এ ধরনের করুণ অবস্থায় পড়তে হবে না। ইসলাম নারীকে স্বাবলম্বী দেখতে চায়, তাই তাকে প্রাপ্য মোহর আদায় করার জন্য স্বামীকে তাগিদ দিয়েছে এবং যারা তা আদায় করবে না তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। – (অনুবাদক)

প্রশ্ন ঃ ১৩১। আসসালামু আলাইকুম। আমি সৈয়দ রিয়াজ। আমি একজন ব্যবসায়ী। আপনি যা বলেছেন এবং আমি যতটুকু জানি যে, ইসলামে নারী-পুরুষ সমান। সুতরাং কেন ইসলামে নারীকে পুরুষের সমান অংশীদার করা হয়নি বিশেষত উত্তরাধিকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন যে, আমি আমার বক্তৃতায় বলেছি, ইসলামে নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক অধিকার সমান। সুতরাং কেন সে উত্তরাধিকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমান অংশীদার হবে না। যেমন– লোকেরা বলে যে, মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অর্ধেক পায়। এ প্রশ্নের জবাব পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১১ এবং ১২ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে, যেখানে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে কিভাবে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন করতে হবে। এ ব্যাপারে কুরআনে বলছে,

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهُ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ -

অর্থ : 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের (অংশ পাওয়া) সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন– পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান হবে, আর যদি শুধু কন্যা থাকে দুইয়ের অধিক, তবে তারা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে, আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয়, তবে সে অর্ধাংশ পাবে, আর পিতামাতা উভয়ের প্রত্যেকে মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে। যদি মৃতব্যক্তির কোন সন্তান থাকে। আর যদি ঐ মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে এবং পিতা মাতাই তার ওয়ারিশ হয়, তবে তার মাতার প্রাপ্য এক তৃতীয়াংশ। আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকে তবে তার মা পাবে এক ষষ্ঠাংশ।'....

১২নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْدَيْنٍ ط وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْدَيْنٍ -

অর্থ : 'আর তোমরা অর্ধেক পাবে ঐ সম্পত্তির যা তোমাদের স্ত্রীগণ রেখে যায়, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি ঐ পত্নীগণের কোন সন্তান থাকে তবে তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে তোমরা এক চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে এক চতুর্থাংশ পাবে, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি কোন সন্তান থাকে তবে তারা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ পাবে। তোমাদের কৃত ওসিয়ত বা ঋণ আদায় করার পর।' (সূরা নিসা ঃ ১২)

সংক্ষেপে বলা যায়, অধিকাংশ সময়ে মহিলারা তার পুরুষ সমশ্রেণির বিপরীতে অর্ধেক সম্পত্তি পায় কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। উদাহরণস্বরূপ বৈপিত্রেয় ভাই বোনের ক্ষেত্রে উভয়েই পাবে সমান এক ষষ্ঠাংশ, যদি তার আপন ভাই না থাকে। যদি মৃতব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে তবে তার বাবা মা উভয়েই সমান এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে যদি মহিলা মারা যায়, যার কোন সন্তান নেই সেক্ষেত্রে তার স্বামী পাবে অর্ধেক। তার মা পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং পিতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ। এ থেকে বুঝা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলাগণ তার সমশ্রেণির পুরুষ থেকে এমনকি দ্বিগুণ পায়। যেমন উপরোল্লিখিত ব্যাপারে মাতা, পিতার চেয়ে দ্বিগুণ পায়। কিন্তু...আমি আপনার সাথে একমত যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলাগণ পুরুষের অর্ধেক পায় যখন নারীটি স্ত্রী বা কন্যা হিসেবে উত্তরাধিকার লাভ করে। কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই, যেহেতু পুরুষ পরিবারের আর্থিক সংস্থাপনের জন্য দায়বদ্ধ এবং যেহেতু আল্লাহ্ কারো প্রতি অবিচার করতে পারেন না, তাই তিনি নারীদের তুলনায় পুরুষদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হিসেবে বেশি অংশ দিয়েছেন। অন্যথায় এখানে আমাদেরকে 'ইসলামে পুরুষদের অধিকার' সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে হতো।

এখানে আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি– মনে করুন একজন লোক মারা গেল এবং সে মারা যাওয়ার পর তার সম্পত্তি তার এক ছেলে এবং এক মেয়ের মধ্যে বিতরণ করা হলো। যার মূল্য দেড় লক্ষ টাকা। ইসলামি শরীয়ার মতে, তার ছেলে পাবে ১ লক্ষ টাকা এবং মেয়ে পাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিন্তু ছেলের পাওয়া ১ লক্ষ টাকা থেকে এখন সংসারের জন্য ব্যয় করতে হবে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ, তা হতে পারে ৭০ বা ৮০ বা ৯০ হাজার টাকা। কিন্তু মেয়েটিকে তার পরিবারের দেখাশোনার জন্য ১ টাকাও খরচ করতে হবে না। আমার মনে হয় এখন ব্যাপারটি সকলের কাছে পরিষ্কার যে, কেন ইসলামে পুরুষকে নারীদের তুলনায় বেশি অংশ দেয়া হয়েছে?

প্রশ্ন ঃ ১৩২। আমি বিজয়, মুম্বাই আই আইটির ছাত্র। আমার প্রশ্ন হলো ইসলামে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ অনুমোদন করে না, এটি কি ইসলামে আধুনিকতা নাকি সেকেলে ধারণা?

উত্তর ঃ যদি আপনি 'আধুনিকতা' বলতে বুঝেন আপনার স্ত্রী বা বোনকে আপনি বিক্রয় পণ্য করবেন যাতে তারা অন্যদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে পারে অথবা আপনি তাকে 'মডেলিং' পেশায় নিয়োগ করবেন, সেক্ষেত্রে ইসলাম সেকেলে বলেই আমার কাছে মনে হয়। কারণ পাশ্চাত্য মিডিয়াতে নারীদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা মহিলাদের অধিক স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়েছে, তারা তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা নারীদের মর্যাদা ক্ষুণ্নই করেছে।

এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, আমেরিকায় ৫০% নারী যারা ইউনিভার্সিটি কিংবা কর্মক্ষেত্রে যায়, তারা ধর্ষণের শিকার হয়। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন ৫০%! কিন্তু কেন? কারণ হল ওখানকার অধিকাংশ কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশার সুযোগ পায়। এখন আপনি যদি মনে করেন একজন মহিলা ধর্ষিতা হওয়া 'আধুনিকতা' তবে সেক্ষেত্রে ইসলাম 'সেকেলে'। আর যদি আপনি বলেন না, তবে ইসলাম অতি আধুনিক।

প্রশ্ন ঃ ১৩৩। আমি সুজাত। আমার প্রশ্ন হল, মহিলাগণ কি এয়ারহোস্টেস হিসেবে চাকরি করতে পারবে? যেহেতু এটি শালীন ও অধিক বেতনের চাকরি?

উত্তর ঃ আমি আপনার সাথে একমত যে, এটি খুব উচ্চ বেতনের চাকরি। কিন্তু এটি শালীন চাকরি কিনা তা বিশ্লেষণ করতে হবে? সাধারণত এয়ার হোস্টেস হিসেবে বাছাই করা হয় ঐ সব মহিলাদের যারা সুন্দরী। আপনি কখনো অসুন্দরী বা কদাকার মেয়ে সেখানে খুঁজে পাবেন না। তদুপরি তাদেরকে হতে হবে তরুণী ও আকর্ষণীয়া।

তাদেরকে পরতে হয় এমন পোশাক যা সাধারণত ইসলামি মূল্যবোধ বিরোধী। তাদেরকে অঙ্গাসজ্জা করতে হবে এমনভাবে যাতে যাত্রীরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এয়ার হোস্টেসদেরকে তাদের যাত্রীদের প্রয়োজন পূরণ করতে হয়, সেখানে অধিকাংশ যাত্রীই হল পুরুষ-যেখানে তাদের মধ্যে নৈকট্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেক সময় পুরুষ যাত্রীরা অপ্রয়োজনীয়ভাবে এয়ার হোস্টেসদের সাথে গল্প করে, যদিও এয়ার হোস্টেস পছন্দ না করে তথাপি তাকে তার কথার উত্তর দিতে হয়, অন্যথায় তার চাকরি হুমকির মুখে পড়ে। অনেক সময় পুরুষ যাত্রীরা বলে 'ম্যাডাম অনুগ্রহ করে আমার সিট বেল্ট বেঁধে দিন।' এক্ষেত্রে এয়ার হোস্টেসের কোন উপায় থাকে না, তাকে সিট বেল্ট বেঁধে দিতে হয়। তাহলে এভাবে কি ঘটতে যাচ্ছে?... এখানে বিপরীতমুখী দুই লিঙ্গের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বা নৈকট্য তৈরি হচ্ছে।

অনেক এয়ারলাইন্সে মদ সরবরাহ করার দায়িত্ব থাকে এয়ার হোস্টেসদের। ইসলাম পুরুষ-মহিলা সবাইকে মদ সরবরাহ বা পান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। আর এসব কাজের জন্যই কেবল নারীদেরকে এয়ার হোস্টেস হিসেবে নিয়োগ দেয়া

হয়। ঐ বিমানে অন্য পুরুষ কর্মচারী থাকলেও তাদেরকে এসব কাজে ব্যবহার করা হয় না। তারা সাধারণত রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে। প্লেনে এ ধরনের বিপরীতমুখী কাজের ঘটনা একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বাস করুন, একটি বিমানও মহিলা কর্মচারী ছাড়া চলে না। এমনকি 'সৌদি এয়ারলাইন্স'ও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও এটি শ্রেষ্ঠ ইসলামি রাষ্ট্র সৌদি আরব কর্তৃক পরিচালিত। কিন্তু যদিও সৌদি মেয়েরা এয়ার হোস্টেস হয় না বা পাওয়া যায় না ফলে তাদেরকে বিদেশ হতে বিমানবালা আমদানি করতে হয়। যদিও এটি সৌদি ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তথাপি তাদের কাছে কোন বিকল্প নেই।

বিমানচালনা একটি পেশা– যেখানে যাত্রীদের আকৃষ্ট করার জন্য মহিলা এয়ার হোস্টেস রাখতে হয়। বিমান চালনা সংস্থায় কতিপয় নিয়ম রয়েছে যা শুনলে আপনি হতভম্ব হবেন। উদাহরণস্বরূপ 'এয়ার ইন্ডিয়া' ও 'ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স' বলে যে, 'এয়ার হোস্টেস নির্বাচিত হওয়ার পর চার বছর পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে না'। কিছু এয়ারলাইন্স বলে যে, 'তুমি যদি গর্ভবতী হও তবে তোমার চাকরি শেষ হয়ে যাবে'। কল্পনা করুন! কিছু এয়ারলাইন্স বলে 'তোমার অবসর বয়সসীমা ৩৫ বছর'। কিন্তু কেন? কারণ তুমি আর তখন যথেষ্ট আকর্ষণীয় নও। আপনি কি এটাকে শালীন চাকরি বলবেন?

প্রশ্ন ঃ ১৩৪। আমি রশীদ শেখ। আমি একজন ছাত্র। আমার প্রশ্ন হল ইসলামে সহশিক্ষার কি অনুমতি আছে?

উত্তর ঃ ডা. নায়েক ঃ সহশিক্ষা বলতে যদি আপনি বোঝেন একই স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে ছেলে-মেয়ে একই সাথে পড়া। তবে প্রথমত আসুন আমরা বিশ্লেষণ করি যেখানে ছেলে এবং মেয়ে একই স্কুলে পড়াশুনা করে এমন প্রতিষ্ঠানের ওপর। 'The World This Week' নামক একটি রিপোর্ট গত বছর প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে সহশিক্ষা ও একক শিক্ষা দানকারী স্কুলের ওপর জরিপ চালানো হয়েছে। যুক্তরাজ্যের স্কুলগুলো এবং জরিপকারীরা বলেছেন একক শিক্ষা দানকারী স্কুল ও সহশিক্ষা দানকারী স্কুলগুলো থেকে অনেক ভাল। যখন শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার নেয়া হলো তখন তারা বললেন, একক শিক্ষাদানকারী স্কুলগুলোর ছাত্ররা সহশিক্ষা দানকারী স্কুলের ছাত্রদের থেকে অনেক মনোযোগী হয়ে থাকে। কিন্তু ছাত্ররা জানান তারা সহশিক্ষাই পছন্দ করে এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, এর কারণ কি? জরিপ থেকে স্পষ্টত দেখা যায় যে, সহশিক্ষা দানকারী স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীরা একটি উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করে বিপরীত লিঙ্গের নিকট জনপ্রিয় হওয়ার জন্য।

অধিকন্তু পড়াশুনায় মনোযোগ না থাকলেও ক্লাসে বিপরীত লিঙ্গের মনোযোগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে তারা শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর দেয় খুব স্মার্টভাবে। তারা স্কুলে পড়াশুনা করার চেয়ে ডেটিংয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় করে। জরিপের সর্বশেষে

দেখা যায় যে, U. K. সরকার অধিক হারে একক শিক্ষা দানকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করছে। এরকম আমেরিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে– মেয়েরা স্কুলে শিক্ষকদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের চেয়ে ক্লাসমেটের কাছ থেকে নিষিদ্ধ যৌন শিক্ষা বা কৌশল শিখতে বেশি সময় ব্যয় করে। ভারতেও অহরহভাবে এমন ঘটনা ঘটছে কম বা বেশি হারে।

চলুন, আমরা এবার সহশিক্ষা দানকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে বিশ্লেষণ করি। এ রিপোর্টে স্কুল সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে ঐ একই কাজগুলো কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও হয় তীব্র হারে। ১৯৮০ সালের ১৭ মার্চ 'নিউজ উইক' এর রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কী পরিমাণে যৌন আক্রমণ হচ্ছে নারীদের ওপর। এ রিপোর্টে বলা হয়েছে– আমি এ রিপোর্টের পুরো ঘটনা উল্লেখ করতে পারব না, কারণ সময় সীমিত। এর প্রধান দিক হল, "প্রফেসর এবং লেকচারাররা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল গ্রেড পয়েন্টের জন্য যৌন হয়রানি করে। ফলে শিক্ষার প্রতি সবার মনোযোগ কমে যায় এবং শিক্ষার মানও নিচে নেমে যায়। গত বছর একটি দূর্ঘটনা ঘটেছে যেটি পত্রিকার শিরোনাম হয়েছে–আমি কলেজটির নাম ভুলে গেছি, যেখানে একটি মেয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে ৪/৫ জন ছাত্র কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে কলেজ ক্যাম্পাসে। গত ২৬ আগস্ট 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'তে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে– যেটি 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ প্রকাশিত হয়েছে–এখানে বলা হয়েছে, আমেরিকার স্কুল ও ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া মেয়েদের মধ্যে ২৫% ধর্ষিতা হয়।

আমার মূল প্রশ্ন হলো– আপনি কি আপনার সন্তানকে স্কুল-কলেজে পাঠাবেন পড়াশুনার জন্য? নাকি তাদেরকে পাঠাবেন যৌন কৌশল শিক্ষার জন্য অথবা যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার জন্য? যদি প্রথমটি হয় তবে আমি আপনাকে উপদেশ দেব সহশিক্ষায় ভর্তি না করানোর জন্য, আর যদি পরেরটি হয় তবে আপনিই ভাল বুঝবেন আপনি কি করবেন?

প্রশ্ন ঃ ১৩৫। আমি জানতে চাই, কুরআন ও হাদীস ব্যাখ্যাদান করার মত কতজন মহিলা বর্তমানে আছেন এবং পুরুষদের তুলনায় তারা কত শতাংশ?

উত্তর ঃ ডা. নায়েক ঃ ভাইজান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় এমন অনেক মহিলা ছিল যারা শুধু হাদীস ব্যাখ্যাই করতেন না তারা সেগুলো মুখস্থও করতেন। হযরত আয়েশা (রা) নিজে ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এখন প্রধান প্রশ্ন হল, বর্তমানে কতজন নারী 'আলেম' আছেন? এবং তিনি তার শতকরা হার জানতে চেয়েছেন। মুম্বাইতে অনেক মহিলা আলেম রয়েছেন এবং অনেক মুসলিম সংগঠনও রয়েছে, এমনকি দারুল উলুম

নদওয়াতেও। অন্যান্য জায়গাতে যেমন মুম্বাইর 'ইসলাহ-উল-বানাত'-এ অনেক মুসলিম সংগঠন রয়েছে যারা নারী আলেম তৈরি করেন। তাদের শতকরা হার আমি জানি না তবে সংখ্যায় তারা শত শত।

প্রশ্ন ঃ ১৩৬। আমি জেনিফার – আমার প্রশ্ন হলো কেবল স্বামীই কি স্ত্রীকে 'তিন তালাক' বলতে পারে? যদি কোন নারী তালাক বা 'ডিভোর্স' নিতে চান তবে তাকে কী করতে হবে?

উত্তর ঃ ভাইয়ের মূল প্রশ্ন হল ঃ একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে পারে, কিন্তু একজন নারীও কি তার স্বামীকে ডিভোর্স বা তালাক দিতে পারে? একজন মহিলা তালাক দিতে পারে না। কারণ 'তালাক' শব্দটি আরবি যেটা 'ডিভোর্স' অর্থে ব্যবহার করা হয়– যা স্বামী তার স্ত্রীকে দিতে পারে, স্ত্রী-স্বামীকে দিতে পারবে না। ইসলামে ডিভোর্স পাঁচ ধরনের হয়ে থাকে।

প্রথম ঃ এ চুক্তির মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বলবে ব্যাস আমরা আর একসাথে ঘর করার মত উপযুক্ত নই– চলো, আমরা উভয়ে উভয়কে ছেড়ে দেই।

দ্বিতীয় ঃ এ প্রকার হল স্বামীর একক ইচ্ছায় একে তালাক বলে; যেখানে স্বামীকে তার স্ত্রীর প্রদেয় মোহর পরিশোধ করতে হবে এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে প্রদেয় উপহারও ফিরিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় ঃ স্ত্রীর একক ইচ্ছায় ডিভোর্স দেয়া। যদি তার বিয়ের চুক্তিতে তথা তার নিকাহনামায় এটি উল্লেখ থাকে তবে এককভাবে স্বামীকে ডিভোর্স দিতে পারবে– এটাকে বলা হয় 'ইসমা'। আমি কখনোই কাউকে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে ডিভোর্স দেয়ার পদ্ধতি ইসমা সম্পর্কে বলতে শুনিনি।

চতুর্থ এ পদ্ধতিটি হল, যদি স্বামী তার সাথে খারাপ আচরণ করে অথবা তাকে ন্যায্য অধিকার না দেয়, তখন তার 'কাজীর' কাছে যাওয়ার অধিকার আছে এবং বিয়ে বাতিল করার আবেদন জানাতে পারবে। একে বলে 'নিকাহ-ই-ফাসেদ'। তখন কাজী তার ইচ্ছানুযায়ী স্বামীকে তার পুরো মোহর অথবা মোহরের অংশবিশেষ পরিশোধ করার জন্য বলবে এবং পঞ্চম ও সর্বশেষটি হল 'খোলা' – এক্ষেত্রে যদিও স্বামী সব দিক থেকে ভাল হয় এবং তার সম্পর্কে স্ত্রীর কোন অভিযোগ না থাকে তথাপি তার ব্যক্তিগত কারণে স্বামীকে পছন্দ করে না – তখন সে স্বামীকে অনুরোধ করতে পারে তাকে ডিভোর্স দেয়ার জন্য – আর এটাই হল 'খোলা'। কিন্তু এটা দুঃখজনক হলেও সত্য, নারী যে স্বামীকে ডিভোর্স দেয়ার এ পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করতে পারে সে কথা কেউ বলে না। কিছু আলেম-ওলামা আছেন যারা এ পাঁচ ধরনের ডিভোর্সকে ২ বা ৩ ভাগে ভাগ করেন; কিন্তু ব্যাপক অর্থে ইসলামে তালাক পাঁচ প্রকার।

প্রশ্ন ঃ ১৩৭। ইসলামে নারীদের কেন মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ সংক্ষেপে বলতে গেলে আপনার প্রশ্ন বেশ কঠিন। কুরআন এবং সহীহ হাদীসে এমন কোন বক্তব্য নেই যাতে করে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখা যাবে। কিছু লোক একটি নির্দিষ্ট হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন যে, মোহাম্মদ ﷺ বলেছেন, 'মহিলাদের জন্য মসজিদের চেয়ে বাড়িতে নামায পড়া উত্তম এবং তার ঘরে নামায পড়ার চেয়ে তার ঘরের অভ্যন্তরের কক্ষে নামায পড়া অত্যধিক উত্তম।'

ঐসব লোকেরা কেবল একটি উৎস গ্রহণ করে অন্য সকল উৎস বাদ দিয়ে। আপনাকে এ হাদীসের প্রেক্ষাপট বুঝতে হবে। মোহাম্মদ ﷺ এটিও বলেছেন যে, 'মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায পড়া ২৭ গুণ বেশি সওয়াবের কাজ।' তখন একজন মহিলা প্রশ্ন করলেন হে নবী ﷺ! 'আমাদের শিশু বাচ্চা রয়েছে, আমাদের সাংসারিক কাজ করতে হয়...সুতরাং কিভাবে আমরা মসজিদে যাব?' তার উত্তরে নবী করীম ﷺ বললেন– যদি কোন মহিলা ঘরে নামায পড়ে তবে এটা তার জন্য উত্তম, মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে; ঘরে নামায পড়ার চেয়ে তার নিবিড় কক্ষে নামায পড়া আরো উত্তম।" যদি তার বাচ্চা থাকে অথবা তার কোন সমস্যা থাকে তবে ঘরে নামায আদায় করলেও তার সমান সওয়াব হবে। বেশ কিছু হাদীস রয়েছে যেগুলো মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে মহিলাদের বাধা দেয় না। এরকম একটি হাদীস হল– 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা মহিলা তাদেরকে মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা দিও না।'

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে– 'নবী করীম ﷺ স্বামীদের আদেশ দিয়েছেন, যদি তোমাদের স্ত্রীগণ মসজিদে যেতে চায়, তবে তাদেরকে বাধা দিও না।' এরকম আরো কিছু হাদীস আছে আমি এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে চাই না। বস্তুত ইসলাম নারীকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সেখানে তার জন্য পৃথক ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে– আমরা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পক্ষপাতী নই। আমরা নারী-পুরুষদের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী নই এ কারণে যে, ইসলাম যদি মসজিদে এরকম করার সুযোগ দেয় তবে তাই ঘটবে যা সচরাচর অন্য ধর্মীয় স্থানে ঘটে– তবে পুরুষরা তাদেরকে ইভ টিজিং ও কুনজর দেয়ার জন্য অধিক হারে মসজিদে আসবে, নামায পড়ার জন্য নয়। সুতরাং ইসলাম বিপরীত লিঙ্গের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী নয়। সেখানে পর্যাপ্ত আলাদা আলাদা প্রবেশ দ্বার থাকতে হবে, আলাদা ওজুর ব্যবস্থা থাকতে হবে– মহিলা ও পুরুষদের জন্য।

মহিলাদের এবং পুরুষদের আলাদাভাবে দাঁড়াতে হবে এবং মহিলাগণ পুরুষদের পেছনের কাতারে দাঁড়াতে হবে– কেননা যদি মহিলাদের পিছনে পুরুষরা দাঁড়ায়

তবে সেখানে বাজে একটি পরিবেশের সৃষ্টি হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই পুরুষদের নামাযে মনোসংযোগের ঘাটতি হবে। ইসলামের নিয়মানুযায়ী যখন আমরা নামাযে দাঁড়াই, আমাদের দাঁড়াতে হয় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে – এক্ষেত্রে ডাক্তারগণ বলেন যে, মহিলাদের পুরুষদের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি তাপমাত্রা থাকে, সেক্ষেত্রে যদি আপনার পাশে কোন মহিলা দাঁড়ায়, আপনি উষ্ণতা ও কোমলতা অনুভব করবেন তখন আপনি আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার পরিবর্তে, মনোনিবেশ করবেন নারীটির প্রতি। আর এজন্যই নারীদেরকে পুরুষদের সাথে না দাঁড়িয়ে তাদের পিছনে দাঁড়ানোর কথা বলেছে।

আপনি যদি সৌদি আরব যান, সেখানে দেখবেন মহিলারা মসজিদে নামায পড়ছে, আপনি যদি লন্ডন বা আমেরিকা যান, সেখানেও দেখবেন নারীরা মসজিদে যাচ্ছে। এটি কেবল ভারত ও অন্য কতিপয় রাষ্ট্রে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখে। আপনি যদি মক্কার মসজিদে হারামে বা মদিনার মসজিদে নববীতে যান সেখানে দেখবেন মহিলারা মসজিদে আসছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ভারতের কোন কোন মসজিদে এমনকি মুম্বাইয়েরও কিছু মসজিদে নারীদের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। আমি আশা করব এরকমভাবে অন্যান্য মসজিদেও এ ব্যবস্থা চালু হবে।

প্রশ্ন ঃ ১৩৮। আমি প্রশ্ন করতে চাই আজকের এ সম্মেলনটি 'ইসলামে নারীর অধিকার' এর ওপর; কিন্তু মঞ্চে কেন একজনও নারী আলোচক নেই? কেন শুধু পুরুষ? যদি ব্যাপারটি এরকম হয় যে, এটি এখানকার মহিলা শ্রোতাদের সন্তুষ্ট না করে তবে কাদের জন্য এ সম্মেলন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোনটি প্রশ্ন করেছেন যে, কেন মঞ্চে একজনও নারী আলোচক নেই– যেহেতু আজ কোন নারী আলোচক নেই। প্রতি শুক্রবার আমাদের সংগঠনের (IRF) কর্মসূচিতে মহিলা আলোচক থাকেন, যেখানে তারা বক্তৃতা করেন। এখানে আমি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করছি। আমি একজন পুরুষ আলহামদুলিল্লাহ, আজকের প্রধান অতিথি এবং অনুষ্ঠান সমন্বয়কারী সকলেই পুরুষ। এখানে আরো কর্মসূচি হবে যেখানে প্রধান বক্তা ও প্রধান অতিথি সকলেই মহিলা। ইনশাআল্লাহ যখন এরকম অনুষ্ঠান হবে আমরা আপনাদেরকে নিমন্ত্রণ করব।

প্রশ্ন ঃ ১৩৯। স্বামী যদি দ্বিতীয় বিবাহ করতে চায়, সেক্ষেত্রে তাকে কি প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে?

উত্তর ঃ ডা. নায়েক ঃ এটি স্বামীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয় যে, দ্বিতীয় বিয়ের সময় তারা প্রথমা স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে– কেননা কুরআন বলেছে– 'তুমি একাধিক বিয়ে করতে পারবে একটা মাত্র শর্তে যে, যদি তুমি তোমার স্ত্রীদের মধ্যে (পূর্ণাঙ্গভাবে) ন্যায়বিচার করতে পার।'

কিন্তু এটি অবশ্যই উত্তম যে, দ্বিতীয় বিয়ের আগে স্ত্রীর অনুমতি নেয়া এবং এটি তার কর্তব্য যে, সে তার দ্বিতীয় বিয়ের আগে স্ত্রীকে জানানো– কেননা ইসলাম বলে– 'যদি তোমার একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে তোমাকে অবশ্যই তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে হবে।'

কিন্তু যদি প্রথম স্ত্রী অনুমতি দেয়, তবে স্বামী ও তার দুই স্ত্রীর মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিরাজ করবে। কিন্তু এটি আবশ্যকীয় নয়, তবে যদি বিয়ের চুক্তিতে এটি উল্লেখ থাকে তবে তাকে অনুমতি নিয়েই বিয়ে করতে হবে। চুক্তিটি এরকম যে, 'তুমি স্ত্রী থাকাকালীন আমি কাউকে বিয়ে করব না।' কিন্তু অন্যক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক নয় বরং ভাল।

প্রশ্ন ঃ ১৪০। আমার নাম ইয়ার হোসাইন। ইসলাম যখন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী নয়, তবে কিভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে তারা একত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করত?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আমার ভাই প্রশ্ন করেছেন যে, যদি ইসলাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার অনুমতি না দিয়ে থাকে, তবে কিভাবে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে একত্রে কাজ করেছে? আপনি যদি আমার বক্তব্য সঠিকভাবে শুনে থাকেন,...আমি সেখানে বলেছিলাম 'এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও তারা পর্দা করত, তবে সেখানে কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছে।'

আপনি যদি 'সহীহ বোখারী' পড়ে থাকেন, সেখানে বলা হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাদের দেখা যাচ্ছিল, অথচ স্বাভাবিক সময় তাদের পা ঢাকা থাকত। সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে ইসলাম কিছুটা ছাড় দিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের ঘোড়ায় চড়ারও দৃষ্টান্ত রয়েছে, তখন তাদের খালি পা দেখা যেত। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলাম কিছুটা ছাড় দিয়েছে পর্দার ক্ষেত্রে; তবে তার মানে এ নয় যে, ইসলাম তাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার অনুমতি দিয়েছে – যেরকম দেখা যায়, আমেরিকার সৈন্যবাহিনীতে। বরং তারা ইসলামি মূল্যবোধ ও ইসলামি পোশাক বজায় রেখে চলত।

প্রশ্ন ঃ ১৪১। আমি মোহাম্মদ আসলাম গাজী। আমার প্রশ্ন হল, ভিডিও ফিল্ম, নাচ-গান, উপন্যাস, ম্যাগাজিন ও সহ-শিক্ষা সংস্কৃতির কারণে বর্তমান সময়ে যৌন অরাজকতা বৃদ্ধি পেয়েছে – সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের সন্তানদেরকে বিশেষত মেয়েদেরকে কি বিয়ের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ মত বিয়ে করার ব্যাপার আমরা তাদের ওপর ছেড়ে দিতে পারি?

উত্তর ঃ ড. নায়েক ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বর্তমানে যৌনতার ওপর ভিত্তি করে অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কি সন্তানদের বিশেষত মেয়েদের তাদের নিজের ইচ্ছামত বিয়ে করার ওপর অনুমতি দেয়া যায়? জবাব হলো– আমি

আপনাকে বলছি, পিতামাতা নিশ্চিতভাবেই তাদেরকে পরামর্শ দিতে পারে যে, কোথায় বা কাকে তারা বিয়ে করবে, কিন্তু তারা কোন বিয়ের ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। আপনি কি এটি বলতে পারেন যে, পিতামাতার পছন্দ সর্বদা সঠিক হবে? সুতরাং ইসলাম অনুমতি দিয়েছে যে, পিতামাতা তাদের সন্তানদের বিয়ের দিকনির্দেশনা দিতে পারবে, কিন্তু তারা কোনরূপ বাধ্য করতে পারবে না, কারণ এটি নিশ্চিত যে, অবশেষে স্বামীর সাথে তার কন্যাকেই থাকতে হবে; পিতা-মাতাকে নয়।

প্রশ্ন ঃ ১৪২। আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি মিসেস রাজিয়া খান। আমার প্রশ্ন হলো 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' অনুযায়ী কেবল পিতাই তার সন্তানের প্রকৃত অভিভাবক – কিন্তু কেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ইসলাম কেবল পিতাকেই সন্তানের অভিভাবকের দায়িত্ব দিয়েছে– এটি ভুল কথা। ইসলামি শরিয়া মতে, সন্তানের জীবনের প্রথম দিকে অর্থাৎ মোটামুটি ৭ বছর বয়সে অথবা ৭ বছরের কম বয়সের সময় অভিভাবকত্ব মায়ের দিকেই থাকে। কারণ, এ সময়ে মায়েরা সন্তানদের প্রতি বেশি দায়িত্বশীল– পিতার চেয়ে। তারপর অভিভাবকত্ব পিতার দিকেই চলে যায় এবং সন্তান উপযুক্ত বয়সে উপনীত হলে তখন এটা তার স্বাধীন ইচ্ছা যে, সে কার কাছে থাকবে। সে পিতা বা মাতা যার কাছে ইচ্ছা থাকতে পারবে। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে তাকে পিতা-মাতা উভয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং তাদের সেবা-শুশ্রূষা ও তাদের জন্য দোয়া করতে হবে।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

প্রশ্ন ঃ ১৪৩. ভাই আমার নাম রাহুল ভাটিয়া। পেশায় আমি ইঞ্জিনিয়ার। আমার প্রশ্ন হলো পবিত্র কোরআনে (সূরা হাজ্জ, আয়াত নং ৪৭-এ) বলা হয়েছে, 'তোমার রবের একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান', এছাড়া (সূরা সাজদাহ, আয়াত নং ৫-এ) তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'তোমাদের প্রতিপালকের একদিনের পরিমাণ হবে তোমাদের হিসেবে হাজারের বইয়ের সমান।' এরপর (সূরা মা'রিজ, আয়াত নং ৪) উল্লেখ আছে যে, 'ফেরেশতা এবং রুহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে যার পরিমাণ হবে পার্থিব ৫০.০০০ বছর। তাহলে একদিন সমান কত হবে? পঞ্চাশ হাজার বছর না এক হাজার বছর আল্লাহর কাছে ?

উত্তর ঃ আপনার নামতো রাহুল তাইনা? জি, হ্যাঁ। আপনিই তো গতকাল সৃষ্টির ৬ দিন নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। 'মাশাআল্লাহ' আপনাকে ভালবাসি। আমিও আপনাকে ভালবাসি– সে বলল। আমি এখন আপনাকে বলি এগুলো বর্তমানে ইন্টারনেটে কমন প্রশ্ন। আপনাকে এগুলো জানার জন্য বিশেষজ্ঞ হতে হবে না।

আপনি ইন্টারনেটে চলে যান। আপনি চলে যান ইসলামবিরোধী সাইটগুলোতে এরকম আরো অনেক কিছুই পাবেন। আমার অবশ্যই মনে হয় যে, ভাই রাহুল আপনি পুরো কোরআন পড়েন নি। সে বলল পুরোটি পড়ি নি কিন্তু আমার আরো প্রশ্ন আছে। আমি আরো কিছু প্রশ্ন করতে চাই? আগে এর উত্তরটি জানতে চাই।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আপনি যদি সত্যটি জানতে চান তাহলে প্রথমে আপনাকে আসল উৎসটি পড়ে দেখতে হবে। যদি আপনি খ্রিস্টান সম্পর্কে জানতে চান এবং শুধু খ্রিস্টানদের বই পড়েন তাহলে আপনি একপাশে হয়ে যাবেন। তাই আমি আপনাকে বলছি প্রথমে ভাল সাইটগুলো দেখেন, পবিত্র কোরআন পড়েন, তারপর দু'টি না, দু'শত প্রশ্ন করেন আমাকে। আমি ইনশাআল্লাহ্ উত্তর দিব। তবে এখনো উত্তর দিচ্ছি। যেহেতু আমি দাওয়ার কাজে নিয়োজিত, আমি বুঝি যে লোকজন প্রথমে ইসলামবিরোধী সাইটগুলো দেখে এবং মেনে নিয়ে ইসলামের বিপক্ষে চলে যায়। ইসলাম সম্পর্কে জানতে হলে ভাল সাইটগুলোতে যান। এমন সাইটে যাবেন না যেমন আনসারিং ইসলাম। লোকটি বলছে যে আমি এখানে আধা ঘণ্টা ধরে আপনাদের কথা শুনছি আমি এখানে একেবারেই নিরপেক্ষ।

আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি– এটি কোন নতুন প্রশ্ন নয় আমার জন্য। এই প্রশ্নের উত্তর অনেক আগেও দিয়েছি আমি। সব কিছুরই রেফারেন্স আমি দিতে পারি 'মাশাআল্লাহ্' ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে কোরআনের দুটি জায়গায় আল্লাহ বলেছেন যে, একদিনের সমান হলো এক হাজার বছর। আর অন্য জায়গায় সূরা মায়া'রিজে উল্লেখ আছে যে, একদিনের সমান হলো পঞ্চাশ হাজার বছর। কথাগুলো কি পরস্পর বিরোধী নয়? এক জায়গায় বলা হচ্ছে ১০০০ বছর অন্য জায়গায় বলা হচ্ছে ৫০,০০০ বছর। আরবি ভাষায় এই শব্দটি হলো 'ইয়াওম', এখন এই ইয়াওমের দু'টি অর্থ আছে। একটি অর্থ হলো 'দিন' যেমন ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন এবং অন্য অর্থটি হলো একটি নির্দিষ্ট সময়কাল। একটি যুগ। এটি যেকোন একটি সময়কাল হতে পারে। তাহলে ইয়াওমের একটি অর্থ দাঁড়াচ্ছে 'দিন' অন্যটি হচ্ছে সময়কাল। তাহলে সঠিক করে কোরআন পড়েন একটি আয়াত বলছে যে, একদিন সবকিছু আল্লাহ্ তায়ালার কাছে উপরে চলে যাবে। যে দিনের পরিমাণ হবে ১০০০ বছর, তোমাদের হিসেবে। একটি দিন একটি সময়কাল তোমাদের দিনের হিসেবে এক হাজার বছর। অন্য জায়গায় সূরা মায়া'রিজ, আয়াত নং ৪-এ উল্লেখ আছে যে 'ফেরেশতাগণ যখন আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এসময় যে সময়টি লাগে সেটি পার্থিব বছরের ৫০,০০০ বছরের সমান।'

আমি একটি উদাহরণ হিসেবে বলি, ধরেন যদি আমি দুবাই থেকে আবুধাবি যেতে চাই তাহলে ১ ঘণ্টা সময় লাগবে। আর যদি দুবাই থেকে আমেরিকা যেতে চাই

সমগতিসম্পন্ন প্লেনে, তাহলে সময় লাগবে ৫০ ঘণ্টা। দুবাই থেকে আবুধাবি যেতে সময় লাগবে ১ ঘণ্টা এবং দুবাই থেকে নিউইয়র্ক যেতে আমার সময় লাগবে ৫০ ঘণ্টা। এটি পরস্পর বিরোধী কথা নয়। কারণ এখানে দুটি বিষয়ই প্রকৃত অর্থে আলাদা। আল্লাহ্ বলেছেন একদিন সবকিছু তার কাছে যাবে, সেটির সময় আলাদা এবং অন্য জায়গায় ফেরেশতাগণ তার কাছে যাবেন সেটির সময়ও আলাদা। এগুলো পরস্পর বিরোধী নয় এখানে বিষয়ই আলাদা। তাই এখানে সময়ের হিসাবটিও ভিন্ন। যদি অনুবাদ করেন ২৪ ঘণ্টার ১ দিন তাহলে পরস্পর বিরোধী হবে এবং যদি অনুবাদ করেন এটি একটি সময়কাল, যেমন আল্লাহ্ বলেছেন যে, তিনি এই পৃথিবীমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন মোট ৬ দিনে অর্থাৎ ৬টি আইয়ামে। এটি কিন্তু ২৪ ঘণ্টার ১ দিন নয়, তাহলে পরস্পর বিরোধী হবে।

এই ৬টি সময়কাল, ৬টি যুগ বিজ্ঞানীদেরও এ বিষয়ে কোন আপত্তি নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এখানেও ইয়াওমের অর্থ একটি সময়কাল। তবে এই উত্তরগুলোর জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে যেতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা হচ্ছে- www.irp.net ইনশাআল্লাহ বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তরই সেখানে পাবেন। আশা করি, আপনার উত্তরটি বুঝে নিয়েছেন। লোকটির জিজ্ঞাসা- স্যার, তাহলে এখানে দুটি জিনিস ভিন্ন? হ্যাঁ, তাই। লোকটি বললো চমৎকার। এখানে ইয়াওমের বহুবচন হলো আইয়াম। এখানে একটি সময়কালকে বুঝাচ্ছে, যা হতে পারে ১ বছর, ১ হাজার বছর, ১ কোটি বছর যেকোন সময়কাল হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ১৪৪। রাহুল ঃ আমি এখন যে প্রশ্নটি করবো সেটি হলো, আপনি একটি লেকচারে বলেছিলেন যে, এক জায়গায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলেছেন- "তোমরা আমার কোন প্রতিমা তৈরি করবে না। এমন রূপক বানাবে না যেটি আছে স্বর্গের উপরে অথবা পৃথিবীর উপরে কিংবা পাতালে। কারণ আমি তোমাদের প্রভু খুবই প্রতিহিংসাপরায়ণ।" এখন আপনার কি এটি মনে হয় না যে, অথবা এটি খুব হাস্যকর মনে হয় না? যে ঈশ্বরের মধ্যে প্রতিহিংসা আছে? অথবা তিনি ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন? আমার ধারণা ছিল এই অনুভূতিগুলো শুধু আদম সন্তানেরই থাকে। ঈশ্বর হিংসা করছে, ঈশ্বর ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন, আমার মনে হয় না যে ঈশ্বর এভাবে কখনো চিন্তা করে থাকেন?

উত্তর ঃ ভাই রাহুল, আপনি আবারও সুন্দর একটি প্রশ্ন করলেন এবং আমিও আপনার সাথে একমত। এই কথাটি বলা হচ্ছে কী? বলে যে ঈশ্বর কেন হিংসা করবেন? বাইবেল আসমানী গ্রন্থ আমি একথা বলছি না এবং আমি এ কথাও মানি না যে পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের বাণী।

রাহুল ঃ আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, আমরা ঈশ্বরের সাথে কাউকে শরিক করবো না। না হলে ঈশ্বর রেগে যাবেন। ভাই রাহুল যদি প্রশ্ন করে থাকেন তবে দয়া করে আমাকে উত্তর দিতে দেন।

রাহুল ঃ আমি দুঃখিত। যদি এটি বিতর্ক হতো আমিও বিতর্ক করতে পারি কোন সমস্যা নেই। কিন্তু এখন প্রশ্নোত্তর চলছে। আপনার প্রশ্নটি করেন তারপর আমার উত্তর শুনেন। যদি আপনি আমার কথার ওপর কথা বলেন, আমি কিন্তু মনে না করলেও সেটা হবে বিতর্ক। তবে পরে সেটি এক সময় করা যাবে। আপনার আরো প্রশ্ন থাকলে আমি শুনব কিন্তু কথা বলতে থাকলে সেটি হয়ে যায় অনেকটা বিতর্কের মতো। কিন্তু বিতর্কে সময় থাকে ১৫ মিনিট করে উভয়পক্ষে। আপনি একটি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে আমি একটি উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম যেখানে বলা আছে যে, তোমরা আমার কোন প্রতিকৃতি তৈরি করবে না। যা আছে স্বর্গের উপরে অথবা পৃথিবীর উপরে কিংবা পৃথিবীর নিচে। তোমরা এমন কাউকে উপাসনা করবে না। কারণ আমি তোমাদের প্রভু, ঈশ্বর এবং খুবই ঈর্ষাপরায়ণ।" কিন্তু এ কথাটির রয়েছে (বুক অব এক্সোডাজ, অধ্যায়-২০, অনু ৩ থেকে ৫) অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্টে। তাছাড়াও (বুক অব ডিওটরনমী, অধ্যায়-৫, অনু-৭-৯) এবং এটি হচ্ছে বাইবেলের উদ্ধৃতি।

আমি এ কথা বলি নি যে পুরোটাই ঈশ্বরের বাণী। এই অনুচ্ছেদের প্রথম অংশের সাথে আমি একমত যে ঈশ্বরের কোন প্রতিকৃতি নেই। কিন্তু ২য় অংশে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর ঈর্ষাপরায়ণ আমি এ কথা স্বীকার করি না। তাই এই প্রশ্নটি করবেন একজন খ্রিস্টানকে। আমি এখানে বাইবেলের সবকিছু সমর্থন করছি না। যদি কোরআনের সাথে মিল থাকে তাহলে সমর্থন করি কিন্তু মিল না থাকলে সমর্থন করি না। তাই আমি এখানে আপনার সাথে একমত যে, ঈশ্বর ওখানে ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন এবং আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

রাহুল ঃ তবে মানতে হবে যে এখানে কাউকে ঈশ্বরের সাথে শরিক করা যাবে না এবং এটাই সবচেয়ে বড় পাপ। হে, এই কথাগুলো আমি পূর্বেও বলেছি। আমি বলেছিলাম যে ঈশ্বরের সাথে কাউকে শরিক করা সবচেয়ে বড় পাপ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ঃ ১৪৫। জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক পিনাই-ডু। তিনি বলেছেন, মুসলমানরা মানবজাতির আশীর্বাদ। কিন্তু এখানে অমুসলিমদের কি হবে? যারা জন্ম থেকেই অমুসলিম। জীবনের কোন পর্যায়ে তারা ইসলামকে বুঝবে?

উত্তর ঃ উনি বলেছেন যে, মুসলিমরা মানবজাতির আশীর্বাদ। 'আলহামদুলিল্লাহ। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। তবে একজন অমুসলিম যিনি জন্ম থেকে মুসলিম নন। জীবনের কোন পর্যায়ে সে ইসলামকে বুঝবে? উত্তর দেয়ার আগে আমি একটি বিষয়ে বলতে চাই যে, আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক শিশুই দীন-উল-ফিতর' নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। 'দীন-উল-ফিতর' অর্থাৎ আল্লাহর ধর্ম। প্রত্যেকটি শিশুই মুসলিম হয়ে জন্মায়। কিন্তু পরবর্তীতে সে প্রভাবিত হয় মা, বাবা, গুরুজন, শিক্ষক ইত্যাদি জন দ্বারা। তারপর তারা শুরু করে মূর্তিপূজা, অগ্নিপূজা

এবং এভাবেই সে অমুসলিম হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক শিশুই ইসলাম অনুযায়ী মুসলিম হয়ে জন্মায় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য। পরবর্তীতে সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে অমুসলিম হয়ে যায়। তাই যখন কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে এখানে শব্দটি আসলে 'কনভার্ট' হবে না। কনভার্ট হলো এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করা, এক বিশ্বাস থেকে অন্য বিশ্বাসে। কিন্তু এখানে সঠিক শব্দটি হবে 'রিভার্ট'। রিভার্ট মানে সে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ছিল এবং তারপর অমুসলিম হয়েছিল এবং আবার ইসলামে ফিরে এসেছে। সে জন্য এখানে সঠিক শব্দটি হবে 'রিভার্ট'। প্রত্যেক মানুষই জন্মায় নিষ্পাপ হয়ে কিন্তু পরবর্তীতে সে ভুল পথে চলে যায়।

এবার প্রশ্নটিতে আসি। যারা অমুসলিম হয়ে যায়, তারা কিন্তু অমুসলিম হয়ে জন্মায় না। প্রত্যেক মানুষই মুসলিম হয়ে জন্মায়। যারা তাদের বাবা, মা অথবা পরিবেশের কারণে অমুসলিম হয়ে যায়। তারা জীবনে কখন ইসলামকে বুঝতে পারবে? একেক সময়ে একেক মানুষ এটি বুঝতে পারবে। যেমন– যে মুসলিম পরিবারে জন্মায় সে হয়তো জীবনের প্রথম দিন থেকেই বুঝতে পারবে। আবার মুসলিম পরিবারে জন্মানোর পরও অনেকে সেটি বুঝতে পারে না এবং পরে হয়তো বুঝতে পারবে। কেউ হয়তো প্রথম দিন থেকেই বুঝবে কেউ ১ বছর পর, কেউ ২ বছর পর কিংবা ৫ বছর পর বা ১০ বছর পর বুঝতে পারে, তবে কতদিন লাগবে সেটি আপনিই ভাল জানেন। কিছু লোক অমুসলিম পরিবারে জন্মায় সেখানে সে বড় হয়। তারা হয়তো একেবারে ছোটবেলায় বুঝবে কিংবা স্কুলে পড়ার সময় অথবা কলেজে পড়ার সময়ও বুঝতে পারে। প্রকৃতপক্ষে একেকজন মানুষ একেক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বুঝে থাকে। কোন মুসলিম সেই অমুসলিমকে বোঝাক বা না বোঝাক আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন (সূরা হা-মীম সিজদা, আয়াত নং-৫৩-এ) "আমি তোমাদের জন্য আমার নিদর্শনগুলো প্রকাশ করবো। নিদর্শনগুলো প্রকাশ করবো এই বিশ্ব জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে যতক্ষণ না তাদের কাছে পরিষ্কার হবে এটাই সত্যি।" তাহলে কোন মুসলিম অমুসলিমদের বোঝাক বা না বোঝাক। আল্লাহ এই কথাটি স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'তিনি নিদর্শনগুলো প্রকাশ করবেন এই বিশ্ব জগতে যতক্ষণ না সেটা মানুষের কাছে পরিষ্কার হবে।'

আমি যদি কোন কথা তাদের বলি সে হয়তো নাও বুঝতে পারে। কিন্তু আল্লাহ যখন বলেন সেটা নিশ্চিত করেন যে, সেটা তারা অর্থাৎ অমুসলিমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে। যতক্ষণ না সে বুঝতে পারে যে, এটাই হলো সত্যি। এটাই হচ্ছে হক্ব। কিন্তু পরবর্তীতে এই সত্যটি জানার পরে সে হয়তো মানবে কিংবা মানবে না সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগত কারণে স্বীকার করতে পারে– আবার নাও স্বীকার করতে পারে। কিন্তু সে মারা যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই আল্লাহ তাকে নিদর্শন দেখাবেন। কিন্তু কবে কখন সেটি তিনি অর্থাৎ আল্লাহই ভাল জানেন। তবে মারা

যাওয়ার পূর্বে এবং রোজ কিয়ামতের দিন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তারা কখনো আল্লাহর কাছে কোন অভিযোগ করতে পারবে না যে, সে কোন নিদর্শন পায় নি। কেন তাকে জাহান্নামে পাঠানো হচ্ছে? তারা শুধু বলবে আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমরা ভুল করেছি। কারণ, তারা জানে যে তারা নিদর্শন দেখেছে কিন্তু গ্রহণ করে নি। তারা তখন বলবে যে তাদের আরেকবার সুযোগ দেয়া হোক। কিন্তু তখন আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাহলে আল্লাহ তাদের নিদর্শন দেখাবেন সে মারা যাওয়ার পূর্বে। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৪৬। আমার নাম মহেশ। আজকেও আপনি একটি খুব সুন্দর লেকচার দিলেন। আমার প্রশ্নটি হলো– পবিত্র কোরআনে একটি সূরা আছে, নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, "তৃষ্ণা তখন চলে যায় সন্ধ্যায় রোজা ভাঙ্গার পরে। তৃষ্ণা যখন চলে যায় এবং শিরায় তখন রক্ত সঞ্চালিত হয়। এটি একটি দোয়া আপনি কি এটির ব্যাখ্যা দিবেন?

উত্তর ঃ 'মাশাআল্লাহ' ভাই আপনি একটি অনুবাদ পড়ে শুনালেন একটি দোয়ার, যেটি দিয়ে ইফতার করা হয় এবং আমি আপনাকে বলতে চাই যে, মাশাআল্লাহ আপনি ধীরে ধীরে বুঝার চেষ্টা করছেন শান্তির ধর্মকে, এই সত্যের ধর্মকে আমি আপনার জন্য দোয়া করি যেন আল্লাহ আপনাকে হেদায়েত করেন। ভাই প্রশ্ন করলেন ইফতারের সময় আমরা যে দোয়াটি পড়ি সেটার অর্থ বা ব্যাখ্যাটি কি? ইফতারের সময় আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, তৃষ্ণা তখন চলে গেছে ধমনীতে রক্ত চলাচল বেড়েছে। আমরা যখন ইফতার করি তখন প্রার্থনা করি আমাদের ইফতারের সময় আমাদের তৃষ্ণা চলে গেছে এবং আমরা তখন বিভিন্ন খাবার খেয়ে থাকি। পানি পান করি এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে, আমরা রোজা রাখতে পেরেছি এখন রোজা ভাঙ্গার সময় হয়েছে এবং তৃষ্ণা দূর হয়ে যাচ্ছে আমাদের ক্ষুধা মিটে যাচ্ছে। এটিই হলো দোয়া। আমরা বলে থাকি যে আমাদের তৃষ্ণা চলে গেছে রোজা ভাঙ্গার মাধ্যমে। ইফতারের পূর্বে আমরা এই দোয়াটি পড়ে থাকি। আশা করি উত্তরটি বুঝতে পেরেছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৪৭। আমার নাম দেবাশীশ গাঙ্গুলী। পেশাগতভাবে আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন সাংবাদিক। এই অনুষ্ঠান নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবো। আমি আপনাকে বেশ কতগুলো প্রশ্ন করতে চাই? আমার প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে, আপনার দেশ নিয়ে কি আপনি গর্বিত?

উত্তর ঃ সাধারণত সাংবাদিকরা একটি প্রশ্ন করে সেটির উত্তর দেয়ার পর দ্বিতীয় প্রশ্নটিই হয় ফাঁদ। আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আমি আসলে বলতে চাই যে, বেশিরভাগ সাংবাদিকই এ রকম করে থাকেন। আমি বলছি না যে আপনিও এ রকম। আপনি হতে পারেন আবার নাও হতে পারেন। তবে বেশিরভাগ

সাংবাদিকই। এখানে আপনারা একটা জিনিস ভাল করে দেখেন আমি লাইনেই আছি। যদি কোন লোক একটি প্রশ্ন করতে চায় তাহলে প্রশ্নটি করেই চলে যায়। কিন্তু উনি দুটি প্রশ্ন করবেন। উনি প্রথম উত্তরটি শুনতে চান, আমি প্রথম উত্তরটি দেয়ার পর দ্বিতীয় প্রশ্নটিই হবে ফাঁদ। কিন্তু যদি ২টি প্রশ্ন করেন এক সাথে সেটি ফাঁদ নয়। তবে কোন সমস্যা নেই আমার উত্তর একই হবে। আমি আমার দেশকে নিয়ে গর্বিত। আপনি যতই প্রশ্ন করেন আমি একথাই বলবো। পৃথিবীর মধ্যে খুব কম ধর্মনিরপেক্ষ দেশ যেখানে অধিকার দেয় যে তার দেশের নাগরিকগণ তার নিজের ধর্মকে প্রচারও করতে পারবে, পালনও করতে পারবে। আমি আমার দেশকে নিয়ে গর্বিত। আমি আমার দেশ নিয়ে অনেকভাবেই গর্বিত।

দেবাশীশ ঃ আমি আমার ২য় প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ঃ ১৪৮। জনৈক অমুসলিম মহিলা। আপনি বলেছেন যে, মুসলিমদের মধ্যে কিছু কুলাঙ্গার আছে, তারা খারাপ কাজ করে থাকে এবং মিডিয়াও তাদের তুলে ধরে। এই সব মুসলিমরা কি ধর্মের নামে খারাপ কাজ করে মিডিয়াকে সুযোগ করে দিচ্ছে না? এবং এতে করে অমুসলিমরাও কী ভুল বুঝছে না?

উত্তর ঃ একজন অমুসলিম বোন এই প্রশ্নটি করেছেন এবং এটি খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। যে, মুসলমানদের মধ্যে বেশ কিছু কুলাঙ্গার আছে। এই কুলাঙ্গাররাই কি ইসলামের নামে খারাপ কাজ করে মিডিয়াকে সুযোগ করে দিচ্ছে না? আসলে এই কুলাঙ্গাররা তো কোন মুসলমানই নয়। একজন মুসলিম কখনো এই রকম ভুল কাজ করবে না। মুসলিম শব্দটার অর্থ হলো যে ব্যক্তি তার নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্থন করে। এই কুলাঙ্গাররা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম নামধারী নকল মুসলিম। তবে তাদের নাম হয়ে থাকে মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ, সুলতান, জাকির ইত্যাদি। কিন্তু নাম দিয়ে আপনি মুসলিম হতে পারবেন না। মুসলমান হতে হলে কথা ও কাজ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করলেই আপনি মুসলিম হবেন। তাহলে এ সব লোকজন প্রকৃত মুসলমান নয় তবে তাদের নামগুলো শুধু মুসলমানদের।

তাই তারা মিডিয়াকে সুযোগ করে দিচ্ছে কি দিচ্ছে না তারা তা নিয়ে ভাবে না। কারণ, তারা তো তাদের নিজের ধর্মের দিকেই কোন খেয়াল নেই। তারা তাদের নিজেদের ধর্ম নিয়ে মোটেও চিন্তা করে না। তারা তাদের ধর্ম নিয়েও ভাবে না। মিডিয়া কি করছে তা নিয়েও চিন্তা করে না। কিন্তু আমি মিডিয়ার দোষ দিতে চাই। তারা কেন অল্প কিছু মানুষকে তুলে ধরছে? যদি মুসলমানদের বেশিরভাগই এ সব কাজ করতো। তখন ইসলামকে অপবাদ দিলে আমি নিজেও আপত্তি করতাম না। কিন্তু তারা অর্থাৎ মিডিয়া অল্প কিছু মানুষকে বেছে নিচ্ছে। যদি আপনারা একটু চিন্তা করে দেখেন যে হিটলার ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছিল এই জন্য কি

আমি খ্রিস্টানদের দায়ী করবো? হিটলার যে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে খুন করলো, সবাইকে সে পুড়িয়ে মারলো, এই জন্য কি আমি খ্রিস্টান ধর্মকে দোষ দিতে পারবো? কিন্তু কখনো নয়। কারণ বাইবেলের কোথাও লেখা নেই যে তোমরা ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করবে। এমন কিছু বলাটা খুবই ভুল।

তাই আমি মিডিয়াকেই বেশি দোষ দিতে চাই এ সব কুলাঙ্গারের চাইতে। প্রত্যেক ধর্ম গোত্রেই আপনারা কিছু কুলাঙ্গার খুঁজে পাবেন এবং আমি আমার অনেক আলোচনাতেই এ সব কুলাঙ্গারের বিরুদ্ধে বলেছি। মিডিয়ার উচিত এমন সব খবর প্রচার করা যেগুলো সত্যি। মিডিয়া এ সব লোকদের দেখিয়ে বলতে চায় এরাই হচ্ছে আসল মুসলিম। কিন্তু তারা এভাবে বলতে পারে যে কিছু মুসলিম চুরি করে তাদের সংখ্যা মাত্র ১ জন, ৫ জন, ১০ জন এবং মুসলমানদের সংখ্যা ১ শত কোটিরও বেশি। এভাবে বলা হলে কোন সমস্যা হতো না। কিন্তু তারা বলতে চায় যে সব মুসলিমই ভুল কাজ করছে। যদি কোন নামধারী মুসলমান মাদক নিয়ে ধরা পড়ে মিডিয়া এমন ভাব করে যেন সব মুসলিমই মাদক নিয়ে ব্যবসায় করছে। কিন্তু মিডিয়ার উচিত সত্য কথা প্রচার করা এবং আমিও তাই চাই। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৪৯। ডা. জাকির নায়েক আপনাকে আমি আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি পিস্ টিভির কার্যক্রম শুরু করার জন্য। আমি সবাইকে তাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। এখন আমার প্রশ্ন হলো, ইসলাম ধর্মে 'খৎনা' দেয়া বাধ্যতামূলক কেন?

উত্তর ঃ এক ভাই প্রশ্ন করলেন যে, খৎনা করা ইসলাম ধর্মে 'ফরয' অর্থাৎ আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক কিনা? ভাই প্রথমে আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি এটি ইসলামে 'ফরয' না, এটি হলো 'সুন্নাত'। এটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এটি করলে ভাল। এ বিধানটি হলো 'মুস্তাহাব'। ইসলামে খৎনা দেয়া হলো সুন্নাত, এটি 'ফরয' না। কিন্তু খৎনা দেয়ার অনেক কারণ আছে। আমি একজন ডাক্তার হিসেবে এই খৎনার উপরে পুরা একটি লেকচার দিতে পারি। তবে যেহেতু এটি প্রশ্নোত্তর পর্ব, তাই আমি সংক্ষেপে বলছি। আজকের বিজ্ঞান আমাদের বলে যদি কোন লোক খৎনা করে তাহলে তার লিঙ্গে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভবনা কম। খৎনা করা থাকলে সম্ভাবনা খুবই কম। যদি খৎনা দেয়া না থাকে তাহলে সম্ভাবনা বেশি। বেশ কিছু রোগ আছে যেগুলো প্রতিরোধ করা যায় যদি খৎনা দেয়া থাকে।

খৎনা দেয়ার সময় লিঙ্গের উপরের স্ক্রিনটি কেটে ফেলে দেয়া হয়। যদি খৎনা দেয়া না থাকে, তাহলে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার পর তার উপরের চামড়ায় কয়েক ফোঁটা প্রস্রাব থেকে যায়, যা থেকে অনেক রোগ হতে পারে। এ থেকে যে সবরোগ হতে পারে। যেমন– চুলকানি হতে পারে, শরীরের ত্বকে প্রদাহ হতে পারে, হতে পারে পেপলোসাইটিস। খৎনা করা থাকলে এসব রোগকে প্রতিরোধ

করা যায়। তাছাড়া প্রস্রাব করার পর আমরা পানি দিয়ে ধুয়ে নেই এবং এভাবেই বিভিন্ন রোগকে প্রতিরোধ করে থাকি। আজকে বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, সে লোক অধিক যৌন তৃপ্তি পাবে যার খৎনা দেয়া থাকে।

তাছাড়াও খৎনা দেয়া থাকলে ত্বকে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। বর্তমানে বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, যার খৎনা দেয়া থাকে তার 'এইডস' রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। যদি খৎনা করা না থাকে তাহলে এইডস ভাইরাস খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে থাকে। এ রকম আরো অনেক রোগবালাই প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় যদি খৎনা দেয়া থাকে। এ জন্যই আপনারা দেখে থাকবেন যে, আমেরিকাতে এখনকার দিনে ৫০% এর বেশি শিশুকে তার বাবা-মায়েরা খৎনা দিয়ে থাকে। তারা তো মুসলিম না। এমনকি আমেরিকার খ্রিস্টানরাও অর্থাৎ ডাক্তার, বাবা-মাকে বলে থাকেন আপনারা কি আপনার ছেলের খৎনা দিতে চান কি না? এবং তাদের মধ্যে ৫০%-এর বেশি ছেলেদেরকে খৎনা দেয়া হয়। ইসলামে আছে বলেই সে জন্য তারা করে না। তার কারণ হলো তারা জানে যে, খৎনা করানো হলে তার ছেলেদেরই উপকার হবে।

প্রশ্ন ঃ ১৫০। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম ইমরান মুহাম্মদ। আমি একজন আইটি ম্যানেজার। আমার প্রশ্নটি হলো ইসলামের বিরুদ্ধে মিডিয়ার ষড়যন্ত্র নিয়ে, কিভাবে মুসলমানরা এ সমস্ত ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করে থাকবে? যেভাবে আমেরিকা পুরো পৃথিবীকে আপন করতে চায় এবং ইসলামকে দাবিয়ে রাখতে চায় ইত্যাদি। প্রায়ই দেখা যায় যে, এ সব ক্ষেত্রে যে সব মুসলিম তাদের ধর্ম সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না তারা মিডিয়ার সেই সমস্ত মিথ্যা রটনাগুলো বেশি করে বিশ্বাস করে থাকে। কিভাবে মুসলমানদের এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ ভাই, আপনি প্রশ্ন করলেন যে, কিভাবে একজন মুসলিম প্রতিবাদ করবে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, যেগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে আমেরিকা প্রচার করে থাকে এবং আমরাও বুঝতে পারি না যে আমাদের কি করতে হবে? তবে প্রথমে যা করতে হবে সেটি হলো– আগে আমাদের নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে। দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য বেশিরভাগ মুসলমানই তার নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানে না। তাই আমরা এই সমস্ত সমস্যায় পড়ে থাকি। যদি নিজের ধর্মকে ভাল করে জানি, তবে মিডিয়া এই মিথ্যা রটনা করতে পারবে না। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে জানি না। এ কারণেই আমরা লজ্জিত হই যখন মিডিয়া বিভিন্ন খবর প্রচার করে এবং তাদের কথাগুলো মেনে নেই।

আমি একটি উদাহরণ দেই। একবার এক ধার্মিক মুসলিম তিনি একদিন আমাকে বললেন ভাই জাকির, আপনি কী জানেন এই তালেবানরা খুবই নিষ্ঠুর খারাপ মানুষ? আমি বললাম কেন? কারণ কি? কারণ তারা মহিলাদের মারে। আমি বললাম কে বলেছে? তিনি বললেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি। কোথায় দেখেছেন? আমি বি.বি.সি-তে দেখেছি। তালেবানদের পক্ষে আমি এখানে বলছি না। তারা আমার বন্ধুও না এবং শত্রুও না। আমি তাদের পক্ষে বলছি না। আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াই। একবার মালয়েশিয়াতে লেকচার দিচ্ছিলাম। এক দম্পত্তি তারা দু'জনেই ডাক্তার। একজন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ অন্যজন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ। তারা আফগানিস্তানে ছিলেন এক মাসেরও বেশি সময় ধরে। সেখানে তারা আহত লোকদের চিকিৎসা করছিলেন।

সেই মহিলা ডাক্তার আমাকে বললেন– "তালেবানরা এক মহিলাকে মারছে" ভিডিওটি যে টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে তারা তালেবান না? আমি বললাম আপনি কিভাবে জানলেন? তিনি বললেন আমি তালেবানদের সাথে ছিলাম, আমি জানি তারা কিভাবে পাগড়ি বাঁধে। যেমন– আমরা আরব নই, তাই আমরা বুঝতে পারব না পাগড়ি বাঁধার কতগুলো নিয়ম আছে আরবদের মধ্যে। তবে তারা জানে যে আরব আমিরাতে পাগড়ি বাঁধার নিয়ম একরকম, সৌদি আরবে পাগড়ি বাঁধার নিয়ম আরেক রকম এবং কুয়েতে অন্য রকম। তারা তা জানে কিন্তু আমরা তা জানি না। সেই মহিলাটি তালেবানদের সাথে ছিলেন। তাই তিনি জানেন তারা কিভাবে পাগড়ি বাঁধেন, কিন্তু ভিডিওতে দেখানো তালেবানরা সেভাবে পাগড়ি বাঁধে না। এখানে বলতে চাচ্ছি, ভিডিওতে যে তালেবানের দেখানো হয়, তারা প্রকৃত তালেবান নন। তারা নকল তালেবান।

ভিডিওতে দেখানো শ্যুটিংটি হলিউড কিংবা অন্য যেকোনখানেই হোক, তারা ঠিকমতো শ্যুটিং করতে পারে নি। এভাবে মিডিয়া সব কিছু বদলে দিতে পারে। যেমন ধরুন, আপনাকে প্রশ্ন করলাম যে, জর্জ বুশ ভাল না খারাপ মানুষ? আপনি বললেন ভাল মানুষ না। আমি এখানে না শব্দটি সম্পাদনা করে মুছে দেব। তারপর আপনারা শুনবেন সে ভাল মানুষ এবং যখন আপনাকে ভিডিওটি দেখানো হবে তখন আপনি বলবেন হয়তো মুখ দিয়ে ভাল শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে। আপনি ভাল মানুষ বলেন নি। আপনি বলেছেন ভাল না কিন্তু আমি না শব্দটি কেটে দিয়েছি। তারপর আপনাকে দেখালাম যে দেখেন আপনি ভাল মানুষ বলেছেন। তখন আপনি বলবেন আমি মুখ ফসকে হয়তো বলে ফেলেছি আমি ভুল করে বলেছি।

কিন্তু আপনি ঠিকই বলেছিলেন। আপনি বলেছেন ভাল মানুষ না। কিন্তু আমি না কথাটি বাদ দিয়ে দিলাম এবং শুনে মনে হবে সে ভাল। এভাবে মিডিয়া বিভিন্নভাবে খেলা করে থাকে। কিন্তু আমাদের মুসলিমদের যেটি করা উচিত তা হলো আমাদের নিজ ধর্মটিকে আরো অনেক ভাল করে জানতে হবে। আমাদের দ্বীন

সম্পর্কে ভাল করে জানতে হবে এবং মিডিয়া যখন এগুলো প্রচার করবে সেগুলো শুনে আমরা কখনোই প্রভাবিত হবো না। যদি ইসলামকে বিচার করতে চান তাহলে ইসলামের মূল ধর্মগ্রন্থগুলোকে দেখতে হবে। অর্থাৎ কোরআন ও হাদীস। একজন মুসলিম এবং মুসলিম সমাজ কি করলো সেটি দেখলে চলবে না। ইসলামকে বিচার করতে চাইলে আমরা দেখাবো না যে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ কিংবা আফগানিস্তানের মুসলিমরা কি করে? আমাদের ইসলামকে বিচার করতে হবে মূল ধর্মগ্রন্থগুলো দিয়ে। অর্থাৎ আল-কোরআন ও নবীজির হাদীসের আলোকে।

কোরআন এবং সহীহ হাদীস দেখতে হবে এবং আমরা এগুলো মেনে চলবো এবং মিডিয়ার এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে আমাদের জানতে হবে কিভাবে টেবিলটি উল্টে দেয়া যায়। যেমন– সে সাংবাদিক ভাই দুটো প্রশ্ন করার কথা বলেছেন, কিন্তু প্রশ্ন করেছেন একটি। কারণ, তিনি সেটা আশা করেন নি প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বলেছিলাম। তিনি আশা করেন নি যে আমি বলবো "আমি আমার দেশকে নিয়ে গর্বিত।" তিনি ভেবেছিলেন আমি দেশকে নিয়ে গর্বিত না। আমি কোন মিথ্যে কথা বলছি না যে আমি আমার দেশ নিয়ে গর্বিত।

আমি ভারতকে নিয়ে গর্বিত এবং ভারত বর্ষ হচ্ছে একটি যুদ্ধক্ষেত্র। আমরা হলাম মুজাহিদ, 'জিহাদ' আমরা সবাই চেষ্টা করছি এবং নাম আমার নায়েক। সংস্কৃতিতে 'নায়েক' মানে যোদ্ধা। একজন বীর। তাহলে নাম দিয়েও আমি একজন মুজাহিদ। এ যুদ্ধের ময়দানে আমাকে থাকতে হবে। আমার কাজ আমাকে করতে হবে এবং সেই জন্য আমি মুম্বাইতে থাকতে চাই। কিন্তু লোকজন আমাকে অন্য জায়গায় থাকতে বলে। অনেক লোক আমাকে আবার অন্য কোন দেশে থাকতে বলে। তারা বলে আপনার জীবনতো হুমকির মধ্যে আপনি কেন এই যুদ্ধের ময়দানে থাকবেন? আমি দেশকে অনেক কারণেই ভালবাসি এবং এখানেই আমার যুদ্ধ। আলহামদুলিল্লাহ্ অনেক কারণে আমি আমার দেশকে নিয়ে গর্বিত। তাই মিডিয়ার এ সমস্ত মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে আমাদের জানতে হবে টেবিলটিকে কিভাবে উল্টে দেয়া যায়?

প্রশ্ন ঃ ১৫১। আসসালামু আলাইকুম। আমি যেহেতু মিডিয়ায় কাজ করছি। তাই প্রশ্নটা প্রায়ই আমার মাথায় আসে। আমি দুবাইয়ের একটা ট্রেড জার্নালের এডিটর। আমার প্রশ্নটা মূলত আল কায়েদা ও উসামা বিন লাদেনকে নিয়ে। আমরা সবাই জানি যে উসামা বিন লাদেন যখন রাশিয়ায় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন তখন আফগানিস্তানের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন একজন নায়েক। আর তার অনেক বছর পরে এই নায়কই একদিন হয়ে গেলেন রাক্ষস। এটা আমরা সবাই জানি। তো

এখন আমার কথা হলো যে, সাংবাদিকতার একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। আমরা বিভিন্ন রিপোর্ট মানুষের সামনে তুলে কোন উপসংহার টানা বা মন্তব্য করা উচিত না। আর পশ্চিমা মিডিয়া তারা বিভিন্ন নিয়ম বানাচ্ছে। আর নিজেরাই সে নিয়ম ভাঙ্গছে। এখনকার দিনে এটাই ঘটছে। আর আপনি এতক্ষণ যে লেকচার দিয়েছেন, সেখানেও একই কথা বলেছেন।

তারা ইচ্ছেমত নিয়ম বানাচ্ছে আর ভাঙ্গছে। আমরা মুসলিমরা কিভাবে পৃথিবীর মানুষকে এ ঘটনাগুলো জানাতে পারি? আপনাকে আমি উদাহরণ হিসেবে বলি। পৃথিবীতে যত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে তারা বলছে এগুলোর জন্য দায়ী আল কায়েদা। আর এখন অনেক রাষ্ট্র থেকে বলা হচ্ছে যে অমুক অমুক ঘটনা ঘটছে দায়ী হল আল কায়েদা। আমরা শান্তিপ্রিয় মুসলমানরা কিভাবে এসব মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে পারি? আমি আবারও সাংবাদিকতার নিয়ম-কানুনের কথা বলছি। একটা ঘটনা ঘটছে তার মন্তব্য করা হচ্ছে। এ দুটো আলাদা থাকা উচিত। অথচ তারা ঘটনা, মন্তব্য– এ দুটো একত্র করে আমাদেরকে দেখাচ্ছে। তারা আসলে পৃথিবীর সব মানুষকে বিশ্বাস করাতে চায় যে, ইসলাম আসলে একটি সন্ত্রাসী ধর্ম। এ ব্যাপারে কোন হাদীস আছে, অথবা অন্য কিছু। যেটা আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।

উত্তর ঃ আপনি একটি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আর আপনি সাংবাদিকতা পেশায় আছেন। আপনি বললেন যে, যখন উসামা বিন লাদেন রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ করেছিল, তিনি তখন হিরো। আর উসামা বিন লাদেনকে আমেরিকাই তৈরি করেছে। পরে যখন সে আমেরিকার বিরুদ্ধে গেল, তখন তাকে বলা হলো সন্ত্রাসী। আর আপনি ঠিকই বলেছেন যে, সাংবাদিকদের একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। সাংবাদিকদের কোন মন্তব্য করা উচিত না। যেগুলো করে থাকেন সাধারণত রাজনৈতিক নেতারা, সাংবাদিকরা নয়। এটাই হচ্ছে নিয়ম। তবে নিয়ম বানানো হয়, ভাঙ্গার জন্যেই। আমেরিকায় নাকি কথা বলার স্বাধীনতা আছে। আমার মতে আমেরিকায় কথা বলার স্বাধীনতা সবচেয়ে কম। ততক্ষণ বলতে পারবেন যতক্ষণ তাদের স্বার্থে আঘাত না লাগবে। [illegible]র বিরুদ্ধে কিছু না বললে আপনি যা খুশি তাই বলতে পারবেন। তবে বিরুদ্ধে কিছু বললে সি. আই. আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

আমার মতে পুরো ব্যাপারটাই একটা নাটক। লোক দেখানো কথা বলার স্বাধীনতা। আপনার প্রশ্নে আসি। আমরা কিভাবে জবাব দিব? উসামা বিন লাদেন সম্পর্কে আর কোন হাদীস আছে কিনা ইত্যাদি। এ প্রশ্নটি আমাকে করা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায় কয়েক বছর আগে পার্থে। আমেরিকার কনসাল জেনারেল আমাকে এ প্রশ্নটা করেছিল। আমার লেকচারের ট্রপিক ছিল টেররিজম এন্ড জিহাদ। তিনি আমাকে বললেন ভাই জাকির আপনি কি জানেন যে, উসামা বিন লাদেন একজন টেররিস্ট।

এটা প্রথম প্রশ্ন। আমি তখন তাকে বললাম যে, উসামা বিন লাদেন সম্পর্কে যদি বলতে হয় প্রথমে আমি তাকে চিনি না। কখনও তাকে দেখিও নি। আমি তার বন্ধু না বা তার শত্রুও না। আমি আসলে জানি না। টিভি চ্যানেলের নিউজগুলো শুনে আমি এর উত্তর দিতে পারব না। বিবিসি, আর সিএনএন। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন সূরা হুজুরাতের ৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْآ اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ـ

অর্থ : 'হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে না ক্ষতিগ্রস্ত করে বস এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদিগকে অনুতপ্ত না হতে হয়।'

মিডিয়া বিবিসি, আর সিএনএনএ যে নিউজ দেখানো হয়, সে নিউজ দেখে আমি বলতে পারব না যে, আপনার কথা ঠিক। কারণ, আমি যা জানি খবরগুলো বানানো। যদি না বুঝি যে খবরটা আসলেই সত্যি। আর ইউহানড্রেডলি যখন আফগানিস্তান থেকে ফিরে আসলেন, তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আল কায়দা সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি বলেছিলেন আমার সন্দেহ হয় আসলে আল কায়দা আছে কি-না? তাহলে সিএনএন আর বিবিসিতে প্রচারিত নিউজগুলোর ওপর নির্ভর করে আমি এর উত্তর দিতে পারব না।

আল্লাহ জানেন আসল ঘটনা কি? তবে সিএনএন-কে নিয়ন্ত্রণ করে আমেরিকা। এখানে জানতে পারি যে, তারা হাজার হাজার আফগানিকে হত্যা করেছে। ইরাক আক্রমণ করেছে এ চ্যানেলগুলোই বলে। এই চ্যানেলগুলোর মালিক যারা তারাই যখন বলছে আর গর্ব করছে, তাহলে এ খবরটা নিশ্চিত। তাহলে এখন বলেন কে এক নাম্বার টেররিস্ট? আমার মতে জর্জ বুশ। এই খবরটা পরের দিন হেড লাইনে আসল যে, ডা. জাকির নায়েক বলেছেন, তিনি একজন মৌলবাদী আর বুশ একজন টেররিস্ট। অস্ট্রেলিয়ার নিউজ পেপারে হেড লাইন হয়েছিল। জানেন কিছু দিন আগে একট জরিপ করা হয়েছিল আমেরিকার শিকাগোতে একটা সার্ভে করা হয়েছিল। আর সেই জরিপে টেররিস্ট হিসেবে নাম দেয়া হয়েছিল তিনজনকে ১. উসামা বিন লাদেন ২. সাদ্দাম হোসেন ৩. জর্জ বুশ।

এ জরিপ শিকাগোর বিভিন্ন শহরের লোকজনের ওপর করা হয়েছিল। আপনাদের কি মনে হয় মুসলিম অমুসলিম সবাই। অমুসলিমরা ও আপনারা কাকে এক নম্বর টেররিস্ট মনে করেন? উত্তরগুলো সব একই, সবাই বলেছে যে জর্জ বুশ সবচেয়ে কম ছিল ৭৫%। ৭৪% লোক বলেছে জর্জ বুশ এক নম্বর টেররিস্ট। সবচেয়ে

বেশি ৭৮% লোক বলেছে তাদের মধ্যে জর্জ বুশ এক নম্বর টেররিস্ট। আমি না। তবে লোকজন আসলে এসব কথা বলতে চায় না। মানুষ এসব কথা বলতে ভয় পায়। একটা হাদীস আছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, যদি কোন অন্যায় হতে দেখ, হাত দিয়ে সেটা থামাও। যদি হাত দিয়ে সেটা থামাতে না পার তবে মুখ দিয়ে থামাও। যদি মুখ দিয়েও থামাতে না পার তবে তুমি অন্তর দিয়ে ঘৃণা কর। আর তখন তুমি হবে সবচেয়ে নিম্নস্তরের মুমিন।

তাই আমি স্পষ্ট করে বলি, আমি সত্য কথা বলি। আল্লাহ কিছু মানুষকে হাত দিয়ে থামানোর ক্ষমতা দিয়েছেন। তারা না থামালে আল্লাহ তাদের প্রশ্ন করবেন। আল্লাহ অন্তত কথা বলার সামর্থ্য দিয়েছেন। তাই আমি কথা বলে যাচ্ছি। এ কথাটা আমি ইংল্যান্ডেও বলেছি। সেখানকার পুলিশ চাপের সামনে। সেখানকার মেয়রের সামনে। এমনকি আমেরিকায় বলেছি, অস্ট্রেলিয়ায় বলেছি, মালয়েশিয়ায় বলেছি। তবে আমি বলেছি হিকমার সাথে। আল্লাহ আমাকে কথা বলার সামর্থ্য দিয়েছেন। যদি আমি না বলি তাহলে আল্লাহ আমার এ ক্ষমতা কেড়ে নিবেন। আর মুসলিমরা একথা বলেছে জাকির নায়েকের কথা বাদ দাও। আমেরিকার বেশিরভাগ অমুসলিমরাই ইউনির্ভাসিটি অব শিকাগোর একটা জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী, আমেরিকাতেই তারা বলছে জর্জ বুশ এক নম্বর টেররিস্ট।

আপনারা যদি ইন্টারনেটে যান এমন কথাও দেখবেন। আমি বলছি না সেটা ঠিক না ভুল। তারা বলছে যে ১১ই সেপ্টেম্বরের সেই দূর্ঘটনা ভেতরের কেউ ঘটিয়েছিল। আর কয়েক জন তো বলেছে যে বুশ নিজেই এ কাজটা করিয়েছে। এবার আমি বলি মুসলিমরা কিভাবে জবাব দিবে? লন্ডনে সেই ৭ জুলাই বোমা বিস্ফোরণের পর কি হয়েছিল? আমেরিকার প্রায় বেশিরভাগ মুসলিম এক জায়গায় একত্রিত হয়ে নিন্দা করলেন। ইংল্যান্ডেও তাই। ইংল্যান্ডেও একই ঘটনা। আমি তাদের নাম বলছি না। আমি তাদের অনেককেই চিনি। তারা নিন্দা করলেন যা ঘটেছে ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এটা হারাম, এটা ভুল। আমরা এটার নিন্দা করছি ৭ জুলাই যা ঘটেছে লন্ডনে। এতে ৫০ জনেরও বেশি লোক মারা গেছে। ১১ সেপ্টেম্বর তিন হাজারেরও বেশি লোক মারা গেছে। আমরা তার নিন্দা করছি, ফুলস্টপ। তারা যা বলেছে ঠিক কথাই বলেছে। আমি তাতে একমত। পবিত্র কোরআনে সূরা মায়িদার ৩২ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

অর্থ : 'এই কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করা হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল।'

তাই আমিও এ কাজের নিন্দা করি। যদি ১১ সেপ্টেম্বর তিন হাজারেরও বেশি লোক মারা যায়। সেটাকে নিন্দা করাই উচিত। লন্ডনে ৫০ জনেরও বেশি লোক মারা যাওয়াটাও নিন্দনীয়। তবে এখানেই থেমে যাওয়া যাবে না। এটাকেও নিন্দা করব যে, আফগানিস্তানে হাজার হাজার লোক মারা গেছে এটাও নিন্দনীয়। ইরাকে যে হাজার হাজার নিরীহ লোক মারা গেছে, এটাও নিন্দনীয়। বসনিয়ায় যে হাজারও মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, এটারও নিন্দা করব আমরা। ফিলিস্তিনে যে হাজারও মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, এটাকেও নিন্দা করতে হবে। আমরা ভয় পাব কেন? তবে আমেরিকানদের প্রশ্ন করলে তারা বলে না, আসলে আমেরিকা দেশটা একটু আলাদা যদি বেশি কথা বলি তাহলে সমস্যায় পড়ে যাব। আমি বললাম কেন? আমেরিকা তো সেই দেশ যেখানে কথা বলার স্বাধীনতা আছে। তাহলে ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি ইন্ডিয়ায় লেকচার দিয়েছি যারা মুম্বাই সম্পর্কে জানেন, মুম্বাইর পরিবেশ পরিস্থিতি বেশি ভাল নয়।

আমেরিকা আর ইংল্যান্ডে তাও কিছু কথা বলার স্বাধীনতা আছে। লোকজন আমাকে বলে ভাই জাকির। কেউ আপনাকে হুমকি দেয় না? আমি বললাম এটা আমার পেশার নিত্যসঙ্গী। নবীজি ﷺ -কে হুমকি দেয়া হত না? আমরা তো নবীজির পথ অনুসরণ করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের রক্ষা করবেন। তবে যখন কথা বলব তখন হিকমার সাথে বলব। তাহলে যখন কথা বলব তখন বলব নিরীহ মানুষকে হত্যা করা নিন্দনীয়। আমরা মানি ১১ সেপ্টেম্বর যে তিন হাজারেরও বেশি লোক মারা গেল, সেটা অন্যায়। আমরা মানি লন্ডনে যা ঘটেছে তা অন্যায়। তবে অন্যসব অন্যায়গুলোরও প্রতিবাদ করতে হবে। যখন একজন লোক শরীরে বোমা বাঁধে, সেটার বিস্ফোরণ ঘটায়, সাথে বিশ ত্রিশজন নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলে তখন বলা হয় টেররিস্ট। তবে যখন কেউ প্লেইন থেকে নিচে বোমা মারে, আর এভাবে হাজারো আফগানিকে মেরে ফেলে, তখন তাকে বলা হয় সাহসী আমেরিকান।

এতে সাহসের কি আছে? একে বলা হয় চুরি করে যুদ্ধ। উপর থেকে বোমা ফেলছে আর এটাতে কাজ হচ্ছে পঞ্চাশটি বোমার সমান। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, ইসলাম হলো সত্যের ধর্ম, আর আমি আমার প্রশ্নের উত্তর শেষ করার আগে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিব। সূরা বনী ইসরাঈলের ৮১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

অর্থ : 'বল, সত্য সমাগত এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।'

প্রশ্ন ঃ ১৫২। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম নোমান। আমি ইন্টারনেট ট্রাভেল আর মার্কেটিং এর ওপর কাজ করি। আমার প্রশ্নটা হলো এখনকার সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়াকে নিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন সিনেমা। আর এ সিনেমাগুলো বানাচ্ছে হলিউড, বলিউড, ললিউড, আর এখন সম্ভবত ডলিউড অর্থাৎ দুবাইতে।

আর এ সিনেমার মাধ্যমে তাদের কথাগুলো পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। Pation of crise এরকম একটি সিনেমা। যেখানে যিশুখ্রিস্টের কথা বলা হয়েছে। সিনেমার ডায়লগগুলো হিব্রুতে। এখন আমার প্রশ্নটা হলো খ্রিস্টান ধর্মে যা প্রচার করে তার সাথে এর এটুকু মিল আছে। আর কোরআনের সাথে এর কতখানি মিল আছে? অবশ্যই কখনও পুরোপুরি মিলবে না। তবে লোকজন পৃথিবীজুড়ে এই সিনেমাটা দেখছে আর এটা তাদের মনে গেঁথে গেছে। এবার আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো মুসলমানরা কিভাবে এই সিনেমা মিডিয়াকে কাজে লাগাতে পারে? যাতে করে মানুষের মাঝে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দিতে পারে। যেমন ধরেন, একটা সিনেমা বানিয়েছিল The Messages এটা দেখে অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। যাযাকাল্লাহু।

উত্তর ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, সিনেমার মাধ্যমেও আমরা নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারি। ধর্ম প্রচার করতে পারি। হলিউড, বলিউড, আর এখন ডলিউড। এটা নতুন শব্দ এর মানে দুবাই মিডিয়া সিটি। আর আপনি Pation of crise এর কথা বললেন। এইসব সিনেমা সম্পর্কে আমার মতামত কি? ভাই আমি Pation of crise দেখি না। যদিও আমার দেখার ইচ্ছে আছে। সাধারণত আমি সিনেমা দেখি না। তবে এর উপরে রিপোর্ট পড়েছি। এই সিনেমাটা বানিয়ে ছিল মেল গিবসন। সেই সিনেমাটা অরিজিনাল ল্যাংগুয়েজে বানিয়েছে। এটা নিয়ে অনেক সমালোচনাও হয়েছে। এটা যেভাবে বানিয়েছে, আর সিনেমাটা কিছুটা ইহুদিদের বিরুদ্ধে ছিল। এসব ব্যাপারে অনেক হৈ চৈ হয়েছে। তবে এই সিনেমাটা নেগেটিভ সেন্সে জনপ্রিয়ও হয়েছে। যেহেতু নেগেটিভ কথা বলা হচ্ছে এটা বক্স অফিসে হিট করেছিল।

সিনেমাটা অনেক রেকর্ড ভেঙ্গেছিল। মেল গিবসন অনেক টাকার ঝুঁকি নিয়ে ছিল। সিনেমাটায় অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছিল। সেটা ফ্লপ হলে তখন তার অনেক টাকা লোকসান হত। সিনেমাটা হিট করেছিল আর সিনেমাতে অনেক সঠিক জিনিস ছিল। অনেক কিছু ভাল। ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলে আবার অনেক কিছু মিলেও না। দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো The Messages সিনেমা নিয়ে। আমি এটা দেখেছি। এটা বানিয়ে ছিল মস্তুফা আকতার ইনথুনি কুইন, অভিনয় করেছিল হামযা হিসেবে। আল্লাহ্ তাকে শান্তিতে রাখুন। সিনেমাটা তখন বানানো হয়েছিল অনেক

সুন্দরভাবে। আর বলব যে ইসলামিক লাইনে সিনেমার মধ্যে এটি একটি শ্রেষ্ঠ সিনেমা। আলহামদু লিল্লাহ। সিনেমার হিরোকে না দেখিয়ে, নবীজি মুহাম্মদ ﷺ -কে না দেখিয়ে, তার কোন ছবি না দেখিয়ে, তার কণ্ঠস্বর না শুনিয়ে, আলহামদু লিল্লাহ সিনেমার সব ঘটনা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে ঘিরেই হচ্ছে। কিন্তু তাকে দেখানো হচ্ছে না। আর তার কণ্ঠস্বর শুনানো হচ্ছে না।

একবার শুধু তার উট আর লাঠি দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেখানে ক্যামেরা যে এঙ্গেলে ধরা হয়েছে যে যখন নবীজি ﷺ ঘুরে অন্য কোন দিকে তাকাচ্ছেন তখন ক্যামেরার এঙ্গেলটাও সেদিকে যাচ্ছে। ডিরেকশন অসাধারণ, এটা একটা মাস্টার পিস। আর এরকম ভাল সিনেমা আমাদের আরো প্রয়োজন। এই সব সিনেমার বাজেট অনেক। কয়েক মিলিয়ন ডলার লাগে, লক্ষ লক্ষ ডলার। এই বাজেটের ব্যাপারটা আছে। কিন্তু সিনেমাটার ব্যবসা সফল হয়েছিল। মস্তুফা আকতার তারপরে আরেকটা বানিয়ে ছিলেন। নাম ছিল 'ওমর মুকতার'। এটা ঠিক ইসলামের কথা বলছে না। একজন মুসলিমের কথা বলছে। আর এই সিনেমাটাও বক্স অফিসে হিট করেছিল। এ রকম সিনেমা আরো দরকার। তবে খেয়াল রাখতে হবে সেটা যেন শরিয়াহ মেনে হয়। কোরআন আর সুন্নাহ মেনে হয়। যেমন– আমি মনে করি যে The Messages সবকিছুই ঠিক। সব মিলিয়ে সিনেমাটা ভাল। কিছু ভুল জিনিসও দেখানো হয়েছে। তবে সব মিলিয়ে সিনেমাটা ভাল। সামগ্রিকভাবে এটা ভাল।

আমাদেরকে ইসলামি শরিয়াহ মেনে এরকম সিনেমা বানাতে হবে। কোরআন আর হাদীসের বিরুদ্ধে যাব না। শরিয়াহ মেনেই বানাব। শুধু সিনেমাই নয়; আমাদের নাটক বানাতে হবে, সিরিয়াল বানাতে হবে, ডকুমেন্টারিও বানাতে হবে, আর মিডিয়া জিনিসটা আসলে একটা সাদা হাতি, সাদা হাতি, সাদা হাতি। আপনারা হয়তো 'কৌন বানেগা ক্রোড় পতি'র নাম শুনেছেন। আসল অনুষ্ঠানটা হুবহু ওয়ান স্টফিয়া মিলিয়ন প্রতি অনুষ্ঠানে এক মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। মাত্র একটি টিস ওয়াটে চার কোটিরও বেশি রুপি খরচ করে। মাত্র একটা পিস ওয়াটে। ৪৫ থেকে ৫০ মিনিট। মুম্বাইতে লেবার কস্ট অনেক কম, তবে অমিতাভ বচ্চন এক্সপেনসিভ। তাহলে এসব ক্ষেত্রে বাজেটে বাধা আছে। যাদের এসব খরচ বহনের সামর্থ্য আছে তারা যদি স্পন্সর করেন তাহলে এমন ফিল্ম বানিয়ে আমরা ইসলামকে প্রচার করতে পারি। এটা আমি বিশ্বাস করি

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ـ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ـ

অর্থ : 'তারা চক্রান্ত করেছিল আল্লাহও কৌশল করেছিলেন। আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ।' (সূরা আলে ইমরান ৫৪নং আয়াত)

হলিউডে একটা সিনেমা বানানো হয়েছে The Rindom of Haven. সিনেমা বানিয়েছেন খুবই বিখ্যাত একজন ডিরেক্টর। আর তিনি এখানে দেখিয়েছেন কিভাবে ক্রুসেডেরেরা আক্রমণ করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করল। আর তারপর সালাউদ্দীন হিরো। তিনি আসলেন, তাকে হিরো দেখানো হয়েছে, এ ব্যাপারটা নিয়ে পশ্চিমা মিডিয়ায় খুবই হৈচৈ হয়েছিল যে, এমন সিনেমা কিভাবে বানাল? সে একজন খ্রিস্টান। সে তার সিনেমায় আসল সত্যি কথা তুলে ধরেছে। তবে এ ব্যাপারটা পশ্চিমারা হজম করতে পারে নি। খুবই হৈচৈ হয়েছিল। তবে যেহেতু সিনেমার ডিরেক্টর ছিলেন খুবই বিখ্যাত। আলহামদু লিল্লাহ এতে করে খুব বেশি একটা ক্ষতি হয় নি। তাহলে একজন অমুসলিম এমন সিনেমা বানিয়েছেন। আমি যদিও সিনেমাটা দেখি নি, তবে নিউজ রিপোর্ট পড়েছি। সিনেমাটা খুব সুন্দর। এখানে তুলনামূলকভাবে অনেক সত্যি বলা হয়েছে। এমন সিনেমাকে উৎসাহিত করতে হবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৫৩। আসসালামু আলাইকুম। এই প্রশ্নটা আমার বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে করছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ফিল্ম মিডিয়াকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে? আরব বিশ্বের ব্যাপারে কি বলবেন? বিশেষ করে আরব বিশ্বের আলোকে ইন্ডিয়ার ব্যাপারে।

উত্তর ঃ প্রশ্ন করলেন আমার ছোট এক ভাই তার বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে। যে, মুসলিম মিডিয়াকে ফিল্ম কিভাবে সাহায্য করতে পারে। মুসলিম বিশ্ব আজ অর্থ সম্পদে সমৃদ্ধ। তাই মুসলিম বিশ্ব ইসলামিক কৃষ্টি কালচার অর্থাৎ কোরআন-হাদীসের আলোকে ফিল্ম তৈরি করে মিডিয়াকে সাহায্য করতে পারে। আমি আরব বিশ্বের ব্যাপারে কি বলব, বিশেষ করে আরব বিশ্বের আলোতে ইন্ডিয়ার ব্যাপারে। দেখবেন সময়ের সাথে সাথে আমাদের পরিস্থিতিও বদলে যায়। মাত্র কয়েক দশক আগেও আরবরা ইন্ডিয়ায় আসত ব্যবসা করার জন্য।

ইন্ডিয়া তখন সমৃদ্ধ ছিল অর্থনৈতিকভাবে সবার উপরে। আর মাশাআল্লাহ ইন্ডিয়ানদের অনেকেই তখন যাকাত দিত। তাতে আরবদের অনেক উপকার হয়েছিল। এখন অনেক দামি সম্পদ খনিজ তৈল আল্লাহ তাদের দিয়েছেন। এখন তারা অনেক ধনী। তাই দেখা যায় ইন্ডিয়ানরাই আরব বিশ্বে চাকরি করতে আসে, ব্যবসা করতে আসে। সৌদি আরবে আসে। আলহামদু লিল্লাহ। আমি তাদের উদ্দেশ্যে এটা বলতে পারি যে, মুসলিমদের কথাটা যদি বলতেই হয় সে কথাটা আমি আগেও বলেছি যে, সব মুসলিমেরই দায়িত্ব ইসলাম প্রচার করা। আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে অনেক বেশি সম্পদ দিয়েছেন। তাই কিয়ামতের দিন আপনাদেরকেই বেশি বেশি প্রশ্ন করবেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা প্রশ্ন করবেন, আমি তোমাদের সম্পদ দিয়েছিলাম তা দিয়ে তোমরা কি করেছ? আমিও বলব, আল্লাহ আপনাদেরকে বেশি সম্পদ দিয়েছেন। আল্লাহর রহমতে আপনারা

এখন খনিজ সম্পদের মালিক। তাই ইসলাম ধর্ম প্রচারে এই সম্পদ ব্যবহার করুন। শুধু ইন্ডিয়াই নয়। অন্যখানেও এ সম্পদ ব্যবহার করুন; ইন্ডিয়ায় অনেক সমস্যা আছে। সমস্যা নাই এ কথা বলব না। তবে আলহামদুলিল্লাহ আমরাই নিজেদের ব্যাপারগুলো দেখব। কিন্তু অন্যদের প্রয়োজন আছে।

ইন্ডিয়ায় যেমন অনেক এতিম শিশু আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়ও তেমনি এতিম শিশু আছে। মানুষ তাদের সাহায্য করছে। আলহামদুলিল্লাহ, কোন সমস্যা নেই। তবে সামগ্রিকভাবে, আরবদের উদ্দেশ্যে আমি একথা বলব। যেহেতু আল্লাহ তাদের তেল ও স্বর্ণ দিয়েছেন। তাদের উচিত হবে সত্যের ধর্ম প্রচারে এগিয়ে আসা। ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেক আরবদের চিনি। তাদের পকেটে যে টাকা থাকে, সে টাকা দিয়ে পাঁচ-দশটা চ্যানেল খুলতে পারে। পকেট মানি দিয়েই। পাঁচ থেকে দশটা চ্যানেল। আল্লাহ তাদের দিয়েছেন এই অগাধ সম্পদ। তাই আমি তাদের অনুরোধ করব। তারা যেন সম্পদের সৎ ব্যবহার করেন। ভাল কাজের জন্য, দ্বীন প্রচারের জন্যে। যাতে করে আখিরাতে তারা উপকৃত হয়। এ উপকার সৃষ্টিকর্তার কোন লাভ লোকসান হবে না। এটা আমাদের নিজেদের ভালোর জন্যই।

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন–اَللّٰهُ الصَّمَدُ অর্থাৎ তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বরং সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তাহলে ইনশাআল্লাহ রোজ কিয়ামতের দিন এই সওয়াব তাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ ১৫৪। আসসালামু আলাইকুম। আমি নেওয়াজ রহমান। আমি কাজ করি আল কাদা ট্রেডিং-এ। আল কায়েদা নয়, আল কাদা ট্রেডিং। স্যালসমেন। মিউজিক হারাম। এটা সব মুসলিমই জানে। আমার প্রশ্নটা হলো আপনারা পিস টিভি চালু করেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ মিডিয়ায় খুব গুরুত্বপূর্ণ হলো বিজ্ঞাপন। এখন এ বিজ্ঞাপনে মিউজিক ব্যবহার করা হয়, বিজ্ঞাপনে মিউজিক ব্যবহার হালাল নাকি হারাম?

উত্তর ঃ আপনি প্রশ্ন করলেন যে, সব মুসলিমই জানে যে মিউজিক হলো হারাম। তবে যেহেতু চ্যানেল শুরু করতে যাচ্ছি। সেখানে বিজ্ঞাপন থাকবেই। এখন এ বিজ্ঞাপনের মিউজিক হালাল নাকি হারাম? দেখেন যেটা হারাম সেটা হারামই। যেটা সৌদি আরবে হারাম সেটা আরব আমিরাতেও হারাম। আমেরিকাতেও হারাম। আবার ইন্ডিয়াতেও হারাম। তবে যদি আপনার জীবন বিপন্ন হয়। আর এলকোহলই আপনাকে বাঁচাতে পারে। তবে ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে এটা পান করতে পারবেন, ওষুধ হিসেবে। এটাই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম। যদি জীবন বিপন্ন হয়। কোন বিজ্ঞাপন না থাকলেও ইনশাআল্লাহ আমাদের চ্যানেল বিপদে পড়বে না।

এজন্যই আমি বলছিলাম একটি চ্যানেল চালানো কঠিন। ইসলামি শরিয়াহ মেনে চালানো আরো কঠিন। সে জন্য আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি। আমরা যেন

শরিয়াহ মেনে চালাতে পারি। যদি ইসলামি শরিয়াহ মেনে চালাতে না পারি, তাহলে চ্যানেল বন্ধ করে দিব ইনশাআল্লাহ। কারণ, ইসলামিক শরিয়াহ মেনে চলাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চ্যানেল চালু রাখাটা নয়। আপস করা যাবে না। আমরা হারাম উপায়ে সত্যকে প্রচার করতে পারব না। যেটা হারাম, সেটা হারামই। আমরা এসব কিছুকে হালাল কিছু দিয়ে বদলে দিতে পারি। যেটা হারাম সেটা বাদ দিয়ে হালাল জিনিস আনব। যেমন– ধরেন, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম। জাফের অনুমতি আছে। প্রাকৃতিক শব্দ ব্যবহার করতে পারি। যেমন– পানি পড়ার শব্দ, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ, কোরআন তেলাওয়াত।

যদি আয়ারাতের অনুষ্ঠানগুলো দেখেন, অনুষ্ঠানের শুরুতে আপনারা শুনবেন, আপনাদের মনে হবে না যে কোন মিউজিক নেই। যদিও আমরা মিউজিক ব্যবহার করি না। তবে এ প্রাকৃতিক শব্দগুলো সেই সব অনুষ্ঠানে যেভাবে শুনবেন। আলহামদু লিল্লাহ এই শব্দগুলো একই রকম না। কিন্তু শুনতে মিউজিকের মত। তবে প্রভাব ভাল, এটা আপনাকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে না। এটা আপনাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে আসবে। তাহলে প্রাকৃতিক শব্দ ব্যবহার করা যায়। এমন কোন বিজ্ঞাপন দেখাব না যেটা হারাম। কোন হারাম বিজ্ঞাপন দেখাব না। যেমন– কোন এলকোহল নিয়ে বিজ্ঞাপন; অথবা সুদ নিয়ে কাজ করে এমন কোম্পানি বা ব্যাংক বা যে সব বিজ্ঞাপনে মহিলাদের শরীর দেখানো হয়ে থাকে। যদি আমাদের চ্যানেলে বিজ্ঞাপন দিতে চান হালাল বিজ্ঞাপন। তাহলে স্বাগতম জানাই। তা না হলে বিজ্ঞাপনের কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের আল্লাহরই সাহায্য প্রয়োজন। আর সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৫৫। ভাই আমি আরেকটা প্রশ্ন করব। কুরআনে সূরা আলাকে বলা হয়েছে– আল্লাহ মানুষকে একটা জমাট বাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। আমি এই কয়েক দিন আগে পবিত্র কোরআনের এই সূরাটির উর্দু অনুবাদ শুনেছিলাম। সেখানে বলা হয়েছিল যে রক্তপিণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়। আমরা এটা জানি। মানে এখন এটা সবাই জানে, আমরা মানুষ জাতি জন্মাই কোন রক্তপিণ্ড থেকে না, শুক্রাণু থেকে। আর আমি এরকম একটা অনুবাদও পড়েছি। অন্য আরেকটা আয়াতে আছে পরে আমি এই বিন্দুকে (শুক্রাণু) পরিণত করি রক্তপিণ্ডে। তারপর এই রক্তকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে। আমার মনে হয় না যে, এ সময় এটা রক্ত পিণ্ডে পরিণত হয়। আপনি একজন ডাক্তার। আপনি বিষয়টা বুঝিয়ে বলতে পারবেন। আমি শিউর।

উত্তর ঃ জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করুন। পবিত্র কোরআনের সূরা নাহলের ৪৩ নং আয়াতে এবং সূরা আম্বিয়ার ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যদি না জানো তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো। আমি খুব বেশি জানি না। তবে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে

আল হামদুলিল্লাহ। আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন ছাত্র। আর সামান্য একজন ডাক্তার এমবিবিএস। তবে এই বিষয়ে জানি। একই যুক্তি দেখিয়ে ছিলেন ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল। আমি একবার তার সাথে বিতর্ক করেছিলাম। তিনি একজন ডাক্তার। আর কোরআনের বিরুদ্ধে বই লিখে তিনি পিএইচডি করেছিলেন। তার বইতে লিখেছিলেন যে কোরআনে ৩০টি বৈজ্ঞানিক ভুল আছে। আট বছরে কোন মুসলিম উত্তর দেয় নি। আমেরিকান ছাত্ররা আমাকে একটা বিতর্কের জন্যে ডাকল। তারপর আমি আমেরিকার শিকাগোতে গেলাম, কয়েক বছর আগে। বিতর্কের বিষয় ছিল কোরআন এবং বাইবেল বিজ্ঞানের আলোকে। আর তার একটা যুক্তিও ছিল একই যেটা আপনি বললেন। কোরআনের যে আয়াতটা প্রথমে নাযিল হয়েছিল। সূরা আলাক বা সূরা ইকরা ১ ও ২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ

অর্থ : 'পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে অর্থাৎ জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ড থেকে।'

তার মতে কোরআনের এই কথাগুলো হচ্ছে নকল করা। গ্রিকরা এভাবে ভাবত যে মানুষ তৈরি হয় রক্ত থেকে। এটা একটা পুরানো Theory যেটা ভুল বলে প্রমাণিত। আর মেডিকেল ডাক্তার হিসেবে আমিও এটা জানি, মানুষ কোন রক্তপিণ্ড থেকে জন্ম নেয় না। তাহলে ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের মতে আমাদের নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অমুক অমুক জায়গা থেকে এগুলো নকল করেছেন। বড় একটা লিস্ট রিসার্চ। আর তিনি বললেন যে, আমাদের নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (নাউজুবিল্লাহ) তিনি নকল করেছেন সিরিয়ানদের গ্রিকদের কেন? এগুলো তিনি নাকি রিসার্চ করে জেনে ছিলেন পিএইচডি করতে গিয়ে। তিনি পিএইচডি ড. আচার মেডিকেল ড. এরপর তিনি আরো বললেন আপনারা যেসব অনুবাদ পড়েন, বলা হয়েছে রক্ত, রক্ত, রক্ত। তবে ইদানীং কিছু মুসলিম অনুবাদ করেছে আলাক, আলাক, আলাক। অর্থাৎ জোঁকের মত কিছু একটা। তিনি এটা জানতেন, আমি জানতাম না। তবে তখন তিনি বলেছিলেন। আমাদের সেই অর্থটা নিতে হবে কোরআন নাযিলের সময়ে তখনকার লোকেরা যে অর্থটা বুঝত। এখনকার সময়ের কোন অর্থ আমরা নিতে পারি না।

কোরআন নাযিলের সময় কোন লোক / মানুষই এটাকে জোঁক বলে মনে করে নি। একথা ঠিক। এজন্য আপনারা আগেরকার যে তাফসিরগুলো পড়বেন সবাই বলেছে রক্ত। একথা কেউ বলছে না যে আলাক জোঁকের মত কিছু আর আমিও একমত। আলাক শব্দটার তিনটা অর্থ আছে– জমাট বাঁধা, রক্তপিণ্ড, ঝুলে থাকে। আর জোঁকের মত কোন জিনিস। প্রফেসর কিতমুরকে কোরআনের এই আয়াতটা দেখান হয়েছিল। মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে তিনি বললেন আমি জানিনা, এটা জোঁকের মত দেখায় কি না। তিনি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থা

পর্যবেক্ষণ করলেন, তারপর জোঁকের একটা ছবির সাথে মিলিয়ে দেখলেন। আর দুটির মধ্যে মিল দেখে খুবই অবাক হয়েছিলেন।

আজকের মেডিকেল সাইন্স বলছে যে ভ্রূণ দেখতে জোঁকের মত। কিন্তু তার যুক্তি ছিল সে সময় যে অর্থটা করা হত সেটা নিতে হবে, আজকেরটা না। আর তিনি উদাহরণ দিলেন যে কোরআন বলছে আর বাইবেলও বলছে যে শূকরের মাংস খেয়ো না। কিন্তু এখন আমেরিকায় একজন পুলিশ অফিসারকেও বুঝায়। তাহলে কি বলবেন কোরআন বলছে কোন পুলিশ খেয়ো না। আর লোকজন সবাই হাসতে লাগল। উনি কথা বলছিলেন তাই কিছু বলি নি। আমাকে নিয়ম মানতে হবে। তারপরও আমি যখন লেকচার দিতে গেলাম তখন বললাম ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল যা বললেন, সেই কথাগুলো শুধু পবিত্র বাইবেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, ইনজীল নাযিল হয়েছিল সেই সময়ের একটা নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য। তাই বাইবেলের জন্য সেই সময়ের অর্থটাই নিতে হবে। তবে পবিত্র কোরআন শুধু মুসলিমদের, আরবদের বা সেই সময়ের জন্য নাযিল হয় নি। কোরআন নাযিল হয়েছে মানুষ জাতির জন্য। চিরস্থায়ী ধর্ম। তাই এখানে সব অর্থই নিতে হবে।

নাযিল হওয়ার সময় থেকে একেবারে কেয়ামত পর্যন্ত সব অর্থকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, একটা সঠিক হতে পারে আবার সবই সঠিক হতে পারে। আর ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল মরোকেবায় Practise করেছিলেন। আর তিনি আরবিতে কথাও বলতে পারতেন। তাহলে ড. মেডিকেল ড. M.D আর আমি সামান্য MBBS তিনি আমার চেয়ে উপরে M.D কোরআনের বিরুদ্ধে বই লিখে পিএইচডি করেছেন। আরবিতে কথা বলতে পারেন আর আমি পারি না। আমরা বিতর্ক করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, আপনি যদি বাইবেলের কথা বলেন ঠিক আছে। বাইবেলের ক্ষেত্রে সে সময়ের অর্থটা নিতে হবে। কিন্তু কোরআনের ক্ষেত্রে সব অর্থই নিতে হবে।

আর এখন যে অর্থটা করা হয় তার কোন আপত্তি নেই। কারণ প্রফেসর কিতমুর, যিনি এ ব্যাপারে বিখ্যাত ভ্রূণ বিদ্যার, বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ; তিনি বলেছেন, আর তার বইতেও তিনি লিখেছেন ভ্রূণ দেখতে জোঁকের মতই, তাই আপত্তি করা যাচ্ছে না। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে দ্বিতীয় অর্থটা ঝুলে থাকে। এটা ঝুলে থাকে সেটাও ঠিক। কারণ ভ্রূণ মায়ের পেটের ভেতরে ঝুলে থাকে। একেবারে Latest রিসার্চ-এ বলা হয়েছে যে প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণের ভেতরে রক্ত প্রবাহিত হয় না। তখন রক্ত পিণ্ডের মত দেখায়। তাহলে রক্তপিণ্ড বলাও সঠিক। এটা বিজ্ঞান সেদিন আবিষ্কার করল।

পবিত্র কোরআন আমাদের বলেছে যে, সৃষ্টি করেছেন রক্ত পিণ্ড থেকে। দেখতে সে, সে রকম একটা জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ডের মত। কাজের দিক থেকে। ভ্রূণ মায়ের পেটে ঝুলে থাকে। আর আকৃতিতে এটা দেখতে জোঁকের মত। তাহলে

আলহামদু লিল্লাহ। তিনটা অর্থই সঠিক। এমনকি রক্তপিণ্ডও সঠিক। সেটা ঝুলে থাকলে এ অর্থটাও সঠিক। জোঁকের মত সেটাও ঠিক।

প্রশ্ন ঃ ১৫৬। আসসালামু আলাইকুম। ভাই জাকির। আমার নাম হেমা। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। প্রথমে বলি আমি দুবাইতে আছি ১৮ বছর। এই প্রথম বারের মত কারো কাছে জিহাদের সত্যিকারের অর্থটা জানলাম, আর আমি বলব বেশির ভাগ মুসলিমই এটা জানে না। আই এম স্যরি। আমার প্রশ্নটা হলো পবিত্র কুরআনে জিহাদ সম্বন্ধে এমন কোন সীমারেখার কথা কি বলা হয়েছে যে, এই পর্যন্ত যেতে পারবেন? যদি আপনি জিহাদ করতে চান।

উত্তর ঃ বোন হেমা, মাশাআল্লাহ। আপনি মুসলিম হয়েছেন। শান্তির ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আপনাকে অভিনন্দন। আপনি বললেন যে, জিহাদের আসল অর্থটা জানতেন না। যেটা আজকে জানলেন। আলহামদুলিল্লাহ। আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে যে, এমন কোন সীমারেখার কথা কি বলা আছে যে জিহাদ করলে এই পর্যন্ত যেতে পারবেন? বোন জিহাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো নিজের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে জিহাদ। জিহাদ আন নফস। সর্বোচ্চ লেভেল। আর আপনি যেকোন সীমারেখা পর্যন্ত যেতে পারেন যতক্ষণ কোরআন অনুমতি দিচ্ছে। আপনি শরিয়াহ ভাঙ্গতে পারবেন না। আপনি যেকোন সীমা পর্যন্ত যেতে পারবেন। তবে সেটা ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী হতে হবে। আপনি এখানে ইসলামি শরিয়াহর বাইরে যেতে পারবেন না। সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো নিজের অহমিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

আমরা আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটা হাদীসের দৃষ্টান্ত দেখি। পবিত্র কোরআনে কিছু সূরা নাযিল হয়েছিল। যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ছিলেন। এগুলো হলো মক্কী সূরা, মদিনায় নাযিল হয়েছিল মাদানী সূরাগুলো। এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে : মক্কী সূরায় বলা হয়েছে কিভাবে ঈমানকে শক্তিশালী করতে হবে। আর মাদানী সূরায় বলা হয়েছে কিভাবে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ইকামাতে দ্বীন অর্থাৎ জিহাদ। আমরা জানি যে মুসলিমরা মদিনায় এসে আগের চেয়ে তাদের অবস্থা শক্তিশালী হয়েছিল। তখন বেশ কিছু যুদ্ধ হয়েছিল। তাই এসব সূরায় জিহাদের কথা বলা হয়েছে। কিতালের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যুদ্ধ। তবে মক্কা থাকার সময় জিহাদ কেমন ছিল? যখন মক্কা শহরের অমুসলিমরা তারা বেশ কিছু মুসলিমকে নির্যাতিত করে মেরে ফেলছিল তখন অনেকেই লড়াই করতে চেয়েছিলেন। যেমন– হযরত হামযা, হযরত উমর (রা) তার প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। তারা ছিলেন যোদ্ধা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সবর বা ধৈর্য ধারণ কর। সবর বা ধৈর্য ধারণ করাই ছিল জিহাদ। যদি সামর্থ্য থাকে আর পাল্টা আক্রমণ করেন সেটা ভাল। আপনার আক্রমণ করার সামর্থ্য আছে তারপরও সবর করছেন, আক্রমণ করলেন না, এটা আসলে অনেক বড় জিহাদ।

হযরত হামযা (রা) তখন বললেন, আমার ভাইদেরকে কারা হত্যা করল? আমি হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাই। তাকে বলা হত মরুভূমির সিংহ। লোকজন তাকে ভয় পেত। কিন্তু নবীজি বলছিলেন এটা করা যাবে না। তাহলে তার জিহাদ ছিল নিজেকে কন্ট্রোল করা, সবর করা। একেক সময় জিহাদ একেক রকমের হয়। জিহাদের অর্থ শুধু শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা নয়। সবর এক ধরনের জিহাদ। আর হযরত আয়েশা (রা) নবীজির স্ত্রী। তিনি নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন আমরাও কি জিহাদ করব? তিনি সেখানে যুদ্ধের কথা বলছিলেন। হাদীসটা সহীহ বুখারীতে আছে চতুর্থ খণ্ডের ২৭৮৪ নাম্বার হাদীস। নবীজি বলেছেন তোমার জন্য জিহাদ হলো একদম সঠিকভাবে হজ্জ পালন করা। আয়েশা (রা)-এর জন্য হজই ছিল শ্রেষ্ঠ জিহাদ।

এছাড়াও আরেকটি হাদীস আছে সহীহ বুখারীতে। এক লোক নবীজি-কে প্রশ্ন করলেন, আমরাও কি জিহাদে যাব? এখানে জিহাদ অর্থে কিতালের কথা বলা হচ্ছে যুদ্ধ। নবীজি বললেন, তোমার কি বাবা-মা আছে? সে বলল– হ্যাঁ। তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ জিহাদ হচ্ছে তোমার বাবা-মা'র সেবা করা। তাহলে পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে জিহাদ একেক সময় একেক রকম হয়। এছাড়াও সুনানে নাসায়ীতে উল্লেখ করা হয়েছে নবীজি বলেছেন কোন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কথা বলাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ। তার মানে এই নয় যে, সবার জন্যই বাবা-মাকে সেবা করাই সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।

নবীজি জানতেন যে, সে লোকের বাবা-মায়ের সেবা প্রয়োজন। তাহলে পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে একেক সময় জিহাদ একেক রকম হয়। এখানে আপনি কতদূর যেতে পারবেন? সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করতে পারেন। এরকম একটা জিহাদ বা কিতালের সময় নবীজি সাহাবিগণকে বললেন– তোমাদের সম্পদের যতখানি দিতে পার দান কর কিতালের জন্য। এটা একটা সহীহ হাদীস। হযরত উমর (রা) তিনি খুব ধনী ছিলেন। তার অনেক সম্পদ ছিল। তিনি সম্পত্তির অর্ধেক দান করলেন। নবীজির হাতে তুলে দিলেন। আর বললেন যে মাশাআল্লাহ আমার সম্পদের অর্ধেক দান করেছি। তিনি ভেবে ছিলেন তিনিই সবার উপরে। তার অর্থ তিনি সবচেয়ে সেরা পুরস্কারটা পাবেন। তিনিই সবার উপরে আছেন।

নবীজি তখন বললেন, হযরত আবু বকর (রা) ইসলামের প্রথম খলিফা। তিনি তাঁর পুরো সম্পত্তি দান করেছেন। তাই তিনি হযরত উমর (রা)-এর চেয়ে বড় পুরস্কার পাবেন। পরিমাণের মাপকাঠিতে হযরত আবু বকর (রা) যা দান করলেন তার তুলনায় হযরত উমর (রা)-এর দান করা সম্পদ অনেক বেশি। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) তাঁর ১০০% সম্পত্তি দান করেছেন। তাই তিনি হযরত উমর (রা)-এর চেয়ে অনেক বেশি সওয়াব পাবেন। আল্লাহ তাদের শান্তিতে রাখুন। যেহেতু পুরো সম্পত্তি দান করেছেন। তিনি বড় পুরস্কারটি পাবেন। অর্থাৎ নিজের

ভোগের জন্য সম্পত্তির কোন অংশ রাখেননি। তাই আল্লাহ শরিয়াহ যে সীমা নির্ধারণ করেছেন সেই সীমা পর্যন্ত যেতে পারেন। যদি জিহাদ করতে চান। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৫৭। আমার নাম রেজাউল আলী খান। আমার প্রশ্নটা হল, আত্মঘাতী বোমা হামলা সম্পর্কে, এই জিনিসটাকে ইসলামের আলোকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর ঃ যদি আত্মঘাতী বোমা হামলার কথা বলা হয় তবে আত্মঘাতী সম্পর্কে এখানে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই শেখ নাসির উদ্দীন আলবানী, শেখ বিন বাদ, শেখ হুদায়মী তিন জনই খুব বড় বিশেষজ্ঞ। আল্লাহ তাদের শান্তিতে রাখুন। তারা এমন ফতোয়া দিয়েছেন যে আত্মঘাতী বোমা হামলা করা হারাম। তবে আরো বিশেষজ্ঞ আছেন যেমন শেখ জাফর আলী হাওয়ালী, শেখ সালমান আওদা তাদের মতামত আলাদা। তবে আমাদের আত্মঘাতী বোমা হামলার ব্যাপারটা বুঝতে হবে। ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা করা হারাম এ ব্যাপারে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই, এটি স্পষ্ট। তবে আত্মঘাতী বোমা হামলার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা একমত নয়। তাদের মতে আত্মঘাতী শব্দটা এখানে সঠিক নয়। এটা সঠিক শব্দ নয়। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে একজন তার জীবন সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে তার জীবনটা শেষ করে দিতে চায়। আর এখানে তাদের মতে এটা যুদ্ধের একটা কৌশল। এখানে উদ্দেশ্য হলো– শত্রু পক্ষের ক্ষতি সাধন করা। আর এটা করতে গিয়ে এই সম্ভাবনাই বেশি যে তারা মারা যাবে। সে জন্য এটা যুদ্ধের একটা কৌশল। অনেক বিশেষজ্ঞ যেমন শেখ সালমান আওদা বলেন– এটা সঠিক। তবে এর মানে এই নয় যে, একজন মুসলিম ইচ্ছে করলেই শরীরে বোমা বেঁধে হামলা করতে পারবে না।

এসব ক্ষেত্রে সালমান আওদা, জাফর হাওয়ালী বলেন– এটা হারাম। আমি আগেই বলেছি যে, আত্মঘাতীর এই কালসার ইসলাম ধর্মে ছিল না। এটা ইসলামে আগে ছিল না। তবে কিছু মুসলিম আছে ফিলিস্তিনে অথবা ইরাকে তারা এমন করেছে। তবে তাদের মতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে না পেয়ে শেষ উপায় হিসেবেই এমনটা করেছে তারা। এসব জায়গায় অনেক মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে অন্য প্রভাবে। তখন তারা চেয়েছিল যে, আমরা একাই মরব না; সঙ্গে আরো কিছু লোক নিয়ে মরব। আর উদ্দেশ্য হলো শত্রু পক্ষের ক্ষতি করা। কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন যুদ্ধের কৌশল হিসেবে নিরূপায় হয়ে শেষ অস্ত্র হিসেবে এটা করা যেতে পারে।

আমিও আমার লেকচারে বলেছিলাম যে, ইরাকে আমেরিকার সৈন্যরা আসার আগে আত্মঘাতী হামলা ছিল না। রবার্ট পেপের কথা অনুযায়ী। তিনি আত্মঘাতীর উপরে বিশেষজ্ঞ, তার মতে বেশির ভাগ আত্মঘাতীর হামলার কারণটা হলো সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণ। সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে দেশ থেকে আগ্রাসী সামরিক

সরকার সরানোর জন্য। তাহলে এ কথাটা বলেছেন, রবার্ট পেপে তার লেখা বই ডাইরিং টু ইউইনে। তবে আত্মঘাতী হামলাকে যেসব বিশেষজ্ঞ অনুমতি দিয়েছে তারাও একথা বলেছেন যে, এ ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ সব নির্দেশনা দিবেন। সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করবেন এমন কেউ যিনি ইসলামি শরিয়াহ ভালভাবে জানেন। নিরীহ মানুষদের হত্যা করতে পারবেন না। ইসলামে এটা হারাম। আর সূরা মায়িদার ৩২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

অর্থ : 'এই কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করল।'

সব কিছু বিবেচনা করে বললে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন যে, এটার অনুমতি আছে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৫৮। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম ডা. খান। আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা হলো– ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মহিলারা কি মিডিয়ার সামনে আসতে পারেন? অনেক মুসলিম বিশেষজ্ঞই মহিলাদের Audio Record করার অনুমতি দেন না। কারণ সে ক্ষেত্রে অন্য পুরুষ তার কণ্ঠস্বর শুনে ফেলবেন। এটার কি অনুমতি আছে? আর তাহলে কিভাবে সেটা বুঝাব? ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ আপনি প্রশ্ন করলেন যে, মুসলিম নারীরা মিডিয়ার সামনে আসতে পারবেন কি-না? সত্য প্রচারের জন্য বা ইসলামের শত্রুদের সাথে লড়াই করতে। আর কিছু বিশেষজ্ঞ এমন ফতোয়া দিয়েছেন যে এটা হারাম। এখানে কিছু ব্যাপার অবশ্যই হালাল। আপনি Article লিখতে পারবেন, সেটাকে কোন বিশেষজ্ঞই হারাম বলতে পারবে না। হয়ত খবরের কাগজে অথবা ইন্টারনেটে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই অংশ নিতে পারেন। আর Audio Meadia এর কথা যদি বলি, এটা নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ আছে। কেউ বলবেন পারবেন, কেউ বলেন পারবেন না। সাধারণত কণ্ঠস্বর নিয়ে বিশেষজ্ঞরা মহিলাদের তেমন কিছু বলেন না। তবে এসব ক্ষেত্রে মহিলাদের কণ্ঠস্বর সাধারণ থাকতে হবে। Audio Meadia এর ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন আপনার কণ্ঠস্বর যেন বেশি উঠানামা না করে। সে সময় বেশি হাসাহাসিও করবেন না। বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ এমন ক্ষেত্রে অনুমতি দেন। এবার টিভির সামনে আসা নিয়ে বলি।

এখানেও বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে যে, বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই বলেন যে, মহিলারা টিভির সামনে আসতে পারবে না। অনেক বিশেষজ্ঞই বলেন, মহিলারা যদি হিজাব পরিধান করে। যদি শরীর পুরোপুরি ঢেকে রাখে, শুধু মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত খোলা রাখে এবং কণ্ঠস্বরে যদি উত্তেজক কিছু না থাকে, আর যদি শরিয়াহর অন্য নিয়মগুলোও মানে, তাকে অনুমতি দেয়া যেতে পারে। তবে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই বলেন না, মহিলারা টিভির সামনে আসতে পারবে না। কারণ পবিত্র কোরআনে সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে –

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ -

অর্থ : 'মুমিনদিগকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।'

এই আয়াতটা এবং বেশ কিছু হাদীস নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতভেদ আছে। তবে এই গত বছরে একজন বিখ্যাত সালাত বিশেষজ্ঞ যেমন– নাসির আল আওয়াদ। আমি সৌদি আরবে এটা শুনেছিলাম, তিনি এটার অনুমতি দিয়েছেন যে, মহিলারা যদি ঠিকমত পোশাক পরে, যদি তার মুখে নেকাপ নাও থাকে। কারণ নেকাপ দেয়াটা ফরয নয়। যদিও অনেকে বলেন ফরজ। তবে শেখ নেসার আলবানীর মতে আরো কয়েকজনের মতে নেকাপ যেটা দিয়ে মুখ ঢাকে এটা ইসলামে ফরজ না। তবে এখন অনেক বিশেষজ্ঞ বেশির ভাগই না তারা অল্প কয়েকজন, সংখ্যায় হয়তো বেশি কিন্তু প্রাকটিসে অনেক কম।

সৌদি আরবের নাসির আল আওয়াদ বলেন যে, মিডিয়ার গুরুত্বের কারণে আমরা মহিলাদের টিভিতে আসার অনুমতি দিতে পারি। কিন্তু এমনকি আজকেও এ নিয়ে মতভেদ আছে। এখনও বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই বলেন যে মহিলারা টিভি-র সামনে আসতে পারবেন না। কারণ সেটা কোরআনের বিরুদ্ধে যাবে। সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে পুরুষরা তাদের দৃষ্টি সংযত করবে। মহিলাদের যদি টিভিতে দেখানো হয় সেখানে অন্য পুরুষেরা তাদের দেখতে পাবে। এজন্য মহিলাদের অনুমতি নেই। এ ব্যাপারে অনেক মতভেদ আছে। তবে আপনি আপনার পছন্দমত একটা বেছে নিতে পারেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৫৯। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম রহমতুল্লাহ। আমার প্রশ্নটা হলো ইসলামের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা খবর ছড়াচ্ছে, এক্ষেত্রে একজন মুসলিম হিসেবে আমার কি করা উচিত?

উত্তর ঃ ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার প্রতিবাদ করতে গেলে আপনাকে যেটা প্রথমে করতে হবে। দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে আপনাকে ভালভাবে জানতে হবে। আর উত্তর দেয়ার সময় হীনমন্যতায় ভোগবেন না। একথা আমি আগেও বলেছি। উত্তর

দিন আত্মবিশ্বাস নিয়ে। মুসলিম হিসেবে গর্ববোধ করুন। খেয়াল রাখবেন যেন ইসলাম সম্পর্কে আপনার ধারণা পরিষ্কার থাকে। আর আপনি সেটা ঠিকভাবে পালন করবেন। যদি আপনি সঠিকভাবে পালন না করেন তাহলে ইসলাম সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রচার করবেন। সেজন্য প্রথমে আপনি সঠিকভাবে পালন করবেন। কোরআন এবং হাদীস মেনে নেন। আর আপনার অমুসলিম বন্ধুরা যদি প্রশ্ন করে, আর সে প্রশ্নের উত্তর না জানলে কোরআন বলছে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করুন; ইন্টারনেটে দেখুন এবং সঠিক উত্তর বের করুন। অথবা বিশেষজ্ঞ কারো কাছে জিজ্ঞেস করুন। তারপর উত্তর দিন। হীনমন্যতায় ভোগবেন না। আত্মবিশ্বাস নিয়ে উত্তর দিন। আপনার উত্তরটা দিন হিকমার সাথে, বিজ্ঞানের আলোকে, কোরআন এবং হাদীস মেনে উত্তরগুলো দিন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৬০। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম শোয়েব খান। আমি একজন ছাত্র। আমি প্রথমে ডা. জাকির নায়েককে অভিনন্দন জানাই এজন্য যে, শুধু মুসলিমরাই নয়, এখানে সবাই আপনাকে নিয়ে গর্বিত। এখন স্যার আমার প্রশ্নটা হলো কিছুদিন আগে ইন্ডিয়ান News চ্যানেলে একটা সংবাদ দেখিয়েছেন যে, এক মহিলাকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করেছেন। সে একজন মুসলিম। তখন হুজুররা তাকে ফতোয়া দিল মহিলা এখন তার শ্বশুরকে বিয়ে করবে। তার স্বামী এখন তার জন্য হারাম। এ ব্যাপার নিয়ে এখন কিছু বলবেন?

উত্তর ঃ ভাই, এ ব্যাপারটা আসলে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু মিডিয়ার কাছে। আর আপনারা হয়তো জানেন যে কয়েক মাস আগে ইন্ডিয়াতে ইমরানা নামে একজন গৃহবধূকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করেছে। তখন বেশির ভাগ ইন্ডিয়ান উলামাই ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, যেহেতু মেয়েটাকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করেছে সেহেতু সে আর তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে না। সে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছে। আর মিডিয়া যখনই দেখল যে এ খবরটা দিয়ে ইসলামের নিন্দা করা যায় তখনই সেটা তারা লোফে নেয়। তারপর খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। যেন ইসলাম ধর্মে এই ইস্যুটা ছাড়া আর কোন ইস্যু নেই। আর ইন্ডিয়ান প্রেস তারা কি করেছে বেশির ভাগ চ্যানেলে এ খবরটা দেখানো হয়েছে। যে ইসলাম ধর্মের উলামা-মাশায়েখ তারা বলে একটা মেয়েকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করেছে সে একজন ভিক্টিম। কিন্তু ইসলাম ধর্ম কি বলেছে, ইসলাম তাকে সাহায্য না করে উল্টো আরো তার নামে বলছে যে, মেয়েটা তার স্বামীর কাছে যেতে পারবে না। সে স্বামীর জন্য হারাম।

মিডিয়া তারপর এই খবরটাকে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এমনকি আজকেও ছড়াচ্ছে। তবে আমি সব সময় বলি, যদি আপনি মিডিয়ার সামনে কথা বলতে না জানেন আপনাকে ট্রেনিং দিতে হবে। আর ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই অন্য

কয়েকজন মুসলিম বিশেষজ্ঞ বলেন না, না, মেয়েটা তার স্বামীর জন্য হারাম নয়। সে তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে। যারা ফতোয়া দিয়েছে যে মেয়েটা তার স্বামীর জন্য হারাম। তারা ভুল বলেছে। তারপর তারা এ ব্যাপারটা নিয়ে অমুসলিমদের সামনে তর্কযুদ্ধ শুরু করল। আমরা এভাবে আমাদের দুর্বলতাগুলো অন্যদের সামনে তুলে ধরছি। মজার ব্যাপারটা হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের দুটো দলই তাদের ফতোয়া দেয়ার জন্য পবিত্র কোরআনের একই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছে। যারা ফতোয়া দিয়েছে যে মেয়েটা তার স্বামীর জন্য হারাম। তারা সূরা নিসার একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছে। সূরা নিসার ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ ۔

অর্থ : 'নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না।'

এখন আরবি ভাষায় নিকাহ্ শব্দটার দুটো অর্থ আছে। একটা হল বিয়ে আরেকটা হল সহবাস। আর আরবি ভাষা সম্পর্কে যারা ভাল জানেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন যে নিকাহ্ শব্দটার দু'টো অর্থ আছে একটা বিয়ে আর অন্যটা সহবাস। আর বিশেষজ্ঞদের প্রথম দলটা তারাই সংখ্যায় বেশি। তারা হলেন দারুল উলুমের বিশেষ লোক। তারা নিকাহ্ শব্দটার অর্থ করেছেন সহবাস। নিকাহ্ শব্দটার অর্থটা যদি ধরেন সহবাস তাহলে কোরআনের এ আয়াত বলেছে তোমরা সহবাস করতে পারবে না, তোমাদের বোনদের সাথে, তোমাদের ফুফুর সাথে, তোমাদের খালার সাথে এবং তোমরা সহবাস করতে পারবে না সে মহিলার সাথে, যে সহবাস করেছে তোমাদের বাবার সাথে। এটার ওপর ভিত্তি করে তারা বলেছেন ছেলেটার বাবা এই মেয়ের সাথে সহবাস করেছে। এখন এই মেয়ে তার ছেলের সাথে সহবাস করতে পারবে না। সে জন্য মেয়েটার স্বামী তার জন্য হারাম।

অন্য আরেক দল বলল ঃ না, এটার অর্থ বিয়ে। এ নিয়ে তারা তর্ক করতে লাগল। আমাদেরকে উত্তর দিতে হবে হিকমার সাথে। এক নাম্বার পয়েন্ট ইমরানা নামের এই মেয়েটার সাথে যা হয়েছিল। সেটা সহবাস ছিল না। সেটা ছিল জিনা-বিল জবর অর্থাৎ ধর্ষণ। ধর্ষণ আর সহবাস দুটো আসলে এক কথা নয়। আর ধর্ষণকে আরবিতে নিকাহ্ বলা হয় না। এক নাম্বার পয়েন্ট আপনি শব্দ নিয়ে খেলা করছেন। এটা সহবাস এতে সমস্যা নেই। দেখেন আমি আগেই বলেছি যদি কেউ ভুল কোন কিছু বলে বিতর্ক করার একটা টেকনিক আছে। যদি কেউ বলে দুই যোগ দুই সমান পাঁচ। আমি তর্ক না করে বলব এই নিন এখানে দুই লক্ষ দিরহাম। আরো দুই লক্ষ দিরহাম। এবার আমাকে পাঁচ লক্ষ দিরহাম দেন। সে তখন বলবে না, না। টেবিলটাকে ঘুরিয়ে দিন। আমাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন আমি বলছিলাম।

আমি তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম যে নিকাহ্ অর্থ সহবাস। তাহলে কোরআনের এ আয়াতটা বলছে যে তোমরা সহবাস করবে না তোমাদের বোনদের সাথে, তোমাদের ফুফুর সাথে, তোমাদের খালার সাথে এবং সেই মহিলার সাথে যে তোমার বাবার সাথে সহবাস করেছেন। তার মানে কি কোরআন অনুমতি দিচ্ছে প্রতিবেশী মহিলার সাথে সহবাস করতে। অথবা অন্য কোন মহিলার সাথে। তারা বলে না, না। আমি বললাম কেন? যদি বলেন যে নিকাহ্ অর্থ সহবাস। তাহলে কোরআন বলছে তোমরা সহবাস করবে না তোমাদের বোনদের সাথে। ফুফুর সাথে, খালার সাথে, আর যে মহিলার সাথে তোমার বাবা সহবাস করেছে। কিন্তু সহবাস করতে পারবে প্রতিবেশী মহিলার সাথে, অন্য যেকোন মহিলার সাথে তারা বলল না। তাহলে সঠিক অর্থটা হচ্ছে নিকাহ্ মানে বিয়ে অর্থাৎ তোমরা বিয়ে করবে না তোমাদের বোনকে, ফুফুকে, খালাকে এবং বিয়ে করবে না সেই মহিলাকে যাকে বিয়ে করেছে তোমার বাবা। তবে আপনি বিয়ে করতে পারেন প্রতিবেশী মহিলাকে অথবা অন্য যেকোন মহিলাকে।

তাই আপনারা লড়াই না করে হিকমা দিয়ে এটা বুঝিয়ে দিন। আর কোন বিশেষজ্ঞই বলবে না যে, আপনারা যেনা করতে পারেন। প্রতিবেশী মহিলার সাথে অথবা অন্য যেকোন মহিলার সাথে। সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা নিজেরাই তর্ক করছি একে অন্যের সাথে। মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামকে সবার সামনে হাস্যকর বানিয়ে ফেলছি। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৬১। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম সামিউল্লাহ। আমি একটা ইলেকটিক্যাল স্যালস এক্সিকিউটিভ। আমার প্রশ্নটা হল– মিডিয়াকে সাধারণত রাষ্ট্র কর্তৃক কিছুটা প্রভাবিত করে। রাষ্ট্রে সরকার মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে মানে মধ্যপ্রাচ্যে যেখানে আরবরা বসবাস করে। আমি সেখানে একথা শুনেছি। এখানে বেশির ভাগ অনুষ্ঠানই মুসলিমদের জন্য দেখানো হয়। এখন এইসব দেশের শাসকরা কিভাবে মুসলিম মিডিয়ার অবস্থানকে উন্নত করতে পারে?

উত্তর ঃ আমি আমার লেকচারে বলেছি কিছু মুসলিম চ্যানেল আছে। একেবারেই নেই বলি নি। তবে তাদের অনুষ্ঠান শুধু মুসলিমদের জন্যই। ইরানে তো উর্দু চ্যানেল আছে, শুধু মুসলিমদের জন্য, পাকিস্তানেও মুসলিমদের জন্য অনুষ্ঠান হয়। আরবি ভাষাতেও দেখতে পারবেন আরবি চ্যানেল আছে। অনেক ভাল, খারাপ অনেক। তবে তাদের অনুষ্ঠানগুলো শুধু আরবদের জন্য। এটা ঠিক আছে আরবি ভাষায় যদি ভাল অনুষ্ঠান হয় সেটা ঠিক আছে। আমি বলছি না সেটা ভুল। যদি চ্যানেলগুলো ভাল হয়, যদি ইসলামি শরিয়াহ মেনে চলে। যেমন মাযাব চ্যানেল

ইত্যাদি। তবে এটাই যথেষ্ট নয়। আমার কথা হল এমন একটা চ্যানেল শুরু করতে হবে যেখানে ভাষাটা হতে হবে আন্তর্জাতিক ভাষা।

আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিটা যাতে বদলে দিতে পারি। পুরো পৃথিবীর মানুষের মনোভাব বদলে দিতে পারি। শুধু আরবদের সাথে ইসলামের ভাল কথাগুলো বলছেন, এটা অবশ্য ভাল কাজ। আমাদের এমন একটা চ্যানেল দরকার যেটার ভাষা হবে আন্তর্জাতিক ভাষা। আমি এখানে বলব যে ঠিক আছে। আপনারা আরবের বিভিন্ন দেশ শাসন করছেন। তবে কেন আপনারা ইংরেজিতে ইসলামিক চ্যানেল চালু করছেন না? যেটা ইসলাম ধর্মের বাণী প্রচার করবে পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই। যেটা যাবে আমেরিকাতে, ইউরোপে, অস্ট্রেলিয়াতে মধ্যপ্রাচ্যে এশিয়ার সব জায়গায়। এতে করে মানুষের মনোভাব বদলাতে পারব। একই সাথে ইসলাম ধর্মকে প্রচার করতে পারব। যেটা ইসলাম অনুযায়ী ফরয।

প্রশ্ন ঃ ১৬২। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম কায়সার রহমান। আমার প্রশ্নটা হলো–একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা পৃথিবীর মুসলিমরা আমরা এখনও রুটি-রুজির জন্যই যুদ্ধ করে যাচ্ছি। তবে এ কথা কি বলবেন, আমাদের কেন বিবিসি বা সিএনএন-এর মত কোন টিভি চ্যানেল নেই?

উত্তর ঃ আমি এখানে লেকচার দিলাম মিডিয়া আর ইসলাম নিয়ে। আর আপনি এখন প্রশ্ন করলেন কেন? যেন আমি আপনাকে রোমিও জুলিয়েটের পুরো গল্পটা বললাম। আর আপনি প্রশ্ন করলেন রোমিও কি ছেলে না মেয়ে। ভাই আমি এতক্ষণ কথাই বললাম মিডিয়া আর ইসলাম নিয়ে। আমরা পিছিয়ে আছি আমাদের দোষেই। এটার উপরই এতক্ষণ লেকচার দিলাম। সম্ভবত আমার লেকচার শুরুর আগে প্রশ্নটা লেখা হয়েছিল। এজন্যই আমি বলি সরাসরি প্রশ্ন করুন। অনেকের মাথায় একটা প্রশ্ন থাকে সেটা লিখে ফেলে। তারপর আমি যে কথাই বলি সেটা জমা দিয়ে দেয়া পুরো ক্যাসেটটা এ বিষয় নিয়ে। যদি আবার শুনতে চান তাহলে ক্যাসেটটা নিয়ে যতবার খুশি শুনতে থাকুন।

প্রশ্ন ঃ ১৬৩. আসসালামু আলাইকুম ডা. নায়িক। আমার নাম জিসান জাফর আহমেদ। আমার প্রশ্নটা হল টিভিতে কার্টুন দেখা যাবে কিনা?

উত্তর ঃ ভাই তুমি আসলে সত্যিই খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছ। আমাদের এ কার্টুন দেখার অনুমতি আছে কি-না। বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল জরিপ আমাকে বলেছে শিশুদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে যে জিনিসটা সেটা স্যাটেলাইট চ্যানেল। আমেরিকাতে একটা শিশু প্রতিদিন প্রায় গড়ে সাত ঘণ্টা টিভির সামনে বসে থাকে। স্কুলে এর চাইতে কম সময় থাকে। বেশির ভাগ চ্যানেলই তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যায়। এমনকি কার্টুন চ্যানেলগুলো। বেশির ভাগ চ্যানেলই। আপনারা চ্যানেলগুলোতে অনেক ভায়োলেন্স দেখবেন। আর একজন

যদি প্রতিদিন ভায়োলেন্ট অনুষ্ঠানগুলো দেখে হোক সে কার্টুন ভিত্তিক সিনেমা। তার বন্ধুর সাথে ঝগড়া হলে সে বাবার পিস্তল নিয়ে বন্ধুকে গুলি করে মারে। মুম্বাইতে একটা সিরিয়াল দেখানো হতো বাচ্চাদের জন্য।

অনেকটা কার্টুনের মতই ছিল। নাম ছিল শক্তিমান। অনেকটা ঠিক সুপারম্যানের মতই। একটা বাচ্চা বাসা থেকে লাফ দিল উঁচু দালান থেকে। ভাবল যে শক্তিমান বা সুপারম্যান তাকে বাঁচাবে। কেউ তাকে বাঁচাল না। সে মারা গেল। যখন বাচ্চার বাবার সাথে কথা বলা হল তখন তিনি বললেন আমি ভাবতেই পারি না আমার বাচ্চা লাফ দিবে। হয়তোবা আগামীকাল আপনার বা আমার বাচ্চা লাফ দিবে। তাহলে এই মিডিয়ার প্রভাব এখন এতটাই বেশি যে এটা মানুষকে অন্ধ বানায়। আর এতে সবচেয়ে ক্ষতি হয় বাচ্চাদের। সে জন্য আমি মুম্বাইতে একটা স্কুল চালু করেছি; যার নাম ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। এই স্কুলে ভর্তি হবার একটা শর্ত হলো আপনার বাড়িতে ক্যাবল টিভি থাকতে পারবে না। স্যাটেলাইট টিভি থাকবে না। এটা শয়তান, এটা শয়তান। লোকে আমাকে বলে তাহলে আমরা পিস টিভি কিভাবে চালাব? এক নাম্বার কথা হলো পিস টিভি দেখার জন্য যদি আপনার ঘরে কয়েকশ শয়তানকে জায়গা দিতে হয়; কিছুই দেখা লাগবে না। সেটাই ভাল। বড় কোন ক্ষতির চেয়ে ছোট ক্ষতি ভাল। কিন্তু যদি আপনার বড় কোন ডিস থাকে আর ডিসে আপনি শুধু পিস টিভি দেখতে চান। অন্য কোন চ্যানেল না। আমরা চেষ্টা করব। যাতে মধ্যপ্রাচ্যও আপনারা দেখতে পারেন। একটা ডিসক দিয়ে, খরচ হবে মাত্র কয়েকশ রুপি বা কয়েকশ দিরহাম। মাসে মাসে দিতে হবে না। অন্য চ্যানেলগুলোতে যেভাবে দেন। হয়তো মাসে মাসে দুই বা আড়াইশ রুপি, খরচ করুন। আর বিল্ডিং এর সব বাসাতেই যেন দেখে। একটা ডিকোভার নেন সেটা দিয়ে শুধু পিস টিভি দেখবেন। অন্য কোন চ্যানেল দেখবেন না। বর্তমানে যা আছে সেটাকে বাদ দিবেন না। যে এটা হালাল এটা হারাম। একটা সাবস্টিটিডট থাকতে হবে।

আমরা বলি যে আমাদের স্কুলের অভিভাবকগণ ক্যাবল টিভি দেখেন না। তবে আমাদের কাছে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর পাঁচ হাজার ভিডিও ক্যাসেট আছে। যদি প্রতিদিন একটা করে দেখেন প্রায় তিন ঘণ্টা করে সব দেখে শেষ করতে আপনার প্রায় ১৩ বছরের বেশি সময় লাগবে। এই সময়ের মধ্যে আপনার ছেলে বা মেয়ে স্কুল থেকে পাস করে চলে যাবে। যদি প্রতিদিন একটা করে দেখেন আমাদের লাইব্রেরিতে আরো নতুন ভিডিও ক্যাসেট আসবে। তের বছরে আরো পাঁচ হাজার নতুন ভিডিও থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের এই ইসলামি ভিডিও ক্যাসেট লাইব্রেরিতে বাচ্চাদের জন্য কার্টুনও রয়েছে। তবে এগুলো ইসলামিক লাইনের। সেজন্য ভাই তোমাকে বলছি, তোমরা এমন কার্টুন দেখবে যেগুলো ইসলামের বিষয়ের ওপর তৈরি করা, যেখানে কোরআনের কথা আছে। নবীজির

হাদীসের কথা আছে। এমন অনেক কার্টুন আমাদের কাছে আছে। এই কার্টুনগুলো আমাদেরকে ইসলামের আরো কাছে নিয়ে আসবে। ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যাবে না। এছাড়া যে কার্টুন আছে টমএন্ডাজেরী, ব্যাটম্যান, সুপারম্যান এগুলোর মধ্যে কোন নীতি কথাই নেই।

এগুলো আপনাকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। এগুলোতে অনেক ভায়োলেন্স থাকে। এজন্য ইসলামিক কার্টুন দেখবেন। যেমন মুসলিম স্কাউট, এরকম আরো অনেক কার্টুন। যেমন ফতে সুলতান, যেগুলোতে একটা নৈতিক গল্প আছে। আর এগুলো আপনাকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসবে। ভাই যদি তুমি কার্টুন দেখতে চাও তাহলে ইসলামিক কার্টুন দেখবে। যেটা তোমাকে আল্লাহর দিকে নিয়ে আসবে। তবে এমন কার্টুন দেখবে না, যেটা আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ ১৬৪. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মুহাম্মদ ইবনে আসাদ। আমার প্রশ্নটা হলো– আমাদের নবী করীম ﷺ-এর সময়ে কাফিররা ইসলামের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা খবর প্রচার করত। যেগুলোতে পরে ইসলামের উপকারই হয়েছে। আপনার মনে হয় না এমনকি এবারও একই ঘটনা ঘটবে?

উত্তর ঃ ভাই আপনি বললেন যে, আমাদের নবী করীম ﷺ এর সময়ে অনেকে ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে ছিল। তাতে ইসলামের উপকারই হয়েছে। এটা সত্যি।

আর আমরাও সব সময় সেটাই চাই। আমার মনে আছে, একবার আমি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলাম টেররিজম এবং জিহাদের ওপর একটা লেকচার দিয়েছিলাম। আর স্বাভাবিকভাবে উসামা বিন লাদেনকে নিয়ে প্রশ্নও ছিল। সেখানে উত্তরে আমি বলেছিলাম যে, সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হল জর্জ বুশ। একজন তরুণ যুবক, সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আর বলল জর্জ বুশের মৃত্যু হোক। সবাই হাত তালি দিল। এখন একজন দায়ী হিসেবে সেখানে আমি অমুসলিমদের বোঝাতে গিয়েছি হিকমার সাথে। আর বিশ্বাস করুন আমার সব চেষ্টা বিফলে চলে গেল। আমি একজন দায়ী সবাই হাত তালি দিল। আর আমি যখন উঠলাম তখন বললাম আমাদের নবীজি ﷺ-এর সময়ে দু'জন উমর ছিলেন। তারা দুজনে ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আর নবীজি ﷺ আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, অন্ততপক্ষে একজন ওমরকে হেদায়াত কর। আর হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) তিনি মুসলিম হলেন। তাই আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব জর্জ বুশকে তুমি হেদায়াত দান কর। আমরা কেন জর্জ বুশের মৃত্যু কামনা করব?

যদি সে ইসলামের ঘোর শত্রুও হয়; আর আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করেন। তাহলে সে ইসলামের পক্ষ নিয়েই লড়াই করবে। তাই আমরা দোয়া করব, আল্লাহ তায়ালার কাছে জর্জ বুশকে হেদায়াত কর, তুমি নির্দেশনা দাও। আর যখন এ কথাটা বললাম, কোন মিডিয়াই বলতে পারল না, আমি যা বলেছি সেটা ভুল। তাই হিকমার সাথে উত্তর দিব। আর আল্লাহর কাছে দোয়া করব তিনি যেন এ লোকগুলোকে হেদায়াত দান করেন। আমিন। এভাবে ইসলাম ধর্ম সব সময়ই সবার উপরেই থাকবে।

প্রশ্ন ঃ ১৬৫। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম খালেক হোসেন। আর আমি একটা প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত। আমার প্রশ্নটা হল– ইসলাম কি মিডিয়ার অনুমতি দেয়? কারণ নবীজি ﷺ -এর সময়ে জনগণের সাথে যোগাযোগের তেমন কোন মাধ্যম ছিল না। একথা আপনি বললেন, তাই আপনি কি কোরআনের কোন সূরার উদ্ধৃতি দিবেন অথবা কোন হাদীস?

উত্তর ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে নবীজি ﷺ -এর সময়ে জনগণের সাথে যোগাযোগের তেমন কোন মাধ্যম ছিল না। তাহলে ইসলাম কি মিডিয়ার অনুমতি দেয়? আর কোরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি আছে কি-না। ভাই একটা কথা বলি, ইবাদতের কথা যদি বলতে হয় সেটা বলা হয়েছে, যেটা ফরয সেটা হল ইসলামি শরিয়াহ। অন্যান্য ব্যাপার, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে যেগুলোকে হারাম বলা হয়েছে সেগুলো হারাম। বাদ বাকিগুলো হালাল। যেমন ধরুন, শূকরের মাংস খাওয়া হারাম, মদ খাওয়া হারাম। এমন কথা বলা না হলে হালাল। ভাই আপনাকে একটা প্রশ্ন করি কোরআন বা হাদীসে এমন কোন কথা বলা আছে যে আম খাওয়া হালাল? তাহলে কি আপনি বলবেন যে আম খাওয়া হারাম। তাহলে ইবাদতের ক্ষেত্রে যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলো ফরয। এটা শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রে। আর জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে যেগুলোকে হারাম বলা হয়েছে সেগুলো বাদে বাকিগুলো হালাল। তা না হলে হয়ত আপনি বলবেন ভাই জাকির আপনি আম খাচ্ছেন কেন? আমি আম পছন্দ করি। কারণ আমি ভারত থেকে এসেছি।

আমি আমার দেশ নিয়ে গর্বিত। আর আমার দেশের আম সেটা নিয়েও গর্বিত। এখন আপনি আমাকে পবিত্র কোরআন বা হাদীসের উদ্ধৃতি দেখান যে মিডিয়া হারাম। কিন্তু না। আমি আপনাকে প্রমাণ দেখাচ্ছি। নবী করীম ﷺ কি করেছিলেন? তিনি চিঠি লিখেছিলেন অমুসলিম রাজাদের উদ্দেশ্যে। যেমন আবিসিনিয়ার রাজাকে, ইয়ামেনের রাজাকে ও পারস্যের রাজাকে। নবীজি ﷺ সেই চিঠিগুলোতে পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াত উল্লেখ করেছিলেন–

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ : 'তুমি বল, হে কিতাবিগণ! আস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তার শরিক না করি এবং আমাদের কেউ কাকেও আল্লাহ ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলো, তোমরা সাক্ষী থাক অবশ্যই আমরা মুসলিম।'

নবীজি ﷺ চিঠিগুলো লিখিয়ে ছিলেন। তারপর ঘোড়ায় করে দূত মারফত পাঠিয়েছিলেন। আজকের দিনের মার্সিডিজ গাড়ি অথবা আর কি বলতে পারেন জেট প্লেন। বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে ছিলেন, তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেছিলেন। সেটাই ছিল সেই সময়ের মিডিয়া। চিন্তা করেন চিঠিগুলো লিখিয়ে ছিলেন তারপর ঘোড়ায় করে সেগুলো বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে ছিলেন। নবীজি ﷺ তার সময়ের মিডিয়াকে পুরোপুরি ব্যবহার করেছিলেন যদি আজকের দিনে নবীজি ﷺ বেঁচে থাকতেন। আমার ধারণা তিনিও আজকের এই মিডিয়াকে পুরোপুরি ব্যবহার করতেন, তবে সেটা ইসলামের শরিয়াহ মেনেই হত। হারাম কোন কিছু ব্যবহার করতে হত না। হারাম কোন কিছু ব্যবহার করা যাবে না। হালাল উপায়ে হবে। যেমন একটা ছুরি ব্যবহার হয় ভাল কাজে আবার খারাপ কাজেও। ছুরি ব্যবহার করা হারাম না।

তাই মিডিয়া আসলে হারাম না। যদি বেশির ভাগ লোক ভাবে যে মিডিয়া হারাম। আমরা এখন এই মিডিয়াকে হালাল কাজে ব্যবহার করব। টেবিলটাকে উল্টে দিব। ইসলামিক শরিয়াহর নিয়মগুলো মেনে হালাল উপায়ে ব্যবহার করব। তখন হয়তো আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার কাছে বলতে পারব। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভব যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ইসলাম প্রচার করার জন্য। কারণ আমাদের কাজ হল ইসলাম প্রচার করা। আল্লাহ বলেছেন (ফাজাক্কির ওয়া মুজাক্কির) আমাদের কাজ ইসলাম প্রচার করা। আর মানুষকে হেদায়াত করা, সেটা আল্লাহ তায়ালার হাতে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৬৬। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মোঃ তানভীর খান। আমার প্রশ্নটা হল– হিন্দু অথবা অমুসলিম মিডিয়াকে উত্তর দেয়ার জন্য আমাদেরকে কি গীতা, বাইবেল ইত্যাদি পড়া উচিত?

উত্তর ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, হিন্দু বা অমুসলিম মিডিয়াকে উত্তর দেয়ার জন্য আমাদেরকে কি গীতা, বাইবেল পড়া উচিত? এটা আসলে ইসলামে ঠিক

ফরয না। এটা হল মুস্তাহাব। আপনি পড়তে পারেন, কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমিও এ আয়াতটার কথা বলেছি আগের প্রশ্নের উত্তরে।

সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ـ

অর্থ : 'তুমি বল হে আহলে কিতাবিগণ! আস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই।'

এখন আমরা এক কথায় কিভাবে আসব। যদি আমরা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো না পড়ি এজন্য অন্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পড়া উচিত। তবে ফরয না। আমি বলব এটা মুস্তাহাব। এই কৌশলের কথা বলছেন আল্লাহ তায়ালা ও আমাদের নবীজি ﷺ। আমাদের নবীজি ﷺ বলেছেন মাত্র একটা আয়াত জানলেও তা প্রচার কর। এটা সহীহ বুখারী শরীফের হাদীস।

এরপর আরো বলা হয়েছে আহলে কিতাবী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিলেও কোন সমস্যা নেই। তাহলে অন্য ধর্মগ্রন্থগুলো পড়া হল একটা কৌশল। যেটা দেখিয়েছেন আমাদের নবীজি ﷺ। আর পবিত্র কোরআনেও আছে, যদি এমনটা করতে পারেন তাহলে ভাল। খুবই ভাল। তবে এখানে আপনাকে বাইবেলের হাফেজ হতে হবে না। বেদের হাফেজ হতে হবে না। আপনাকে জানতে হবে দাওয়াহর জন্য কোন অনুচ্ছেদগুলো লাগবে। এত সময় দেয়া লাগবে না। যেটা কুরআনের পিছনে দেন। সময় নষ্ট করবেন না। এমনকি আমিও বাইবেলের হাফেজ নই। কোরআনেরও হাফেজ নই। কোরআনের হাফেজ হতে চাই। তবে এখনই নয়। বেদের হাফেজ নই বা ভগবত গীতারও হাফেজ নই। তবে আমি বেদের সেই অনুচ্ছেদগুলো জানি যেগুলো দাওয়ার কাজে লাগে। বাইবেলেরও সেই অনুচ্ছেদগুলো জানি যেগুলো মিশনারীরা বলে। ভাবতে পারেন আমি মিশনারীদের চাইতেও বেশি জানি। ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আমি জানি।

আমি আসলে এই কৌশলটা শিখেছি শেখ আহমদিনেজাদের কাছ থেকে মাশাআল্লাহ। তিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করুন। তিনি হাজারও মুসলিম তরুণকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এমনকি আমাকেও। তাই আপনি সময় নষ্ট করবেন না। তবে আপনি সেই অনুচ্ছেদগুলো পড়বেন যেগুলো দাওয়ার কাজে লাগবে। আর তাদের কাছে বলবেন ইসলাম ধর্মের বাণী কোরআন যে বলেছে আমাদের সাদৃশ্যের কথা تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ এভাবে আপনি কাজ করলে ইনশাআল্লাহ আপনি সহজে ইসলামের বাণী প্রচার করতে পারবেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৬৭। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম শাকিল আহমেদ। আমার প্রশ্নটা হল- দয়া করে বলবেন আপনাদের টিভি চ্যানেলে কি পরিমাণ টাকা ইনভেস্ট করা উচিত?

উত্তর ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, আপনি কত টাকা দিবেন? পিস টিভি চালাতে গেলে কত টাকা ইনভেস্ট করবেন? তখন সময়ের অভাবে গড চ্যানেল সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে পারি নি। লেকচারে যখন আমি গড চ্যানেল সম্পর্কে বলছিলাম তখন আমি সংক্ষেপে বলছিলাম এই গড চ্যানেল হল খ্রিস্টান চ্যানেলগুলোর সবচেয়ে জনপ্রিয় চ্যানেল। এরা প্রচার করে আপনি যদি এক পাউন্ড দেন প্রতি বছর সেটা দিয়ে তারা পাঁচটি ভাষায় গড চ্যানেলের অনুষ্ঠানগুলো প্রচার করবে। তার মানে আপনি যদি বিশ পাউন্ড দেন। তাহলে কথাটি দাঁড়ায় প্রতি বছর এক হাজার ভাষায় প্রচার করবে আপনি যদি দেন দুইশ পাউন্ড তাহলে প্রতি বছর এক হাজার ভাষায় প্রচার করবে। যদি আপনি এক হাজার ডলার দেন তাহলে তারা পাঁচ হাজার ভাষায় প্রচার করবে। এভাবে তারা প্রচার করে। আর গড চ্যানেল ভালভাবেই চলছে।

এখন পিস টিভির কথা যদি বলতে হয় মুসলিমরা এক সাথে এমন অনেক কাজ করে যেখানে তারা টাকা ইনভেস্ট করে, তারপর সেখানে তারা লাভ করে এবং লাভের টাকা ভাগাভাগি করে নেয়। তবে পিস টিভির কথা যদি বলি এই চ্যানেলটা কোন কমার্শিয়াল না। আপনারা কিছু দিবেন সেটার প্রতিদান পাবেন আখেরাতে। ইনশাআল্লাহ কয়েক গুণ বেশি। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ২৬১ নং আয়াতে বলেছেন –

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ـ

অর্থ : 'যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্য বীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে রয়েছে একশত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন।'

তার মানে শত গুণ বেশি লাভ। ব্যবসার ভাষায় বললে ৭০,০০০% লাভে। আল্লাহ তায়ালা এখানে আরো বলেছেন তিনি বেশিও দিতে পারেন। তাহলে আপনারা যারা সাহায্য করবেন, ইনশাআল্লাহ আখেরাতে আরো বেশি পাবেন। আপনারা যাই দেন সবাইকে স্বাগতম জানাই। আল্লাহ এটা দেখবেন না যে আপনি কত দিয়েছেন? তিনি দেখবেন আপনি কত পারসেন্ট দিয়েছেন। একজন ধনী লোক যদি আমাকে অনেক টাকা দেয় এবং এক লক্ষ ডলার বা এক মিলিয়ন ডলার। এই ধনী লোকের

কাছে হয়তো তার এই টাকাটা তার সম্পদের এক পারসেন্টেরও কম। কোন গরিব লোক দশ ডলার দিল। যেটা তার সম্পদের অর্ধেক। তাহলে সে বেশি সাওয়াব পাবে। আমাদের চ্যানেলটা চলবে আসলে আল্লাহর সাহায্যে। আমি যদি নাও দেই। আমি কিন্তু নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করি না। বিশ্বাস করুন আমি তোতলা ছিলাম। যারা আমাকে ছোট বেলা থেকে চিনেন তারাও জানেন আমি তোতলা ছিলাম। কেউ জিজ্ঞেস করলে তোমার নাম কি? আমি বলতাম জা জা জাকির। এ অবস্থা ছিল। আমি অবশ্য মুসা নবীর দোয়াটা পড়ি। তিনি তোতলা ছিলেন।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ـ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ـ

অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।' (সূরা তাহা : ২৫ আয়াত)

তাই আল্লাহই সাহায্য করবেন। আমি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবি না। তাই এখানেও আসলে আমাদের আল্লাহর সাহায্য দরকার। আল্লাহ বিভিন্ন উপায়ে তার বান্দাকে সাহায্য করেন; আপনারা যত টাকা দেন না কেন? এখানে আমি আবারও বলব আল্লাহ সেটার পারসেন্টিস দেখেন। আমি আপনাদের বলব। আপনারা টাকার পরিমাণ দেখবেন না। আপনি ঠিক করবেন যে, ইনশাআল্লাহ যাকাত দেই তার পাশাপাশি আমার প্রতিমাসের ইনকামের ২০% দিব পিস টিভিকে। ২৫%, ২০%, ৩০%। কেউ যদি গরিব হয়ে থাকে সে হয়ত বলবে যে আমি সম্পত্তি দিয়ে দিব ২০%, সেটার পরিমাণ হতে পারে ১০০ ডলার। কিন্তু সে বিলিয়নার হলে সেই ২০% হতে পারে বিলিয়ন ডলার, তখন তার হার্ট ঠিক ঠিক এত টাকা দিয়ে দেব। কিন্তু ভুলে যাচ্ছে যে, কুফরী করার জন্য আপনার কাছে আরো ৮০% আছে। একজন ভাল ব্যবসায়ী এই পার্সেন্টিস বাড়াবে।

তাই আমি ধনী লোকদের সব সময় বলি, যখন আপনি দান করেছেন। তখন আপনার ইনকামের একটা পার্সেন্টিস সেখানে দান করুন। এটা করলে আখিরাতে আপনাদের জন্য সুসংবাদ থাকবে। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কখনই ঠকাবেন না। আপনি সেরা পুরস্কারটাই পাবেন। তাই আপনারাই ঠিক করুন ২০%, ২৫%, ৩০% যত ইনকাম করব, তার এত পার্সেন্টিস যাকাতের পাশাপাশি আল্লাহর পথে খরচ করব। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে প্রতিদান দেবেন এই জীবনে এবং আখিরাতে। আশা করি উত্তরটা পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৬৮। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম রিয়াজ আহমেদ। সেলস এন্ড মার্কেটিং এর চাকরি করি। আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা হল, আমরা সবাই এটা জানি যে পশ্চিমা মিডিয়ায় ইসলাম আর মুসলিম সম্পর্কে অনেক ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে। আমরা এটা সবাই জানি। তবে এটার চাইতেও খারাপ ব্যাপার হল, কিছু মুসলিম দেশেও আমরা দেখি, এমনকি এই মধ্যপ্রাচ্যেও আমরা এমনটা দেখি। এখানকার মিডিয়াতেও একই কথা বলা হচ্ছে। এখানেও মুসলিমদেরকে টেররিস্ট বলা হচ্ছে। হরহামেশা মুসলিমদেরকে কেন এই অপবাদ দেয়া হচ্ছে?

উত্তর ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, মিডিয়ায় ইসলামকে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে কেন? দূর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু মুসলিম দেশে তাদের চ্যানেল ও শব্দ ব্যবহার করছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সেই সব মুসলিমদের প্রশ্ন করুন। আমাকে না। সেইগুলোকে জিজ্ঞেস করুন। আর কিছু মুসলিম এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে ভালভাবে জানে না বলে এই অভিযোগগুলো মেনে নেয়। যেমন ধরুন, এক মুসলিম আমাকে একবার বলেছিল তালেবানরা খারাপ। আসলে তিনি কিন্তু তালেবানদের শত্রু ছিলেন না। তাই মাঝে মধ্যে এখন মিডিয়া অনুষ্ঠানের মাঝে এতটা আচ্ছন্ন করে রাখে আমরা যা শুনি, আমরা যা দেখি তার সবকিছুই বিশ্বাস করি।

তাই একজন মুসলিম হিসেবে আমরা যেটা করব আমরা সেইসব মুসলিমদের ভুল ধারণাগুলো ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করব। পাশাপাশি মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ জানাব। আর ইনশাআল্লাহ আমরা যুক্তি দিয়ে কথা বলব। এমন কথা বলব না যে আমরাই ঠিক বলছি। আমরা যুক্তি দিয়ে বুঝাব যে, ইসলাম হল সত্যের ধর্ম, ইসলাম হল শান্তির ধর্ম। আর শুধু ইসলামের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ইসলাম ছাড়া আর কোন পথ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ অর্থাৎ আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হল ইসলাম। যার অর্থ নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে শান্তি অর্জন করা।

প্রশ্ন ঃ ১৬৯। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম আমিনুল্লাহ শরীফ। আমি পেশায় একজন একাউনটেন্ট। আমি গর্বিত যে, আমরা স্বদেশী, ইন্ডিয়া থেকে এসেছি। জিহাদের ওপর আপনার লেকচারটা খুবই সুন্দর। আর শিক্ষণীয় ছিল। আমার প্রশ্নটা হল আমার ধারণা এখানের বেশির ভাগ লোকই এমনটা মনে করেন যে, উসামা বিন লাদেন আসলেই জিহাদ করেছেন। আমার অনেক সহকর্মী আর অন্যান্য লোকজন তারা প্রশ্ন করে যে, এটা আসলে জিহাদ কিনা? এখন এসব ব্যাপারে আমরা জানি না।

তাহলে তাদেরকে কিভাবে বুঝাব। আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হল– এটা যদি জিহাদ না হয় তাহলে এটাকে কি বলা যায়? ইসলাম এ ব্যাপারে কি বলে?

উত্তর ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, উসামা বিন লাদেন জিহাদ করেছে কিনা? ভাই উনার সাথে আমার কখনও দেখা হয় নি। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাকে চিনিও না। সিএনএন আর বিবিসি এর খবরের ওপর ভিত্তি করে আমি উত্তরটা দিতে পারব না। সেজন্য কোন মন্তব্য করব না। আমার সাথে কখনও তার দেখা হয় নি। অনেক খবরই জানি। অনেকের সাথে দেখা হয় নি। জর্জ ডব্লিউ বুশের সাথেও কখনও দেখা হয় নি। কিন্তু সিএনএন এর খবর দেখেছি। খবরগুলো বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারছি, তারা যে খবরটা দেখাচ্ছে সেটা সঠিক। তবে একথাটা বলতে পারি আমি জিহাদ করছি। আলহামদুলিল্লাহ। আমি জিহাদ করছি। আমি সংগ্রাম করছি। জিহাদ অর্থ সংগ্রাম করা, চেষ্টা করা। আমি আমেরিকান পুলিশদেরও একই কথা বলেছিলাম যে, আমি জিহাদ করছি, আমি সংগ্রাম করছি। সে জিহাদ করছে কিনা সেটা আমি জানি না। তার সাথে কখনও দেখা হয় নি। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রশ্ন করবেন না যে, উসামা বিন লাদেন জিহাদ করেছে কিনা?

প্রশ্ন ঃ ১৭০। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আমার নাম ড. ফেরদৌস। আমার প্রশ্নটা হল– রাসূল ﷺ-এর হাদীস থেকে আমরা দাজ্জালের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারি। এমন বেশ কিছু হাদীস আমাদের বলে যে, দাজ্জাল পৃথিবীর সব বাড়িতেই যাবে। সে তোমাকে এমন পানি দেখাবে, যেটা পান করতে পারবে না। এমন আগুন দেখাবে যেটাতে তুমি পুড়বে না। আমরা কি টেলিভিশনকে এমন একটা দাজ্জাল বলতে পারি না?

উত্তর ঃ আপনি প্রশ্ন করলেন যে, একটা সহীহ হাদিসে দাজ্জালের কথা বলা হয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন, আর আপনিও একথা বললেন যে, কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন, এই টেলিভিশনখানা আদ দাজ্জাল, এক চোখের দাজ্জাল। Screen হল এর একটা চোখ। তাই টিভি দাজ্জাল। এখন এই টিভিকে দাজ্জাল বলা যায় কিনা? আমরা আসলে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে টিভিই হল দাজ্জাল। এখানে আমি কি করতে পারি?

আমাদের নবীজি ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াবে কোন ফাঁকা জায়গা রেখো না। ফাঁকা জায়গা পূরণ করো। যাতে করে শয়তান সেখানে দাঁড়াতে না পারে। সহীহ বুখারী শরীফের ১ম খণ্ডের কিতাবুল আযান-এর ৭৫ নং অধ্যায়ের ৬৯২ নং হাদীস। এই হাদীসটা ছাড়াও আছে সেটা সুনানে আবু দাউদ ১ম খণ্ড কিতাবুস সালাত ২৪৫ নং অধ্যায়ের হাদীস নং ৬৬৬। যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াবে, কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াও। ফাঁকা জায়গা পূরণ কর। যাতে শয়তান

ঢুকতে না পারে। যদি আপনি মনে করেও থাকেন টিভি একটা দাজ্জাল, তাহলে সে দাজ্জালকে মুসলিম বানিয়ে নিন। এই মিডিয়ার আকৃতি পাল্টে দিয়ে। এটা দিয়ে ইসলাম প্রচার করা শুরু করে দিন। এমন কোন প্রমাণ নেই যে টিভি একটা দাজ্জাল। তবে আপনি যদি টিভি দাজ্জাল মনে করেও থাকেন, তাহলে আমরা কি করব? আমরা এই মিডিয়াকে ব্যবহার করব সত্য প্রচারের কাজে। যাতে করে আল্লাহ তায়ালার কাছে আমরা বলতে পারি যে আমরা ইসলাম প্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এই পৃথিবীতে ইসলামের বাণী ছড়ানোর চেষ্টা করেছি। পুরো মানবজাতির জন্য।

প্রশ্ন ১৭১। ডা. আবু বকর তাহের ঃ ১৯৯৩ সালের Riot-এর সময় যারা ইসলামের লেবেল লাগাতো তাদেরকে খুঁজে বের করে মেরে ফেলা হত। সুতরাং যে অবস্থায় ইসলামের লেবেল লাগালে জীবনের ঝুঁকি থাকে ঐ অবস্থায় ইসলামের লেবেল লাগানো কি উচিত হবে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ সব নিয়মেরই কিছুটা ব্যতিক্রম থাকে। অনুরূপ ইসলামি শরিয়াহও সেই সুযোগ দেয় যে জীবনের ঝুঁকি থাকলে নিয়মের ব্যতিক্রম করা যাবে। যেমন ঃ কোন অমুসলিম যদি কোন মুসলিমের মাথায় বন্দুক ধরে এবং জিজ্ঞেস করে সে কি মুসলিম না অমুসলিম? সেক্ষেত্রে ঐ মুসলিমের জন্য নিজেকে অমুসলিম বলে পরিচয় দেয়া গোনাহ-এর কারণ হবে না। সুতরাং কোন অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় যদি Riot হয়, সেখানে কোন মুসলিম তার জীবন বাঁচাতে নিজের মুসলিম পরিচয় গোপন করতে পারবে এবং ইসলামি লেবেল খুলে ফেলতে পারবে। তবে এ অবস্থায় কেউ যদি নিজের লেবেল না খোলার কারণে নিহত হয়, সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

অর্থ : 'তোমরা মৃত জীবের রক্ত, শূকরের গোশত খাবে না এবং এমন সব জিনিসও খাবে না যার ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারও নাম নেয়া হয়েছে। অবশ্য কেউ যদি খুব বেশি ঠেকা অবস্থায় পড়ে যায়, সে যদি ঐসব জিনিস থেকে কিছু খায়, কিন্তু তার যদি আইন অমান্য করার নিয়ত না থাকে এবং ঠেকা পরিমাণের বেশি না খায়, তাহলে তার কোন গুনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।' (সূরা বাকারা ঃ ১৭৩)

সূরা আনআমের ১৪৫নং, সূরা মায়িদার ৩নং এবং সূরা নাহলের ১১৫নং আয়াতেও একই কথা উল্লিখিত হয়েছে। এ আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, শূকরের গোশত খাওয়া হারাম। কিন্তু কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি এমন স্থানে যায় যেখানে শূকরের গোশত ছাড়া আর কোন খাবার নেই এবং গোশত না খেলে জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে তাহলে সেখানে ততটুকু পরিমাণ শূকরের গোশত খাওয়া যেতে পারে যতটুকু না খেলে একজন বাঁচে না।

সুতরাং এখান থেকে দেখা যায় যে, ইসলামি শরিয়াহ যেসব ক্ষেত্রে জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় সেসব ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ১৭২। আজম নায়ের ঃ কোন অমুসলিমকে কি আসসালামু আলাইকুম বলা যাবে? অথবা, কোন অমুসলিম সালাম দিলে কি তার জবাবে ওয়া আলাইকুমুসসালাম বলা যাবে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ অমুসলিমদের সালামের জবাবের ব্যাপারে কোন কোন বিশেষজ্ঞের মত হচ্ছে, যদি তারা আসসালামু আলাইকুম বলে তবে তাদের সালামের জবাবে বলতে হবে আলাইকুম। তারা তাদের মতের উৎস হিসেবে সহীহ মুসলিমের তৃতীয় খণ্ডের সালাম অধ্যায়ের ৫৩৮০ থেকে ৫৩৯০ পর্যন্ত ১১টি হাদীসকে নিয়েছেন, যেখানে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত আছে। প্রথম দিককার হাদীসগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যদি ইহুদিরা বলে আসসালামু আলাইকুম অর্থাৎ আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হোন। তখন তাদের জবাব নবী করীম ﷺ বলতে বলেছেন, আলাইকুম অর্থাৎ আপনাদের ক্ষেত্রেও সেটাই হোক। অর্থাৎ যদি কোন মুসলিম জেনেশুনে আপনার অকল্যাণ কামনা করে বলে আসসালামু আলাইকুম আপনি তাদের বলবেন আলাইকুম অর্থাৎ আপনারও তাই হোক। ঐ বিশেষজ্ঞগণের অভিমতও এই।

তবে, কোরআনে সূরা নিসায় বলা হয়েছে, 'যখন কেউ তোমাদেরকে সম্মানের সাথে সালাম দেয়, তখন এর চেয়ে আরও ভালভাবে এর জবাব দাও। অথবা, কমপক্ষে ঐভাবেই দাও (যেভাবে সে দিয়েছে)। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের হিসাব নিয়ে থাকেন।' (সূরা নিসা : ৮৬)

সুতরাং কোরআনের এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন অমুসলিমের অভিবাদনের জবাবে অনুরূপভাবে বা তার চেয়ে আরও উত্তমভাবে অভিবাদন জানানো যাবে।

এখন অমুসলিমদের সালাম দেয়ার ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসের বক্তব্য জেনে নেয়া যাক। পবিত্র কোরআনের সূরা মারিয়মে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) তাঁর মুশরিক বাবাকে সালাম দেন এবং আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা চান।

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ـ

অর্থ : 'ইবরাহীম বললেন, আপনাকে সালাম। আমার রবের নিকট আপনার জন্য গুনাহ্ মাফ চাইব। আমার রব আমার ওপর বড়ই মেহেরবান।' (সূরা মারিয়ম-৪৭)

সূরা ত্বো'হার ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে,

فَاْتِيٰهُ فَقُوْلاَ اِنَّا رَسُوْلاَ رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْٓ اِسْرَآئِلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ـ

অর্থ : 'মুসা (আ) এবং হারুন (আ) কে আল্লাহ্ নির্দেশ করলেন, যখন ফেরাউন ও অন্যান্যের কাছে যাবে তারা যেন বলে শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎ পথ অনুসরণ করে।'

এর অনুসরণে আমাদের নবী করীম ﷺ ও অমুসলিমদের কাছে লিখিত চিঠিতে লিখিয়েছিলেন যে, শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎ পথ অনুসরণ করে। আর সূরা ফুরকানের ৬৩নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ـ

অর্থ : 'রাহমানের (আসল) বান্দাহ্ তারাই, যারা জমিনের বুকে নম্র হয়ে চলে। আর জাহিল লোকেরা তাদের সাথে যখন কথা বলে তখন তারা তাদেরকে 'সালাম' দিয়ে (বিদায় করে)।'

সূরা কাসাসের ৫৫ নং আয়াতে আছে,

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ـ

অর্থ : 'যখন তারা (মুসলিম) কোনো বাজে কথা শুনে, তখন এ কথা বলে তা থেকে সরে যায়, আমাদের আমল আমাদের জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য, তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা জাহিলদের মধ্যে শামিল হতে চাই না।'

অর্থাৎ, কোরআন তাদেরকেও সালাম দিতে বলছে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে। সুতরাং অমুসলিমদের সালাম দিলে কোনো সমস্যা নেই। তাফসীর গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, সালাম

একটা অভিবাদন এবং তা অমুসলিমদেরও দেয়া যেতে পারে। সালাম সৌজন্য তারও বহিঃপ্রকাশ।

পূর্বোক্ত সূরা মারিয়মের ৪৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কুরতুবী তাবারীর বরাত দিয়ে তার তাফসীরে বলেছেন যে, এখানে সালাম কথাটার অর্থ হল শান্তি। সুতরাং মুসলিমদের জন্য এটা অনুমতি আছে যে, তারা অমুসলিমদের সালাম দিতে পারবে। নাকামাও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। কুরতুবীর বরাত দিয়ে ওয়াইনা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সূরা মুমতাহিনার ৮নং ও ৪নং আয়াতের উল্লেখ করেন। সূরা মুমতাহিনার ৮নং আয়াতে আছে,

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ـ

অর্থ : 'যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করে নি এবং তোমাদেরকে বাড়িঘর থেকে বের করে দেয় নি, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার ও ইনসাফ করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।'

সূরা মারিয়মের ৪নং আয়াতে এসেছে, 'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে এক সুন্দর আদর্শ আছে...।'

আয়াতদ্বয় থেকে ওয়াইনার ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ইবরাহীম (আ) যদি তার মুশরিক পিতাকে সালাম দিতে পারেন তাহলে মুসলিমদেরও এ অনুমতি আছে যে, তারা অমুসলিমদের সালাম দেবে।

ইবনে মাসউদ (রা)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, অমুসলিমদের সালাম দিয়ে অভিবাদন জানানো যায় কিনা? তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ হ্যাঁ। তিনি নিজে তাঁর সঙ্গীদের সাথে এমনটাই করেছিলেন এবং বলেছিলেন আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি। এছাড়া আবু উসামা (রা)ও অমুসলিমদের সালাম দিতেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিশেষজ্ঞদের এক অংশের মতে সালাম দেয়া যাবে। আমি বিশেষজ্ঞদের এই অংশের সাথে একমত। অর্থাৎ আপনি অমুসলিমদের সালাম দিতে পারবেন এবং অমুসলিমদের সালামের জবাবও অনুরূপ বা তার চেয়েও সুন্দরভাবে দিতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ ১৭৩। জনৈক প্রশ্নকারী ঃ আমরা জানি, টাই খ্রিস্টানদের প্রতীক, মুসলমানদের জন্য টাই পড়ার অনুমতি আছে কি?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ অনেক মুসলিম আছে যাদের ধারণা টাই হল ক্রসের প্রতীক। কিন্তু তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, খ্রিস্টানদের কোন ধর্মগ্রন্থেই বলা নেই যে, টাই ক্রসের প্রতীক।

হাদীস অনুসারে মুসলমানরা এমন কোন পোশাক পরিধান করতে পারবে না যে পোশাক অমুসলিমদের কোন বিশেষ প্রতীকের মত হয়। তবে বাইবেলে কোথাও বলা নেই যে, টাই ক্রসের প্রতীক। বরং এটি একটি কালচারাল পোশাক। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঠাণ্ডা হাওয়ার দেশের লোকেরা টাই পরে তাদের পোশাক আটকে রাখত এবং সেখান থেকেই টাইয়ের উদ্ভব হয়।

একদল মুসলিম আছেন যারা পশ্চিমা কালচার পছন্দ করেন না এবং পশ্চিমাদের সবকিছুতেই প্রতিবাদ করেন। তবে আমার মতে আমাদের উচিত পশ্চিমাদের যে কাজগুলো খারাপ সেগুলোর প্রতিবাদ করা এবং যেগুলো ভালো সেগুলো গ্রহণ করা। যেগুলো নিরপেক্ষ সেগুলোতে প্রতিবাদ করার দরকার নেই। কেউ যদি প্রমাণ সহকারে এটা উপস্থাপন করতে পারে যে, টাই ক্রসের প্রতীক। তাহলে সেটা পরিধান করা যাবে না। শরিয়ত মুসলমানদের এ অনুমতি দিয়েছে যে, মুসলিমরা সে পোশাক পরতে পারবে না, শরিয়তের সীমার বাইরে যায় না। কিন্তু যেগুলো ইসলামি শরিয়তের বিপরীতে যায় সেগুলো পরা যাবে না। যেমন ঃ হাফপ্যান্ট, শর্টস ইত্যাদি। এগুলো যদিও পশ্চিমা সংস্কৃতির পোশাক, কিন্তু শরিয়তের সীমালঙ্ঘন হওয়ায় এগুলো পরার অনুমতি নেই।

খ্রিস্টানরা গাড়ি আবিষ্কার করেছিল। তাই বলে কি আমরা তাদের আবিষ্কৃত গাড়িতে চড়ব না?

সুতরাং টাই পরার অনুমতি আছে। কারণ, এটা খ্রিস্টানদের ধর্মীয় প্রতীক নয়।

প্রশ্ন ঃ ১৭৪। জনৈক প্রশ্নকারী ঃ কিছু মুসলিম আছে, যারা এ অজুহাতে মাথায় টুপি পরেন না এবং মুখে দাড়ি রাখেন না যে, তাদের হয়ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনৈসলামিক কাজ (যেমন ঃ ঘুষ দেয়া, ঠকানো, মিথ্যা বলা) করতে হতে পারে। তাদের যুক্তি হল এক্ষেত্রে তাদের যদি মুসলিম হিসেবে সনাক্ত করা যায় তাহলে ইসলামেরই বদনাম হবে। এসব ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ মুসলিমদের মধ্যে দু'ধরনের মানুষ দেখা যায়। একদল হতাশাবাদী এবং আরেক দল আশাবাদী। হতাশাবাদীরা সবসময় নেগেটিভলি চিন্তা করে। তারা ইসলামের লেবেল পরতে চায় না এই ভেবে যে, হয়ত কোন সময় তাদের অনৈসলামিক কাজ করতে হতে পারে, যেমন ঃ ঘুষ খাওয়া, কাউকে ঠকানো, মিথ্যে বলা। কারণ, তারা ইসলামের বদনাম ছড়াতে চায় না। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, ইসলামি লেবেল লাগানোর কারণে কোন ব্যক্তির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজের লেবেলের দিকে খেয়াল করে উক্ত অনৈসলামিক কাজগুলো থেকে বিরত থাকবে। এতে করে সে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন উপকার

থেকে হয়ত বঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু পরকালে এর বিনিময় পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। পবিত্র কোরআনে সূরা ইসরার ৮১নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ـ

অর্থ : 'সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত। সত্যের সামনে মিথ্যা বিলুপ্ত হতে বাধ্য।'

সুতরাং আমাদের আশাবাদী হওয়া উচিত। যেসব ব্যক্তি আশংকা করেন যে, তাদের অনৈসলামিক কাজ করতে হতে পারে এবং এ অবস্থায় তাদের ইসলামি লেবেল থাকলে ইসলামেরই বদনাম হবে, তাদের উচিত হতাশাবাদী না হয়ে আশাবাদী হওয়া। সেক্ষেত্রে তারা আরও ভাল মুসলিম হতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ ১৭৫। ফুরকান আহমেদ ঃ আমি একটি কোম্পানিতে চাকরি করি যেখানে হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা বেশি। আমি দেখেছি যেসব মুসলিম দাড়ি রাখে ও টুপি পরে তাদেরকে তারা অন্যভাবে দেখে। ফলে দাড়ি না রাখলে এবং টুপি না পরলে তাদের সাথে মেশা এবং তাদেরকে ইসলাম বুঝানো সহজ হয়। আমি জানতে চাই যে, ইসলাম প্রচারের জন্য মাথায় টুপি এবং দাড়ি কি বাদ দিতে পারি?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

অর্থ : 'মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর হিকমত ও সৎ উপদেশ দ্বারা আর তাদের সাথে তর্ক কর এবং তাদেরকে যুক্তি দেখাও উত্তম ও গ্রহণযোগ্য পন্থায়।'

সুতরাং ইসলামের দাওয়াত হিকমতসহকারে উপস্থাপন করা গেলে টুপি এবং দাড়ি কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না। বরং টুপি পরলে এবং দাড়ি রাখলে অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত পেশ করা সহজ হয়। টুপি পরলে এবং দাড়ি রাখলে দাওয়াত দেয়া কঠিন হয়– এ ধরনের চিন্তাভাবনা ভুল এবং এটি হীনমন্যতার পরিচয় বহন করে। যদি কেউ মানে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম তাহলে তার মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে ভয় পাওয়ার কথা নয়। একদিকে আপনি নিজেই ইসলামের লেবেলগুলো পরিধান করছেন না তথা নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিতে ভয় পাচ্ছেন, অন্যদিকে সেই ইসলামের দিকেই মানুষকে ডাকছেন। এ ধরনের কাজ প্রতারণার শামিল। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, একজন বৃদ্ধ লোক, যার এক পা কবরে চলে গেছে বলা যায়। সে যদি বলে যে, তার কাছে যাদুর পানি আছে, যে পানি খেলে শক্তি বাড়বে, একশত বছর বেশি বাঁচা যাবে এবং এই কথা বলে সে

প্রতি বোতল পানি একশ টাকা দরে বিক্রি করতে চায়, তাহলে আপনি কি সেই পানি কিনবেন? কখনই না। কারণ প্রশ্ন জাগবে যে, ঐ যাদুর পানিতে যদি এতই শক্তি থাকে তাহলে তিনি-ই কেন আগে তা গ্রহণ করছেন না? সুতরাং লোকটি ব্যবসার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলছে।

অতএব, কোন মুসলিম যদি দাড়ি না রাখে এবং টুপি না পরে কিন্তু ইসলামের পক্ষে কথা বলে, তাহলে তো সে বরং ঐ অমুসলিমদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গিকেই সত্য বলে মেনে নিল। বরং সে এক ধরনের প্রতারণা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিল।

মাথায় টুপি পরলে এবং দাড়ি রাখলে নিশ্চয়ই মানুষের স্বভাব বদলায় না। সুতরাং আপনি দাড়ি রাখুন ও মাথায় টুপি দিন এবং হিকমত অবলম্বন করে দাওয়াত দিন, এতে আপনার কাজ আরও সহজ হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন ঃ ১৭৬। জনৈক প্রশ্নকারী মহিলা ঃ হিন্দু কেউ মারা গেলে কি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলা যাবে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ প্রকৃতপক্ষে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন একটি কোরআনের আয়াত। এর অর্থ 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।' মুসলিমদের সাথে সাথে অমুসলিমদের জন্যও এ কথাটা প্রযোজ্য। অমুসলিমরাও আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে এবং তাদেরকেও তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। এমনকি সে যদি মুশরিকও হয় তাহলে এটা প্রযোজ্য। সুতরাং অমুসলিম কেউ মারা গেলে এই দোয়াটা পড়া যাবে। তবে কোন মুশরিক মারা গেলে তাদের জন্য এই বলে দোয়া করা যাবে না যে, 'ও আল্লাহ! তাকে জান্নাতে পাঠিয়ে দাও।' পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ১১৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আল্লাহর শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না।' সুতরাং কেউ মুশরিক অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহর কাছে তার ক্ষমার জন্য দোয়া করা যাবে না। তবে কেউ যদি মুশরিক থেকে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে মারা যায় তাহলে ভিন্ন কথা।

অনেকের ধারণা, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' কেবল কেউ মারা গেলেই পড়তে হয়। এটা একটা ভুল ধারণা। বরং যেকোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেই এ দোয়াটা পড়া যেতে পারে। যেমন ঃ কেউ যদি দূর্ঘটনার শিকার হয়।

প্রশ্ন ঃ ১৭৭। ফিরোজ ঃ কতিপয় মুসলিম মেয়ে আছে যারা বাসা থেকে বোরকা পরে বের হয় এবং কলেজের গেটে এসে বোরকা খুলে ফেলে। তারা জিন্স টিশার্ট ইত্যাদি পরা থাকে। তারা ছেলেদের সাথে সেভাবে মেলামেশা করে এজন্য তাদেরকে বলা হয় খারাপ চরিত্রের মেয়ে। এজন্য কিছু লোক ভাবে যে, যারা বোরকা পরে তারা খারাপ চরিত্রের মেয়ে। আর এ কারণে যারা প্রকৃতপক্ষেই বোরকা পরে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এছাড়াও

এমনও কিছু মেয়ে আছে যারা অমুসলিম, কিন্তু তারা বোরকা পরে বয়ফ্রেন্ডদের সাথে ঘুরে বেড়ানোর সময় নিজেদের লুকানোর জন্য। এ ধরনের মেয়েদের সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ মুসলিম মহিলাদের গায়রে মোহাররম পুরুষ তথা পরপুরুষের সামনে হিজাব পালন করা ফরজ। যদি কোন মেয়ে বোরকা পরে এমন কলেজে যায়, যেটা শুধু মেয়েদের জন্য, সেক্ষেত্রে তারা ভেতরে গিয়ে বোরকা খুলে রাখতে পারে। তবে যেসব কলেজে সহশিক্ষা চলে অর্থাৎ যেখানে ছেলে ও মেয়েরা একসাথে পড়ালেখা করে সেসব কলেজে এ ধরনের কাজ অনুমোদিত নয়। যদি এ ধরনের কাজ করে তার মানে এ নয় যে বোরকাটাই সমস্যা বরং সমস্যা হচ্ছে বোরকা পরিহিতার। সুতরাং এ ধরনের কাজ করলে কোন মুসলিম নারীই আর বোরকা পরবে না এ ধরনের চিন্তাভাবনা অযৌক্তিক।

প্রত্যেক সমাজের ভেতরে কিছু কুলাঙ্গার থাকে, এদের দেখে কেউ যদি ভাবে যে, এরা বোরকা পরেও খারাপ কাজ করছে, অতএব আমি বোরকাই পরব না, এ ধরনের সিদ্ধান্ত হবে একেবারেই ভুল। যেমন ঃ একজন ব্যক্তি গাড়ির দোকানে গিয়েছে গাড়ি ক্রয় করতে। সে মার্সিডিজ বেন্‌জ-এর সর্বশেষ মডেলের একটি গাড়ি দেখে গাড়িটি পরীক্ষা করতে চাইল এবং এমন একজন ড্রাইভারকে গাড়িটির ড্রাইভিং সিটে বসালো যে গাড়ি চালাতে জানে না। এ অবস্থায় ঐ গাড়িটি যদি না চলে, তাহলে কি গাড়ির দোষ হবে নাকি ড্রাইভারের?

সুতরাং কেউ যদি বলে, যে আমি বোরকা পরব না, কারণ কিছু মেয়ে, ছেলেদের সাথে মেলামেশা করে এবং সুযোগ সুবিধা নেয়, এটা ঠিক এমন কথাই হবে যে, ড্রাইভার গাড়ি চালাতে পারে না বলে, মার্সিডিজ একটা বাজে গাড়ি। হিটলার একজন খ্রিস্টান ছিল, সে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে নির্মমভাবে হত্যা করে, তাই বলে কি আমি খ্রিস্টান ধর্মকে ঘৃণা করব? কখনই না। কারণ সে একজন খারাপ দৃষ্টান্ত। সুতরাং যদি কোন মেয়ে এই কাজ করে, সেক্ষেত্রে অন্য মেয়েদের উচিত হবে, এভাবে চিন্তা করা যায় যে, কিছু মেয়ে আছে যারা বোরকা পরে ইসলামের নামে বদনাম ছড়াচ্ছে, সেহেতু আমরাও বোরকা পরব এবং প্রমাণ করে দেব যে, মুসলিম মহিলারা ভাল।

যেসব মেয়েরা না জানার কারণে এ ধরনের আচরণ করছে এবং যাদের চরিত্রগত দুর্বলতা আছে, আমরা তাদের জানাব এবং হিকমতসহকারে তাদের সংশোধন করার চেষ্টা করব।

কতিপয় অমুসলিম আছে যারা বোরকা পরে নিজেদের লুকিয়ে রাখার জন্য। তাদের জন্য হেদায়াতের দোয়া করা উচিত। তারা অনৈতিক কাজ করার জন্য যদি বোরকা পরে তাহলে আমরা তাদের বুঝাতে পারি যে, তাদের নিয়ত ভুল এবং বোরকার

উদ্দেশ্য হল শালীনতা বজায় রাখা কিন্তু তাদের তো এ কথা বলতে পারি না যে বোরকা পরা ভুল। আর মানুষদের কাছে হিজাব পালনের প্রয়োজনীয়তা ও কারণ সম্পর্কে প্রচার করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ ১৭৮। জনৈক নওমুসলিম ঃ ইসলামে ধূমপান এবং পান খাওয়া অনুমোদিত কি না?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ইসলামে ধূমপান অনুমোদিত কি-না এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন ফতোয়া দিয়েছেন। পূর্ববর্তী আলেমরা সে সময়ের জ্ঞানের আলোকে বলেছিলেন, এটা মাকরূহ। এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে বিশেষজ্ঞদের মতামতটাও পরিবর্তিত হয়েছে। কেননা সূরা বাকারার ১৯৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ـ

অর্থ : 'তোমরা তোমাদের নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না।'

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতিবছর ১০ লাখের বেশি মানুষ মারা যায় ধূমপানের কারণে। যারা ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা যায়, তাদের মধ্যে ৯০% হল ধূমপান করার কারণে। যারা ব্রংকাইটিসে মারা যায় তার ৭০%, হৃদরোগের কারণে যারা মারা যায় তার ২০%-এর কারণ হল ধূমপান। এ ধূমপান ধীরে ধীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। সিগারেটের মধ্যে থাকে ক্ষতিকর নিকোটিন এবং টরে। সিগারেট শুধু ধূমপায়ীর ক্ষতি করে না বরং তার প্রতিবেশীরও ক্ষতি করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, চেইন স্মোকারদের স্ত্রীদের ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ, একটিভ স্মোকিং তো ক্ষতিকর বটেই প্যাসিভ স্মোকিং আরও বেশি ক্ষতিকর। প্যাসিভ স্মোকিং-এ ধূমপায়ীর ধোঁয়াটা আরেকজনের ফুসফুসে প্রবেশ করে।

ধূমপান করলে ধূমপায়ীর ঠোঁট, দাঁতের মাড়ি, আঙ্গুল কালো হয়ে যাবে। গলায় ঘা হবে, পেপটিক আলসার হবে, কোষ্ঠকাঠিন্য হবে, যৌনশক্তি কমে যাবে, ক্ষুধা কমে যাবে, স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে। এমনকি স্মৃতি-শক্তিও কমে যাবে। এসব গবেষণার ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে আলেমরা ৪০০-এর বেশি ফতোয়া দিয়েছেন যে, ধূমপান করা হারাম। তাই, এটা কারও ভালো লাগুক বা না লাগুক, ইসলামে এটার অনুমতি নেই।

আর পান খাওয়ার ব্যাপারে কথা হল, পানে তামাক থাকলে তা হারাম এবং তামাক না থাকলে খাওয়ার অনুমতি আছে। অর্থাৎ ইসলামে যেকোনোভাবে তামাক নেয়াটাই নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন ঃ ১৭৯। যুবায়ের ঃ হাদীস থেকে জানা যায় হুজুর ﷺ-এর দাড়ি এক মুঠোর চেয়ে একটু বড় ছিল। প্রশ্ন হল, দাড়ি কতটুকু রাখতে হবে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আমাদের প্রিয় নবী করীম ﷺ এর নির্দেশ হল পৌত্তলিকরা তথা মুশরিকরা যা করে তার বিপরীত কাজ কর। মুখে দাড়ি রাখ এবং গোঁফ ছোট কর। নবীজির এই নির্দেশ বিস্তারিত জানা যায়, নবী করীম ﷺ এবং সাহাবীদের জীবনী থেকে। বুখারী শরীফের ৭ নং খণ্ডের পোশাক অধ্যায়ে (৬০নং অধ্যায়) ৭৮০ নং হাদীসে বলা হয়েছে, 'নাফি (রা) ইবনে ওমর (রা)-কে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, পৌত্তলিকরা যা করে তার বিপরীত কর, মুখে দাড়ি রাখ আর গোফকে ছোট করে রাখ।'

এছাড়া আরও বলা হয়েছে, ইবনে ওমর (রা) হজ ও ওমরার পরে হাতের মুঠো দিয়ে দাড়ি ধরে নিচের অংশটুকু কেটে ফেলতেন। আর সাহাবিগণই জানতেন নবীজি ﷺ কি চাচ্ছেন? সুতরাং কেউ সাহাবিগণকে অনুসরণ করেন সেটা উত্তম।

এখান থেকে জানা গেল যে, দাড়ি বড় করলেও একটা সীমা আছে। আর তা হল মুঠোর নিচেরটুকু কেটে ফেলতে হবে। এমন দশটিরও বেশি হাদীস আছে, যেখানে বলা আছে যে, সাহাবিগণ এভাবে দাড়ি রাখতেন।

বুখারী শরীফের ৭নং খণ্ডের পোশাক অধ্যায়ের (৬০নং) ৭৮০ নং হাদীসে আছে, 'ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা দাড়ি রাখ এবং গোঁফ ছোট করে রাখ।'

এসব হাদীস থেকে দেখা যায় যে, দাড়ি রাখা হল প্রথম শর্ত এটা ফরজ। এরপর অধিক তাকওয়া অর্জন করতে চাইলে সাহাবীদের অনুসরণে দাড়ি রাখতে হবে। এছাড়াও গোঁফ ছোট করতে হবে। সহীহ হাদীসের গ্রন্থাবলি অনুসারে সাহাবীরা এমনভাবে গোঁফ ছোট করতেন যেন ওপরের ঠোঁটের চামড়া দেখা যায়। তাকওয়া বেশি অর্জন করতে চাইলে আরও ছোট করা যাবে। আর গোঁফ বড় করলে কোন কিছু খাওয়া বা পান করার সময় গোঁফ লাগতে পারে, যেটা অস্বাস্থ্যকর।

অতএব, প্রথমে মুখে দাড়ি রাখতে হবে এবং গোঁফ ছোট করতে হবে।

প্রশ্ন ১৮০। জনৈক প্রশ্নকারী ঃ বাবা, ভাই বা স্বামীর পক্ষে এ অনুমতি আছে কি যে, মেয়ে, বোন বা স্ত্রীকে পর্দা করতে বাধ্য করবে, যদি তারা পর্দা করতে না চায়?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হল, নিকট আত্মীয়দের মধ্যে ইস্‌লাহ তথা সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো। প্রথমত, হিকমাহ দিয়ে বোঝানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে, তাদেরকে কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে, যুক্তি

দিয়ে বোঝাতে হবে যে, হিজাব পালন করা উচিত। এ পদ্ধতিতে যদি কাজ না হয়, বাধ্য বা জোর করা যেতে পারে। যেমন ঃ পিতা কন্যাকে বলতে পারে যে, হিজাব না পরলে কলেজে যাওয়ার টাকা দেব না। এভাবে অর্থনৈতিকভাবে বাধ্য করা যেতে পারে।

ফরজ কাজের ব্যাপারে জোর করার অনুমতি আছে তবে এক্ষেত্রে সীমাও আছে। যেমন ঃ নামাজ পড়া ফরজ। এটার ব্যাপারে সীমার মধ্যে থেকে জোর খাটানো যেতে পারে। একইভাবে হিজাবের ব্যাপারেও স্বামী স্ত্রীকে বলতে পারে যে, আমি তোমাকে ওটা দেব না কারণ তুমি হিজাব পালন কর না। তবে বাধ্য করার পূর্বে অবশ্যই হিকমত ও সদুপদেশ দিয়ে বুঝাতে হবে। এরপরও কাজ না হলে সীমার মধ্যে থেকে বাধ্য করার অনুমতি আছে।

অনেকের ধারণা, স্বামী শুধু স্ত্রীর ব্যাপারে জোর খাটাতে পারে। স্ত্রী কেন স্বামীর ওপর জোর খাটাতে পারবে না? স্ত্রীদেরও উচিত স্বামীদের ওপর জোর প্রয়োগ করা যেন তারা ভাল মুসলিম হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে একজন ভুল পথে থাকলে অপরজনের সে ভুলটা ভাঙ্গতে হবে। কারণ, পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ -

অর্থ : 'তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।'

অর্থাৎ স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের পোশাক বা পরিচ্ছদের মত। তাই এটা দেখতে হবে যেন দু'জনেই সীরাতুল মুস্তাকিমের পথে থাকে।

প্রশ্ন ঃ ১৮১। সৈয়দ সাহাব আলী ঃ টুপি পরা ও দাড়ি রাখার বৈজ্ঞানিক উপকারিতা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ টুপি পরার একটি উপকারিতা হল, আপনি সানবার্ন থেকে রক্ষা পাবেন। এছাড়াও শিশির বা বৃষ্টির পানি আপনার মাথায় পরবে না; এতে আপনি ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাবেন।

দাড়ির উপকারিতা হল, যারা দাড়ি রাখে তাদের শরীরের উপরের অংশে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। যেমন ঃ ফুসফুসের ইনফেকশন, গলার ঘা ইত্যাদি। তবে দাড়ি রাখলে তা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। সুতরাং যে দাড়ি রাখে এবং দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে গিয়ে পাঁচ বার ওযু করে তাদের শরীরের উপরের অংশে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এছাড়াও দাড়ি রাখলে মুখের চামড়ায় ক্যান্সার হয় না।

প্রশ্ন ঃ ১৮২। মোঃ রফিক ঃ প্যান্ট গোড়ালির উপরে পরা কি আবশ্যক? আর এটা কি একটা লেবেল?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ সহীহ্ বুখারীর ৭নং খণ্ডের পোশাক অধ্যায়ের (৪নং অধ্যায়) ৬৭৮ নং হাদীসে বলা হয়েছে, আমাদের নবীজি বলেছেন যে, পুরুষদের প্যান্টের যে অংশ গোড়ালির নিচে ঝুলানো থাকে, সে অংশটা দোযখে যাবে। এছাড়া একই গ্রন্থের ৫নং অধ্যায়ের ৬৭৯-৬৮৩ পর্যন্ত হাদীসগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করে, যার প্যান্ট টাখনুর নিচে মাটিতে ঝুলানো থাকে আল্লাহ্ তাকে অভিশাপ দেবেন।

সুতরাং আমাদের নবী করীম ﷺ-এর কথা অনুযায়ী গোড়ালির নিচে যায় এমন প্যান্ট পরা যাবে না।

এখন প্রশ্ন হল এটা লেবেল কি– না? উত্তর হল, এটা লেবেলের-ই অংশ। তবে তা টুপি অথবা দাড়ির মত স্পষ্ট লেবেল না, কারণ প্যান্টের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকি না। সুতরাং যাদের খোদাভীতি বেশি এবং যারা নবী করীম ﷺ-এর অনুসরণ করতে চান, তাদের উচিত গোড়ালির উপরে প্যান্ট পরা।

প্রশ্ন ১৮৩। জনৈক মহিলা ঃ অমুসলিম কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার নাম বদলানো কি বাধ্যতামূলক?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ লেকচারে বলা হয়েছিল যে, নবী করীম ﷺ কারও পদবী বদলাতে বলেন নি। কারণ পদবীতে তাদের বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। সে কোন অঞ্চল থেকে এসেছে তাও বুঝা যায়। আর নামের ক্ষেত্রে, নামের প্রথম অংশে যদি শিরক করার মত কিছু থাকে তাহলে তার নামটা বদলানো উচিত। যেমন ঃ কারও নাম রাম বা লক্ষ্মণ। এ নামের দেবতাগুলোকে অমুসলিমরা পূজা করে। এর মধ্যে শিরকের উপাদান আছে। সুতরাং এ নামগুলো থাকলে তা বদলানো উচিত। এ শর্ত ছাড়া পূর্ববর্তী নামটা রাখাও যেতে পারে আবার বদলানোও যেতে পারে।

আমাদের নবী করীম ﷺ কোন কোন ক্ষেত্রে নাম বদলান নি; কিন্তু নামে শিরকের উপাদান থাকলে তা বদলে দিয়েছেন। বিখ্যাত সাহাবি হযরত আবু হুরায়রার নাম ছিল আবদে শামস ও আব্দুল উয্যা। রাসূল ﷺ তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন আব্দুর রহমান। আসওয়াদ নাম বদলিয়ে আবইয়ায রাখেন। অনুরূপ আবুল হারেস, বাররা আছিয়াহ নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম দিলেন। সুতরাং মুসলমান হলে ইসলামি নাম হওয়া আবশ্যিক।

প্রশ্ন ঃ ১৮৪। আরবি না বুঝেও নামাযে কেন তা ব্যবহার করা হয়? আমরা কি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতে পারি না? ওয়াহিদা খান– বি.এড

উত্তর : কেন আপনি প্রশ্ন করলেন যে, বেশির ভাগ মুসলিমই আরবি ভাষা বুঝতে পারেন না। এটা করলে কেমন হয়, আমরা প্রত্যেক এলাকায় সালাত নিজস্ব ভাষায় পড়ব। আমি তর্কের খাতিরে আপনার কথাটা মেনে নিলাম যে, আমরা স্থানীয় ভাষায় সালাত আদায় করব। তাহলে মুম্বাইতে কিছু লোক বলবে, আসুন আমরা ইংরেজিতে পড়ি। কেউ হয়ত বলবে উর্দুতে, কিছু লোক বলবে হিন্দি, কেউ হয়তো বলবে গুজরাটি, তখন সেখানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এ সমস্যার সমাধান যদি করি, কেউ হয়তো বলবে, চলুন, এক নম্বর মসজিদে যাই। সেখানে ইংরেজিতে নামায পড়ব, দুই নম্বর মসজিদে উর্দুতে, তিন নম্বর মসজিদে হিন্দিতে, চার নম্বর মসজিদে গুজরাটি আর এভাবেই চলতে থাকবে। তারপরও সেখানে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা চলতে থাকবে। কেউ বলবে আমরা এক নম্বর মসজিদে ইংরেজিতে সালাত আদায় করব। আমরা সেখানে আল্লামা হযরত ইউসুফ আলী আবদুল্লাহর অনুবাদে পড়ব। কেউ বলবে, আমরা পিকটেল-এর অনুবাদ পড়ব, কেউ বলবে আল্লামা আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী, আর কেউ বলবে মহসিন খান-এর অনুবাদ পড়ব। তাহলে আবারও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। যদি এটাও মেনে নিই যে, আমরা একটা অনুবাদ পড়ব, তবুও সেই অনুবাদটা হলো মানুষের করা অনুবাদ। এটা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ও নবী করীম ﷺ -এর কথাকে প্রতিস্থাপন করতে পারবে না। আর এ অনুবাদে অনেক ভুল থাকতে পারে। আর যদি ভুল থাকে তাহলে বলা হবে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ভুল করেছেন।

যেমন ধরুন আপনি যদি দুই নম্বর মসজিদে সালাত আদায় করেন, সেখানে উর্দুতে পড়া হয়। আর ধরুন ইমাম যেখানে সূরা লুকমানের ৩৪ নম্বর আয়াত থেকে তিলাওয়াত করল। আর যদি উর্দু অনুবাদ পড়া হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানেনা মায়ের গর্ভের সন্তানের লিঙ্গটা কী হবে? যদি আরবিতে কুরআন শরীফ পড়েন লিঙ্গ শব্দটা কুরআনের কোথাও নেই। উর্দুতে অনুবাদ করার সময় বেশির ভাগ অনুবাদক এভাবেই করেছেন। আর যদি কোনো ডাক্তার সালাত আদায় করেন তিনি ভাববেন এটা কোন ধরনের কথা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না আমাদের গর্ভের সন্তানের লিঙ্গটা কী হবে এখনতো আলট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে আমরা আগে থেকেই বুঝতে পারি সন্তানের লিঙ্গ কি হবে। তাই সে কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে। আর সেজন্যে আপনি অনুবাদটা পড়তে পারবেন না। কারণ আপনি যদি কুরআনের ভুল অনুবাদ করেন, সেটা বলা হবে আল্লাহ তাআলা ভুল করেছেন। অথবা কোনো হাদীসে বলা হবে নবী করীম ﷺ ভুল করেছেন। আর আপনি অনুবাদের মাঝে কখনো পূর্ণাঙ্গ অর্থ পাবেন না যাতে করে মনোযোগ দিতে পারেন। যেমন ধরুন, আমি প্রায়ই বিভিন্ন দেশে

যাই, আমি যদি ফ্রান্সে যাই। আপনার কথানুযায়ী সেখানে নামায পড়া হবে ফ্রেঞ্চ অর্থাৎ ফরাসি ভাষায়। যদি সালাত আদায় করা হয় ফ্রেঞ্চ ভাষায় তাহলে সেখানে আযানও দেয়া হবে ফ্রেঞ্চ ভাষায়। আর ফ্রেঞ্চ ভাষায় আযান দেয়া হলে আমি হয়তো ভাববো সে কাউকে অভিশাপ দিচ্ছে। আমি যদি মসজিদে যাই, আর ইমাম যদি ফ্রেঞ্চ ভাষায় সালাত পড়ান তাহলে বুঝতে পারবো না তিনি কি আল্লাহর প্রশংসা করেছেন, নাকি গল্প করেছেন। আর সালাত যদি আরবিতে হয় আমি যদি ভারতীয় হই তাহলে বুঝতে পারবো তিনি কী পড়াচ্ছেন।

আর আরবিতে আযান পৃথিবীর সকল মুসলমানের জন্যে জাতীয় সঙ্গীত। তাই যে কোনো ভাষার লোক পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় থাকুক না কেন আরবিতে আযান দিলে সে বুঝতে পারবে। কারণ এটা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। প্রিয় বোন এজন্যে সবচেয়ে ভালো উপদেশ হলো আমাদের পবিত্র কুরআনের ভাষাটা শিখতে হবে। যদি আমরা আরবিটা নাও বুঝি, তাহলেও অন্তত কুরআনের অর্থটা বুঝতে হবে। যে ভাষাটা আপনি সবচেয়ে ভালো বোঝেন সে ভাষায় কুরআনের অনুবাদটা পড়ুন। তাহলে আপনি সালাত আদায়ের উপকারিতা পাবেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৮৫। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম রফিক। আমি একজন ব্যবসায়ী। অনেক অমুসলিম বলে যে, ইসলাম যখন মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে, তখন মুসলমানরা কেন কা'বার সামনে নতজানু হয়?

উত্তর : ভাই আপনি বললেন, আমরা কা'বা শরীফের কাছে মাথা নোয়াই। যার অর্থ আমরাই সবচেয়ে বড় মূর্তিপূজারি। ভাই আমরা মুসলমানরা মাথা নোয়াই কা'বা শরীফের দিকে। কারণ, কা'বা আমাদের কিবলা বা দিকনির্দেশনা। আমরা কিন্তু কা'বাকে উপাসনা করি না। সালাতের সময় আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করি না। ইসলাম ধর্মে আমরা এক কথায় বিশ্বাস করি। ধরুন, এখন মুসলিমরা সালাত আদায় করবে। কেউ বলবে উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়াই, কেউ বলবে দক্ষিণে, কেউ বলবে পূর্বে, আবার কেউ বা বলবে পশ্চিম দিকে, তাহলে আমরা কোন দিকে মুখ করে দাঁড়াবো? তাই আল্লাহ পৃথিবীর সকল মুসলমানদের কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। যদি আপনি থাকেন পশ্চিমে তাহলে পূর্বদিকে ফিরে দাঁড়াবেন, যদি থাকেন পূর্বদিকে তাহলে পশ্চিমে ফিরে দাঁড়াবেন, যদি দক্ষিণে থাকেন তাহলে উত্তরে ফিরে দাঁড়াবেন, যদি উত্তরে থাকেন, তাহলে দক্ষিণে ফিরে দাঁড়াবেন (অর্থাৎ কা'বার দিকে)। সব মুসলিম একতার জন্যে কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। আর ইতিহাসে মুসলিমরাই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র এঁকেছিল। যখন মানচিত্রটি আঁকা হয় সেখানে দক্ষিণ মেরু ছিল উপরে আর উত্তর মেরু ছিল নিচে। আলহামদুলিল্লাহ কা'বা অর্থাৎ মক্কা শরীফ ছিল কেন্দ্রে।

পরবর্তীতে পশ্চিমীরা এসে এ মানচিত্রটা দিল পাল্টে। উত্তর মেরু উপরে আর দক্ষিণ মেরু নিচে। আলহামদুলিল্লাহ্ কা'বা শরীফ এখনো কেন্দ্রবিন্দুতেই রয়ে গেছে। আর মুসলমানরা যখন হজে যায়, তখন তাওয়াফের সময় কা'বার চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। আর আমরা এর মাধ্যমে বুঝাই যে, সকল বৃত্তেরই একটা কেন্দ্র থাকে। আমরা ইবাদত করি কেবল আল্লাহর, আর কারো নয়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো উত্তর দিয়েছিলেন হযরত উমর (রা)। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। সহীহ্ বুখারীতে আছে হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর সম্পর্কে হযরত উমর (রা) বলেন, 'তুমি কেবল একটি পাথর, আমার উপকারও করতে পারবে না, ক্ষতিও করতে পারবে না। হযরত মোহাম্মদ ﷺ যদি তোমাকে চুমু না দিত। আমি তোমাকে স্পর্শও করতাম না, চুমুও দিতাম না।'

এ হাদীসটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, আমরা কা'বার উপাসনা করি না। আরেকটি উত্তর দিতে পারেন। আমাদের নবীজির সময়ে সাহাবিগণ কা'বা শরীফের ওপরে উঠে আযান দিতেন। আমি তাদের প্রশ্ন করতে চাই, কোনো পূজারি কি তার পূজা করা মূর্তির উপর দাঁড়িয়ে পূজা করে?

প্রশ্ন ঃ ১৮৬। আমার নাম এরশাদ, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ছি। অমুসলিমরা বলে যে, সালাত আসলে এক ধরনের ব্যায়াম ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উত্তরে আপনি কী বলবেন?

উত্তর : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন অমুসলিমরা বলে, সালাত আসলে ব্যায়াম ছাড়া আর কিছু নয়, এর জবাব চেয়েছেন।

সালাত ও ব্যায়ামে একই উপকার ও একই ধরনের দাঁড়ানো, মাথা নিচু করা, আবার ওঠানো ইত্যাদি একই ধরনের মন্তব্য করা যায়। ভাই আসলে সালাত ও জিমন্যাস্টিকের বা ব্যায়ামের মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। সালাতে আমাদের শরীর এবং আত্মার উপকার হয়। ব্যায়ামে আমাদের শরীরের উপকার হতে পারে; কিন্তু আত্মার কোনো উপকার হবে না। সালাতে আপনি মানসিক শান্তি পাবেন, কিন্তু ব্যায়ামে তা পাবেন না। সালাতে আপনি নড়াচড়া করবেন ধীরে ধীরে ঝাঁকি ছাড়া; কিন্তু ব্যায়ামে নড়াচড়া করবেন ঝাঁকি দিয়ে। সালাতের পর অলসতা দূর হয়ে যাবে। ব্যায়ামের পর শরীর অবসন্ন হয়ে যাবে। সালাতের পর আপনার কাজ করতে ইচ্ছা করবে। ব্যায়ামের পর আপনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন, সালাত সব বয়সের মানুষ আদায় করতে পারে; কিন্তু ব্যায়াম সব বয়সের মানুষ পালন করতে পারে না।

সালাতে কোনো টাকা লাগবে না। আর কোনো ভালো জিমন্যাস্টিকে গেলে টাকা দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাবেন। সালাতের জন্যে কোনো যন্ত্রপাতির দরকার নেই। কিন্তু ব্যায়ামের জন্যে প্রয়োজন হয় যন্ত্রপাতি। যেমন প্যারালাল বার, রিং ইত্যাদি। সালাতে সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়। এছাড়াও ভ্রাতৃত্ববোধ ও সংহতি বৃদ্ধি পায়। ব্যায়ামে সামাজিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। সালাত আদায় আপনাকে

ন্যায়পরায়ণতার দিকে উদ্বুদ্ধ করে। ব্যায়ামের মাধ্যমে আপনি উন্নত মানুষ হবেন না। অথবা আপনার ন্যায়নিষ্ঠার উন্নতি হবে না। সালাতের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। যেখানে একটি নিয়ত থাকবে। বাহ্যিকভাবে মিল থাকলেও দুটো এক নয়, সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। আর শত চেষ্টা করেও ব্যায়ামে তা পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন ঃ ১৮৭। আসসালামু আলাইকুম ভাই, আল্লাহ কি আমাদের ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন? এতে তার কী উপকার হবে?

উত্তর : বোন আপনি প্রশ্ন করলেন– আমরা যে ইবাদত করি আল্লাহর তার কী প্রয়োজন অথবা তার উপকারই বা কী? বোন আমরা যখন আল্লাহর প্রশংসা করি অথবা কেউ ধরুন বলল : اَللّٰهُ اَكْبَرُ অর্থাৎ আল্লাহ মহান। এতে করে আল্লাহ্ আরও সর্বশক্তিমান হবেন না। আপনি ১০ লক্ষ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলেন আর নাই বলেন, আল্লাহ সর্বশক্তিমানই থাকবেন। আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা তাঁর উপকারের জন্যে করি না। এটার উত্তর দেয়া আছে সূরা ফাতির-এর ১৫ নম্বর আয়াতে–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاۤءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ .

অর্থ : হে মানবজাতি! তোমরাই তো আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী। তোমাদের প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার। আল্লাহ তাআলা সকল প্রকার অভাব থেকে মুক্ত এবং সমস্ত প্রশংসা তারই জন্য।

আমরা আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহর কোনো উপকার হবে না; বরং আমাদেরই উপকার হবে।

আমাদের জন্যে এটাই স্বাভাবিক আমরা উপদেশ মেনে চলব। আমরা এমন কোনো লোকের উপদেশ মানব না যে অপরিচিত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী নয়। এজন্যে আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি। কারণ, তিনি সর্বশক্তিমান, বুদ্ধিমান, সর্বজ্ঞানী এবং সবার উপরে। আমরা যেন তাঁর নির্দেশগুলো সবসময় মেনে চলি। আর এ কারণেই সূরা ফাতিহায় আছে যা সব সালাতের সময় পড়া হয়।

সূরা আল ফাতিহায় আল্লাহ পাক বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ .

অর্থ : আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করি নিজেদের বুঝাচ্ছি তিনি সর্বশক্তিমান। আমরা তার কাছে সব ধরনের সাহায্য চাই। এরপরে আমরা সূরা ফাতিহার অন্য আয়াত পড়ি।

তাঁর কাছে আমরা সৎ সুন্দর পথ কামনা করি। যেমন কুরআনের ভাষায়–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ

অর্থ : আমরা আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা করি আমাদের উপকারের জন্যে, আর তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। তাঁর বিভিন্ন উপদেশ আমরা চাই।

যেমন ধরুন, কোনো ব্যক্তি হার্টের সমস্যায় আক্রান্ত। এমন সময় কোনো অপরিচিত ব্যক্তি যাকে কেউ চেনে না তার উপদেশ মানবেন, নাকি যিনি বিখ্যাত হার্ট বিশেষজ্ঞ তার পরামর্শ গ্রহণ করবেন। আপনি এখানে বিখ্যাত হার্ট বিশেষজ্ঞ এর কথা গ্রহণ করবেন যিনি একজন ডাক্তার। সেজন্যে আমরা আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা করি যাতে করে আমাদের উপকার হবে। কিন্তু আমরা আল্লাহ্ তাআলার যতই প্রশংসা করি না কেন সেটা যথেষ্ট নয়। সূরা কাহাফের ১০৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ـ

অর্থ : সমুদ্রের পানি যদি দোয়াতের কালি হয়, আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসার কথা লেখার আগেই তা শেষ হয়ে যাবে, যদি এমন আরেকটি সমুদ্রও আনে।

একই ধরনের কথা সূরা লোকমানের ২৭ নং আয়াতে এসেছে –

وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ـ

অর্থ : পৃথিবীর সব বৃক্ষকে যদি কলম বানাও, আর সাত সমুদ্রের সব পানি যদি কালি হয় তারপরও আল্লাহ্ তাআলার কথা লিখে শেষ করা যাবে না।

আপনি যতোই প্রশংসা করুন সেটা আসলে যথেষ্ট নয়। তারপরও আমরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি। কারণ এতে তাঁর কোনো উপকার হবে না। বরং আমাদেরই উপকার হবে। আসুন আমরা তাঁর কথাই মেনে নিই। আমরা যেন صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বা সরল পথের উপর থাকতে পারি।

প্রশ্ন ঃ ১৮৮। আসসালামু আলাইকুম জাকির ভাই, আমার নাম জাহাঙ্গীর, আমি মুসলমান হয়েছি। আমার প্রশ্ন হলো– যদি অফিসের সময়-স্বল্পতার কারণে সালাত আদায় করতে না পারি তখন কী করব?

উত্তর : ভাই, আপনি প্রশ্ন করেছেন– আপনি কী করবেন যদি অফিসের সময় স্বল্পতার কারণে সালাত আদায় করতে না পারেন। যদি আপনি লক্ষ্য করেন দিনে

পাঁচ ওয়াক্ত নামায আমাদের জন্যে ফরজ। আপনারা দেখবেন যে, ফজরের সালাত ভোরবেলার সালাত। আর এশার সালাত রাতের সালাত– এ দুটোর জন্য অফিস টাইমের কোনো বিরোধ নেই। মাগরিবের সালাতেও কোনো সমস্যা নেই। তবে যোহরের সালাতের কথা যদি বলেন, এ সালাত আদায় করা যায় অফিসের দুপুরের খাবারের সময় আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন আসরের ওয়াক্তে। এছাড়া আপনি রাতের বেলায় কাজ করলে অন্যান্য ওয়াক্তের সমস্যায়ও পড়তে পারেন। আর আপনার অফিস সময়ের সাথে সালাতের কোনো বিরোধ হলে আপনার স্যারকে অনুরোধ করবেন দশ মিনিট সময় দেয়ার জন্যে যাতে সালাত আদায় করতে পারেন। তবে বেশির ভাগ মুসলিম সালাতের জন্যে বসের কাছে সময় চাইতে লজ্জা পান।

তবে আমরা অন্যান্য ব্যাপারে অর্থাৎ কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য যেমন পিকনিকে বা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্যে সময় চেয়ে অনুরোধ করতে পারি। কিন্তু সালাতের ব্যাপারে আমরা লজ্জা পাই। বেশির ভাগ মুসলিম সালাতের সময় চাইতে হীনমন্যতায় ভোগেন। আর আপনার কর্তা ব্যক্তি যদি অমুসলিম হন আমার অভিজ্ঞতা আমাকে বলে তিনি ৯৯% সময়ে অনুমতি দিবেন। তবে অনুরোধ করবেন ভদ্রভাবে, নম্রভাবে। কিছু মুসলিম আছে সালাতের জন্যে এক ঘণ্টা সময় নেন এবং বলেন দূরে একটা মসজিদে গিয়েছিল। তখন স্যার চিন্তা করেন তিনি সালাতে গিয়েছিলেন, নাকি বেড়াতে গিয়েছিলেন। আমার কোনো আপত্তি নেই যদি মসজিদে যান আর মসজিদ যদি কাছাকাছি হয়। যদি সেটা কাছাকাছি না হয় অনেক দূরে হয়, তাহলে আপনি অফিসে সালাত আদায় করতে পারেন। আপনি একটি জায়নামায যোগাড় করে সেটা আপনার ড্রয়ারে রেখে দিন।

আমি আগেও বলেছি নবী করীম ﷺ সহীহ্ বুখারীতে বলেন, এ পৃথিবীকে আমার ও আমার অনুসারীদের জন্যে বানানো হয়েছে একটি মসজিদ হিসেবে, একটি সিজদার স্থান হিসেবে। (সহীহ্ বুখারী, সালাত অধ্যায়, হাদীস নং ৪২৯)

যেখানে যখনই সালাত আদায়ের ওয়াক্ত আসবে তখনই সালাত আদায় করবেন। আপনি আপনার অফিসে একটি পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে সালাত আদায় করতে পারেন। এখন নফল সালাত আদায় করার দরকার নেই। ফরজ সালাত আদায় করেন এবং তার পাশাপাশি সুন্নাত সালাত আদায় করেন। আপনি আরেকটি সমস্যায় পড়তে পারেন। দেখলেন আপনার সামনে একটি ছবি আছে। তখন ছবিটা নামিয়ে ফেলুন অথবা একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিন। যদি ছবির কারণে সালাত আদায়ে সমস্যা হয় অন্য স্থানে চলে যান। কেন আপনাকে ছবির সামনে সালাত আদায় করতে হবে। আরেকটি স্থানে চলে যান। কিছু মুসলিম আছে অমুসলিম বসের অফিসে জামাআতে সালাত আদায় করে। এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে খেয়াল রাখবেন একসাথে সালাতে চলে গেলে অফিসের কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে

যেতে পারে। এজন্য আলাদা জামাআতে সালাত আদায় করতে পারেন। আর আপনারা দেখবেন এটা সহীহ্ বুখারীর প্রথম খণ্ডে উল্লেখ আছে দু'জন ব্যক্তিকে নিয়েও জামাআত হতে পারে।

আর যদি কোনো মুসলিম কাজ করেন নিষ্ঠার সাথে তাহলে কোনো অফিসের অমুসলিমরাই সালাত আদায়ে বাধা দেবে না। যদি কোনো অফিসার একরোখা হন তাহলে আপনি চা-পানে বিরতির পরিবর্তে কিছু সময় চেয়ে নিন। অথবা যদি এভাবে বলেন, ছুটি শেষে আমি দ্বিগুণ কাজ করে দিব বা তিনগুণ কাজ করে দিব বিনা পারিশ্রমিকে। যেকোনো ব্যবসায়ী এটা মেনে নেবেন। আপনি দশ মিনিট ছুটি নিয়ে আধঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করে দিবেন।

আর যদি আপনার স্যার চরমপন্থী হন, নামাযের সময় না দেন তাহলে আপনার জন্যে উত্তম হলো চাকরিটা বদলানো। সালাত আদায় করা ফরজ। যদি স্যার সময় না দেন তাহলে চাকরিটা ছেড়ে দিন, হয়তো আল্লাহ্ তাআলা আপনার জন্যে তার চেয়ে ভালো চাকরির ব্যবস্থা করবেন। সেখানে আপনি বেশি আয় করবেন। তবে নতুন চাকরিতে আপনি বেশি বেতন পান আর না পান, সালাত আদায় করলে আপনি পরকালে উপকার পাবেন। চাকরির কারণে সালাত আদায় না করলে সে উপকারটা আপনি পাবেন না। দূর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু মুসলিম অফিসেও দেখবেন, সেখানে বেশিরভাগ কর্মচারী মুসলিম। কিন্তু সালাত আদায় করে না। একাও করে না, জামাআতেও করে না।

আমি অনুরোধ করবো, আপনারা যারা মুসলিম নিজেরা এবং আপনাদের কর্মচারীরা সকলেই সালাত আদায় করবেন। আর আপনারা এভাবে ব্যবস্থা করে নেন যাতে অফিসে কাজেরও কোনো সমস্যা হবে না। আর একটা সময় দেখবেন যদি কর্মচারীদের নিয়ে সালাত আদায় করেন, এতে আপনার ব্যবসার উন্নতি হবে এবং আপনি আরো উন্নতি লাভ করবেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন। জামাআতে নামায আদায় করে না এমনকি একাও পড়ে না, সেই মুসলিম অফিসকর্তাদের উচিত তাদের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে নামায আদায় করা। এতে তার অফিসের কাজের কোনো ক্ষতি হবে না। বরং তাদের নিয়ে নামায পড়ার কারণে বেশি লাভবান হবেন। আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ১৮৯। মুসলমান মহিলারা কীভাবে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি পাবে?

উত্তর : কুরআনে এমন কোনো দলিল নেই যা মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করে। এমনকি কোনো হাদীসও নেই যেখানে বলা আছে মহিলারা মসজিদে যেতে পারবে না। বরং এর বিপরীতে অনেক হাদীস আছে। সহীহ্ বুখারী শরীফে আছে 'যখন তোমার স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার জন্যে অনুমতি চায় তখন তাদের নিষেধ করো না।' (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, সালাতের বৈশিষ্ট্য, অধ্যায় ৮৪, হাদিস নং ৮৩২)

এমনকি সহীহ্ বুখারীতে আছে– 'যদি তোমার স্ত্রী রাতের বেলায়ও মসজিদে যেতে চায়, ত হলে তাকে অনুমতি দাও।' (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, সালাতের বৈশিষ্ট্য, অধ্যায় ৮০, হাদিস নং ৮২৪)

মুসলিম শরীফে আরো আছে, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত– মহিলাদের জন্যে মসজিদে সবচেয়ে ভালো স্থান হচ্ছে তারা প্রথম কাতারে দাঁড়াবে, আর পুরুষরা শেষ লাইনে দাঁড়াবে। অথবা পুরুষরা প্রথম লইনে দাঁড়ালে মহিলাদের জন্যে ভালো হলো শেষ লাইনে দাঁড়ানো। (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, অধ্যায় ৮১, সালাত, হাদিস নং ৮৮১)

এ হাদীসে একসাথে নামায আদায়ের ইঙ্গিত দেয়া আছে।

মুসলিম, বুখারী শরীফে আরো আছে– 'আল্লাহর বান্দাদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত করো না।' (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, অধ্যায় ১৭৭, সালাত, হাদিস নং ৮৮৪)

সহীহ্ মুসলিমে আরো আছে।

'তোমরা মসজিদের ভেতরে মহিলাদের জায়গা কেড়ে নিও না।' (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, অধ্যায় ১৭৭, হাদিস নং ৮৯)

যার অর্থ রাসূল ﷺ এর সময়ে মহিলারা মসজিদে যেতেন এবং রাসূল ﷺ কখনো মহিলাদের মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন নি। কিন্তু মহিলারা মসজিদে গেলে তারাও সমান সুবিধে এবং নামাযের পৃথক ব্যবস্থা পাবে।

মহিলা-পুরুষরা একসাথে নামায আদায় করবে না। এতে কিছু মানুষ নামাযের নামে সমস্যা তৈরি করবে। মহিলাদের জন্যে আলাদা প্রবেশ করার এবং নামায পড়ার ব্যবস্থা থাকবে। আর মহিলারা পুরুষের সামনের লাইনে থাকবে না। এতে অনেকের মনোযোগ সেদিকে চলে যাবে। তবে মহিলাদের সমান সুযোগ সুবিধা থাকবে। যদি আমরা লক্ষ্য করি, সৌদি আরবে মহিলারা মসজিদে যায় এমনকি হারামাইন শরীফ (মক্কা) এবং মসজিদে নববীতেও মহিলারা নামায পড়েন। আমেরিকায়, বৃটেনে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় মহিলারা মসজিদে যেতে পারে। কেবল ভারতে অধিকাংশ মসজিদ মহিলাদের প্রবেশের অনুমতি দেয় না। আলহামদুলিল্লাহ, আমি যতদূর জানি মুম্বাইতে কিছু মসজিদ আছে যেখানে মহিলারা যেতে পারেন। এমনকি কেরালাতে প্রায় পাঁচশ মসজিদে মহিলাদের আলাদা নামাযের ব্যবস্থা আছে। আশা করি সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী মুম্বাইতেও মহিলাদের মসজিদে যেতে বাধা দেয়া হবে না। উত্তর পেয়েছেন আশা করি।

প্রশ্ন ঃ ১৯০। আমার নাম শেখ আহমদ। আমি চাকরি করি। আমরা তাকবীর দিতে গিয়ে হাত উপরে তুলি। এর গুরুত্বটা কী?

উত্তর : ভাই, আপনি প্রশ্ন করলেন– সালাত আদায় করার সময় আমরা হাত উপরে উঠাই। এর গুরুত্ব প্রসঙ্গে। হাত হলো ক্ষমতা এবং শক্তির একটি প্রতীক। আমরা

মুসলমানরা যখন সালাতের সময় হাত ওঠাই এটা তিনটি বিষয়কে নির্দেশ করে। প্রথমটি হচ্ছে হাত উত্তোলনের মাধমে আমরা নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করি। হাত উত্তোলনের মাধ্যমে বুঝাই– হে আল্লাহ, আমি আমার নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম। যেমন আমরা কাউকে আত্মসমর্পণ করতে চাইলে বলি Hands up যেমন পুলিশ বলে গ্রেফতারকৃতদের উদ্দেশে। এর মানে 'আত্মসমর্পণ' করতে বলা হচ্ছে। তাই আমরা যখন হাত তুলি তখন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি।

এছাড়াও এটা দ্বারা আরো বুঝায় আমরা আমাদের মুখের কথা ও কাজের দ্বারা আল্লাহর মহত্ত্বকে প্রমাণ করছি। اَللّٰهُ اَكْبَرُ – অর্থাৎ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আর এটা দ্বারা আরো বুঝায় জাগতিক বিষয়ের প্রতি আমি আমার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছি এবং আমি সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহ তাআলার দিকে মনোযোগ পেশ করছি। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৯১। আমার নাম ইউসুফ দিসায়ী। আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। আমার প্রশ্ন, নবীজির জীবনের কোন্ সময়টাতে আল্লাহ সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন? আর শবে মিরাজের সাথে সালাতের সম্পর্কটা কী? আমার ধারণা, প্রশ্ন দুটো প্রাসঙ্গিক তাই একসাথে বললাম।

উত্তর ঃ ভাই, আপনি প্রশ্ন করলেন যে, ঠিক কোন্ দিন কোন্ সময়ে আমাদের নবীজিকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আর শবে মিরাজের সাথে সালাতের সম্পর্কটা কী? ভাই জন্ম এবং মৃত্যুর দিনটা আমরা যেভাবে সঠিকভাবে জানি, সালাত ফরজের সঠিক দিনটি সেভাবে জানি না। তবে নির্দেশটা এসেছিল নবুয়ত লাভের প্রথম দিকে। কারণ, একটি সহীহ্ হাদীসে আছে যে, ফেরেশতাদের প্রধান হযরত জিবরাইল (আ) নবীজিকে সালাতের নিয়মটা দেখিয়েছিলেন। হযরত জিবরাইল (আ) সেখানে তার পা মাটিতে রাখলেন আর তা থেকে পানি বের হয়ে আসতে লাগল। জিবরাইল (আ) নবীজিকে অজু করার নিয়মটা দেখালেন। আর সালাত আদায়ের নিয়মটাও দেখালেন। তিনি এ কাজগুলো হুবহু বিবি হযরত খাদিজা (রা)-এর সামনে করে দেখালেন। এ থেকে বুঝা যায় নবীজি এ নির্দেশটা পেয়েছিলেন নবুয়তের প্রথম দিকে।

এবার কয় ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হবে। আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ শবে মিরাজের ব্যাপারে বলি। এ ঘটনাটি উল্লেখ আছে পবিত্র কোরআনে সূরা ইসরার ১ নং আয়াতে। আমাদের নবীজি ভ্রমণ করেছিলেন মসজিদে হারামাইন থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। সহীহ্ বুখারীসহ আরো অন্যান্য হাদীসে আছে, নবীজি সেখানে দেখা করেছিলেন মুসা (আ), ঈসা (আ)-এর সাথে। আল্লাহ তাআলা সেখানে নবীজিকে নির্দেশ দিলেন যে মুসলিমরা দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে সহীহ্ বুখারী অনুযায়ী তারপর মুসা (আ) নবীজিকে বললেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত

নামায আদায় করা মুসলমানদের জন্য কষ্ট হয়ে যাবে। আপনি আল্লাহর কাছে অনুরোধ করে এটা কমিয়ে নেন। নবীজি সালাতের ওয়াক্ত কমাতে গেলেন এবং সবশেষে দিনে পাঁচবার সালাতের নির্দেশ পেলেন। আর আল্লাহ বললেন, এই পাঁচ ওয়াক্তের মাধ্যমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান সওয়াব পাওয়া যাবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৯২। আমি একজন মহিলা। আমার প্রশ্ন হলো, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কেন আমাদের দুআর উত্তর দেন না অথবা সব দোয়া কবুল করেন।

উত্তর : এ প্রশ্নটার উত্তর পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২১৬ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

অর্থ : তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেয়া হল, যদিও তা তোমাদের নিকট অপ্রিয়। সম্ভবত তোমরা যেটা নিজেদের জন্যে যা কল্যাণকর মনে করো, সেটা হতে পারে অকল্যাণকর। আবার যেটা তোমরা নিজেদের জন্য অকল্যাণ মনে করো সেটা তোমাদের জন্যে হতে পারে কল্যাণকর। আল্লাহ সবকিছু জানেন আর তোমরা জানো না।

যেমন ধরুন, একজন ধার্মিক লোক দুআ করল আল্লাহ আমাকে একটি মটর সাইকেল দাও; যাতে আমার যাতায়াত সুবিধা হবে। আর আল্লাহ সে দুআ কবুল করলেন না। আপনি হয়তো বলবেন সে খুব ভালো লোক, ধার্মিক লোক, তার দুআ কেন কবুল হলো না? আল্লাহ তাআলা জানেন যদি লোকটার মটর সাইকেল থাকে তাহলে সে দূর্ঘটনায় পড়তে পারে এবং পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। আর পবিত্র কুরআন বলছে, 'তোমরা যেটা পছন্দ কর সেটা অকল্যাণকর হতে পারে। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জানো না।'

এবার খুব ধনী একজন ব্যবসায়ী যিনি লন্ডনের একটি ফ্লাইট ধরতে এয়ারপোর্ট যাচ্ছিলেন একটি চুক্তি করার জন্যে, চুক্তিটি করলে তার লাভ হবে ১০০ কোটি রুপি। যখন তিনি এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন দূর্ভাগ্যজনকভাবে রাস্তায় খুব বড় একটি যানজট ছিল। তাই তিনি সময়মতো এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে পারলেন না। তিনি যখন পৌঁছলেন ততক্ষণে ফ্লাইটটি উড়াল দিয়েছে। তিনি তখন বললেন, এটা আমার জীবনের সবচেয়ে একটি বাজে ঘটনা। বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় গাড়িতে

যে রেডিওটি ছিল তাতে সর্বশেষ খবরটি শুনলেন– তিনি যে ফ্লাইট ধরতে চাচ্ছিলেন সেটা ক্র্যাস করেছে এবং বিমানে যে কয়জন যাত্রী ছিল তারা সকলেই মারা গেছেন। তখন সেই ব্যবসায়ী বললেন, এ ঘটনা হলো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ একটি ঘটনা। কিছুক্ষণ আগেই ট্রাফিক জ্যামকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন। কারণ, এটার কারণে তার ১০০ কোটি রুপী লোকসান হয়েছে।

আর এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি সে ট্রাফিক জ্যামকে ধন্যবাদ জানালেন। কারণ, এতেই তার জীবনটা বেঁচে গেছে। পবিত্র কুরআন বলছে যেটা তোমরা কল্যাণকর মনে করো সেটা অকল্যাণ হতে পারে। আর আল্লাহ্ যা জানেন, তোমরা তা জানো না। আল্লাহ জানেন সেই ব্যক্তির জীবন তার ১০০ কোটি রুপীর চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান। আপনি যে দুআ করেন অনেক সময় দেখা যায় আল্লাহ্ তাআলা সে দুআটি পূরণ করছেন না। তিনি সে দুআ কবুল করেন না। আর পবিত্র কোরআনে সূরা শূরার ২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ -

অর্থ : আল্লাহ্ তাআলা যদি তার সকল বান্দাকে জীবনের উপকরণের প্রাচুর্য দিতেন, তাহলে এরা অবশ্যই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো।

কিন্তু আল্লাহ তাঁর ইচ্ছেমতো পরিমাণেই নাযিল করেন এবং তিনি জানেন তিনি কী দিয়েছেন। পবিত্র কুরঅনের সূরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে– যখন মানুষ আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করবে, তাদের বলো আমি তাদের নিকটেই আছি। তাদের খুব কাছেই আছি এবং আমি আমার ভৃত্যদের সব আহ্বান শুনতে পাই।

পবিত্র কুরআনের সূরা গাফেরের ৬০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ -

অর্থ : আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।

মানুষ ভাবতে পারে এ আয়াতটির কথা পূরণ হবে না। যদি দুআ কবুল না হয়। যদি আপনি ভালো করে লক্ষ্য করেন আপনি দেখবেন আল্লাহ্ তাআলা প্রার্থনার উত্তর দিচ্ছেন। উত্তর না দেয়ার মাধ্যমে। কারণ আল্লাহ্ জানেন কোন্টা ভালো কোন্টা খারাপ আপনার জন্যে। আর কিছু মানুষ আছে যারা হয়তো বলবে, আমরা অনেক অবিশ্বাসীকে দেখেছি, অধার্মিক মানুষ যারা ভুল ঈশ্বরের উপাসনা করে, তারা বিলাসবহুল জীবন-যাপন করে। অবিশ্বাসীরা নকল ঈশ্বরের উপাসনা করে টাকার জন্যে, আর তারা সম্পদশালী হয়। যদিও এসব অধার্মিক ও অবিশ্বাসী লোকেরা নকল ঈশ্বরের কাছে বিভিন্ন জিনিসের প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তাদের বস্তুগত চাহিদা

পূরণ করে থাকেন। কারণ তিনি জানেন তারা সেটার প্রার্থনা করছে ভবিষ্যতে এদের দ্বারা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরকালে এসবের জন্যে তারা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সত্যিকারের বিশ্বাসীদের জন্যে এটা কোনো ব্যাপারই না যে, সে ধনী না গরিব, এখন তার সুসময় না দুঃসময়। আর তারপর আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করে। পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ৩৭ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "সেইসব লোক যারা ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় করে ও আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাকে স্মরণ করা, যাকাত প্রদান করা, সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকে না, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন অনেকের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তারা শুধু আখিরাতের ভয় করে, রোজ কিয়ামতের দিন যেদিন আমাদের প্রত্যেকের বিচার করা হবে। সত্যিকারের বিশ্বাসী সব সময়ই বলে আলহামদুলিল্লাহ যে ঘটনাই ঘটুক না কেন। 'আলহামদুলিল্লাহ' মানে 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে'। এমনকি তার যদি ক্ষতিও হয় সে বলবে 'আলহামদুলিল্লাহ'। কারণ সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। আর আল্লাহ তাআলা যখন তার ক্ষতিটা হতেই দিলেন এতে করে ভবিষ্যতে তার উপকারই হবে। এক কথায়, সত্যিকারের বিশ্বাসী মনে করে যা কিছু হয়েছে তা ভালোর জন্যেই হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ১৯৩। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম বাইয়ার। আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার। জুমার খুৎবা এটা সালাতের অংশ নয়, এটা আরবি ভাষায় দেয়া কি আবশ্যক?

উত্তর : জুমার খুৎবা আরবিতে দেয়া প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মাঝে কিছু মতভেদ রয়েছে। এখানে কেবল ইমাম মালেক (র.) বলেছেন, আরবিতে পড়া অত্যাবশ্যক। অন্যান্য সকল বিশেষজ্ঞরা যেমন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বলসহ বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই বলেছেন এটা যেকোন ভাষায় পড়া যাবে। জুমার খুৎবার মাঝে যে বিষয়গুলো থাকতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করা, আমাদের নবীজির জন্যে দু'আ করা আর জুমআর খুৎবায় যে সকল আরবি আয়াতগুলো পড়া হয় সেগুলো অবশ্যই আরবি হতে হবে। বাকি অংশটা যেকোন ভাষায় হতে পারে। আর এমন কোনো সহীহ্ হাদীস খুঁজে পাবেন না, যেখানে নবীজি বলেছেন যে, জুমার খুৎবা অন্য ভাষায় দেয়া যাবে না। তবে আমি এটাও জানি নবীজি সকল সময় আরবিতে খুৎবা দিয়েছেন। কারণ সে সময় আরব দেশের লোকেরা কেবল আরবি ভাষা বুঝতে ও পড়তে জানতো। তাই নবীজিও কেবল আরবি ভাষায়ই খুৎবা দিয়েছেন। কিন্তু কোনো হাদীসই বলছে না আরবি ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় খুৎবা দেয়া যাবে না। নবীজি কোনো লোককেই বলেন নি যে, আরবি ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় খুৎবা দেয়া যাবে না।

জুমার সময় খুৎবা দেয়ার কারণ হলো, এতে করে সমবেত লোকদের আল্লাহ এবং নবীজির নির্দেশিত পথে পরিচালিত করা যায়। এছাড়াও এতে সমবেত লোকজন

জানতে পারে আশে-পাশে কী ঘটনা ঘটছে। এক কথায় খুৎবার মাধ্যমে মুসলমানদের পথনির্দেশনা দেয়া হয়। এটা খুবই অযৌক্তিক হবে যদি বলি যে, আমি কাউকে এমন ভাষায় উপদেশ দিব যে ভাষাটা সে বোঝে না। বাস্তবক্ষেত্রে আপনি কাউকে উপদেশ দিবেন এমন ভাষায় যে ভাষাটা সে বোঝে। আপনি যদি আমেরিকায় যান তাহলে দেখবেন আমেরিকার অনেক মসজিদেই ইংরেজিতে খুৎবা দেয়া হয়।

এ পৃথিবীতে এমন অনেক মসজিদ আছে যেখানে খুৎবা দেয়া হয় স্থানীয় ভাষায়। আমেরিকা, বৃটেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাসহ অনেক স্থানেই খুৎবার মাধ্যম ইংরেজি ভাষা। যদি আপনি আরব বিশ্বে যান, যেহেতু সেখানকার মানুষ আরবি বুঝে তাই সেখানকার খুৎবা আরবিতে হয়। তবে কিছু দিন আগে আমি কুয়েতে গিয়েছিলাম যদিও সেখানকার বেশিরভাগ মানুষ আরবি বুঝে তারপরও কিছু মসজিদে খুৎবা দেয়া হয় ইংরেজিতে। কিছু মসজিদে খুতবা দেয়া হয় উর্দুতে, কিছু মসজিদে খুৎবা দেয়া হয় মালায়ম এবং অন্যান্য ভাষায়। মসজিদগুলোকে সরকার বিশেষভাবে অনুমতি দিয়েছে যাতে করে বিদেশী লোকজন যে সকল ব্যক্তি কুয়েতে নাগরিক নন যারা বিভিন্ন দেশ থেকে কুয়েতে এসেছে চাকরি করার জন্যে, তাদের জন্য এ খুৎবার ব্যবস্থা। তাহলে খুৎবা যেকোনো ভাষায় দেয়া যাবে। কিন্তু এখানে শর্ত হলো যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রশংসা আরবিতে হতে হবে।

আর নবী করীম ﷺ-এর জন্যে দুআও আরবিতে হতে হবে। খুৎবার সময়ের দোয়া আরবিতে হতে হবে। এই দুআয় মাত্র কয়েকটা আয়াত আরবিতে রয়েছে। খুৎবার সময় সেটার অনুবাদও করতে পারেন। তাহলে স্থানীয় ভাষায় খুৎবা দেয়াতে কোনো সমস্যা নেই। তাই মানুষকে বুঝাতে হবে খুৎবার ভাষা স্থানীয় হলে সমস্যা নেই। আর ভারতবর্ষে ও বিদেশে যে সকল মসজিদ ভারতীয়রা নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোতে আরবিতে খুৎবা দেয়া হয়। কিছু মসজিদে দেখবে ফ্রি খুৎবা স্থানীয় ভাষায় দেয়া হয়, কিছু মসজিদে খুৎবার অনুবাদ করা হয় জুমআর সালাতের পর। তাই আমি ভারতের জন্যে দুআ করব আল্লাহ যাতে আমাদের হেদায়াত করেন। যাতে করে খুৎবা স্থানীয় ভাষায় হয় এবং আমরা খুৎবার মাধ্যমে সঠিক নির্দেশ পেতে পারি।

প্রশ্ন ঃ ১৯৪। ভাই জাকির, আমি আব্দুল্লাহ। আমি একজন ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী। আপনি বললেন মুসলিমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে। এছাড়াও বললেন মিরাজের বিভিন্ন ঘটনা। কীভাবে আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশটা পেলাম। আমরা কিছু মানুষকে দিনে তিনবার সালাত আদায় করতে দেখি। এভাবে সালাত আদায় করার কোনো যৌক্তিকতা আছে কি?

উত্তর : আমি আগেও বলেছি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ। আল-কুরআনে এ কথার উল্লেখ আছে। কিছু মানুষ তিন ওয়াক্ত নামায পড়ে এর কোনো যুক্তি আছে কি-না?

পবিত্র কুরআন অনুযায়ী আমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করব। তবে এ ব্যাপারে আমাদের কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছে। সূরা ত্বহার ১৩০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূরা–রুম এর ১৭-১৯ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি এ আয়াতগুলো পড়েন যেখানে আমাদের বলেছে আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা উচিত। তবে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১০১ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, যখন তোমরা সফর করবে তখন তোমরা সালাত সংক্ষিপ্ত করতে পারো। আমি আগেও বলেছি যোহর, আসর ও এশার সালাত চার রাকআতের বদলে দুই রাকআতও পড়া যায়। আর যখন তোমরা সফর করবে তখন তোমরা দুই ওয়াক্তের নামায এক সাথে পড়তে পারো। যোহর ও আসরের সালাত, এছাড়াও মাগরিব ও এশার সালাত একসাথে পড়তে পারেন। এভাবে দুই ওয়াক্ত একসাথে পড়লে ঠিক আছে। সফরের সময় কেউ এভাবে সালাত আদায় করলে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। এমনকি হাদীসও বলছে।

সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ আছে। একবার খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, লোকজন মাগরিবের সালাতের পর এশার জামাআতের জন্যে আসতে পারবে না। নবীজি তাই দুই ওয়াক্ত সালাত একসাথে পড়লেন। তাহলে কোনো বিপর্যয় হলে, কোনো অসুবিধা হলে নবীজি দুই ওয়াক্ত একসাথে আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছে যারা বলেও আমাকে তো অফিসে যেতে হবে সেজন্যে আমি আসরের সালাত আগে পড়ে নিব। অথবা আপনি কেনাকাটা করতে মার্কেটে গেছেন। সেখানে কিছু সময় লাগবে। তাই আপনি যোহর ও আসর একসাথে পড়ে নিলেন। এটার অনুমতি নেই। সফরের সময় অথবা যখন সত্যিই অসুবিধায় পড়বেন তখন অনুমতি আছে। এছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৯৫। পৃথিবীর প্রথম আযান কে দিয়েছিলেন? কোথায় দিয়েছিলেন? আর এ আযান কোন দেশ থেকে শুরু হয়েছিল?

উত্তর : আযান শুরু হয়েছিল আরব দেশে, আরবের মদিনায়। সহীহ্ হাদীসে উল্লেখ আছে মদিনায় মসজিদ তৈরি করার পর নবীজি এবং সাহাবীরা সালাতের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন কীভাবে মানুষকে আহ্বান করা হবে। কেউ কেউ বললো, ড্রাম বাজাও, কেউ বললো, শাঙ্খ বাজাও। একেকজন একেক কথা বললো। হাদীস বলছে তখন একজন লোক তার স্বপ্নের মধ্যে আযান শুনলো। সে শুনলো আযানের আওয়াজ যেটা আমি আগে বলেছিলাম মানুষের কণ্ঠে। খবরটা তখন নবীজির কাছে পৌছে গেল। আর নবীজি বললেন, সে যে কথাগুলো শুনেছে সেগুলো শুনতে খুব ভালো লাগছে। আর সালাতের জন্যে মানুষকে আহ্বান করতে এর চেয়ে ভালো উপায় আর নেই, যেখানে সবাইকে ডাকা হচ্ছে মানুষের কণ্ঠ দিয়ে। এজন্যে তখন

নবীজি আদেশ দিলেন যখন মানুষকে সালাতের জন্যে ডাকবে তখন মানুষের কণ্ঠ ব্যবহার করবে। ড্রাম, শাখ ইত্যাদি ব্যবহার করো না। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৯৬। এ প্রশ্নটা করেছেন ভাই আব্দুল্লাহ। সালাত আদায়ের অনেক নিয়ম রয়েছে। এর সবই কি ঠিক? নাকি সালাত আদায়ের কোনো বিশেষ নিয়ম রয়েছে?

উত্তর : যদি আপনি মার্কেটে যান যেখানে কয়েক শত বই রয়েছে সালাতের নিয়মের ওপর ভিত্তি করে। বেশিরভাগ বইতেই কিছু হাদীস রয়েছে যেগুলো সহীহ্ হাদীস নয়। বেশিরভাগ বইয়ে সালাত আদায়ের কেবল একট নিয়মই রয়েছে। আমাদের নবীজি বলেছেন এটার উল্লেখ আছে। (সহীহ্ বুখারী)

'সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছো।'

আমরা সালাত আদায় করবো সেই নিয়মে যেভাবে আমাদের প্রিয় নবী করীম ﷺ সালাত আদায় করেছেন। সালাতের অন্য কোনো নিয়ম নেই। তাহলে সালাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলো যেমন কীভাবে হাত বাঁধতে হবে, রুকু দিতে হবে, সিজদা দিতে হবে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি এসব ব্যাপারে মাত্র একটাই নিয়ম আছে। একটাই পদ্ধতি। আর সহীহ্ হাদীসে এ নিয়মগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। সালাতের কিছু কিছু ব্যাপারে এ নিয়মগুলো কিছুটা শিথিল। যেমন ধরুন, আমরা রুকুতে যেটা পড়ি সহীহ্ হাদীস বলছে কখনো কখনো নবীজি বলেছেন- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সুমহান।' কোনো কোনো সময় বলেছেন- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সুমহান, সমস্ত প্রশংসা তাঁর।'

তাহলে এমন কিছু নিয়মের ব্যাপারে শিথিলতা আছে যেগুলো আমাদের নবীজি করেছেন রুকুর সময়, সিজদার সময়। যেমন ধরুন, বিতরের সালাতের বিজোড় রাকাতের সালাত আদায় করতে হয়। নবীজি কখনো পড়েছেন এক রাক'আত, তিন রাক'আত, পাঁচ রাকআত, সাত রাক'আত। তবে বেশিরভাগ সময়ই পড়েছেন তিন রাক'আত। তাহলে এমন কিছু ব্যাপারে শিথিলতা আছে। যখন আপনি রুকুতে অথবা সিজদায় গিয়ে কিছু পড়ছেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ দেহের অঙ্গ-ভঙ্গি যেভাবে দাঁড়াবেন যেভাবে বলবেন, যেভাবে মাথা নোয়াবেন, যেভাবে একটাই। আর এগুলো উল্লেখ করা আছে সহীহ্ হাদীসে। আর এখানে আমি যে বইটার কথা বলতে পারি বইটা মার্কেটে পাবেন। এ বইটা খুবই সংক্ষিপ্ত খুবই ছোট। এখানে আপনারা পাবেন সহীহ্ হাদীস, বইটির নাম 'The Guide to Salah' written by MA Sakib. আপনাদের যদি বেশি সময় থাকে আর

বিস্তারিত জানতে চান, তাহলে আরেকটি বইয়ে বিস্তারিত আছে। কীভাবে সিজদায় যাবেন, কোন অঙ্গ প্রথম মাটিতে স্পর্শ করবে, কীভাবে উঠে দাঁড়াবেন। এসব কিছু বিস্তারিত জানতে নতুন 'The prayer of the Prophet'.

সালাতের বিভিন্ন নিয়ম এখানে বিস্তারিতভাবে পাবেন, লিখেছেন শেখ মোঃ নাসিরুদ্দীন আলবানী বইটিতে সহীহ্ হাদীসের উদ্ধৃতি পাবেন। এ বইটি পড়ে দেখতে পারেন। তবে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা হলো যে সালাত আদায়ের সময় এ গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর নিয়মমাত্র একটাই, আপনারা যদি বইগুলো পড়তে চান তাহলে যোগাযোগ করুন আমাদের Islamic Research Foundation-এর লাইব্রেরিতে। সেখানে আপনারা এ বইগুলো পাবেন।

প্রশ্ন ঃ ১৯৭। 'আমার নাম জগবন্ধু সিধু। ইসলাম সম্পর্কে আমি খুব কম জানি। আমার আজকের প্রশ্নটাও সালাতের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয়, প্রশ্নটা কি করতে পারব?' আপনার প্রশ্নটা আজকের বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক হতে হবে। আমি প্রশ্নের উত্তরটা অনেকের কাছে বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু উত্তরটা সেভাবে পাই নি।' আপনি প্রশ্নটা করতে পারেন। আমি এটাই আশাই করছিলাম। দুটো প্রশ্ন না আপনি একটি প্রশ্ন করবেন একটার ব্যাপারে ছাড় দিয়েছি, আর না ঠিক আছে, আমি এ প্রশ্নটা আগে আমার কয়েকজন বন্ধুর কাছে করেছি এবং মোহাম্মদ আলী রোডে কয়েকজন ইমামের কাছেও করেছি। আর আমি যতটুকু জানি الم। حم . নবীজি এ শব্দগুলোর কোনো ব্যাখ্যা দেন নি। এগুলোর ব্যাপারে কি সাহাবিরা কিছু জানতেন? এগুলো কি কেউ জানতো না? নাকি কখনো বলা হয় নি? নাকি কেউ জানে না? ঘটনাটা কী? الم। এরপর থেকেই কুরআনের শুরু?

উত্তর : ভাই আপনি অনেক মুসলিম ও ইমামের কাছে এ প্রশ্ন করে উত্তর পান নি। এ সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো সম্পর্কে আপনি বিস্তারিতভাবে জানতে চাইলে আমার ভিডিও আছে সেখানে জানতে পারবেন। তারপরও আপনি যেহেতু সংক্ষেপে প্রশ্ন করেছেন তাই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। এ সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো যেগুলো পবিত্র কুরআনের বেশ কিছু সূরার পূর্বে আছে। এগুলো কুরআনের ২৯টি সূরার পূর্বে আছে। যদি আরবি হরফগুলো গুণে ا . ب . ت . ث . ج। এ রকম ২৯টি অক্ষর।

আর পবিত্র কুরআনের ২৯টি সূরার কোনোটির পূর্বে একটি অক্ষর ص কোনোটির পূর্বে দুটি অক্ষর حم আবার কখনো তিনটি অক্ষর الم। কখনো চারটি, কখনো পাঁচটি। আর এ ব্যাপারটা নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। কিছু মানুষ বলে এ অক্ষরগুলো আল্লাহ তাআলার সংক্ষিপ্ত রূপ। আবার কিছু লোক বলে এটা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার সিফাত। কিছু লোক বলে এটা আল্লাহর নাম, কিছু লোক বলে হযরত জিবরাইল (আ) এটার মাধ্যমে নবীজির মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। আর নবীজি এগুলো বলে অন্যান্য মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। এরকম আরো

অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। আর সবচেয়ে খাঁটি ও সঠিকটা হলো এই যে, এই সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো যদি আপনারা ভালো করে দেখেন, এগুলো অনেক সূরার প্রথমে রয়েছে। এগুলো দিয়ে মানুষকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বেশ কয়েক জায়গায় আছে। চেষ্টা করে কুরআনের মতো একটা বই লেখ। সূরা ইকরার ৮৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে, মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয়েও তারা কুরআনের মতো আরেকটি বই রচনা করতে পারবে না।

পবিত্র কোরআনের সূরা তূরের ৩৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে–

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ـ

অর্থ : তোমরা কোরআনের মতো আরেকটি বই রচনা করতে পারবে না।

সূরা হুদ-এর ১৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ ـ

অর্থ : তোমাদের যদি সন্দেহ থাকে কোরআনের মতো ১০টি সূরা রচনা কর।

এছাড়া সূরা ইউনুসের ৩৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ـ

অর্থ : তোমরা পারলে কোরআনের মতো আরেকটি সূরা রচনা কর।

আর এ চ্যালেঞ্জটা আস্তে আস্তে সহজ হয়েছে। এর চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জটা করা হয়েছে সূরা বাকারার ২৩ ও ২৪ নম্বর আয়াতে।

আল্লাহ্ পাক বলেন–

وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ـ

অর্থ : আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে তাহলে এর মতো একটি সূরা অবতীর্ণ করে দেখাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য অভিভাবকদের ডাকো। আর তোমরা যদি তা না পারো, আসলে তোমরা কখনোই পারবে না। সুতরাং তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যা কাফিরদের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা এখানে মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন পবিত্র কোরআনের মতো একটি সূরা রচনা করতে।

তাহলে আল্লাহ্ তাআলা যখন বলছেন الم । حم . يس তিনি এখানে বলছেন আরবদের। কুরআন নাযিল হয়েছিল আরবি ভাষায়। কারণ সেখানে স্থানীয় লোকদের ভাষাও ছিল আরবি। তাই আল্লাহ্ এখানে পরোক্ষভাবে বলছেন, আরবিতো তোমাদেরই ভাষা (যেমনটি A, B, C, D) যে অক্ষরগুলো নিয়ে তোমরা খুব গর্ব করো। কারণ কুরআন যখন নাজিল হয়েছিল আরবরা তাদের ভাষা নিয়ে খুব গর্ব করতো। আরবি ভাষা ছিল তখন উন্নতির চরম শিখরে। তখন আরবরা যে বিষয়টা নিয়ে সবচেয়ে বেশি গর্ব করতো সেটা তাদের ভাষা। তখন ছিল সাহিত্যের যুগ। তারা সাহিত্যে খুবই উন্নত ছিল। তাই আল্লাহ্ বলেছেন এগুলো তোমাদের ভাষার অক্ষর, এগুলো তোমরা খুব গর্ব করো। আমি রচনা করেছি তোমাদের জন্যে এ পবিত্র কুরআন। আল্লাহ পৃথিবীর সব মানুষকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। প্রয়োজনে জ্বিনদের সাহায্য নিতে বলেছেন। তবে আল্লাহ্ ব্যতীত পারলে তোমরা একটি সূরা তৈরি কর। পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা মাত্র তিনটি আয়াত দশটি শব্দ। আল্লাহ্ চ্যালেঞ্জ করছেন যে, তোমরা যদি সক্ষম হও এমন একটি সূরা তৈরি কর।

তাহলে আল্লাহ্ যখন বলছেন الم । حم এভাবে যখন আল্লাহ্ এগুলো ব্যবহার করেছেন দেখবেন এরপরই পবিত্র কুরআনের প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন ধরুন সূরা আল-বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে –

الٓمّٓ ـ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ـ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ

অর্থ : الم। এটাই সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, এটা মুত্তাকীদের জন্যে পথনির্দেশক।

তাহলে যখনই এই সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো আসবে তারপরেই দেখবেন সেখানে পবিত্র কুরআনের প্রশংসা করা হচ্ছে। তাহলে যখনই এ অক্ষরগুলো দেখবেন মনে করিয়ে দিচ্ছে এগুলো আল্লাহর কালাম। আর এখানে চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছে পবিত্র কুরআনের মতো করে একটি সূরা রচনা কর। তোমরা এটা করতে পারবে না। এ পর্যন্ত কেউ করতে পারে নি। তবে অনেকেই চেষ্টা করেছে। অনেক অমুসলিম চেষ্টা করেছে তারা এখনো পর্যন্ত পারে নি। আর ভবিষ্যতেও কেউ ইনশাআল্লাহ পবিত্র কুরআনের মতো সূরা রচনা করতে পারবে না।

প্রশ্ন ঃ ১৯৮। পুরুষ এবং মহিলারা যখন সালাত আদায় করে তখন আলাদা নিয়মে কেন আদায় করে?

উত্তর : আমি আগেও বলেছি, বাজারে অনেক বই পাবেন যেখানে সালাত আদায়ের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন দেয়া আছে। বেশিরভাগ বইয়েই আলাদা একটা অধ্যায় থাকে

যে, মহিলারা কীভাবে সালাত আদায় করবে এবং পুরুষরা কীভাবে সালাত আদায় করবে। আর সেখানে নিয়মগুলোও আলাদা। সত্যি বলতে এমন একটি সহীহ্ হাদীসও খুঁজে পাবে না যেটা বলছে মহিলারা সালাত আদায় করবে পুরুষদের থেকে ভিন্ন নিয়মে। এমন কোনো সহীহ্ হাদীস নেই।

আর আপনারা যদি সহীহ্ বুখারী পড়েন এক নম্বর খণ্ডে পাবেন, হযরত উম্মে দারদা (রা) তাশাহহুদে বসেছিলেন পুরুষদের মতো করে। (সহীহ্ বুখারী)

আর তিনি ছিলেন এমন একজন যিনি ধর্মীয় বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন, এরকম আরো অনেক সহীহ্ হাদীস আছে যেগুলোর বর্ণনা দিয়েছিলেন হযরত আয়েশা (রা) ও নবীজি (সা)-এর অন্যান্য স্ত্রীরা আর অন্য মহিলা সাহাবিরা। আল্লাহ্ তাদের শান্তিতে রাখুন।

আর এর উল্লেখ আছে সহীহ্ বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিম শরীফে। তবে তাদের কেউই বলেন নি পুরুষ এবং মহিলাদের সালাত আদায় করার নিয়ম একেবারে আলাদা। উত্তরটা খুব পরিষ্কারভাবে দেয়া আছে আমার লেকচারে আগেও বলেছি। নবী করীম ﷺ বলেছেন ইবাদত করো সেভাবে যেভাবে আমাকে ইবাদত করতে দেখো। (সহীহ্ বুখারী) তাহলে পুরুষ এবং মহিলারা সালাত আদায় করবে একই রকম নিয়মে এবং একই পদ্ধতিতে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৯৯। আসসালামু আলাইকুম, ভাই সালাত আদায় করা কি আবশ্যক? নিজের মতো করে প্রার্থনা করা যাবে না। আল্লাহ কী সেটা কবুল করবেন না? পূর্বের নবী রাসূলরাও কি আমাদের মতো দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন?

উত্তর : ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন– আমরা কি সেভাবে সালাত আদায় করবো যেভাবে কুরআন হাদীসে বলা হয়েছে। নাকি নিজের মতো করে আদায় করা যাবে। আর পূর্বের নবী রাসূলরাও কি এ নিয়মে সালাত আদায় করতেন?

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা দিই, আল্লাহ্ তাআলার সকল রাসূলই সালাত আদায় করেছেন। আর তাদের প্রত্যেকেই সিজদা দিয়েছেন যেটা সালাতের প্রধান অংশ। তবে আমরা যেভাবে সালাত আদায় করি সকল রাসূল হয়তো সেভাবে সালাত আদায় করেন নি। পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদার তিন নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۔

অর্থ : আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণাঙ্গ করলাম, আর তোমাদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে স্থির করে দিলাম ইসলামকে।

পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার পর আমাদের দ্বীন সম্পন্ন হয়েছে। আর এর আগে রাসূলগণ সালাত আদায় করেছেন, সিজদাও দিয়েছেন। তবে সব নিয়ম-কানুন হয়তো এক রকম ছিল না, হয়তো কিছু গড়মিল ছিল। এ সম্পর্কে আগেও বলেছি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়েছি ইত্যাদি। হয়তো মিল ছিল কিন্তু একই নিয়ম ছিল না।

এবার প্রথম প্রশ্নের উত্তর বলি যে, আমাদের ইচ্ছেমতো কি সালাত আদায় করতে পারি? কেন একই নিয়মে সালাত আদায় করতে হবে? আমি কারণটা বলেছিলাম কেন আমরা একই নিয়মে সালাত আদায় করি। সামাজিক উপকার পাবো, আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধ বেড়ে যাবে, আমাদের একতা বাড়বে, আমাদের সাম্যতা বাড়বে। যদি বলেন চেয়ারে বসে আমি বাসায় সালাত আদায় করবো। তাহলে এসকল উপকারগুলো পাবেন না। যেমন সামাজিক সাম্যতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, আত্মার উন্নতি ইত্যাদি। সালাতের বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি। নিয়ম মানলে এ উপকারগুলো পাবেন। কিন্তু আপনার নিয়মে সালাত আদায় করলে এ উপকারগুলো পাবেন না। আর এ নিয়মগুলো আমাদের শিখিয়েছে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল ﷺ। যদি আপনি নিজেকে নবীর চেয়ে বড় মনে করেন, চেষ্টা করে দেখতে পারেন তবে সফল হবেন না। আর পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৫৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۔

অর্থ : অবিশ্বাসীরা চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। আর আল্লাহই শ্রেষ্ঠ কৌশলি।

তাহলে আল্লাহ বলছেন এটা শ্রেষ্ঠ নিয়ম। যদি আপনি নিজেকে আল্লাহর চেয়ে বড় মনে করেন তবে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। কিন্তু ব্যর্থ হবেন। আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করেছেন কুরআনের মতো একটি সূরা রচনা করুক মানুষ চেষ্টা করেও সফল হতে পারে নি। যদি কেউ মনে করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চাইতে উন্নত সে, যদিও এটা একটি কুফর। এজন্যেই অবিশ্বাসীরা নিজেদের নিয়মে প্রার্থনা করে। কিন্তু যে লোক পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করে, তাঁরা শুধু নবীজির নিয়মেই সালাত আদায় করবে। আর কুরআন বলছে– اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২০০। এবারের প্রশ্নটা এসেছে ভাই রিদওয়ানের কাছ থেকে। আসসালামু আলাইকুম। আমি সৌদি আরবের জেদ্দায় চাকরি করি। একবার আমি আমার এক ফিলিপিনি বন্ধুকে নামায আদায় করতে বলি। সে বলে আমি কা'বা শরীফে অনেকবার সালাত আদায় করেছি। আর কা'বা শরীফে একবার সালাত আদায় এক লক্ষ বার আদায় করার সমান। তাই আগামি কয়েক বছর আমার সালাত আদায়ের কোনো প্রয়োজন নেই। কীভাবে এটার উত্তর দিবো?

উত্তর : তার এ কথার কিছু অংশ ঠিক যে, এ সম্পর্কে সহীহ্ হাদীসে আছে। যেখানে আমাদের নবীজি বলেছেন, মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করা মদিনার অন্য যে কোনো মসজিদে এক হাজার বার সালাত আদায় করার সমান। কেবল মক্কার পবিত্র মসজিদ ব্যতীত। আর কেউ যদি মক্কায় এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করে সেটা অন্যান্য যে কোনো মসজিদে এক লক্ষ বার সালাত আদায় করার সমান। আর আমিও একমত এ ব্যাপারে। কম জ্ঞানী মানুষেরা এ হাদীসের আসল অর্থটা বুঝতে পারে না। এখানে আপনি অনেক সওয়াব পাবেন এ মসজিদে সালাত আদায় করলে। কিন্তু এতে করে আপনার অন্যান্য ফরজ সালাত মাফ হবে না।

আমাদের নবীজি এমনটি বলেন নি যে, এ মসজিদে এক ওয়াক্ত ফজরের নামায পড়ো তা একলক্ষ ফজরের ওয়াক্তের সমান। এখানে সওয়াব বেশি আপনি এক লক্ষ গুণ বেশি সওয়াব পাবেন। তার অর্থ এ নয় যে, আপনার এক লক্ষ ওয়াক্ত ফজরের সালাত আদায় না করলেও চলবে। আপনার বুঝার সুবিধার জন্যে আমি আরেকটি উদাহরণ দিই। যখন আমরা বিভিন্ন রকম পরীক্ষা দিই অনেক জায়গায় বোনাস মার্ক থাকে। যদি আপনি ক্রিকেট খেলোয়াড় হন তাহলে আপনি পাঁচ নম্বর পাবেন। মেডিকেল অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হওয়ার সময় কিছু বাড়তি নম্বর থাকে NCC আর খেলাধুলা যেমন ব্যাডমিন্টন বা ফুটবলের জন্যে। যদি আপনি ক্রিকেটার হন অথবা ফুটবলার হন এর জন্যে আপনি ৩ অথবা ৪ নম্বর পাবেন। এখানে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো?

এই নম্বরটা কাজে লাগবে তখন যখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্যে নম্বর লাগবে ৯৫%। আপনি যদি ৯৪% পান এ নম্বরটা কাজে লাগিয়ে আপনি তখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারবেন। কিন্তু কেউ যদি বলে আমি সারাদিন ধরে শুধু ক্রিকেটই খেলব এভাবে সারা বছর ও সারা জীবন খেলে অতিরিক্ত নম্বর যখন পাঁচ পাঁচ করে একশো নম্বর হবে, তখন আমি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে যাব। সে কি ভর্তি হতে পারবে? সে দিন রাত ক্রিকেট খেলতে লাগল সারাদিন আর সারারাত। এভাবে সে পুরো বছরই ক্রিকেট খেলতে লাগল। দশ বছর খেললো। তারপর সে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে বললো, 'আমি এতোদিন ক্রিকেট খেলেছি। এই ক্রিকেট খেলার নম্বরটা হলো বোনাস মার্ক যে এখানে পরীক্ষার

নিয়মিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি এখানে অতিরিক্ত কিছুর জন্যে এ বোনাস মার্ক পাবেন। তাহলে সওয়াব পাবেন, আল্লাহর দোআ পাবেন। কিন্তু এই সওয়াবের জন্যে আপনার অন্যান্য ফরজ সালাত মাফ হয়ে যাবে না। যেগুলো আমাদের জন্যে ফরজ সেগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে। তাহলে কেউ যদি মসজিদে হারামাইনে সালাত আদায় করে, এর জন্যে সে অতিরিক্ত সওয়াব পাবে। কিন্তু তার ফরজ আদায় মাফ হয়ে যাবে না। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২০১। আমি বিষ্ণু মহেশ মেহতা। আমি একজন ব্যবসায়ী, আমি ভারতে দেখেছি সারা মসজিদে নামায পড়ে তাদের জন্যে মসজিদে টুপি পরাটা আবশ্যক, কিন্তু ইরান ও মরক্কোতে যারা মসজিদে নামায পড়তে যায় তারা মাথায় টুপি পরে না বা কিছু দিয়ে মাথা ঢাকে না কেন?

উত্তর : ভাই পবিত্র কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই অথবা সহীহ্ হাদীসও নেই যেটা বলছে মাথায় টুপি দেয়া ফরজ বা সালাত আদায়ে টুপি দেয়া আবশ্যক। এমন কথা কোথাও নেই। তবে সহীহ্ হাদীসে এমন কথা আছে যে, সাহাবারা সালাত আদায়ের সময় মাথা ঢেকে রাখতেন। আর যখন আপনি আপনার মাথা ঢেকে শ্রদ্ধা দেখাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। যদি ভালো করে দেখেন আমাদের প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধা দেখাতে আমরা টুপি পরি। কিন্তু যদি ইংল্যান্ডে যান 'হ্যালো ম্যাম' বলে তারপর টুপি খুলে ফেলে। হ্যালো ম্যাম 'How are you' তারপর টুপি খুলে ফেলে। পশ্চিমা কালচারে শ্রদ্ধার জন্যে টুপি খোলে আর প্রাচ্যে আমরা টুপি পরি। তবে আমরা মুসলিমরা পূর্ব অথবা পশ্চিমের সংস্কৃতি মেনে টুপি পরি না। রাসূলের অনুকরণের জন্যে আমরা শ্রদ্ধা দেখাই। আর হাদীসেও আছে সাহাবিরা সালাতের সময় মাথা ঢেকে রাখতেন টুপি অথবা অন্য কোন কাপড় দিয়ে। সৌদি আরব গেলে দেখতে পারবেন। তবে সহীহ্ হাদীসে কোথাও নেই টুপি পরা ফরজ। যদি মুসলিমরা টুপি ছাড়া সালাত আদায় করে সেই সালাতও ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ কবুল করবেন। এটা ফরজ নয়, তবে সালাত আদায়ের সময় টুপি পরা ভালো। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২০২। এবারের প্রশ্ন স্লিপে। কোনো অমুসলিম কি সালাত আদায়ের সময় অংশগ্রহণ করতে পারে? প্রশ্ন করেছেন ভি. এস. জো?

উত্তর : কোনো অমুসলিম লোক যদি মন থেকে সালাত আদায়ে অংশ নিতে চায় তাহলে প্রথমে তাকে ঈমান আনতে হবে। যদি কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতে চান শুভেচ্ছা স্বাগতম। আর সালাত তখনই কবুল হবে যদি বিনয়ী ও নম্রভাবে আদায় করেন। যদি আল্লাহ তাআলার ওপর বিশ্বাস থাকে তাহলে সে অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করবে এবং সালাত আদায় করবে। কিন্তু সে যদি বলে আল্লাহকে বিশ্বাস করি না আপনার সাথে সাথে এ কাজটা আমি করতে চাই। তাহলে সালাত আদায় করতে পারে কিন্তু তা হয়ে যাবে জিমন্যাস্টিক ব্যায়াম।

বিশ্বাস না থাকলে, ঈমান না থাকলে সালাত কোনো কাজে আসবে না। যদি কোনো অমুসলিম সালাত আদায় করে ইসলাম গ্রহণের পর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ্ সেটা কবুল করবেন। যদি সে আল্লাহকে বিশ্বাস না করে কেবল লোক দেখানোর জন্যে সালাত আদায় করে সূরা আল মাউনে আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে বলছেন–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ـ

অর্থ : দূর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্যে যারা নামায সম্পর্কে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্যে সালাত আদায় করে।

আর সূরা নিসার ১৪২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ ـ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ـ

অর্থ : মুনাফিকরা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন তারা অলসতাসহ নামাযে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায় এবং আল্লাহকে তারা খুব কমই স্মরণ করে থাকে।

তাহলে কুরআন মুনাফিকদের ব্যাপারে বলছে এরা সালাতকে অবহেলা করে। অমুসলিমরা সালাতে দাঁড়াতে পারে, এতে তারা ন্যায়নিষ্ঠার পথে পরিচালিত হবে না। তারা মুনাফিক, তারা ধোঁকাবাজ, তবে কেউ যদি ঈমান এনে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে তাহলে সেটা করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ২০৩। আসসালামু আলাইকুম, ভাই আমরা কি অমুসলিমদের বাসায় সালাত আদায় করতে পারি?

উত্তর : কেন আপনি প্রশ্ন করলেন আমরা অমুসলিমদের বাসায় সালাত আদায় করতে পারি কিনা?

কেন আমি আগেও বলেছিলাম আমাদের নবীজি বলেছেন এটার উল্লেখ আছে সহীহ্ বুখারীতে। 'এই পৃথিবীকে আমার ও আমার উম্মতের জন্যে সিজদা করার স্থান বা মসজিদ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।' (সহীহ্ বুখারী)

আপনি পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় সালাত আদায় করতে পারেন। তবে জায়গাটা হতে হবে পবিত্র। এছাড়াও কিছু নিয়ম-কানুন আছে। যদি কোনো অমুসলিমের ঘরে নামায পড়তে চান তবে কোনো পবিত্র কাপড়ের উপর পবিত্র জায়গায় সালাত আদায় করতে পারেন। খেয়াল রাখবেন যেখানে নামায পড়বেন, তার সামনে যেন কোনো মূর্তি বা ছবি না থাকে, মাঝে একটি সুতরা রাখতে হবে। আমাদের নবীজি একথা বলেছেন। দেয়ালের সাথে একটু দূরত্ব রাখবেন, মাঝে একটা সুতরা রাখবেন। এমনকি একটি তীরও সুতরা হতে পারে। সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ আছে

এই সুতরা একটি দড়িও হতে পারে। আপনি যদি সালাতের নিয়মগুলো মেনে চলেন তাহলে অমুসলিমদের ঘরেও সালাত আদায় করতে পারেন। তবে জায়গাটা যেন পবিত্র হয় এবং সামনে যেন কোনো মূর্তি বা ছবি না থাকে। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২০৪। এবারের প্রশ্ন স্লিপে। সালাত আদায়ের জন্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পোশাক কোনটি? কোর্তা পায়জামা, প্যান্ট, শার্ট না কি অন্য কিছু?

উত্তর : একেবারে ন্যূনতম শর্ত হলো মহিলাদের জন্যে হাত, মুখ ব্যতীত পুরো শরীর ঢেকে রাখতে হবে। জামা ঢিলেঢালা হবে। জামা টাইট হবে না। হিজাবের বিভিন্ন শর্তগুলো পুরুষদের জন্যে নাভি থেকে গোড়ালি হাঁটু পর্যন্ত সাধারণত গ্রহণযোগ্য হলো পুরো শরীর ঢেকে রাখা এমনকি আপনার কাঁধও। এখন কথা হলো কোর্তা পায়জামা পরবেন নাকি প্যান্ট, শার্ট, টাই যদি আপনি সালাতে পোশাকের ন্যূনতম অংশটা পূরণ করেন যেটা সহীহ্ হাদীসে রয়েছে আপনি যেটাতে আরাম বোধ করবেন সেটা পরবেন। যদি আপনি পশ্চিমা ব্যক্তিকে কোর্তা পায়জামা পরতে বলেন তাহলে সে নামাযে এদিক-সেদিক নড়াচড়া করবে। যদি কোনো গ্রামের মানুষকে কোর্ট টাই পরতে বলেন তাহলে সে স্বস্তি পাবে না। তাহলে আপনি যদি সালাতে পোশাকের ন্যূনতম অংশ পূরণ করেন যেটা বলা আছে সহীহ্ হাদীসে, সে শর্ত মেনে আপনি যে কোনো পোশাক পরতে পারেন। তবে সেটা ইসলামি শরীআহর বিরুদ্ধে যাবে না। যদি সে পোশাকটা শরীআহ অনুযায়ী হয়ে থাকে আপনি সেটা পরতে পারেন। তবে গলায় যেন কাপড় ঝুলানো না থাকে। এটা পরে আপনি সালাত আদায় করতে পারেন না। কারণ এটা হারাম। তবে পোশাকটা যদি হারাম না হয় সব শর্ত পূরণ করে তাহলে আপনি কোর্তা, প্যান্ট, শার্ট পরে যদি আরাম পান তাহলে সেটা পরতে পারেন। আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২০৫। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মৌলিক চন্দ্র রানা। আমি একজন অমুসলিম। আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই, মুসলিমদের সালাত এবং হিন্দুধর্মের উপাসনার মাঝে পার্থক্য কী? যেমন পূজা পার্বন, আর সালাত বাদে এসব প্রার্থনা করলে কি কোনো রকম সমস্যা আছে?

উত্তর : আপনি প্রশ্ন করেছেন, মুসলিম এবং অমুসলিমদের প্রার্থনার মাঝে পার্থক্যটা কী– যেমন পূজা। এখানে প্রধান পার্থক্য হলো আমরা যখন সালাত আদায় করি তা করি আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, মহান স্রষ্টার উদ্দেশ্যে। আর মুসলিমরা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাকে মেনে চলে। আমি মহান সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আগেই বলেছি। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা যার উপাসনা করে থাকে, মহান

সৃষ্টিকর্তা বলে মানে আমরা তাকে মানি না। যেমন ধরুন, একজন লোক মূর্তিপূজা করে। আমরা বলি সে যে মূর্তিপূজা করছে সেটা মহান স্রষ্টা নয়। আর যদি ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সেগুলোও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে। তাই আমরা মুসলিমরা যা কিছু করব পবিত্র কুরআন বলছে, 'আস.সেই কথায় যা আমাদের এবং তোমাদের মাঝে এক।'

যদি কোনো হিন্দু লোক আমাকে জিজ্ঞেস করে সে যে মূর্তিপূজা করে তা সঠিক না ভুল?– আমি সেই লোককে বলব যদি আপনি পড়েন বেদ ৩২ নম্বর অধ্যায়ের ৩ অনুচ্ছেদে বলছে, 'না আমি প্রতিমা আস্তি' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার কোনো প্রতিমূর্তি বানানো যাবে না। আপনারা যেটা করছেন সেটা ভুল। ভগবত গীতায় এটার উল্লেখ আছে ৭ নম্বর অধ্যায়ের ১৯-২৩ নম্বর অনুচ্ছেদে যে সকল জাগতিক বিষয়ে চিন্তা করে তারা নকল ঈশ্বরে পূজা করে ও মিথ্যা ঈশ্বরের। যারা মিথ্যা ঈশ্বরের পূজা করে আমি তাদের মনের ইচ্ছেও পূরণ করি। যারা নকল ঈশ্বরের পূজা করে তারা নকল, মিথ্যা ঈশ্বরের রাজত্বে যাবে। যারা আমার উপাসনা করে তারা আমার কাছে আসবে। আমি একজন মুসলিম হিসেবে অমুসলিমদের এ কথাটা বলব আপনারা যেটা করেছেন আমি কুরআনের উদ্ধৃতি দিচ্ছি না। আপনাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ীও সেটা ভুল আপনাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী এভাবে প্রার্থনা করা ভুল। যদি কোন খ্রিস্টানকে প্রশ্ন করেন সে কিন্তু পবিত্র বাইবেলের নিয়মগুলো মেনে প্রার্থনা করে না। পবিত্র বাইবেল বলছে আমি একথা আগেও বলেছি সকল নবী-রাসূল সালাত আদায়ের আগে সিজদা করেছিলেন। সালাত আদায়ের আগে হাত ধুয়েছেন, হযরত মূসা ধুয়েছেন, হযরত হারুন (আ) (তারা সবাই শান্তিতে থাকুন) সিজদা দিয়েছেন, তবে এখন খ্রিস্টানরা প্রার্থনার আগে হাত পা ধৌত করে না, সিজদাও করে না।

আমি তাদের প্রথমে বলবো তাদের ধর্মগ্রন্থ যেটা বলছে সেটা তারা মেনে চলছে না। এরপরও আমি তাদের বলব আল কুরআন হল আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এখানে প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়মের কথা বলা হয়েছে। আর কিছু লোক এখানে পাল্টা যুক্তি দেখাবে কেন তারা বিভিন্ন ধরনের মূর্তির পূজা করে এ ব্যাপারে অন্য একটি ভাষণে বলেছিলাম পৃথিবীর প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলোতে ঈশ্বরের ধারণা এ ক্যাসেটটি দেখলে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন। উত্তরটি পেয়েছেন আশা করি।

প্রশ্ন ঃ ২০৬। এ প্রশ্নটি করেছেন তানজিমে খতিব। ক্লাস ৮ম শ্রেণীর একজন ছাত্র। আপনি বলেছেন, নামায পড়তে হবে কাঁধে কাঁধ রেখে। মহিলারাও কি একইভাবে নামায আদায় করবেন?

উত্তর : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন– আমি একটি অফিসের উদ্ধৃতি দিয়েছি যে, আমাদের নবীজি বলেছেন সালাতের সময় তোমরা কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াও

মহিলারাও কি একই কাজ করবে? আমি আগেও বলেছি মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি আছে। তাই বলে পুরুষ মহিলা কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে এটা ঠিকনা। বর্তমানে আমাদের মেডিকেল সাইন্স বলে মহিলাদের শরীরের তাপমাত্রা ১° বেশি গরম। যখন লাগবে আপনি তখন আল্লাহ বাদ দিয়ে তার দিকে তাকাবেন, তাহলে পুরুষরাও কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে মহিলারাও কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু পুরুষ ও মহিলা একসাথে সালাত আদায় করবে না। সালাতের অন্যান্য নিয়মগুলো পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে সমান। মহিলা ও পুরুষের সমান ও আলাদা ব্যবস্থা থাকবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২০৭। আসসালামু আলাইকুম। ভাই, আপনি বললেন যে, মহিলারা মসজিদে নামায পড়তে পারবে আলহামদুলিল্লাহ। তবে আপনাকে প্রশ্নটা করছি কারণ রমযান মাস সামনে। এ সময়টাকে আমরাও কাজে লাগাতে চাই। তখন এটা দেখা যায় যে, এশার নামাযের সময় আমরা মহিলারা পারিবারিক সমস্যার কারণে মসজিদে যেতে পারি না। তাহলে আমরা যদি বাসায় এশার নামাযের পর ২০ রাকাআত নফল নামায পড়ি, সেক্ষেত্রে একই সওয়াব পাবো, নাকি আমরা মসজিদে যাবো?

উত্তর : বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে, রমযান মাসের সময়ে আমরা তারাবীর নামায পড়ি এশার পরে। তবে পারিবারিক কারণে মহিলারা মসজিদে যেতে পারেন না। আর আলহামদুলিল্লাহ, এখন মুম্বাইতে কিছু মসজিদ দেখা যায় যেখানে মহিলারা তারাবীর নামায পড়তে পারে। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন বেশ কিছু মসজিদ আছে। আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু যদি যেতে না পারেন তাহলে কি বাসায় পড়া যাবে? হ্যাঁ বোন অবশ্যই পড়তে পারেন। তবে ভাল হয় যদি মসজিদে যান। বিশেষ কোন কারণে মসজিদে যেতে না পারেন তবে বাড়িতে একা পড়তে পারেন। আর এখানে কি সওয়াব সমান? স্বাভাবিকভাবেই মসজিদে যাওয়ার নেকী পাবেন। পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শুনবেন। আর যদি কুরআনে হাফেজ না হন তাহলে আপনি তারাবীর নামাযে কুরআন শরীফ খতম দিতে পারছেন না তবে নামায না পড়ার চেয়ে বাসায় পড়া অনেক ভালো। আর সওয়াবের কথা বললে জামাআতে পড়লে সওয়াব বেশি। আমাদের প্রিয় নবী সহীহ্ বুখারীর ১ম খণ্ডে বলেন– তোমরা মসজিদে জামাআতে নামায পড়লে ২৫ গুণ অথবা ২৭ গুণ বেশি সওয়াব পাবে। তাহলে জামাআতে সালাত আদায় করলে বেশি সওয়াব পাবেন। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২০৮। স্যার, আমার নাম ওয়াসিগরেন। আমি একজন খ্রিস্টান সাংবাদিক। আমরা জানতাম যে, ক্রুসেডাররা যে ক্রুসেডে গিয়েছিল সেগুলো ছিল পবিত্র যুদ্ধ। কিন্তু এখন আমরা জানি যে, ক্রুসেড কিভাবে

নিরীহ মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছিল? এভাবে কি বলা যায় না যে, এ ক্রুসেড থেকেই ধর্মীয় সন্ত্রাসের শুরু? সত্য কথা হল তারা সন্ত্রাস চালিয়েছে, আর এখন তারাই মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলছে। পাশ্চাত্যের লোকেরা ক্রুসেডকে মানুষের সামনে এভাবে তুলে ধরে কেন? ইউরোপিয়ান আর আমেরিকানরা ক্রুসেডকে পবিত্র যুদ্ধ আর মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলে কেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি বেশ ভালো প্রশ্নই করেছেন। উনি একজন খ্রিস্টান, উনি স্বীকার করলেন আর আমিও আপনাদের বলছি। মুসলমানেরা এ পবিত্র যুদ্ধকে বলেছে 'জিহাদ'। এক এক জায়গায় এক এক নাম। আর ক্রুসেড যখন পবিত্র যুদ্ধ তখন মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে যে, এটা খুব পবিত্র। আর তিনি একজন সাংবাদিক, তারপরও তিনি সত্য কথাটা স্বীকার করলেন। এ ক্রুসেড নিরীহ মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছে, আমি এ সম্পর্কে আগে কিছু বলি নি। কারণ আমি এখানে ইসলামের ওপর কথা বলছি। আমি এখানে অন্য ধর্মের কথা বলছি না। অন্য ধর্মের সমালোচনা করছি না। সমালোচনা করতে চাইও না। প্রত্যেক ধর্মই শান্তি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়। আপনি প্রশ্ন করেছেন, তাই বলতে হচ্ছে, হ্যাঁ ভাই, আপনি ঠিক বলেছেন যে, ক্রুসেড মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছে। সন্ত্রাস তারাই শুরু করেছে। আর এখন তারা মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলছে।

আর পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তা যদি আপনি দেখেন, তাহলে দেখবেন, পৃথিবীতে ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা এখন সর্বোচ্চ হারে বাড়ছে। মুসলমানেরা যে সবাই ভালো, সে কথা বলছি না। সব ধর্মেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে। তবে সব মিলিয়ে আপনি বলতে পারবেন না যে, মানুষকে তরবারির মুখে জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে। কোনদিন না, কখনো না। বরঞ্চ, মুসলমান হওয়ার কারণে অনেক মানুষকে হেনস্তা, অপদস্ত করা হচ্ছে। এ সমস্যার সমাধান আপনি পাবেন, যদি আপনি বাইবেল পড়েন। বাইবেলে দেখবেন, যীশু খ্রিস্ট বা ঈসা মসীহ বলেছেন– (ম্যাথিউ এর গসপেলে। অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ৪০, ৪১-এ।)

'যদি কেউ তোমার ডান গালে থাপ্পর দেয়, অন্য গালটা বাড়িয়ে দাও। যদি কেউ তার সাথে এক মাইল থাকতে বলে, তুমি দুই মাইল তার সাথে থাকো। যদি কেউ তোমার জামাটা চায়, তাকে তোমার আলখাল্লাটা দিয়ে দাও।'

তাহলে যীশুখ্রিস্ট যিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর একজন প্রেরিত নবী, তিনি আমাদের শান্তি কি তা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা প্রতিবেশীকে ভালবাসো।' আপনি যদি ভাল করে দেখেন, যদি ভালো করে বাইবেল পড়েন, তাহলে দেখবেন কোথাও লেখা নেই যে, যীশুখ্রিস্ট বা ঈসা মসীহ মুসলমানদের অপদস্ত করতে

পবিত্র, সেই ধর্মে ফিরে যান। যেই ধর্মগ্রন্থ সবচেয়ে পবিত্র, সেটা ভাল করে পড়েন। কোরআনে বলা হচ্ছে, (সূরা আলে ইমরান : পারা-৩, আয়াত নং ৬৪-তে)

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا ـ

অর্থ : তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত এবং সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি উহাকে (সত্য দ্বীনকে) সব জীবন ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করতে পারেন।

আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২০৯। আমার নাম সিলে রাজা। আমি একজন অমুসলিম। আমার ভাই সাইফুল্লাহ, দেখতেই পাচ্ছেন যে, স্টেজের ওপরে বসে আছে, সে মুসলমান হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আর এজন্য বাবা-মায়ের সাথে ওর বেশ সমস্যা হচ্ছে। এটা আমার প্রশ্ন না, আসলে আমি এখানে অন্য ধর্মের মানুষ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আমি একটা কথা বলতে চাই যে, অমুসলিমরাও যে কোন প্রশ্ন করতে পারেন। আলোচনার ভেতরে এবং আলোচনার বাইরেও। এটা একটা সুযোগ। আর সুযোগ সব সময় আসে না। আপনি এটার সদ্ব্যবহার করেন। আমি যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি আছি। আপনি যদি অমুসলিমও হন, আমি সানন্দে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব। আলোচনার ভেতরে এবং বাইরে যে কোনো ধর্মের ব্যাপারে। এটা আমার সৌভাগ্য। হ্যাঁ ভাই, প্রশ্নটা বলেন।

প্রশ্ন ঃ ২১০। হ্যাঁ, ১১ সেপ্টেম্বরের পরে এখন যা পরিস্থিতি আর ১১ সেপ্টেম্বরের আগে কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ার আমেরিকান দূতাবাসে যে বোমা বিস্ফোরণ হলো সে পরিস্থিতির মধ্যে অনেক পার্থক্য। আসলে আমি ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি। আশেপাশের সবাই এখন ওসামা বিন লাদেন আর ইসলাম নিয়ে কথা বলছে। সবাই বলছে, ইসলাম মানেই ওসামা বিন লাদেন। আমার ভাইয়ের মতামত হলো যে, ইসলাম এক জিনিস, আর ওসামা বিন লাদেন আরেক জিনিস। আমি আসলে একটা সহজ প্রশ্ন করতে চাই। ইসলামের মূলনীতি অনুসারে স্রষ্টায় বিশ্বাসী একজন লোক হিসেবে, আপনার কি মনে হয়, মুসলমানরা সবাই বলতে পারবে যে, ইসলাম এক জিনিস আর ওসামা বিন লাদেন আরেক জিনিস।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো, আমার বন্ধুর পক্ষ থেকে। আমার বন্ধু শারীরিক প্রতিবন্ধী। তার প্রশ্ন হলো, স্রষ্টা কেন মানুষকে পঙ্গু করে পৃথিবীতে পাঠান।

কোরআনের কোনো আয়াতে বা নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর হাদীসে কি এ ব্যাপারে কিছু বলা আছে যে, কি কারণে স্রষ্টা মানুষকে শারীরিক প্রতিবন্ধী বা পঙ্গু করে পৃথিবীতে পাঠান। প্রশ্ন এটাই। আর আমার ধারণা, এর পরে আমি আর কথা বলার সুযোগ পাব না। তাই ইসলামিক ইনফরমেশন সেন্টার এবং ড. ফাতিমা মুসিফার আর ড. জাকির নায়েককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এ প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনার প্রশ্ন মূলত দুটি। প্রথম প্রশ্নটা ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো, কেন মহান স্রষ্টা মানুষকে পঙ্গু বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। প্রথম প্রশ্নটা হলো, ওসামা বিন লাদেন কেন ইসলামের নেতৃত্ব দেবে? ইসলাম এক কথা বলে আর লাদেন আরেক কথা বলে, আর আমি ওসামা বিন লাদেনকে কিভাবে দেখি? ভাই, আমি ওসামা বিন লাদেনকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো পরিচয় নেই। তার সাথে আমার কখনো দেখা হয় নি।

এ প্রশ্নটা কয়েক মাস আগে আমাকে অস্ট্রেলিয়াতেও করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পার্থে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনি কি ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসী মনে করেন?' আমি একই উত্তর দিয়েছিলাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওসামা বিন লাদেনকে চিনি না। তবে আমরা প্রত্যেক দিন যে খবরগুলো বি.বি.সি, সি.এন.এন ইত্যাদিতে দেখছি, আর যদি খবরগুলো সত্য বলে মেনে নেই, তাহলে তাকে সন্ত্রাসী না মেনে উপায় নেই। কিন্তু পবিত্র কোরআনে সূরা হুজুরাতের ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ .

অর্থ : যদি কোনো ফাসিক ব্যক্তি এমন কোনো সংবাদ নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়– যাতে তোমরা অজ্ঞভাবে কোনো জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে অতঃপর তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।

ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে বলতে গেলে, আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। কখনো তার সাথে দেখাও হয় নি। খবরগুলোর সত্যতা যাচাই না করে বলতে পারছি না, সে আসলেই সন্ত্রাসী কি-না। তবে একটা কথা বলতে পারি, তাঁকে সি.এন.এন-এ সবসময় বলা হচ্ছে, এক নম্বর সন্দেহভাজন, প্রমাণ নেই। যার মাথায় সামান্য বুদ্ধি আছে সেও বুঝবে, যে প্রমাণগুলো আছে সেগুলো কোনো প্রমাণই না। অপরাধের প্রমাণ কোথায়? আমি ওসামা বিন লাদেনের পক্ষে বলছি না। উনি আমার বন্ধু না। আমি তাকে চিনি না। আমি একথা বলছি না যে, সে

ভালো। আবার এ-ও বলছি না যে, সে খারাপ। কিন্তু শুধুমাত্র সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর দূর্বল দেশের ওপর আক্রমণ করাটা কি যৌক্তিক? পবিত্র কোরআনে সূরা হুজুরাতের ১১ ও ১২ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! কোনো জাতি যেন অপর জাতিকে উপহাস না করে। কারণ হতে পারে যাকে উপহাস করা হয়েছে সে তাদের চেয়ে উত্তম। আর কোনো মহিলাও যেন অপর মহিলাকে উপহাস না করে, কারণ হতে পারে উপহাসকৃতা উপহাসকারিণীর চেয়ে উত্তম। আর তোমাদের নিজেদের বড় মনে করো না এবং অপরের উপাধি নিয়ে উপহাস করো না। ঈমান গ্রহণের পর পাপাচারমূলক নামে ডাকা কতই না মন্দ কাজ। আর যারা এসব থেকে প্রত্যাবর্তন না করে তারাই অত্যাচারী।

পার্থে যিনি আমেরিকার ভাইস কনসাল জেনারেল, এ একই প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসী মনে করি কি-না? আর আসল সন্ত্রাসী কে? আমার উত্তরটা পরের দিন খবরের কাগজের হেডিং-এ এসেছিল। আমি চিন্তা করছি যে, একই উত্তরটা দেব কি-না। সেই ভাইস কনসাল জেনারেলকে আমি বলেছিলাম, বি.বি.সি আর সি.এন.এন-এর রিপোর্ট থেকে যতদূর জানি, তাতে কোনোভাবেই তাকে সন্ত্রাসী বলা যায় না। আমি একথা বলছি না যে, সে ভাল। আবার এ-ও বলছি না যে, সে খারাপ। তা না হলে আল কায়েদার একজন সন্ত্রাসী পাওয়া গেছে বলে হয়তো কালই আমার বাড়িতে পুলিশ পাঠাবেন। তাই আমি তার পক্ষেও বলছি না, বিপক্ষেও কিছু বলছি না। যেহেতু আমি জানি না তাই প্রমাণ ছাড়া শুধু সন্দেহের বশে কাউকে আক্রমণ করা যায় না। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর দেশটি শুধু সন্দেহের বশে পৃথিবীর সবচেয়ে দূর্বল দেশকে আক্রমণ করল।

১১ সেপ্টেম্বরের জন্য দায়ী কে? এ ব্যাপারে শুধু আমেরিকাতেই কয়েকশ মত রয়েছে। যদি আপনি ইন্টারনেট দেখেন, তাহলে দেখবেন সেখানে আমেরিকান সাংবাদিক, ঐতিহাসিকরাই বলছে যে, ওসামা বিন লাদেন এটি করে নি। একটু চিন্তা করেন, একজন মানুষ কোত্থেকে এতো প্রযুক্তি পাবে? আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সি.আই.এ, এফ.বি.আই. এর বাজেট কোটি কোটি ডলার। আমি একথা বলছি না যে, তারা যা বলছে তা ভুল, অথবা তারা যা বলছে তা ঠিক। আমি শুধু

একটি তথ্য আপনাদের দিচ্ছি। আমি বিভিন্ন দেশ এবং ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখেছি যে, কিছু লোক বলছে জর্জ বুশ নিজেই এটি করেছে। এখন আপনি যদি শুধু সন্দেহের বশে বলেন যে, বুশই আসল অপরাধী, ওকে আমার কাছে তুলে দাও, না হলে আমি আমেরিকায় বোমা মারব। তাহলে আপনাকে পাগল বলা হবে। আমরা সি.এন.এন. আর বি.বি.সি. থেকে যতটুকু জানি, তা হলো এটি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

আপনারা জানেন, কিছু রাজনীতিবিদ তাদের সুবিধার জন্য ঘটনার মোড় ঘোড়ায়। আমেরিকানরাই এ ব্যাপারে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছে। তারা বলছে যুদ্ধটা হয়েছে তেলের জন্য, এটার জন্য, ওটার জন্য, আরো কত কি। আমি বলছিনা যে, তাদের কথা ঠিক বা ভুল। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে, এ কাজটি ওসামা বিন লাদেন করেছে। কিন্তু শুধু একজন লোকের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল দেশের ওপর আক্রমণ করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা সন্ত্রাস ছাড়া কিছুই নয়। খবরের হেড লাইন ছিল যে, আমি বলেছিলাম পৃথবীর এক নম্বর সন্ত্রাসী হলো জর্জ বুশ। প্লিজ আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি শুধু ভাইস কনসাল জেনারেলের পার্থের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। প্রশ্নকর্তাকে বলছি, ভাই আপনাকে বুঝতে হবে যে, প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষী বলা যায় না। ইসলামে বলা হচ্ছে যে, যদি কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, আর সেটা যদি তদন্তে ধরা পড়ে, তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। ইসলামে আরো বলা হচ্ছে যে, যদি কেউ তথ্য পায় তাহলে সেটা কাউকে বলার আগে তা সত্য কি-না যাচাই করতে হবে। শুধু মিথ্যা খবরের কারণেই ভুল বুঝাবুঝি আর যুদ্ধ হচ্ছে। আর বর্তমানের অবস্থা হচ্ছে এক নম্বর সন্দেহভাজন ব্যক্তি হল সাদ্দাম হোসেন। আসলে তাদের ইস্যু তৈরি করার জন্য কাউকে না কাউকে দরকার। তাদের সুবিধার জন্য সব কিছু মিথ্যা দিয়ে সাজাচ্ছে। আপনি যদি লাদেনকে অভিযুক্ত করেন তাহলে আপনাকে প্রমাণ দেখাতে হবে। অনুমান দিয়ে অভিযুক্ত করা যায় না।

প্রমাণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে, ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টারে একটি পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। তাহলে বলা যায়, এখন থেকে আমেরিকার পুলিশের ড্রেস ঐ পাসপোর্টের মালমসলা দিয়ে বানানো হোক। তাহলে তাদের কিছু হবে না। চিন্তা করুন, এত বড় বিস্ফোরণ হল, যেখানে তাপমাত্রা ছিল হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াস। সেখানে প্রচণ্ড পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হল অথচ সেই জায়গায় তারা একটা পাসপোর্ট খুঁজে পেল। এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা যারা মুসলমান, যদি কোন মুসলিম বা অমুসলিমকে কোন অপরাধে অভিযুক্ত করি, তাহলে তাকে অপরাধী বলার আগে সেটা প্রমাণ করতে হবে। আর যদি আমরা প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ করি, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

এবার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসি। **কেন? কি কারণে আল্লাহ কিছু মানুষকে পঙ্গু বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠান।** ভাই, এর কারণটা পবিত্র কোরআনে সূরা মূলকের ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ـ

অর্থ : তিনি সেই সত্তা যিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম আমলকারী।

এখন এ প্রশ্নে আসি যে, কেন কিছু মানুষ পঙ্গু হয়, কেউ গরিব আবার কেউ জন্মগত অসুখ (ক্রটি) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ প্রশ্নটি হিন্দু দার্শনিকদেরও সমস্যায় ফেলে। আর এ কারণে হিন্দু দার্শনিকরা একটি দর্শনের কথা বলেছে। তারা বলেন, এটি হল "সংস্কার" জন্ম বা পুনর্জন্মের চক্র। আমি বেদসহ সব ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। বেদে বলা হচ্ছে পুনর্জন্মের কথা। 'পুনঃ' মানে পরবর্তী 'জন্ম' অর্থাৎ পরবর্তী জীবন। এমনকি কোরআনেও মৃত্যুর পর জীবনের কথা বলা হচ্ছে। তবে সেটা বেদের মতো না। জন্ম, তারপর মৃত্যু, আবার জন্ম আবার মৃত্যু, আবার জন্ম আবার মৃত্যু এমন কোন চক্র আসলে নেই। কিন্তু হিন্দু ধর্ম দর্শনের একটি প্রধান ভিত্তি হল 'কর্ম' যা ধর্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কর্ম নির্ভর করে ধর্মের ওপর। এর একটি ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া আছে।

আর এর ওপর ভিত্তি করে হিন্দু দার্শনিকরা মনে করেন যে, সম্ভবত আগের জীবনে এ লোকগুলো কোনো অন্যায় করেছিল। তাই এ জন্মে তারা পঙ্গু হয়েছে। যদিও এ কথা বেদের কোন অনুচ্ছেদে নেই। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ বেদে এ সম্পর্কে আপনি কিছুই পাবেন না। সেখানে আপনি পাবেন শুধু পুনর্জন্ম, যার অর্থ পরবর্তী জীবন। খ্রিষ্টানরা এটি বিশ্বাস করে। মুসলমানরাও বিশ্বাস করে। কিন্তু কেন কিছু মানুষ কঠিন অসুখ নিয়ে জন্মায়, তারা এর ব্যাখ্যা দিতে পারে না। হিন্দু দার্শনিকরা যুক্তি দেখায় যে, মানুষ মারা যায়, তারপর রূপ পরিবর্তন করে। যদি আপনি আগের জন্মে খারাপ কাজ করেন, তাহলে এ জন্মে আপনি পঙ্গু হয়ে জন্ম গ্রহণ করবেন। আর যদি কোনো মানুষ ভালো করে থাকে, পরের জন্মে সে উঁচু জাতে জন্মায়। আর সবচেয়ে উঁচু স্তরের প্রাণী হলো মানুষ। এ জন্মে আপনি খারাপ কাজ করলে নীচু স্তরের প্রাণী হয়ে জন্মাবেন। হতে পারে বিড়াল, কুকুর অথবা অন্য কোন প্রাণী। আমি একটি প্রশ্ন করি, পৃথিবীতে এখন অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? নিশ্চয়ই বাড়ছে। আর এখনকার দিনে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে না কমছে? নিশ্চয়ই বাড়ছে। যদি ধরে নেই, খারাপ কাজ করলে নীচু স্তরে জন্ম হয়, তাহলে তো পৃথিবীর জনসংখ্যা কমে যেত।

তারপরও কথা থাকে, কেন কিছু লোক পঙ্গু হয়ে জন্মায়, কেউ গরিব আবার কারো জন্মগত ত্রুটি থাকে। এর উত্তর দেয়া হয়েছে পবিত্র কোরআনের সূরা মূলকের ২ নং আয়াতে–

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ ـ

অর্থ : তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন।

পৃথিবীতে আপনার জীবন পরকালের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আপনাকে দেয়া পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে আপনার বিচার হবে। আর মহান স্রষ্টা এক এক জনকে এক একভাবে বিচার করেন। বাস্তবে প্রত্যেক বছর প্রশ্নপত্র বদল হয়। যদি প্রশ্ন না বদলায় তাহলে পরীক্ষাটা কোথায়? প্রশ্ন প্রতি বছর বদলাবেই।

একইভাবে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কিছু মানুষকে তিনি সম্পদ দেন। আর যদি কাউকে তিনি সম্পদ দেন, ইসলামিক শরিয়াহ বলে, আপনার অতিরিক্ত সম্পদের আড়াই পার্সেন্ট দান করে দিতে হবে। যেটাকে বলা হয় যাকাত। গরিব লোককে কোনো যাকাত দিতে হবে না। সে যাকাতের ১০০% পাবে। আর ধনী লোকের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা খুব কঠিন হবে। যীশু খ্রিস্ট বলেছেন– 'ধনী লোকের পক্ষে স্বর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব।'

আর মহানবী মোহাম্মদ ﷺ বলেছেন, 'ধনী লোকের পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করা খুব কঠিন।'

যদি ভালো করে খেয়াল করেন, তাহলে দেখবেন, মহান স্রষ্টা আপনাকে যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, তা দিয়েই আপনার বিচার হবে। যদি তিনি আপনাকে সম্পদ দিয়ে থাকেন, আপনাকে যাকাত দিতে হবে। যদি আপনার সম্পদ না থাকে তবে যাকাত দিতে হবে না। কেন কিছু মানুষকে আল্লাহ পঙ্গু করে বানায়? এ ছোট শিশুর অপরাধ কি? সে কি অন্যায় করেছে?

আমরা ইসলামে বিশ্বাস করি। ইসলাম আমাদের বলে যে, প্রত্যেকটি শিশুই মানুষ। প্রত্যেক শিশুই নিরপরাধ আর নিষ্পাপ। হতে পারে এটি বাবা-মায়ের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, "তোমার সম্পত্তি, সন্তান আর স্ত্রী হলো তোমার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। হয়তো আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করছেন। হতে পারে বাবা-মা খুব ধার্মিক। এখন স্রষ্টা তাদের সন্তানকে পঙ্গু করে আরো কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন। স্রষ্টা হয়তো দেখতে চাচ্ছেন, এখনো কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর? আর পরীক্ষা যত কঠিন, পুরস্কারও ততো বড়। যেমন ধরুন, যখনই আপনি এম.বি.বি.এস পাস করবেন, আপনার নামের আগে ডাক্তার লেখা হবে। পরীক্ষাটা কঠিন; কিন্তু যখনই আপনি পাস করবেন, আপনি একজন ডাক্তার। সম্মান অনেক বেশি। পরীক্ষা যত কঠিন, পুরস্কারও তত বড়। আর আল্লাহ বিভিন্ন মানুষকে

বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কেউ পঙ্গু হয়ে জন্মেছে, তার মানে এই না যে, সে আগের জন্মে কোনো অন্যায় করেছে। সে নিষ্পাপ। তার এ পঙ্গুত্ব হয়তো তার বাবা-মায়ের জন্য পরীক্ষা। হতে পারে এটা তার নিজের জন্যই পরীক্ষা।

আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করতে চান যে, সে এখনো স্রষ্টাকে বিশ্বাস করে কি-না। আর এজন্য আল্লাহ কিছু মানুষকে গরিব ঘরে পাঠান আবার কিছু মানুষকে করেন ধনী। কিছু মানুষ ভাল স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মায়। আর কেউ পঙ্গু হয়ে জন্মায়। আর আল্লাহ বিচার করেন পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে। চিন্তা করেন, ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় কিছু লোক যদি পঙ্গু থাকে তারা ৫০ মিনিট আগে থেকে দৌড় শুরু করে। কারণ, হয়তো তার পায়ে সমস্যা আছে, আর এ কারণে সে শুরু করে ৫০ মিনিট আগে থেকে। যদি আল্লাহ কোন মানুষের কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেয়, তাহলে তিনি সেভাবেই বিচার করবেন। যদি পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন হয়, তাহলে শিক্ষক সহজভাবে খাতা দেখেন। আর যদি প্রশ্ন সহজ হয়, তাহলে শিক্ষক কঠিনভাবে খাতা দেখেন। আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন রঙে বিভিন্ন ভাষায় ও আলাদা আলাদা পরিবেশে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ যাকে যে পরিবেশ দিয়েছেন, যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, সেভাবেই তার বিচার করবেন। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২১১। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামের বিরুদ্ধে যে বইগুলো লেখা হয়েছে, তা নিয়ে পৃথিবীর অনেকেই বিশ্বাস করে যে, আমাদের ধর্ম ভুল, আমাদের কোরআন ভুল, আমাদের নবীরা ভুল। আর এটি যারা বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে অনেক খ্রিস্টান আছে যারা বাইবেল বিশ্বাস করে। বাইবেল যে নবীদের কথা বলছে, কোরআনও তাদের কথা বলছে। যীশুখ্রিস্ট, মূসা (আ) আমাদেরও নবী। তাহলে সন্ত্রাসী বলতে শুধু মুসলমানদের বুঝানো হয় কেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনার প্রশ্নটা ভালো। যখন কোরআন আর বাইবেলে এতো মিল, তখন মুসলমানদের এতো অপদস্থ করা হয় কেন? আমি আপনাদের আগেও বলেছি, এ 'মৌলবাদী' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল একদল খ্রিস্টানকে বুঝাতে। প্রায় একশো বছর আগে, চার্চের বিরোধিতা করে একদল খ্রিস্টানকে বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি ভাষায় প্রথম খ্রিস্টানদের বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এখন দাবার ছক পাল্টে গেছে। তারা টেবিলটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। তারা এখন মুসলমানদের মৌলবাদী বলে। ব্যাপারটা এরকম কেন? আমাদের সাদৃশ্যের ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি। বোন আমি সেখানে ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে অনেক সাদৃশ্যের কথা বলেছি। সাদৃশ্য আছে কোরআন ও বাইবেলেও। তাহলে আসুন, আমরা সবাই অন্তত পক্ষে সাদৃশ্যগুলো মেনে চলি। পার্থক্যগুলো পরে আলোচনা করা যাবে। তাহলে ওরা

কেন এমনটা করছে? কারণটা সহজ। আমি আগেও বলেছি যে, পৃথিবীতে এখন ইসলামের অনুসারী বাড়ছে সর্বোচ্চ গতিতে। ঐ লোকগুলো হয়তো ভয় পাচ্ছে যে, ইসলামের যেভাবে বিস্তৃতি ঘটছে, তাতে করে ওরা এখন যা করছে সে কাজগুলো তাদেরকে বন্ধ করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ২১২। (মহিলা) ঃ শুভ সন্ধ্যা, স্যার। আমার নাম ওয়াসেপ জাগরা। আমি একজন আইনের ছাত্রী। প্রথমেই আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সন্ত্রাস ও ইসলামের ওপর এ তথ্যবহুল বক্তৃতা দেয়ার জন্যে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হঠাৎ বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো সম্পর্কে যেগুলো আসলে ইসলামিক আর তারা ইসলামের নামে যুদ্ধ করে সেগুলো সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? আপনিই বলেছেন যে, ইসলাম নির্দেশ দেয় যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধাদের ক্ষতি করা বা হত্যা করা যাবে না। কিন্তু অনেক বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে যেখানে নারী ও শিশুরা মারা গেছে। আপনি এদের সম্পর্কে কি বলবেন? আপনাকে ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে সন্ত্রাসী সংগঠনের সংখ্যা বাড়ার কারণ কি? ইসলাম যখন বলে নারী ও শিশুদের হত্যা করা যাবে না; তখন অনেক বোমা বিস্ফোরণে নারী ও শিশু হত্যার কারণটা কি? এটা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন। কোন কট্টর সন্ত্রাসীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমার কখনো সাক্ষাৎ হয় নি। তবে আমি কারণটা যুক্তি দিয়ে বলতে পারি। প্রথমত, কিছু মানুষ হয়তো আসলেই নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার করছে। তারা হয়তো কোরআনের নির্দেশ মানছে না। প্রত্যেক গোষ্ঠীতেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে। এদের মধ্যে মানব ইতিহাসে এক নম্বর সন্ত্রাসী হল হিটলার। সে ষাট লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছিল। এজন্য কি আমি খ্রিস্টান ধর্মকে দায়ী করতে পারি? হিটলার একজন খ্রিস্টান ছিল বলে খ্রিস্টান ধর্মকে দায়ী করা যাবে না। আপনি যদি পৃথিবীর সব সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর হত্যাকাণ্ডগুলো দেখেন, তাহলে আমার মনে হয় না সব মিলিয়ে ষাট লক্ষ হবে। একজন মানুষ একাই ষাট লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল– আবার দেখেন, মুসোলিনী হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। তার অর্থ-এই নয় যে, আমি খ্রিস্টান ধর্মকে দায়ী করব। যারা সন্ত্রাসী কাজকর্ম করছে তারা নিজেদের মুসলমান বলতে পারে আর এটা ভুলও হতে পারে।

দুই নম্বর পয়েন্ট এটা হতে পারে যে, ঐ লোকগুলোকে অপদস্থ করা হয়েছে। লোকগুলো হয়রানির শিকার হয়েছে। আপনি কি দেখেছেন এখন কোনো ইন্ডিয়ান দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে? কিন্তু একশো বছর আগে অনেকেই যুদ্ধ করেছেন। এখন আপনি যদি প্রশ্ন করেন ভাই জাকির, কেন একশো বছর আগে

অনেক ইন্ডিয়ান তাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করত? কারণটা সহজ। তখন ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিয়া শাসন করতো–এ কারণেই মানুষ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতো।

আজকে ব্রিটিশ সরকার চলে গেছে তাই কেউ আর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে না। সেজন্যে হতে পারে এ মুসলমানরা যারা আসলেই হয়রানির শিকার হয়েছে। হতে পারে তাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাবেন। যেমন– প্যালেস্টাইন। আপনি যদি ইতিহাস ঘাটেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, তারা আসলেই হয়রানির শিকার হয়েছে। আর যখন কেউ তাদের সাহায্য করতে আসে নি, তখন তাদের যা ছিল তা নিয়েই মোকাবেলা করেছে। যেমন ধরুন, বাইবেলের সেই ঘটনাটা যেটা ডেভিড আর গোলাইয়াথ (দাউদ আর জালুত) মধ্যে একটা পাথর নিয়ে সমস্যা হয়েছিল।

তাই দোষটা কাদের দেয়া যায়? দোষটা আসলে আমাদেরই। কারণ, আমরা এ সমস্যার মূল কারণটা খুঁজছি না। যদি কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন থাকে, তাহলে আমাদের সেখানে গিয়ে দেখতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে কি কারণে তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। শুধু এভাবেই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। তাদেরকে হত্যা করে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আপনি একজনকে হত্যা করলে দশজন আসবে। তাই আমাদের পেছন ফিরে দেখতে হবে আসল কারণটা কি? কোন কারণে তারা এ পথ বেছে নিয়েছে। আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এর মূল কারণ।

উদাহরণ হিসেবে প্যালেস্টাইনের কথা বলা যায়। হিটলার যখন ষাট লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করল এবং অনেককে জার্মানি থেকে তাড়িয়ে দিল, তখন প্যালেস্টাইনরা বলেছিল, 'আহলান ওয়া সাহলান।'

তোমরা আমাদের জ্ঞাতি ভাই। আমাদের কাছে চলে আসো। ব্যাপারটা এরকম যে, আমি এক অচেনা লোককে বললাম কোনো অসুবিধা হলে আমার ঘরে এসে থাকো। কয়েক বছর পর সে আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। আর যখন আমি ঘরের বাইরে এসে শোরগোল শুরু করলাম এ কারণে যে, তারা আমার ঘর দখল করেছে, তখন আপনি আমাকে বললেন, 'সন্ত্রাসী'। আসলেই আমি কি সন্ত্রাসী? শুধু মানবতার কারণে আমি আমার ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আর এখন আমিই কি-না সন্ত্রাসী।

কাকে দোষ দেব? দোষ আসলে আমাদেরই। আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আসলে সমস্যাটা কোথায়? সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন এবং সবাইকে একত্রিত করার শক্তিও দিয়েছেন। যদি আপনি মূল কারণটা দেখেন তাহলে অনেক বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেন একজন মানুষ মরতে চায়? কে মরে যেতে পছন্দ করে? যে মানুষটা বলে, আমি নিজেকে মারতে পারি, তাহলে

কেন সে আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মরবে না? আপনারা যদি কোনো মনোবিজ্ঞানীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, তিনি বলবেন, মূল কারণ জানতে হলে প্রথমে ঐ লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, কেন তারা এগুলো করছে? সে ক্ষেত্রে আপনি অনেক সময়ই দেখবেন যে, এর পেছনে কিছু যৌক্তিক কারণ আছে।

আর কারণটা হচ্ছে, হতে পারে তাদের কিছু অংশ হয়রানির শিকার হয়েছে, আর কিছু অংশ আসলেই সন্ত্রাসী। কেউ মানুষকে অত্যাচার করে টাকার জন্য, কেউ হয়তো খ্যাতির জন্য, আবার কেউ হয়তো রাজনীতির জন্য। এ ব্যাপারে আমি একমত। আমি মনে করি এদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছিল। হতে পারে তারা মুসলমান, হতে পারে তারা হিন্দু, হতে পারে তারা খ্রিস্টান। যখন মানুষ আর তাদের ওপর চালানো অত্যাচার সহ্য করতে পারে না, তখন তার একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। তখন সে বেছে নেয় সহিংসতার পথ। মনোবিজ্ঞানীরাও একথাই বলেন। আমি একজন মেডিকেল ডাক্তার হিসেবে একথা বলতে পারি যে, মানুষের স্বভাব হলো অত্যাচারিত হলে তার শোধ নেয়া। একজন মানুষ যে একটা আঙ্গুলও উঁচু করতে চায় না, কেন সে বন্দুক হাতে নিতে চাইবে? কেন আমাদের এমনটা করতে হবে? সবার ভালোর জন্যই আমাদের মূল কারণটা খুঁজে বের করতে হবে এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। তবেই এ নিরীহ মানুষের ওপর সন্ত্রাস বন্ধ হবে এবং সব মানুষ এক জাতি হিসেবে একসাথে বসবাস করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ ২১৩। আমার নাম রবিঠাকুর। আমি একজন সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। প্রথমেই আমি ইন্ডিয়ান ভাইদের অনুরোধ করছি যে, সবসময় ১১ সেপ্টেম্বরকেই সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করবেন না। কারণ, ইন্ডিয়াতেও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। কাশ্মীরে বিশ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে। দুই হাজার মুসলমান ভাই মারা গেছে গুজরাটে। তাই এখানে অনেক ঘটনাই ঘটে যাকে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করা যায়। শুধু ইন্ডিয়াতেই যেমন ১৩ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করতে পারি। সেদিন কিছু লোক আখকসাধামের মন্দিরে ঢুকে অনেক মানুষকে হত্যা করেছিল। এটাকে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করা যায়। জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো পরিষ্কার করার জন্য আমি মি. জাকির নায়েককে ধন্যবাদ জানাই। আমার প্রশ্নটা হলো– আপনি বলেছেন যে, শুধু একজন লোকের কারণে একটা দেশকে আক্রমণ করা যায় না। এখন আমি আপনাকে একটা কাল্পনিক ঘটনা বলি। ধরুন, আমি কোন আরব দেশে গেলাম। সেখানে লক্ষ-কোটি মানুষ মেরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে আবার ইন্ডিয়ায় চলে আসলাম। তারপর সেই দেশটা প্রমাণ দেখালো ইন্ডিয়ার সরকারকে, যে এ লোকটা আমাদের দেশে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করেছে। কিন্তু ইন্ডিয়ার সরকার বলছে তোমরা যে প্রমাণ দেখিয়েছ

তা অকাট্য নয়। আর সেই প্রমাণের ব্যাপারে অন্য দেশগুলো সবাই একমত। এখন ধরুন, সেই দেশটা বারবার বলার পরও আমাকে দেয়া হচ্ছে না। তখন সেই দেশটা কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে?

আর একটু বলে আমি শেষ করতে চাই যে, এ দেশটার ব্যাপারে প্রমাণ আছে যে, ছিনতাই করা বিমান তাদের দেশে এসেছে এবং তারা ছিনতাইকারীদের উৎসাহ দিয়েছে এ ব্যাপারে। তারা সন্ত্রাসীদের সেই দেশ থেকে ছিনতাই করা বিমান নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে। যদি এ হয় দেশটার অবস্থা তাহলে কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে সেই অভিযোগকারী দেশটি?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন। এটা খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এবং তুলনাটাও চমৎকার। তিনি নিজেই ১১ সেপ্টেম্বরের তুলনাটা সুন্দর দিয়েছেন। তিনি একজন ইন্ডিয়ান, আরব দেশে গিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে আবার ইন্ডিয়াতে ফিরে আসলেন। আর সেই আরব দেশটি ইন্ডিয়াকে এ ব্যাপারে প্রমাণ দেখালো। কিন্তু ইন্ডিয়ান সরকার সেটা মেনে নিল না।

মোল্লা ওমর কিন্তু আমার বন্ধু না। তিনি আমেরিকাকে বলেছিলেন– আমাকে প্রমাণ দেখান। কিন্তু আমেরিকা প্রমাণ দেখাতে পারে নি। তারা প্রমাণ দেখিয়েছে টনি ব্লেয়ারকে। তারা প্রমাণ দেখিয়েছে মোশাররফকে। মোশাররফ বলেছেন যে, আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। আর আপনি আফগানিস্তান সরকারকে বলছেন যে, অপরাধীকে দিয়ে দাও। আফগানিস্তান সরকার বলছে, কিছু একটা প্রমাণ দেখান। তারা প্রমাণ দেখাতে পারে নি আফগানিস্তান সরকারকে। তারা প্রমাণ দেখায় টনি ব্লেয়ারকে। এটা অযৌক্তিক। তাহলে কি তাদের প্রমাণে সন্দেহ ছিল? এমনকি এখনো ওসামা বিন লাদেন হলো প্রধান সন্দেহভাজন। এটা শুধুই অনুমান। প্রমাণ হতে হবে অকাট্য। আর যদি তারা অকাট্য প্রমাণ দিত যে, ওসামা বিন লাদেনই এটা করেছে, তাহলে অবশ্যই আফগানিস্তান সরকার ওসামা বিন লাদেনকে দিয়ে দিত। আপনি কোনো আরব দেশের যদি ক্ষতি করেন আর সেই আরব দেশ যদি প্রমাণ দেখায় এবং ইন্ডিয়ান সরকার এতে আপত্তি জানায়, তখন আপনি আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে পারেন। আন্তর্জাতিক আদালতে ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে মামলাটা কোথায়? আপনি জানেন, আন্তর্জাতিক কিছু নীতিমালা আছে। যদি দুই দেশের মধ্যে বন্দি বিনিময় নীতি থাকে, তাহলে অপরাধীকে ফেরত দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। যেমন ধরুন, ইন্ডিয়া আর ইংল্যান্ডের মধ্যে বন্দি বিনিময় প্রথা আছে।

যদি কোনো অপরাধী কোনো অপরাধ করে ইংল্যান্ডে যায়, তারা ঐ অপরাধীকে ফেরত দেয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারে। এর একটা উদাহরণ হলো নাদিম।

আপনারা সেই সঙ্গীত পরিচালক নাদিমকে হয়তো চেনেন। ইন্ডিয়ার সরকার বলল যে, গুলশান কুমার হত্যাকাণ্ডে সে যুক্ত ছিল। তাই যখন ইন্ডিয়ার সরকার প্রমাণ দিল ইংল্যান্ড সরকারের কাছে, ইংল্যান্ডের আদালতে। তখন ইংল্যান্ডের আদালত বলল যে, আপনাদের প্রমাণ একেবারে অর্থহীন। তারা ইন্ডিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। আর ইন্ডিয়ার সরকার নাদিমের উকিলের খরচ দিতে বাধ্য হলো। ইন্ডিয়ার সরকার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু তারা একমত হয় নি। তারা বলেছে, আপনাদের প্রমাণ অকাট্য নয়। এ ঘটনার পর ইন্ডিয়া কি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে? কেন ইন্ডিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে নি? ইন্ডিয়া সরকার তো নিজেদের পক্ষে প্রমাণ দিয়েছিল।

পক্ষান্তরে, আমেরিকা আফগানিস্তানকে কোনো প্রমাণ দেয় নি। তাই যদি এখনো আপনি সৌদি আরব বা কোন আরব দেশে যান এবং সেখানে ক্ষয়-ক্ষতি করেন এবং সৌদি সরকার এ ব্যাপারে প্রমাণও দেয় যে, আপনি আসলেই একজন অপরাধী এবং এ ব্যাপারে ইন্ডিয়া সরকার একমত না হয়, তাহলে সৌদি সরকার কোটি কোটি ইন্ডিয়ানদের বোমা মেরে মেরে ফেলতে পারে না। ইসলাম এ অনুমতি দেয় না। হতে পারেন আপনিই অপরাধী, হতে পারেন আপনি লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরেছেন। তাদের যদি শক্তি বা ক্ষমতা থাকে তারা এসে আপনাকে ধরতে পারে। তারা লোকদের বোমা মারতে পারে না। ইসলাম এটার অনুমতি দেয় না। একই ঘটনা দেখেন কাশ্মীরে, গুজরাটে, আখকসাধমে। আমি বলবো আগে যাই ঘটে থাকুক না কেন ঐ দুই সন্ত্রাসী ভেতরে ঢুকেছিল? ইসলাম ধর্মে আপনি মন্দির ধ্বংস করতে পারেন না। আপনি ধর্মীয় লোকদের হত্যা করতে পারেন না।

কেউ যদি কোনো উপাসনালয়ে বা গীর্জায় গিয়ে নিরীহ লোকদের হত্যা করে সেটা কোরআনের বিধানের বিরুদ্ধ করা হবে। তাই আমরা এর নিন্দা জানাব। যে দু জন লোক এ ঘটনা ঘটিয়েছিল তাদের কাছে একটি চিঠি ছিল। সেখানে লেখা ছিল তারা তাহরীফ কিসাস থেকে এসেছে। 'কিসাস' আরবি শব্দ। যার অর্থ হতে পারে প্রতিশোধ। আর সেখানে বলা হয়েছে যে, হতে পারে তাদের পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। যদি তাদের পরিবারকে হত্যা করাও হয়, তবুও তাদের ঐ ৪৪ জনকে হত্যা করার অধিকার নেই। কারণটা হতে পারে অন্য কিছু। কিন্তু কাজটা ছিল ভুল। যদি তারা জানত যে, কে তাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছে? আর তারা সেই লোকদের কাছে যেয়ে প্রতিশোধ নিত তাহলে ঠিক ছিল। কিন্তু তাই বলে চুয়াল্লিশ জন নিরীহ লোককে হত্যা করতে পারে না। যদিও আসল অপরাধী কে এ বিষয়ে জানা যায় না। আমি আগেও বলেছিলাম, পবিত্র কোরআনে সূরা মায়িদার ৩২ নং আয়াতে আছে–

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

অর্থ : এ জন্যই আমি বনী ইসরাঈলদের নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, যে ব্যক্তি নিজ ব্যতীত অন্য কোন লোককে হত্যা করল অথবা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস চালায় সে যেন সমগ্র মানব জাতিতে হত্যা করল।

শুধু যদি আপনি জেনে থাকেন কেউ কোন অন্যায় করেছে বা কাউকে হত্যা করেছে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করতে পারবেন। তা না হলে আপনি কাউকে হত্যা করতে পারবেন না। ইসলাম এ বিষয়ে নিন্দা করে। ইসলামে বলা হয়েছে, এটা পুরো মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২১৪। আসসালামু আলাইকুম, একজন মুসলমান হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এ প্রশ্নটা করতে চাই। বর্তমানে সামাজিক, রাজনৈতিক আর ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের কারণে আমি খুব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছি যে, কোন পক্ষে যাব। আমি এটাও বুঝতে পারছি না যে, কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল। যাবতীয় কুসংস্কারকে বাদ দিয়ে বিশ্বাসীদের কাজকর্ম দিয়েই কোনো ধর্মকে বিচার করা যায় এটা আজ প্রমাণিত। এ যুক্তিটা ধরে নিয়ে কিভাবে আমি মনস্থির করব বা কিভাবে আমার বিশ্বাসকে ঠিক রাখব? আমার সাথীদের সাথে বেশ কিছু ব্যাপারে মতের অমিল হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আপনি সাদ্দাম হোসেনকে বা পারস্যের মুজাহিদদের অনুভূতিকে অথবা প্যালেস্টাইনি আত্মঘাতী যোদ্ধার মৃত্যুকে সমর্থন করেন কি?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি প্রশ্ন করেছেন পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি আর চিন্তাভাবনা নিয়ে। তিনি জানেন না কোনটা তার জন্য ঠিক। কার সাথে তিনি একমত হবেন এবং কার সাথে হবেন না। তার এখন কি করা উচিত? তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, আমি প্যালেস্টাইনের মুজাহিদদের বা সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন করি কি-না ইত্যাদি। বোন, আমি আগেও বলেছি যে, এগুলো হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতি। সবকিছুর একটা লুকানো কারণ থাকে। এ ব্যাপারটা ভুল না ঠিক তা আমি বলতে পারি না। তবে আমি অনেক দেশ ঘুরেছি যার কারণে আমার মনে হয় এটার কারণ হাতে গোনা কিছু লোক। আর রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক কারণেই কাউকে বানানো হচ্ছে কোরবানির গরু। আর এটাই কারণ যে, তারা দেখতে চায় যে কাজ হচ্ছে।

কেউ মুসলমান হিসেবে যদি আমাকে প্রশ্ন করে তাহলে আমি শুধু তাদেরকে সত্যটা অনুসরণ করতে বলব। যদি কেউ তাদের ক্ষতি করে থাকে, যদি কেউ তাদের হত্যা করে থাকে, অত্যাচার করে এক্ষেত্রে যদি তারা মোকাবেলা করে

তাহলে ঠিক আছে। তা না হলে তারা পারবে না। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, ওসামা বিন লাদেন বা সাদ্দাম হোসেনের ক্ষেত্রে কি ঘটেছে? আমি বলব, আমি পুরো ঘটনা জানি না। তাই আমি ফতোয়া দিতে পারি না। আমি তাদেরকে অভিযুক্ত করতে পারি না। কারণ আমি তাদের সাক্ষাৎকার নেই নি। আমি মতামত দিতে চাইলে আগে তাদের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। তাই আমি বলি আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ্ আমাকে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন না যে, ওসামা বিন লাদেন একজন সন্ত্রাসী কি-না। আমি বলব সে যদি ভুল কিছু করে থাকে অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে তাহলে সে ভুল করেছে। আর যদি সে নিয়মনীতি না লঙ্ঘন করে তাহলে ঠিক আছে। এটার ওপর ভিত্তি করে আমি পরীক্ষায় পাস করব না।

আমাকে ধর্মগ্রন্থ কোরআন পড়তে হবে। তবে এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন বিশেষজ্ঞরা যারা বিভিন্ন জায়গায় যায়, কিংবা আফগানিস্তানে গিয়ে সাক্ষাৎকার নেয় ইত্যাদি। এগুলো আমরা খবরের কাগজেও দেখি। আপনাকে আমাকে আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন না যে, সাদ্দাম হোসেন একজন সন্ত্রাসী ছিল কি-না? আমরা বলতে পারি এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। আমরা তাদের সমর্থনও করি না। তাদের নিন্দাও করি না। যদি একজন লোকের বিরুদ্ধে বা কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ থাকে যে, সে যেটা করেছে তা কোরআনের বিপক্ষে। তাহলে আমরা তাকে নিন্দা করব। কিন্তু যদি কোনো প্রমাণ না থাকে বা আংশিক প্রমাণ থাকে তাহলে আমাদের নিরপেক্ষ থাকতে হবে। কোরআন এটাই বলে। আর এ ব্যাপারে আপনার বিশ্বাস দূর্বল হবে না, বোন। ধর্মগ্রন্থে যা বলা আছে সেটাই হবে আপনার বিশ্বাসের ভিত্তি।

বিশ্বাস আনার সবচেয়ে ভাল উপায় হলো কোরআন পড়া। আপনি কোরআনে কোনো খুঁত বা পরস্পর বিরোধী কিছু পাবেন না। যদি কেউ আরবি ভাষা বুঝতে না পারে, তাহলে তাকে কোরআনের অনুবাদ পড়তে হবে। তাই বোন, আপনি যদি কোরআনের নির্দেশগুলো পড়েন যে কিভাবে জীবন ধারণ করতে হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার বিশ্বাস মজবুত হবে। আর বিশ্বাস করেন, কুরআনের মূলনীতিগুলো মেনে চলতে আপনি মোটেও লজ্জাবোধ করবেন না। যদি আপনার বুদ্ধি আর যুক্তি থাকে তাহলে বুঝবেন, কেন এ নীতিগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। আপনি জানেন আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াই। সেসব জায়গায় আমি কথা বলি এ টুপি পরে আবার আমার দাঁড়িও আছে। আমি অনেক পশ্চিমা দেশে গিয়েছি কখনো কোন সমস্যায় পড়ি নি। মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে। মানুষ প্রশ্ন করেছে, কিন্তু কোন সমস্যা হয় নি। সত্যি বলতে মনে ভয় পাব কেন? আর যদি আপনার যুক্তি-বুদ্ধি থাকে তাহলে আপনি গর্ববোধ করবেন। এমনকি আমার মতো আপনি নিজেকেও বলবেন, মৌলবাদী।

প্রশ্ন ঃ ২১৫। আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ ফজলুর রহমান আব্দুল্লাহ। স্যার আমি ১১ সেপ্টেম্বর নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি। আপনি বলেছেন যে, সেখানে সন্দেহজনক কিছু ছিল বলে তারা প্রমাণটা দেয় নি। আমি প্রমাণটা পেয়েছি ইন্টারনেটে। একটা সাইট ছিল আই.এন.আই.এস. ডটকম বা আই.এন.আই.এন ডট নেট। এটা এখন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমি সেখানে দুটো ছবি পাশাপাশি দেখেছিলাম। একটাতে এক অভিনেতার ছবি যে একটা ফিল্মে ওসামা বিন লাদেন সেজেছিল সবাই দেখেছে সেটা। আর অন্যটা ওসামা বিন লাদেন। আর শিরোনাম ছিল একজন, একজন বোকা ও দুচোখ দিয়ে সহজেই চিনে বলতে পারবে যে, এ দুজন লোক এক নয়। এটাই ছিল প্রমাণ যেটা আমেরিকা দিয়েছিল। আরেকটা ব্যাপার হল যে, আমি চাকরি করি এইচ.এল-এ। আমাদেরকে একটা হ্যান্ডবুক দেয়া হয়েছে। সেখানে দায়িত্ব আর কর্তব্য লেখা আছে (কি করব আর কি করব না)। হ্যান্ডবুকটার প্রথম পৃষ্ঠার ওপর ভগবতগীতার শ্লোকের একটা অংশ লেখা আছে। আমি পুরো শ্লোকটা বলছি যে, 'ইয়াদা ইয়াদা হি ধর্মস্য, গ্লানি ভুবতি ভারতা, আব্যুস্থানা নামা ধর্মস্য, যব আত্মানাম সদাবিহম, পরিত্রনায় সাধুনাম, বিনাশায় চতুষ্কতা, ধর্ম সংস্থাপনার সম্ভাবনায় ইয়ুগে ইয়ুগে।'

তারা বিশেষ করে উল্লেখ করেছে যে,'পরিত্রনায় সাধুনাম বিনাশয় চতুষ্কতা।' আমি আপনি সত্য অথবা ভালকে রক্ষা করতে চান, তাহলে খারাপকে দূর করতে হবে। অন্য কোন উপায় নেই। তারপর আমি শেষের দিকের শ্লোকটা বলছি সেটা হল– 'ধর্ম সংস্থাপনায় সম্ভাবনায় ইয়ুগে ইয়ুগে।' এর অর্থ হলো– ঈশ্বর বলছেন যে, আমি সব যুগেই পৃথিবীতে আসি। এটা হলো আমাদের হিন্দু ভাইদের বিশ্বাস। আমি মি. জাকির ভাইকে এটার ব্যাখ্যা করতে বলব। আমাদের এ যে বিশ্বাসগুলো আছে এগুলো ঠিক না ভুল? ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আমি আবার অনুরোধ করছি দর্শকদের এবং ভলান্টিয়ারদের যাতে অমুসলিমদের থেকে বেশি প্রশ্ন আসে। যাতে তাদের ভুল ধারণাগুলো ভাঙ্গাতে পারি। আর তারপর মুসলমানদের কাছে আসব। তারা অনেক অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকছেন। আমি চাইব অমুসলিমরা বেশি করে প্রশ্ন করুন। আপনারা প্রত্যেকদিন ইসলামের ওপর প্রশ্ন করার সুযোগ পান না। ভাই একটা প্রশ্ন করেছেন তার আগে একটা মন্তব্য করেছেন। তিনি ইন্টারনেটে দেখেছেন যে, ওসামা বিন লাদেন আসলে নকল। আবার এ প্রমাণটাতেও সন্দেহজনক কিছু থাকতে পারে। তাই আমি একপক্ষ নিয়ে বলছি না যে, আপনি যে প্রমাণ পেয়েছেন সেটা সঠিক। এ প্রমাণটাও আমেরিকার কোন শত্রুর বানানো হতে পারে। তাই

আমি এ প্রমাণটাও বিশ্বাস করি না। তাই আপনাকে হতে হবে নিরপেক্ষ। আমি পক্ষপাত করে বলতে পারি না যে, হ্যাঁ, ভাই, ঠিকই বলেছেন। যেমন ঘটেছিল তেহেলকাতে যা আপনি হয়তো জানেন। তেহেলকার সেই অডিও ক্যাসেট আর ভিডিও ক্যাসেটের কথা মনে আছে নিশ্চয়। এ সব কিছু তো মনোযোগ আকর্ষণের ফন্দি।

আমি একজন মিডিয়ার লোক তাই আমি জানি আমরা যদি চাই খুব সহজে সত্য বদলাতে পারি। মিডিয়াতে কোন কিছু বদলে দেয়া খুবই সহজ। আপনি যে কথা মোটেও বলেন নি আমি সেটাই দেখাতে পারি। এটা খুবই সোজা। মিডিয়ার কথা বাদ দেই। আবারও বলছি, আমি জানি না এটা ভুল না ঠিক। যেহেতু কোথাও কোন প্রমাণ নেই। আপনার প্রশ্নটাতে আসি। ভাই, যে উদ্ধৃতি দিলেন সেটা ভগবতগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে। সেখানে বলা আছে যে, 'যখনই অধর্ম হয়, যখনই অসত্য আসে, মিথ্যা আসে, যখনই পৃথিবীতে অরাজকতা আসে, তখন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা তিনি আসেন এবং মানুষের রূপ অবতার গ্রহণ করেন। আর তিনি পৃথিবীর অরাজকতা, বিপদ, বিশৃঙ্খলা বন্ধ করতে আসেন।'

প্রশ্ন ঃ ২১৬। শুভ সন্ধ্যা, স্যার। আমার নাম রাজকুমার। আমি এম.বি.বি.এস ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। আমি স্ট্যানলি মেডিকেল কলেজে পড়ি। আমার প্রশ্নটা হলো ইন্ডিয়ার মুসলমানরা কেন সবসময় ইন্ডিয়ান সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে? কেন ইন্ডিয়ার মুসলমানরা কমন সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে? ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন যে, কেন মুসলমানরা সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে। ভাই আমি কমন সিভিল কোর্টের পক্ষে। কিন্তু সেই সিভিল কোর্টকে হতে হবে সবচেয়ে সেরা যেখানে ন্যায়বিচার পাওয়া যায় (যেখানে হাতে হাতে বিচার পাওয়া যায়)। আমি এটার পক্ষে। এমনকি ইন্ডিয়ার সমস্ত মুসলমান এর বিরোধিতা করলেও আমি ডা. জাকির নায়েক এটার পক্ষে তর্ক করতে রাজি আছি। আমি যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা করতে রাজি আছি যে, কোন নিয়মটা সেরা? যে আইনটা সবচেয়ে বাস্তবসম্মত সেটাই প্রয়োগ করেন। আমি এখানে বলব যে, ইন্ডিয়াতে কমন সিভিল কোর্ট থাকুক এমনকি কমন ক্রিমিনাল কোর্টও। কিন্তু আমাদের আগে ঠিক করতে হবে যে, কোন আইনটা সেরা। যেমন– একজন মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কেন ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়? আমি উত্তর দিয়েছিলাম : মানুষ সেটার প্রশংসাও করেছিল। আপনি এ উত্তরের সাথে একমত হলে আপনাকে কমন সিভিল কোর্টে লিখতে হবে যে, একজন পুরুষ একজনের বেশি স্ত্রী রাখতে পারবে না। আমরা জানি পৃথিবীতে মহিলার সংখ্যা পুরুষের চেয়ে

বেশি। এর জন্য কোনো সমাধান নেই। কোনো ধর্মই এর সমাধান দেয় নি। যদিও কোনো ধর্মই বলে না যে, মাত্র একটাই বিয়ে করেন। শুধু ইসলাম ছাড়া।

আর আমি একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম হিজাবের সঙ্গে ধর্ষণের সম্পর্ক নিয়ে। আমি উপমা দিয়েছিলাম যে, যে শাস্তিটা সর্বোচ্চ তার ফলাফলও সবচেয়ে ভালো। যেমন- ইসলাম বলে মহিলাদের হিজাব পরা উচিত। কোন পুরুষ কোন মহিলাকে দেখলে তার দৃষ্টি নিচু করবে। আর তারপরেও যদি কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে ধর্ষণ করে, সে সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে, যেটা হল মৃত্যুদণ্ড। আর আমি আমেরিকার একটি পরিসংখ্যান দিয়েছিলাম যে, এফ.বি.আই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯০ সালে প্রত্যেক দিনে ১,৭৫৬টি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক দিন ২,৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতি ৩২ সেকেন্ডে একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আমরা এখানে গত দুই ঘণ্টা ধরে আছি। এ সময়ের মধ্যে ২০০ শত এরও বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আমি বলছি যে, যদি আপনারা ইসলামি শরিয়াহ প্রয়োগ করেন যে, যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার দিকে তাকাবে, সে তার দৃষ্টি নিচু করবে। প্রত্যেক মহিলা হিজাব পরবে। পুরো শরীর ঢাকা থাকবে শুধু মুখমণ্ডল ও হাতের কবজি ছাড়া। তারপরও যদি কেউ ধর্ষণ করে সে সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে। আমি একটা প্রশ্ন করছি যে, তাতে কি ধর্ষণের হার বাড়বে? একই রকম থাকবে? নাকি কমে যাবে? অবশ্যই কমে যাবে। এটাই হল বাস্তব আইন।

আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন যে, বি.বি.সি.তে একবার একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেখানে বলা হচ্ছিল- নাইজেরিয়া সম্পর্কে যারা ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করেছিল। আর তখনি ধর্ষণের ঘটনা সেখানে কমে গিয়েছিল। পৃথিবীতে সবচেয়ে কম ধর্ষণের ঘটনা ঘটে সৌদি আরবে। আমি সৌদি আরবের পক্ষে বলছি না। তবে যেটা ভাল তার প্রশংসা করা উচিত। আমি এলকে আদভানিকে অভিনন্দন জানাই। আমার মনে পড়ছে কয়েক বছর আগে ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, মৃত্যুদণ্ডই হবে একজন ধর্ষকের উপযুক্ত শাস্তি। আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। তিনি ইসলামের কাছাকাছি এসেছেন। হয়তো এর পরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলবেন যে, সব মহিলাদের হিজাব পরা উচিত।

প্রশ্ন ঃ ২১৭। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম ইয়াশার ফাহামী। আমি এসেছি ইরান থেকে। আপনি নিশ্চয়ই সালমান রুশদীর স্যাটানিক ভার্সেস পড়েছেন। একজন মুসলমান হিসেবে কেউই বইটা পছন্দ করবে না। আপনি কি মনে করেন, ইমাম খোমেনি সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে যে ফতোয়া জারি করেন সেটা সঠিক ছিল?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি প্রশ্ন করেছেন, সালমান রুশদী সম্পর্কে ইমাম খোমেনি যে ফতোয়া দিয়েছিলেন সেটা সঠিক ছিল কি-না? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এক বছর পর কেন ইমাম খোমেনি ফতোয়া জারি করলেন? যে দেশ সবার আগে সালমান রুশদীর 'স্যাটানিক ভার্সেস' নিষিদ্ধ করেছিল সেটা হলো ইন্ডিয়া। আমি রাজিব গান্ধীকে এ কাজটা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কেন ইমাম খোমেনি সালমান রুশদীকে হত্যা করার ফতোয়া জারি করলেন এক বছর পরে? কারণ, তাকে নিয়ে কোন খবর তৈরি হচ্ছিল না। এসবই রাজনীতি আর রাজনীতিবিদদের খেলা। আপনি যদি ফতোয়া দিতে চান, আপনি সেটা দেবেন। বইটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমালোচিত হয়েছে। অনেক দেশ এটা নিষিদ্ধ করেছে। আর তিনি ফতোয়া দিলেন সেটা পরের কথা। এসবই রাজনীতির খেলা কিন্তু রাজিব গান্ধী যা করেছিলেন হয়তো তিনি এটা জানতেন না। আমি আগেও 'স্যাটানিক ভার্সেস' নিয়ে কথা বলেছি। যদিও বইটা ইন্ডিয়াতে নিষিদ্ধ, আমি বইটা পড়েছি।

আপনারা জানেন সালমান রুশদী বলেছে যে, সে আগে মুসলমান ছিল। সে কাউকেই বাদ দেয় নি। তার বইতে সে রাণী এলিজাবেথকে ছোট করেছে (গালাগালি দিয়েছে)। আর সেই একই ব্রিটিশ সরকার অশ্লীল শব্দ ব্যবহারের জন্য এক আমেরিকান লেখকের বই নিষিদ্ধ করেছিল। তিনি (চার অক্ষরের একটি শব্দের জন্য) ফাদার, আংকল, কাজিন, কিং সবার প্রথম অক্ষর নিয়ে মার্গারেট থ্যাচারের কূটনীতিকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেন। আর এ সালমান রুশদী শব্দটাকে আরো ভয়াবহ করল। সে তার সাথে আইএনজি যোগ করল। তারপরও বইটা খুব জনপ্রিয় হলো। তাহলে একজন আমেরিকান লেখকের বইটা নিষিদ্ধ করা হল মার্গারেট থ্যাচারকে গালি দেয়ার জন্য। অন্য আরেকজন লোক সেটাকে আরো ভয়াবহ করলো। অথচ সে পুরস্কার পেল। কিন্তু কেন সে পুরস্কার পেল? কারণ সে ইসলামের নিন্দা করেছে। এতে তারা খুব খুশি। আর আপনি কি জানেন, সে বাদ দেয়নি রাম আর সীতাকেও। আপনারা জানেন এদেরকে বেশিরভাগ ইন্ডিয়ান শ্রদ্ধা করে। সে তাদেরকেও ছোট করেছে (অপমান করেছে)। আমি শব্দটা আর বলতে চাই না। সে তাদেরকেও ছোট করেছে, তাদেরকেও ছাড়ে নি। আর অনেক লোকই সেটা সমর্থন করে। পরে রাজিব গান্ধী বইটি পড়ে বুঝতে পারেন যে, এখানে কাউকেই বাদ দেয়া হয় নি। সে সবসময় নিন্দা করে। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরা মায়িদার ৩৩ নং আয়াতে বলেছেন—

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۔

অর্থ : যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে– তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত এবং পাসমূহকে কর্তন করা হবে অথবা দেশ থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হবে।

আর এ আইন শুধু কোরআনে নয় বাইবেলেও আছে। আপনি যদি 'বুক অবলেভিটিকাস' পড়েন তাহলে সেখানে দেখবেন যে, 'কেউ যদি স্রষ্টার নিন্দা করে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা কর।' এমনকি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া একজন পথিকও তাকে পাথর নিক্ষেপ করবে। তাহলে এ আইন সব ধর্মগ্রন্থেই আছে। বেশিরভাগ ধর্মেই ঈশ্বরের নিন্দা করা সেটা হতে পারে খ্রিস্টান ধর্ম, হতে পারে ইসলাম ধর্মে, হতে পারে ইহুদি ধর্মে— জঘন্য অপরাধ। স্রষ্টার বিরোধিতা যদি সেটা নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের বিরোধিতা করা হয়, যদি অন্য দেশের সীমানার মধ্যে হয়, তাহলে আমরা ফতোয়া দিতে পারি না যে, তাকে হত্যা করা হবে। যদি সেই দেশে ইসলামি আইন থাকে, তাহলে কেউ স্রষ্টার বিরোধিতা করলে তার জন্য নির্দিষ্ট আইন এবং কিছু নিয়ম-কানুন আছে।

কিন্তু রাজনীতিবিদরা হোক সে মুসলিম রাজনীতিবিদ অথবা কোন অমুসলিম রাজনীতিবিদ, তারা নিজেদের সুবিধার জন্য আপস করছে। আমি দুঃখিত আমি কোন রাজনীতিবিদকে ছোট করতে চাই না, আঘাত করতে চাই না। সবাই না হলেও আমি বলব বেশির ভাগ রাজনীতিকই এটা করছে। আর ঠিক এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে ধর্ম আর রাজনীতি দুটো আলাদা জিনিস। কিন্তু তারা ধর্মকে ব্যবহার করে হাতিয়ার হিসেবে যাতে তারা খ্যাতি অর্জন করে।

আমাদের বোঝা উচিত, খোমেনি যে ফতোয়া দিয়েছিলেন সেটা আমার মতে রাজনীতিতে মনোযোগ আকর্ষণের একটা কৌশল। কিন্তু রাজিব গান্ধী বইটি নিষিদ্ধ করে সঠিক কাজই করেছিলেন। তিনিই প্রথম বইটা নিষিদ্ধ করেছিলেন। আর এখন এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হচ্ছে। আমি জানিনা এ নিষেধাজ্ঞা ওঠে গেছে কি-না। তবে কেউ যদি সৃষ্টিকর্তার বিরোধিতা করে তাহলে ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মে বলা আছে, তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। ইসলাম ধর্মে হত্যা থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত চারটা পথ রয়েছে। খ্রিস্টান ধর্মে একটাই পথ। ইসলাম ধর্মে চারটা পথ আছে। যে কোন একটা বেছে নেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২১৮। আমি টিয়া অনুরাগী, আইনের শেষ বর্ষের ছাত্রী। আমার ধারণা সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করা যায়। যদি মানুষকে সহিষ্ণুতা (সহনশীলতা) শেখানো যায়, নিধেনপক্ষে সন্ত্রাসবাদ কমানো যায়। ইসলাম কি সহনশীলতা সম্পর্কে কোন শিক্ষা বা উপদেশ দেয়? আর যদি দিয়ে থাকে তাহলে যে মানুষগুলোর ওপর ইসলাম ধর্মের এ দায়িত্বগুলো রয়েছে। [আমি

আসলে শব্দগুলোর (নামগুলোর) সাথে পরিচিত না। যেমন হিন্দু ধর্মে গুরুরা আছেন] যারা ইসলাম সম্পর্কে উপদেশ/শিক্ষা দেন অন্য মুসলমানদের তারা কি সহনশীলতা সম্পর্কে কোন শিক্ষা দেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন। আপনি ঠিকই বলেছেন যে, সহনশীলতার মাধ্যমে সন্ত্রাস কমানো যায়। আর ইসলাম সহনশীলতার শিক্ষা দেয় কি-না। বোন, আমি আমার বক্তৃতায় বলেছি যে, যে কোন মানুষের জন্য জান্নাতে বা স্বর্গে যেতে হলে অনেক শর্তের মধ্যে একটি হল সহনশীলতা। পবিত্র কোরআনে সূরা আল-আসরের ১ থেকে ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে– 'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, শুধু তারা ব্যতীত যাদের ঈমান আছে, সৎকর্ম করে এবং যারা মানুষকে সত্যের উপদেশ দেয়।'

মানুষকে সহনশীলতা আর অধ্যবসায়ের উপদেশ দেয়ার নাম হল দাওয়া। সহনশীলতা হল জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম শর্ত। আপনি যদি সহনশীল না হন তাহলে সূরা আসর অনুযায়ী আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না। শুধু সহনশীল হলেই চলবে না, অন্য মানুষকে সহনশীলতার পথে আনতে হবে। তবে 'সহনশীলতা' শব্দটার অনেক রকম অর্থ করা যায়। আর বিশেষজ্ঞরাও বলবে যে, সহনশীলতার একটা সীমা আছে। সহনশীলতা বলতে আপনি কি বুঝেন? কেউ যদি আপনার সাথে অন্যায় কিছু করে আপনি প্রতিশোধ নিলেন না, খুব ভাল। কিন্তু কত দিন করবেন? তাই সহনশীলতারও একটা সীমা আছে। আর ইসলাম ধর্মে জালিম সেই লোক যার কাজ হল যুলুম করা। অর্থাৎ, আপনি বলতে পারেন, যে লোক সবার ক্ষতি করে সেই যালিম। যুলুম দুই প্রকারের রয়েছে। একজন ক্ষতি করে অন্য মানুষের আর আরেকজন ক্ষতি করে নিজের। এ দু'প্রকারের লোককেই যালিম বলা হয়। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেটা সহীহ্ মুসলিম হাদীসে উল্লেখ আছে যে, 'যদি তোমার চোখের সামনে অন্যায় কিছু ঘটে আর যদি তোমার সামর্থ্য থাকে তাহলে সেটা হাত দিয়ে বন্ধ কর। যদি হাত দিয়ে বন্ধ করতে না পার তাহলে তোমার জিহ্বা দিয়ে বন্ধ কর। তোমার জিহ্বা দিয়ে বন্ধ করতে না পারলে মনে মনে ঘৃণা কর। আর যদি তুমি এটা কর তাহলে তুমি একেবারে নিচের স্তরের বিশ্বাসী।'

তাই আমাদের কি করতে হবে? আমাদের সহনশীল হতে হবে। সহনশীলতার শিক্ষা দিতে হবে। যেমন– আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরা আল বাকারার ১৫৩ নং আয়াতে বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

অর্থ : 'নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।'

তবে সবর– এরও একটা সীমা আছে। সহনশীলতার একটা সীমা আছে। যদি আপনি দেখেন একজন মহিলাকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, আপনি ঐ মহিলাকে বলতে পারবেন না সহ্য করেন, সমস্যা নেই। যদি স্রষ্টা আমাকে শক্তি দিয়ে থাকেন তাহলে আমি আমার হাত দিয়ে সেটা বন্ধ করব। যদি না পারি তাহলে বলব আরে ভাই, দয়া করে ধর্ষণ করবেন না। মুম্বাইতে একটি খবর বেরিয়েছিল যে, একটা ১৩ বছরের বাচ্চা মেয়েকে চলন্ত ট্রেনে একজন মাতাল ধর্ষণ করেছে। সেখানে পাঁচজন যাত্রীর মধ্যে মাত্র একজন একটু আপত্তি তুলেছিল আর সবাই তাকে বাধা দিয়েছিল। পাঁচজন মানুষ ইচ্ছে করলে একজন মাতালকে ঠেকাতে পারতো। মাতালটা একটা থাপ্পর মারল আর তারা কিছুই করল না। মানবতার আজ হয়েছেটা কি? মানুষ আজ কোথায় গিয়েছে? পাঁচজন সক্ষম লোক একজন মাতালকে ঠেকাতে পারল না, যে একটা মেয়েকে ধর্ষণ করছে, একটা চলন্ত ট্রেনে। এটাকে কি আপনি সহনশীলতা বলবেন? আমি বলব, কাপুরুষতা। সেজন্য আমি বলছি, যদি এ পাঁচজন লোক সন্ত্রাসী হতো, সন্ত্রাসী মানে যারা অসমাজিকভাবে মনে ভয় জাগায়, তাহলে ঐ মাতালটা একাজ করার সাহস পেত না। তাহলে বোন আমরা মানুষকে উৎসাহ জোগাতে চেষ্টা করব যাতে মানুষ আরো সহনশীল হয়, একই সাথে তারা যেন কাপুরুষ না হয়। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, অসামাজিক যা কিছু আছে তা যেন কমে যায়। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে একসাথে চেষ্টা করতে হবে যাতে এ লোকগুলো অসামাজিক কাজ থেকে বিরত থাকে। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২১৯। হ্যালো, আমার নাম দীপক। আমি একজন চার্টার্ড একাউনট্যান্ট। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, সেটা হল তালিবান সরকার বামিয়ানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করার জন্য একটা ফতোয়া জারি করেছিল। বলা হয়েছিল সেটা ইসলামের বিরুদ্ধে। আমি জানতে চাই এটা আসলেই ইসলামের বিরুদ্ধে কি-না? এটা কি আসলেই শয়তানের দেখানো সে পথ যে ব্যাপারে মুসলমানদের সতর্ক থাকতে হবে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সে একই প্রশ্ন করা হয়েছিল সুরাটে যখন আমি যেখানে বক্তৃতা করছিলাম। ঘটনাটি ঘটার মাত্র কয়েকদিন পরের কথা। তখন এটা বেশ গরম খবর। তালেবানরা সেই সময়ে বামিয়ানের বুদ্ধ মূর্তিগুলো ধ্বংস করেছিল। ভাই, আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, এটা ইসলামের বিরুদ্ধে কি-না ইত্যাদি। এ একই প্রশ্ন আমাকে একজন অমুসলিম জিজ্ঞেস করেছিল সুরাটে। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে কাজটা ঠিক না ভুল? তখন অবশ্যই পরস্পর বিরোধী খবর শোনা গিয়েছিল যে, আসলেই তারা মূর্তিগুলো ধ্বংস করেছে কি-না। আর তাই তখন আমি বলেছিলাম ওগুলো ধ্বংস করা হয়েছে কি-না আমি তা জানি না। কিন্তু আজকে আমরা জানি যে এটা সত্য ঘটনা যে ওগুলো

ধ্বংস করা হয়েছে। কাজটা ঠিক না ভুল সে বিষয়ে আমি বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ের ছাত্র হিসেবে বলতে পারি যে, যদি তারা বুদ্ধ মূর্তিগুলো ধ্বংস করে থাকে তাহলে তারা আসলে বৌদ্ধদের উপকারই করেছে।

আমি বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ের ওপরে একজন ছাত্র।

আমি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। আমি 'ধাম্মাপাট' ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েছি। এ ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে কোথাও নেই যে, যেখানে বুদ্ধ বলেছেন আমার মূর্তি তৈরি কর। বুদ্ধ কখনোই বলেন নি যে, বৌদ্ধরা মূর্তি পূজা করবে। আমি বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ের একজন ছাত্র হিসেবে বলতে পারি যে, এ প্রথা চালু হয়েছে অনেক পরে। ঠিক না ভুল সে ব্যাপারে পরে আসছি। তবে তারা যেটা করেছিল তা বৌদ্ধদের উপকার করেছিল। কারণ, কোনো বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেই লেখা নেই যে তারা বুদ্ধের মূর্তি বানাবে।

এবার প্রশ্নটাতে আসি। বাঙ্গালোরে একজন সাংবাদিকও আমাকে এ প্রশ্নটা করেছিল। ইসলাম মনে করে যে, মূর্তিপূজা একেবারে নিষিদ্ধ। অন্য ধর্মেও বলে; আর খ্রিস্টান ধর্মেও একই কথা বলে। যদি আপনি ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়েন, সেখানে বলা হয়েছে বুক অভ ডিউটারোনোমিতে ৫নং অধ্যায়ের ৭ থেকে ৯ নং অনুচ্ছেদে। এছাড়াও বুক অভ এক্সোডাসে ২০ অধ্যায়ের ৩ থেকে ৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে–

'আমাকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করো না, আমার উপাসনা করতে কোন প্রতিমা (প্রতিমূর্তি) তৈরি করো না। আমার কোনো রূপক তৈরি করো না। উপরে স্বর্গ, নিচে পৃথিবী অথবা পৃথিবীর নিচের সমুদ্র থেকে। তাদের সামনে নতজানু হয়ো না। তাদের সেবা করো না, কারণ আমি ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা খুবই ঈর্ষাপরায়ণ।'

তাই খ্রিস্টান ধর্মানুসারে ও ইহুদি ধর্ম মতেও মূর্তি তৈরি করে তাকে ঈশ্বর বলা একেবারে নিষিদ্ধ। একইভাবে এটা ইসলামেও নিষিদ্ধ। তো আমি যখন উত্তরে বললাম যে, তারা বৌদ্ধদের উপকার করেছিল, তখন আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এই তালেবানরা কি লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধদের কষ্ট দেয় নি? আমি বলেছিলাম– হ্যাঁ। তাহলে ইসলাম কি লক্ষ লক্ষ মানুষকে কষ্ট দেয়ার অনুমতি দেয়? আমি সেই সাংবাদিককে প্রশ্ন করেছিলাম যে, যদি বেশ কিছু ড্রাগস, কোকেন, ব্রাউনসুগার যার দাম ১০ কোটি টাকা এগুলো পাচার করার সময় ইন্ডিয়ার সরকার ধরে ফেলে তাহলে কি করা হবে? সেই সাংবাদিক বললেন যে, ইন্ডিয়ার সরকার ঐ ড্রাগস পুড়িয়ে ফেলবে।

আমি বললাম, বেশ। তারপর বললাম, আপনি কি জানেন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এ পৃথিবীতে ড্রাগই ঈশ্বর। তাহলে আপনি কি ইন্ডিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে যাবেন যে, তারা মাদকাসক্তদের ঈশ্বরকে ধ্বংস করেছে? কারণ, ইন্ডিয়া সরকার

মনে করে যে, ড্রাগস শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তারা যা করছে সেটা ঠিক যদিও ব্যাপারটা লক্ষ লক্ষ ড্রাগ অ্যাডিক্টদের কষ্ট দিচ্ছে। আপনি সেখানে যেয়ে ইন্ডিয়ার সরকারকে বলতে পারেন না যে, আপনারা যা করছেন তা মাদকাসক্তদের কষ্ট দিচ্ছে। তাই একইভাবে আফগানিস্তানের মূর্তিগুলো তাদের সম্পত্তি। এগুলো পছন্দ হলে তারা রাখবে আর পছন্দ না হলে ধ্বংস করবে। এতে আমরা আপত্তি জানানোর কে? তবে যদি তারা অন্য কোনো দেশে গিয়ে এটা করতো, তাহলে আপত্তি জানাতে পারতেন।

এছাড়াও লোকজন বলাবলি করে যে, ইন্ডিয়ার সরকার খুবই সহনশীল। আপনি জানেন কি মুম্বাইতে সান্টাক্রুজ এয়ারপোর্টে মহাবীরের একটা বড় মূর্তি ছিল। মূর্তির পেছনেই ছিল হোটেল জাল। আর মূর্তিটা নগ্ন ছিল। তারপর লোকজন আপত্তি জানাল। এরপর মূর্তিটার সামনে একটা দেয়াল তুলে দেয়া হলো। কয়েক মাস পরে তারা মূর্তিটা সরিয়ে ফেললো। এ একই লোকগুলো মূর্তিটার ব্যাপারে আপত্তি জানালো আবার এ লোকগুলোই আফগানিস্তানকে নিন্দা জানাচ্ছে। কেন এ লোকগুলো রাস্তার ওপরের মূর্তিটার ব্যাপারে আপত্তি জানালো? আপনি কি জানেন যে, এ ইন্ডিয়াতে জৈন ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা আফগানিস্তানের বৌদ্ধদের চেয়ে বেশি? তাই যখন মুম্বাই সরকার সেই মূর্তিটা সরিয়ে ফেলল যাকে জৈনরা ঈশ্বর মনে করে, 'তীর্থঙ্কর' মনে করে, তখন কেউ আপত্তি তোলে নি। আর যখন আফগানিস্তানের সরকার এটা করছে। তখন আপত্তি জানাচ্ছেন। এ দুমুখো নীতি কেন?

দুমুখো নীতি নয়— আমাদের যুক্তিবান মানুষ হিসেবে একমুখীনীতি অবলম্বন করা উচিত। একেকবার এক এক রূপ ধারণ করাটা ভাল না। আমি যেটা মনে করি এটা তাদের সম্পত্তি। ধরুন, একজন অমুসলিম একটা বাড়ি কিনল। ধরুন, সেই ঘরের মধ্যে একটা কাবা শরীফ খোদাই করা আছে। যদি সেই অমুসলিম কাবা শরীফ অপছন্দ করে সেটা ঢেকে ফেললে কে আপত্তি জানাবে? আর যদি কোনো মুসলমান মহানবী ﷺ-এর মূর্তি তৈরি করে আর সে মূর্তিটা যদি আপনি ধ্বংস করেন তাহলে পুরো মুসলিম বিশ্ব যদি আপনার বিপক্ষে থাকে আমি ডা. জাকির নায়েক আপনাকে সমর্থন দেব। কারণ, মহানবী ﷺএর মূর্তি তৈরি করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন ঃ ২২০। জনাব ডা. জাকির নায়েক। ইসলাম কি অন্য ধর্ম বা ধর্মীয় দেবতাদের অপমান বা ছোট করতে বলে? আমি এ প্রশ্নটা যে কারণে করছি সেটা হল যখন একজন মুসলমান ইন্ডিয়ান চিত্রশিল্পী হিন্দু দেবী স্বরস্বতীকে নগ্ন করে এঁকেছেন। তখন অনেকে প্রশংসা করেছিল এ বলে যে, এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা। আর যখন সালমান রুশদী ইসলাম সম্পর্কে বই লিখল, তখন রাজীব গান্ধী নিষিদ্ধ করেছিলেন। এটা প্রায় প্রত্যেক ইন্ডিয়ানই সমর্থন

করেছিল। কিন্তু যখন হুসেন হিন্দু দেবীকে নগ্নভাবে আঁকলো তখন ইন্ডিয়ার রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে কমিউনিস্ট দলগুলো বলেছিল যে, এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা। তিনি যা খুশি আঁকতে পারেন। ইসলাম অন্য ধর্মের দেবতাদের অপমান, ছোট করা সম্পর্কে কি বলে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি যে মুসলমান শিল্পীর কথা বলেছেন তিনি এম.এফ. হুসেন। এম.এফ. হুসেন মুম্বাইয়ে থাকেন। আমিও একই শহর থেকে এসেছি। তিনি দেবী স্বরস্বতীর কিছু নগ্ন ছবি এঁকেছেন আর অনেক সাংবাদিকও তাকে সমর্থন করেছে এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে। আপনি আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। প্রথম কথা হলো, কোন মহিলার নগ্ন ছবি আঁকা সেটা দেবতা/দেবী হোক বা না হোক ইসলামে সেটা হারাম। হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম এটা অনৈতিক, অমানবিক। কেন আপনি আপনার মেয়েকে বিক্রি করবেন? কেন আপনি পিছিয়ে যাবেন? দেখেন পশ্চিমা কালচারে কি হচ্ছে? তারা আমাদের মা-বোনদের বিক্রি করছে। একটা বিখ্যাত বিএমডব্লিউ-এর অ্যাডের কথা শুনেছিলাম। বিএমডব্লিউ গাড়ির নাম শুনেছেন? এটা অনেকটা বড়লোকদের ও ধনী লোকদের জন্য মার্সিডিজ গাড়ির মত। খুব দামি একটা গাড়ি। আমি দুঃখের সাথে বলছি যে, আমি শুনেছিলাম সেই বিজ্ঞাপনে একজন মহিলা বিকিনি পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির সামনে ওপরে লেখা আছে, 'তাকে পরীক্ষামূলক চালানো শুরু কর এখনই।' কাকে? গাড়ি না মেয়েটা। মেয়েটার ঐ গাড়ির সামনে কি প্রয়োজন? এসব কিছুই ঐ মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে মেয়েদের অপমান করা। এম.এফ. হুসেন যা করেছেন সেটা সম্পূর্ণ ভুল। মূল প্রশ্নটাতে আসি। আপনি কি অন্যান্য ধর্মের দেবতাদের সমালোচনা করতে পারবেন? আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরা আনআমের ১০৮ নং আয়াতে বলেছেন–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য যেসব উপাস্যদের তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কারণ, তাহলে অজ্ঞতার কারণে শত্রুতামূলকভাবে তারা আল্লাহকে গালি দিবে।'

কোরআন বলছে, 'নিন্দা করো না ঐ দেবতাদের যারা তাদের উপাসনা করে আল্লাহ ছাড়া বরঞ্চ তারাই না জেনে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'য়ালার নিন্দা করে।' তাই ইসলাম ধর্মে কোন ধর্মের দেবতাকে নিন্দা করা যদিও আপনি তাকে না মানেন– সেটা নিষিদ্ধ। আর ঠিক একথাই বলা হচ্ছে সূরা আনআমের ১০৮ নং আয়াতে। এম.এফ. হুসেন একজন দেবীর নগ্ন ছবি এঁকেছেন যেটা ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২২১। কেন অধিকাংশ মুসলমান মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী?

উত্তর ঃ মুসলমানদেরকে প্রায়ই এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে হয় প্রত্যক্ষভাবে নয় পরোক্ষভাবে, যখনি সমকালীন বিশ্ব বা ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। মুসলমানগণ অব্যবহিত কাল থেকেই সব ধরনের মিডিয়া থেকে তথ্য সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ মিথ্যা তথ্য ও মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা প্রায়শই মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও সহিংসতার সৃষ্টি করছে। উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রতিককালে মার্কিন মিডিয়া কর্তৃক 'একলাহোমায়' বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে মুসলিম বিরোধী অপপ্রচারের কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে আমেরিকান সংবাদ সংস্থা ও সংবাদপত্রগুলো তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করল যে, এটি 'মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র।' পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসল অপরাধী হল এক মার্কিন সেনা সদস্য।

চলুন, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করি।

১. শাব্দিক অর্থে মৌলবাদী

শাব্দিক অর্থে একজন মৌলবাদী হল এমন একজন ব্যক্তি যে তার ধারণকৃত তত্ত্ব বা মতবাদকে অনুসরণ করে, তার ওপর অনুগত থাকে এবং একনিষ্ঠভাবে তা পালন করার চেষ্টা করে। একজন ব্যক্তি ডাক্তার হতে চাইলে তার উচিত মেডিসিন তত্ত্বের মৌল নীতিসমূহ জানা, অনুসরণ করা এবং তার চর্চা করা। তখনই সে মেডিসিন তত্ত্বে মৌলবাদী হতে পারবে।

একজন ব্যক্তি গণিতশাস্ত্রে ভালো হতে চাইলে তার উচিত গণিতশাস্ত্রের মূলনীতিসমূহ ভালোভাবে জানা, তার অনুশীলন করা এবং ব্যাপকভাবে তার চর্চা করা। তবেই সে গণিতশাস্ত্রে মৌলবাদী হতে পারবে।

একজন ব্যক্তি ভালো বিজ্ঞানী হতে চাইলে তারও উচিত বিজ্ঞানের মৌলসমূহ জানা, তার পথ অনুসরণ করা এবং একনিষ্ঠভাবে তার অনুশীলন করা। কেবল তখনি সে বিজ্ঞান শাখায় মৌলবাদী হতে পারবে।

২. সব মৌলবাদী এক নয়

একজন ব্যক্তি একই ব্রাশ নিয়ে যেমন সব রং একত্রে আঁকতে পারে না, তেমনিভাবে একজন ব্যক্তি সব মৌলবাদীকে একই শ্রেণীতে ফেলতে পারে না, হয় তা ভাল ক্ষেত্রে হোক বা মন্দ ক্ষেত্রে হোক।

একজন মৌলবাদীকে এরকমভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়, কোন ক্ষেত্রে সে পারদর্শী তার ওপর ভিত্তি করে। একজন ডাকাত বা চোর মৌলবাদী সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ এবং সে সমাজে কারো কাম্য নয়। অন্যদিকে, একজন ডাক্তার মৌলবাদী সমাজের জন্য উপকারী এবং সে সমাজে সম্মানিত।

৩. মুসলিম মৌলবাদী হিসেবে আমি গর্বিত

আল্লাহর দয়ায় আমি একজন মুসলিম মৌলবাদী, যে ইসলামকে ভালো জানে, অনুসরণ করে এবং বাস্তবায়নের সর্বাত্মক চেষ্টা করে। একজন সত্যিকারের মুসলমান মৌলবাদী হতে লজ্জাবোধ করে না। আমি মুসলিম মৌলবাদী হিসেবে গর্ববোধ করি। কারণ, আমি জানি যে, ইসলামের নীতিমালাসমূহ মানবজাতি এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী। ইসলামের নীতিসমূহের মধ্যে এমন ১টি নীতিও নেই যা মানুষের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক।

অনেক মানুষ ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা তথ্যের আশ্রয় নেয় এবং ইসলামের অনেক বিধি-বিধানসমূহকে অসঙ্গতিপূর্ণ ও ভুল মনে করে। আর এ ধারণা পোষণ করে তারাই যারা সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা রাখে না।

যদি কোনো ব্যক্তি খোলা মনে ইসলামের বিধি বিধানগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে তবে সে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, ইসলাম সমাজ ও ব্যক্তি উভয় ক্ষেত্রেই উপকারী।

৪. আভিধানিক অর্থে মৌলবাদী

Webster ডিকশনারীর মতে, মৌলবাদ ছিল আমেরিকান প্রোটেস্টাইন খ্রিস্টানদের একটি আন্দোলন যা বিংশ শতাব্দির প্রথমে আমেরিকাতে শুরু হয়েছিল। এটি হয়েছে তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের সংস্কার করে যুগোপযুগী করার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। এ সংস্কার ঐ সমস্ত খ্রিস্টানদের ধর্ম বিশ্বাসকে মারাত্মক আহত করেছে, যারা বিশ্বাস করত বাইবেলের প্রত্যেকটি শব্দ নির্ভুল এবং স্রষ্টার পক্ষ হতে আগত এবং যুগোপযুগী। সুতরাং 'মৌলবাদী' শব্দটি এমন একটি শব্দ যা প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে এক শ্রেণীর খ্রিস্টানদের বেলায় যারা বিশ্বাস করত যে, বাইবেল অক্ষরে অক্ষরে স্রষ্টার বাণী যাতে কোন ধরনের ভুল নেই।

Oxford ডিকশনারীর মতে 'মৌলবাদ' হলো– প্রাচীন কোনো মতবাদ বা ধর্মের কঠোর অনুশীলন বিশেষত ইসলাম।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে বলতে হয় আজ এমন এক সময় যখন 'মৌলবাদী' বলতে বুঝানো হয় কেবল ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তিকে এবং ধারণা করা হয় সে একজন সন্ত্রাসী।

৫. প্রত্যেক মুসলমানকে সন্ত্রাসী হতে হবে

প্রত্যেক মুসলমানকেই একজন সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। একজন সন্ত্রাসী এমন ব্যক্তি যে মানুষের মাঝে অপকর্ম করে বেড়ায় এবং সে সমাজে ভীতি ছড়ায়।

কিন্তু যখনি একজন ডাকাত পুলিশকে দেখে তখনি সে ভীত হয়ে পড়ে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে একজন পুলিশ ডাকাতের জন্য সন্ত্রাসীস্বরূপ। একই রকমভাবে প্রত্যেক মুসলমানকে সমাজের জন্য ক্ষতিকর শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীস্বরূপ হতে

হবে। এ রকম অসামাজিক লোক যেমন- চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী, ধর্ষক ইত্যাদি মানুষ যেন একজন মুসলমানকে দেখে তখন সে যেন মুসলিমকে ভয় পায়। এটি সত্য যে, সন্ত্রাসী শব্দটি সাধারণত ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্ত্রাসী করে। তবে একজন সত্যিকারের মুসলমানকে কেবল কিছু সংখ্যক মানুষ নামধারী অমানুষদের জন্য সন্ত্রাসীর ভূমিকা নিতে হবে। অবশ্যই নির্দোষ মানুষের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলমানকে সাধারণ মানুষের জন্য শান্তির ধারক-বাহক হওয়া উচিত।

৬. একই ব্যক্তিকে একই কাজের জন্য ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যায়

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ থেকে স্বাধীন হওয়ার আগে কিছু মুক্তিযোদ্ধা যারা স্বাধীনতার জন্য সহিংস আন্দোলন করেছে ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে 'সন্ত্রাসী' বলে আখ্যায়িত করেছে; অন্যদিকে ভারতবর্ষের মানুষ তাদেরকে সে একই কাজের জন্য 'দেশ প্রেমিক' বলে আখ্যায়িত করেছে।

সুতরাং দেখা গেল একই কাজের জন্য একই ধরনের মানুষকে দুটি ভিন্ন গ্রুপ ভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছে। এক শ্রেণী বলেছে 'সন্ত্রাসবাদ' অন্য শ্রেণী বলেছে 'দেশ প্রেম'।

ঐ সব লোক যারা বিশ্বাস করে ভারতের ওপর ব্রিটিশদের শাসন করার অধিকার রয়েছে তারা বলল এটি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। অন্যদিকে যারা বিশ্বাস করে ভারতবর্ষ শাসন করার কোন অধিকার ব্রিটিশদের নেই তারা তাদের কার্যকলাপকে মুক্তিযুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছে এবং তাদেরকে দেশ প্রেমিক হিসেবে বরণ করেছে। সুতরাং একজন মানুষের বিচার হওয়ার পূর্বে তার পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত শুনানি হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাদী-বিবাদী দুপক্ষেরই যুক্তি শোনা, অবস্থা বিশ্লেষণ করা এবং তাদের ঐ ঘটনার পিছনে কি অভিপ্রায় ছিল তা বিবেচনায় নেয়া উচিত। তবেই কেবল সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার পাওয়া সম্ভব।

৭. ইসলাম মানে শান্তি

ইসলাম শব্দটি 'সালাম' শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ শান্তি। সুতরাং ইসলাম শান্তির ধর্ম, যার মূলনীতিসমূহ তার অনুসারীদের শিক্ষা দেয় সারা বিশ্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং তা আরো সুদৃঢ় করতে।

এভাবে প্রত্যেক মুসলিমকেই মৌলবাদী হতে হবে অর্থাৎ তাকে অবশ্যই ইসলামের অর্থ শান্তির ধর্মের আইন-কানুনসমূহ অনুসরণ করতে হবে। তাকে সন্ত্রাসী হতে হবে কেবল সমাজের আগাছাদের জন্য, শুধু সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

প্রশ্ন ঃ ২২২। ইসলামকে কেন শান্তির ধর্ম বলা হয়, যেখানে এটি বিস্তৃতি লাভ করেছে তরবারীর মাধ্যমে?

উত্তর ঃ কিছু সংখ্যক অমুসলিমের কাছে এটি খুব সাধারণ প্রশ্ন যে, কোটি কোটি মুসলমান ইসলামের অনুসারী হতো না যদি ইসলাম শক্তির মাধ্যমে বিস্তৃত না হতো।

নিচের বিষয়গুলো এ ধারণা স্বচ্ছ করবে বলে আশা রাখি :

১. ইসলাম অর্থ শান্তি

'ইসলাম' শব্দটির মূল বা উৎপত্তিগত শব্দ হল 'সালাম' যার অর্থ শান্তি। এর অন্য অর্থ হলো একমাত্র আল্লাহর কাছে ব্যক্তির ইচ্ছা বিসর্জন দেয়া। অর্থাৎ, নিঃশর্তভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। তাই ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম এবং এ ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

২. মাঝে মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার্থে শক্তি ব্যবহার করতে হয়

এ পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের কাজ কর্ম শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূলে আসে না। বরং তাদের মধ্যে অনেকেই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত। তাই মাঝে মাঝে তাদের নিভৃত করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। ইসলাম মাঝে মাঝে শক্তি ব্যবহার করেছে এ কারণে যাতে দেশে সমাজ বিরোধী ও অপরাধীরা শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করতে না পারে। ইসলাম প্রকৃতপক্ষে সমাজে শান্তি বিস্তৃত করে। একই সাথে ইসলাম তার অনুসারীদের এও আদেশ দিয়েছে, যে এ শান্তি-শৃঙ্খলার বিনষ্ট করবে তাকে নিভৃত করতে, তার ওপর শক্তি প্রয়োগ কর। অত্যাচার, অবিচার, বৈষম্য ও শান্তি-শৃঙ্খলার পরিপন্থিদের বিরুদ্ধে কখনো তাই শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে। ইসলামে কেবল শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই শক্তি ব্যবহারের বিধান রয়েছে।

৩. ঐতিহাসিক ডি ল্যাসি ওলেবী

ইসলাম তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে এ ভুল ধারণার সর্বোত্তম জবাব দিয়েছেন ঐতিহাসিক ডি ল্যাসি ওলেবী তার বিখ্যাত বইতে (Islam at the Cross Road) পৃষ্ঠা ৮ এ। তিনি বলেছেন 'মুসলমানগণ তাদের ধর্মের অগ্রযাত্রার পথে অস্ত্রের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে।' এটি একটি বাস্তবতা বিবর্জিত উদ্ভট পৌরাণিক গল্প; যা ঐতিহাসিকগণ বার বার উল্লেখ করেছেন।

৪. মুসলমানগণ ৮০০ বছর স্পেন শাসন করেছেন

মুসলমানগণ প্রায় আটশত বছর স্পেন শাসন করেছেন। স্পেনে মুসলমানরা সেখানকার মানুষদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য কখনোই শক্তি ব্যবহার করেন নি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন খ্রিস্টান ক্রুসেডররা স্পেনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে

তখন তারা সেখান থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে। এমনকি সেখানে এমন একজন মুসলমানও অবশিষ্ট ছিল না যে উচ্চস্বরে আযান দিতে পারে।

৫. আরব বিশ্বে ১৪ মিলিয়ন উত্তরাধিকার সূত্রে খ্রিস্টান

মুসলমানগণ প্রায় ১৪শত বছর যাবত আরব বিশ্ব শাসন করে আসছে। মাঝখানে কিছুদিন ব্রিটিশ ও ফ্রেঞ্চও শাসন করেছে। তদুপরি মুসলমানরা ১৪০০ বছর শাসন করছে। কিন্তু এখনো সেখানে প্রায় ১৪-১৫ মিলিয়ন উত্তরাধিকার সূত্রে খ্রিস্টান রয়েছে যারা যুগ যুগ ধরে তাদের ধর্ম পালন করে আসছে। যদি মুসলমানরা শক্তি ব্যবহার করত তবে কি সেখানে একজন খ্রিস্টানও অবশিষ্ট থাকতো?

৬. ভারতের শতকরা ৮০%-এর বেশি ভারতীয় অমুসলিম

মুসলমানগণ প্রায় ১০০০ বছর যাবত ভারত শাসন করেছে। যদি তারা চাইত তবে ভারতের প্রত্যেকটি অমুসলিমকে ইসলামে দীক্ষিত করার ক্ষমতা তাদের ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বর্তমানে ভারতের ৮০%-এর বেশি মানুষ অমুসলিম। এ সমস্ত মানুষ আজ প্রত্যক্ষদর্শী যে, ইসলাম মোটেই তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে নি।

৭. ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া

ইন্দোনেশিয়া বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। মালয়েশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও মুসলমান। এখন প্রশ্ন জাগে কবে, কোন সৈন্য ঐ দেশ দুটিতে অস্ত্রের দাপটে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে?

৮. আফ্রিকার পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল

ইসলাম-পূর্ব আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। এখন কেউ এ প্রশ্ন করতেই পারে যদি ইসলাম শক্তির দাপটে বিস্তার লাভ করে থাকে তবে কোন মুসলিম সৈন্যদের দ্বারা এ বিস্তার ত্বরান্বিত হয়েছে?

৯. থমাস কার্লাইল

বিখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল তার বই 'হিরো এন্ড হিরো'স ওরমীপ-এ ইসলামের বিস্তার সম্পর্কে ভুল ধারণার অবতারণা করেছেন– এটি তরবারি বটে, কিন্তু আপনি কোথা থেকে তরবারি পাবেন? প্রত্যেকটি নতুন ধর্ম বা মত প্রচারের প্রারম্ভকালে খুব ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে। এ মতটি কেবল একজন ব্যক্তির মাথাতেই থাকে এবং এটি তার মাঝেই বসবাস করে। সারা পৃথিবীতে সেই কেবল এটি বিশ্বাস করে। বিশ্বের সমগ্র মানুষের বিপক্ষে তার অবস্থান থাকে। আর এ বিশ্বাস (ধর্মমত)-টিই হলো তার তরবারি; যা সে ধারণ করে এবং এর সাহায্যে সে তার ব্যাপক প্রচার চালাতে চেষ্টা করে। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই আদর্শের

অস্ত্র ধারণ করতে হবে। সর্বোপরি, এটি এমন এক অস্ত্র যে নিজেই তার প্রচার কার্য চালাতে পারে।

১০. ধর্ম গ্রহণে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই

কোন অস্ত্রের সাহায্যে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছে? যদিও তাদের হাতে অস্ত্র থাকত তথাপি ইসলাম বিস্তারের কাজে তারা এ অস্ত্র ব্যবহার করতে পারত না। কারণ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ আছে–

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ـ

অর্থ : 'ইসলামে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।'

'আজ সত্য মিথ্যা থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।'

১১. মেধার অস্ত্র

ইসলাম ধর্ম মেধার অস্ত্র। যে অস্ত্র মানুষের হৃদয়-মন জয় করেছে। পবিত্র কুরআনের সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

অর্থ : তোমরা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাক প্রজ্ঞা সহকারে আর উত্তম উপদেশের দ্বারা; আর তাদের সাথে যুক্তিতর্ক কর অতি উত্তম পন্থায়।

১২. ইসলাম ইউরোপ এবং আমেরিকাতে দ্রুত বর্ধনশীল

বর্তমানে আমেরিকাতে দ্রুততম বর্ধনশীল ধর্ম হল ইসলাম। ইউরোপের দ্রুত বর্ধনশীল ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলাম ১ নম্বরে। পাশ্চাত্যে কোন্ অস্ত্রের জোরে ইসলাম এতো বিরাট সংখ্যক মানুষকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছে?

১৩. ড. যোশেফ এডাম পিয়ারসসন

ড. যোশেফ এডাম পিয়ারসন যথার্থই বলেছেন, ঐ সমস্ত মানুষ যারা এ ভেবে উদ্বিগ্ন যে, একদিন পরমাণু অস্ত্র আরবদের হাতে চলে আসবে, তারা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামিক বোমা ইতোমধ্যে হস্তগত হয়েছে, আর এটা সেদিনই হয়েছে যেদিন হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্মগ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ ২২৩। আমি মিসেস সারলা রামচন্দর। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, কেন মুসলিমরা খোদাকে 'আল্লাহ' বলে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন যে প্রশ্নটি রেখেছেন তাহলো 'কেন মুসলমানরা খোদাকে আল্লাহ বলে?' আমার বক্তব্যে আমি আল-কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর পরিচয় সূরা ইখলাসের আলোকে তুলে ধরছি। ১১২ নং সূরা ইখলাসে বলা হয়েছে–

'বলুন, তিনিই আল্লাহ এক এবং একক, আল্লাহ অদ্বিতীয়, অনন্ত, তিনি কাউকে জন্ম দেন নি, কারো দ্বারা জন্মগ্রহণও করেন নি। এ পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।' ১৭ নং সূরা ইসরা-এর ১১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۔

অর্থ : বলুন, আল্লাহ নামে আহ্বান কর, কিংবা রহমান বলে, তাঁকে যে নামেই ডাক না কেন, তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে।

আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম আছে এ সংবাদ নিম্নোক্ত বিভিন্ন সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে–

৭ নং সূরা আরাফ-এর ১৮০ নং আয়াত,

৫৯ নং সূরা হাশর-এর ২৪ নং আয়াত এবং

২০ নং সূরা ত্বাহা-এর ৮ নং আয়াতে।

'আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম আছে।' কিন্তু এসব নাম যেন কোনোরূপ মনের উপর ছবি না আনে। তবে নাম হতে হবে সুন্দর।

গড্‌কে 'আল্লাহ' বলার কারণ

মুসলমানরা 'খোদা' বলার পরিবর্তে 'আল্লাহ' বলে। 'গড্' ইংরেজি শব্দ, খাঁটি আরবি শব্দ আল্লাহ। ইংরেজি 'গড্' শব্দের নিম্নরূপ রূপান্তর ঘটতে পারে। যেমন:

যদি God এর সাথে s যোগ করেন তাহলে Gods অর্থাৎ বহুবচন হবে। আপনি আল্লাহর সাথে s যোগ করতে পারেন না। 'আল্লাহ' বহুবচন বলতে কিছু নেই। আল্লাহ, যেমন– আল-কুরআনে আছে 'বলুন, তিনি আল্লাহ, এক এবং একক।' যদি আপনি dess যোগ করেন তাহলে Godess অর্থাৎ নারী God হবে। আল্লাহর নারী-পুরুষ বলতে কিছু নেই। আল্লাহর কোনো লিঙ্গ নেই। আপনি যদি God বড় হাতের G দিয়ে লেখেন তাহলে এটা হবে সত্যিকার God. যদি ছোট হাতের g দিয়ে god লিখেন তাহলে এর অর্থ হবে নকল খোদা।

ইসলামে আমাদের একজনই সত্য আল্লাহ। আমাদের কোনো মিথ্যা আল্লাহ নেই। যদি আপনি god-এর সাথে father যোগ করেন তাহলে হবে godfather. সে আমার গডফাদার। আপনি আল্লাহর সঙ্গে 'আব্বা' কিংবা 'ফাদার' যোগ করতে পারবেন না। 'আল্লাহ আব্বা' কিংবা 'আল্লাহ ফাদার' বলে ইসলামে কিছু নেই। যদি আপনি god-এর সাথে mother যোগ করেন তাহলে হবে godmother। আপনি আল্লাহর সাথে 'মাদার' বা 'আম্মি আল্লাহ' বলতে পারেন না। ইসলামে 'আম্মি আল্লাহ' বলতে কিছু নেই। যদি আপনি গড এর পূর্বে 'টিন' লাগান তাহলে হবে 'টিনগড' বাতিল গড। ইসলামে 'টিন আল্লাহ' বলতে কিছু নেই। আল্লাহ খাঁটি এবং

একক। আপনি তাঁকে যে কোন নামে ডাকতে পারেন, তবে অবশ্যই তা হতে হবে সুন্দর নাম। আমি আশা করি উত্তর যথেষ্ট হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২২৪। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম কাসিম দবীর। আমার প্রশ্ন হলো অ্যারুন শৌরী বলে যে, আল-কুরআনের ৪ নং সূরার আয়াত নং ১১ ও ১২ এতে উল্লেখিত, যদি আপনি উত্তরাধিকারীদের প্রতি প্রদত্ত অংশগুলো যোগ করেন তাহলে যোগফল ১ এর অধিক হয়। অতএব এ্যারুন শৌরী দাবী করে যে, কুরআনের রচয়িতার গণিতের জ্ঞান নেই, অনুগ্রহ করে পরিষ্কার করুন।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাইটি একটা প্রশ্ন করেছেন যে, অ্যারুন শৌরী আল-কুরআনের ৪ নং সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াতের উত্তরাধিকারীদের অংশগুলো একত্র করলে অংশগুলো ১-এর অধিক হয়; অতএব তাঁর দাবী হলো কুরআনের রচয়িতা গণিত জানেন না।

আমি আমার বক্তব্যে আপনাদের বলেছি, হাজার হাজার লোক যারা কুরআনের ভুল-এর দিকে ইঙ্গিত করেছে; কিন্তু আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, তাদের সবগুলোই অসত্য। তাদের একজনও সত্য বলে নি।' কুরআন উত্তরাধিকারের বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছে।

২ নং সূরা বাকারার ১৮০ নং আয়াত

২ নং সূরা বাকারার ২৪০ নং আয়াত

৪ নং সূরা নিসার ৯ নং আয়াত

৪ নং সূরা নিসার ১৯ নং আয়াত

৫ নং সূরা মায়িদার ১০৫ নং আয়াত

এটি বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে, তবে অংশগুলোর বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রে ৪ নং সূরা নিসার আয়াত নং ১১ ও ১২, একই সূরা আয়াত নং ১৭৬।

অ্যারুন শৌরীর উদ্ধৃত আয়াতের অনুবাদ যেটা ৪ নং সূরার নিসার আয়াত নং ১১ ও ১২ এতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের সন্তানদের উত্তরাধিকারের অংশ সম্পর্কে পুরুষ-নারীর দ্বিগুণ পাবে। কেবল একজন কন্যা দুই হয়ে অর্ধেক দুই এর অধিক কন্যা হয় তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ, যদি কন্যা মাত্র একজন হয় তাহলে অর্ধেক। যদি পিতামাতা দু'জন থাকে তাহলে প্রত্যেকে ছয় এর একাংশ পাবে, যদি তাদের সন্তান থাকে, যদি সন্তান না থাকে তাদের মা পাবে তিন ভাগের একভাগ। অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

'তোমার স্ত্রী যা ছেড়ে রেখে গেছে- সন্তান থাকলে তার চারভাগের এক ভাগ এবং সন্তান না থাকলে অর্ধেক তোমরা পাবে। অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমরা যা ছেড়ে রেখে যাও সন্তান না থাকলে তাঁর চার ভাগের একভাগ এবং সন্তান থাকলে পাবে আট ভাগের একভাগ তোমাদের স্ত্রীগণ।'

এটা কিছু দ্বিধান্বিত বিষয় তবে আপনারা দ্বিধান্বিত হবেন না। আপনি বাড়ি গিয়ে দেখতে পারেন। সংক্ষেপে সূরা নিসার ১১ নং আয়াতে প্রথম যে অংশের কথা বলা হয়েছে, তা সন্তানদের, অতঃপর পিতা-মাতার। পরবর্তীতে ১২ নং আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর অংশ। উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ইসলাম বিস্তারিত বর্ণনা করে। আল-কুরআন মূল নির্দেশনা দান করে। আপনি বিস্তারিত পেতে হলে হাদীস দেখেন। একজন মানুষ তাঁর পূর্ণ জীবন শুধু ইসলামের উত্তরাধিকার বিধানের গবেষণায় কাটাতে পারে। অ্যারুন শৌরী মাত্র দু'টি আয়াত-এর উদ্ধৃতি দিয়েই এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের প্রত্যাশা করে। এটা কিছুটা ঐ রকম, যে ব্যক্তি সরল অংকের সমাধান করতে চায় অথচ সে তার কোনো রুলই জানে না। যেমন BODMAS; BODMAS-এর নিয়ম অনুযায়ী B-O-D-M-A-S অর্থাৎ অংকের যে চিহ্নটি আসে, সেগুলো প্রথমে বা পরে যখনই আসুক প্রথম আপনাকে এর এর কাজ (ব্র্যাকেট off) করতে হবে। এরপর ভাগ (Division = D) ও গুণ (M = Multuplication) এরপর যোগ (Aaddition) ও বিয়োগ (S = Subtraction)। যদি আমরা এ সূত্র না জানি এবং প্রথমে বিয়োগ করে তারপর গুণ করে, তারপর যোগ করে 'এর' এর কাজ করি তাহলে অবশ্যই উত্তর ভুল বের হবে। একইভাবে অ্যারুন শৌরী নিজেই গণিত জানেন না। কারণ, ইসলামী উত্তরাধিকারের বিধান অনুযায়ী মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রথমেই স্বামী-স্ত্রী ও পিতা-মাতার অংশ দিতে হবে। এরপর যা থাকবে তা সন্তানদের মধ্যে ভাগ হবে। যদি আপনি এ নিয়ম অনুসরণ করেন তা হলে যোগফল কখনোই ১ এর অধিক হবে না। আশা করি উত্তর যথেষ্ট হয়েছে।

(উদাহরণ স্বরূপ ধরুন, আঃ করিম, স্ত্রী, সন্তান ও পিতা-মাতা রেখে মারা গেলেন। তার সম্পদের ১/৬ পিতা, ১/৬ মাতা, স্ত্রী ১/৮ মোট (১/৬ + ১/৬ + ১/৮) = ১১/২৪ অংশ দেবার পর যা থাকবে অর্থাৎ ১৩/২৪ সন্তানদের মধ্যে ১ ঃ ২ অনুপাতে ভাগ করে দিতে হবে। – অনুবাদক।)

প্রশ্ন ঃ ২২৫। আমার নাম ফৌজিয়া সাঈদ। আমি BMC-তে পরিদর্শক হিসেবে কাজ করি। আমি খ্রিস্টান ছিলাম এবং ১৯৮০ সালে ইসলাম গ্রহণ করি। আমি কিভাবে আমার মাতা-পিতাকে, যারা এখনো খ্রিস্টান, বুঝাই মুহাম্মদ ﷺ বাইবেল থেকে কুরআন নকল করেন নি।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ যে বোন প্রশ্নটি করেছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। পূর্বে তিনি খ্রিস্টান ছিলেন। আমি তাঁকে একবার নয় তিনবার অভিনন্দন জানাই। নাস্তিকদের একবার অভিনন্দন আর তাঁকে তিনবার। কারণ, তিনি 'লা-ইলাহা' বলার পর 'ইল্লাল্লাহ' বলেছেন অতঃপর 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-ও বলেছেন। অর্থাৎ কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ ছাড়া, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর

প্রেরিত রাসূল। আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই।

প্রশ্নটা হলো যে, কিভাবে তিনি প্রমাণ করবেন, কিভাবে তিনি তাঁর আত্মীয়দের বুঝাবেন যে, কুরআন বাইরে থেকে নকল কিংবা চুরি করে নিজের বলে চালানো হয় নি। আমি আপনাকে যেরূপ একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা বলেছি যে, নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিরক্ষর ছিলেন, এটা প্রমাণের জন্য এই যথেষ্ট। আল-কুরআনের ৭ নং সূরা আরাফের ১৫৭ নং আয়াতে বলে–

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ ـ

অর্থ : যারা এই বার্তাবাহক নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে। যার উল্লেখ তাদের (কিতাব) তাওরাত ও ইঞ্জিলেও তারা দেখতে পায়।

এবং আজও যদি আপনি বাইবেল অধ্যয়ন করেন। ইসাইয়াহ গ্রন্থের অধ্যায় ২৯, শ্লোক নং ১২-তে উল্লেখ আছে ঃ 'একজন নবীকে যিনি শিক্ষিত নয়, তাকে একটি কিতাব দেয়া হবে।'

কুরআন বলছে, তাদের শাস্ত্রে, যদি আপনি বাইবেল খোলেন এটা তাদের ইসাইয়া হতে অধ্যায়– ২৯, শ্লোক– ১২-তে রয়েছে। ঐ সব প্রাচ্যবিদ, যারা বলে হযরত মুহাম্মদ ﷺ কুরআনকে বাইবেল থেকে নকল করেছেন নাউযুবিল্লাহ তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন বর্তমান ছিলেন তখন বাইবেলের কোন আরবি অনুবাদ ছিল না। প্রথম ওল্ড টেস্টামেন্ট আরবিতে যেটা আমাদের নিকট আছে তা আর সাদিয়াস গাওন কর্তৃক ৯০০ খ্রিস্টাব্দে অনূদিত। সেটা সাধারণ বিষয়, নবী করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের ২০০ বছরেরও পরে এবং আরবিতে সবার আগে যে নিউ টেস্টামেন্ট আমাদের হাতে যেটা আছে, তা প্রকাশিত হয় ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের প্রায় হাজার খানিক বছর পরে।

আমি এ ব্যাপারে একমত হতে পারি যে, বাইবেল এবং কুরআনের মধ্যে কিছু মিল আছে। এতে একথা বুঝায় না যে, পরেরটা পূর্বেরটা থেকে নকল করা হয়েছে। এটা এ অর্থ দেয় যে, উভয়েরই তৃতীয় উৎস আছে। আল্লাহর নাযিলকৃত সব সংবাদেই আল্লাহকে বিশ্বাসের কথা আছে। তাঁদের একই সংবাদ আছে। পরবর্তী সকল নাযিলকৃত কিতাবেরই সময়-সীমা নির্ধারিত ছিল। যেমন– আমি উল্লেখ করেছি, সেগুলো তাদের মূল গঠনের ওপর নেই। সেগুলোতে অন্যায় সংযোজন (তাহরীফ) ঘটেছে। সেগুলোতে অনেক মানব সংযোজিত মিথ্যা কাহিনী সংযুক্ত রয়েছে। তারপরেও সেগুলোতে আবশ্যকীয়ভাবে কিছু বিষয়ের মিল রয়েছে। শুধু মিলগুলোর কারণে বলা ভুল হচ্ছে যে, এগুলো নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বাইবেল

থেকে নকল করেছেন। এক্ষেত্রে এটাও অর্থ দেয় যে, যীশু (নাউযুবিল্লাহ) নিউ টেস্টামেন্ট, ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে নকল করেছেন, কেননা নিউ এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। উভয় গ্রন্থই একই উৎস (আল্লাহর) থেকে এসেছে।

ধরুন, কেউ পরীক্ষায় নকল করল, আমি উত্তর পত্রে লিখব না, আমি আমার প্রতিবেশীর থেকে নকল করলাম। আমি লিখব না, আমি x y z থেকে নকল করেছি। হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরিষ্কারভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, ঈসা (আ), মূসা (আ) এবং সব নবীই আল্লাহ প্রেরিত। এটা তাঁদের সঠিক সম্মান ও মর্যাদা দান করে। তিনি যদি নকল করতেন তাহলে তিনি বলতেন না যে, ঈসা (আ), মূসা (আ) আল্লাহর নবী ছিলেন। এটা প্রমাণ করে যে, তিনি নকল করেন নি; শুধু ঐতিহাসিক বিষয়াবলির ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তির পক্ষে বলা কঠিন– কোনটা সঠিক, বাইবেল না কুরআন।

যাহোক, আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে পরীক্ষা করতে পারি। এর উপরিভাগে যদি আপনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, দেখবেন অনেক ঘটনা এবং দিক আছে যেগুলো কুরআনে যেমন উল্লেখ আছে, তেমনি বাইবেলেও উল্লেখ পাওয়া যায়।

আপনি যদি উপরিভাগে তাকান, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন অনেক ঘটনা এবং বিষয় কুরআনে যেমন উল্লেখ আছে বাইবেলেও তেমনি আছে। আপনি এক রকমই দেখতে পাবেন। কিন্তু আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন তাহলে আকাশ পাতাল পার্থক্য পাবেন। উদাহরণস্বরূপ, বাইবেলে উল্লেখ আছে, জেনেসিস প্রথম অধ্যায়, বিশ্ব স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে এটি ৬ দিনে সৃষ্টি হয়েছে এবং দিনের বর্ণনা করা হয়েছে ২৪ ঘণ্টা সময়। আল-কুরআনও বিভিন্ন স্থানে যেমন ঃ

৭নং সূরা আল আরাফের ৫৪ নং আয়াত

১০ নং সূরা ইউনুস-এর ৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'জান্নাত এবং পৃথিবী ৬ আইয়্যামে সৃষ্টি করেছি।' আরবি শব্দ ايام। শব্দটি يَوْمٌ শব্দের বহুবচন যার অর্থ দিন। يوم অর্থ দিন। এর অর্থ অনেক অনেক দীর্ঘ সময় এমন কি যুগও বুঝায়। অতএব এখানে আল-কুরআন যখন বলবে জান্নাত এবং পৃথিবী ছয় যুগ ধরে অর্থাৎ অনেক অনেক দীর্ঘ সময় ধরে সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে এ বর্ণনায় বিজ্ঞানীদের কোনো আপত্তি থাকে না। কিন্তু পৃথিবী মাত্র ২৪ ঘণ্টার ছয় দিনে সৃষ্টি হয়েছে এটা অবৈজ্ঞানিক।

বাইবেলে ১ নং 'জেনেসিস অধ্যায়ের ৩ ও ৫ নং শ্লোকে বলা হয়েছে; প্রথম দিনে দিন এবং রাতের সৃষ্টি হয় এবং বিজ্ঞান আমাদের বলছে মহাবিশ্বের আলো সৃষ্টি হয়েছে নক্ষত্রের প্রতিক্রিয়ায় এবং বাইবেলে জেনেসিস ১ম অধ্যায়-এর শ্লোক নং ১৪ ও ১৯ এ বলা হয়েছে যে, সূর্য চতুর্থ দিনে সৃষ্টি হয়েছিল, কিভাবে এটা সম্ভব

যে, ফলাফল যেটা হলো 'আলো' সূর্যের চারদিন পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে? অযৌক্তিক, এটা অবৈজ্ঞানিক, পৃথিবী যা দিন রাতের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন, তা সৃষ্টি হয়েছে তৃতীয় দিনে। আল-কুরআনও আলো এবং সৃষ্টি সম্পর্কে বলে তবে এটা অসম্ভব ও অবৈজ্ঞানিক ধারাবাহিকতা প্রদান করে না। আপনারা কি মনে করেন যে, নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এটা বাইবেল থেকে নকল করে সংশোধন করে ঘটনাক্রমগুলো সাজিয়ে নিয়েছিলেন? কেউই এগুলো ১৪০০ বছর পূর্বে জানতেন না।

বাইবেলের জেনেসিস ১ম অধ্যায়ের ৯ থেকে ১৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, পৃথিবী তৃতীয় দিনে সৃষ্টি করা হয়, ১৪ থেকে ১৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, সূর্য এবং চন্দ্র চতুর্থ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। আজ বিজ্ঞান আমাদের বলছে যে, পৃথিবী এবং চন্দ্র মূল নক্ষত্রের অর্থাৎ সূর্যের অংশ। এটা অসম্ভব যে, পৃথিবী সূর্যের আগে সৃষ্টি হয়েছে। এটা অবৈজ্ঞানিক। বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায় নং-১ শ্লোক নং-১১ এবং ১৩ তে সবজির রাজত্ব, বীজ, বীজ বহনকারী চারাগাছ, লতা, গাছ-পালা তৈরি হয়েছিল তৃতীয় দিনে এবং ১৪ থেকে ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সূর্য সৃষ্টি হয়েছিল চতুর্থ দিনে। কিভাবে সবজির মূল সূর্য ছাড়াই অস্তিত্বে আসলো?

বাইবেলে জেনেসিস ১ম অধ্যায়, শ্লোক নং ১৬-তে বলা হয়েছে যে, সর্বশক্তিমান খোদা দু'টি বড় আলো সৃষ্টি করেছেন, সূর্য যেটা বড় আলো দিনকে পরিচালনা করার জন্য এবং চন্দ্র অপেক্ষাকৃত কম আলো, রাতকে পরিচালনা করার জন্য। বাইবেল বলে সূর্য এবং চন্দ্রের নিজস্ব আলো আছে। আমি পূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, আল কুরআনের ২৫ নং সূরা ফুরকান-এর ৬১ নং আয়াতে বলা হয়েছে চন্দ্রের আলো প্রতিবিম্বিত আলো। এটা কিভাবে সম্ভব যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ সব বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে নকল এবং সংগ্রহ করেছেন। এটা সম্ভব নয়।

যদি আপনি বাইবেল এবং কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করেন তাহলে উভয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পাবেন। বাইবেলে আদম (আ)-এর সৃষ্টির ঘটনা উল্লেখ আছে। প্রথম মানব যিনি এ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছিলেন তিনি হলেন আদম (আ) এবং বাইবেলে তার আনুমানিক তারিখ দিয়েছে ৫৮০০ বছর আগে। আজ প্রত্নবিদ্যা ও নৃবিদ্যার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞান বলছে যে, প্রথম মানব দশ হাজার বছর আগে ছিলেন। আল-কুরআনও আদম (আ) সম্পর্কে আলোচনা করে যে, তিনি প্রথম মানব ছিলেন; কিন্তু অবৈজ্ঞানিক কোনো তারিখ ঘোষণা করে নি।

বাইবেলে নূহ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করে যে, সেখানে যে প্লাবন হয়েছিল, তা ছিল পৃথিবীব্যাপী প্লাবন। জেনেসিস ৬, ৭ ও ৮ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ সেখানে হয়েছিল এক বিশ্বব্যাপী প্লাবন, যাতে পৃথিবীতে বসবাসকারী সব প্রাণী ডুবে যায় এবং মারা যায় শুধু এ সব ছাড়া যারা নূহ (আ)-এর কিস্তিতে ছিলেন। বাইবেলে উল্লিখিত আনুমানিক তারিখ হলো একবিংশ বা দ্বাবিংশ শতাব্দী। আজ প্রত্নতত্ত্ব

সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মিসরের ১১তম রাজবংশ এবং ব্যাবিলনের ২য় রাজবংশ, খ্রিস্টপূর্ব একবিংশ শতাব্দীতে কোনরূপ বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই চলছিল। অর্থাৎ এ ধরনের প্লাবন সেখানে হয় নি।

আল-কুরআনেও নূহ (আ)-ও বন্যা সম্পর্কে কথা বলে, কিন্তু কোনো তারিখ দেয় না এবং আল-কুরআন যে প্লাবনের কথা বলে তা ছিল স্থানীয় প্লাবন, এটি বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্তির কথা বলে না এবং এ প্লাবন ছিল নূহ (আ)-এর লোকদের মধ্যে এবং এর ওপরে বিজ্ঞানীদের কোনো আপত্তি নেই।

সুতরাং আপনি নিজেই বের করে নিতে পারেন যে, আল-কুরআন বাইবেল থেকে নকল করা হয়েছে কিনা?

ডা. মুহাম্মদ জাকিরকে এবং শ্রোতামণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং শ্রোতাদেরকে শুধু বিষয়-এর সাথে (কুরআন কি আল্লাহর বাণী?) সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করার অনুরোধ করেন। যেহেতু কেউ একজন আলোচিত বিষয়ের বাইরে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি শ্রোতাদেরকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করারও অনুরোধ করেন, যেহেতু তখন সেশন ইংরেজিতে চলছিল। তাই একজন হিন্দিতে প্রশ্ন করেছিল যদিও ডা. নায়েক ইংরেজি এবং হিন্দিতেও প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম ছিলেন। প্রোগ্রাম বা সেশন ইংরেজিতে চলছিল বলেই ইংরেজিতে প্রশ্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। একজন বয়স্ক লোক হিন্দিতে প্রশ্ন করলেও ডা. জাকির বিস্তারিত উত্তর প্রদান করেন।

ডা. জাকির নায়েক : ভাই প্রশ্ন আরোপ করার পূর্বেই বলেছেন, সব হিন্দু ভগবান রনজীশকে বিশ্বাস করেন না। এখানে ভিডিও রেকর্ডগুলো রয়েছে, আপনি সেগুলো দেখতে পারেন, আমি বলেছি কিছু লোক ভগবান রনজীশকে বিশ্বাস করে। সুতরাং আপনার এবং আমার মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। আমি বলি নি যে সব হিন্দু তাকে বিশ্বাস করেন। হিন্দুদের বিশ্বাস সম্পর্কে আমি জানি, এমনকি আমি শাস্ত্রও পড়েছি। দাদা একটি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন, আমি কি একমত যে আল-কুরআন বলে, খোদা অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং অনেক কিতাবও নাযিল করেছেন। আমি কি বেদে বিশ্বাস করি? আমি কি বেদ শাস্ত্রে বিশ্বাস করি এবং আমি অন্যান্য নবীকে বিশ্বাস করি কি-না? সে হলো মূল প্রশ্ন আমি তাঁর সঙ্গে একমত। আল-কুরআন বিভিন্ন স্থানে বলে ৩৫ নং সূরা ফাতির-এর ২৪ নং আয়াতে বলেন,

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ.

অর্থ : 'এমন কোনো জাতি ছিল না, যাদের নিকট নবী আসেনি।'

১৩ নং সূরা রাদ-এর ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ.

অর্থ : 'আপনি একজন ভীতি প্রদর্শনকারী মাত্র, আর প্রত্যেক জাতির জন্যই পথ প্রদর্শক রয়েছে।'

আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী আপনি বেদশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন কি না? অন্যান্য নবীগণ আল্লাহ প্রেরিত কি? আল-কুরআনে মাত্র ২৫ (অথবা ২৬ জন) নবীর নাম উল্লেখ করেছে। আদম, ইবরাহীম, মূসা, ইসমাঈল, ঈসা (আ), মুহাম্মদ ﷺ কিন্তু হাদীস অনুযায়ী এক লক্ষ চব্বিশ হাজারেরও বেশি নবী পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন। আমরা ২৫ জনের নাম জানি। বাকিরা নবী হতেও পারেন, নাও হতে পারেন, আমরা নিশ্চয়তা দিয়ে কিছু বলতে পারি না।

আপনার প্রশ্ন অনুপাতে আপনি কি বেদকে আল্লাহর বাণী মনে করেন, আসুন আমরা দেখি কুরআন এবং বেদের মধ্যে কোনো বিষয়ের মিল আছে কি না? হ্যাঁ আছে, বিষয়টা যদি আল্লাহর বিষয়ে হয়। কুরআনও এ সম্পর্কে বলে বেদও এ সম্পর্কে বলে। যদি আপনি বেদ পড়েন, দেখবেন।

যযুরবেদ অধ্যায় ৩ শ্লোক-৩২। 'তুমি কোনো প্রতিমূর্তি ঐ খোদার ব্যাপারে করতে পারবে না।'

যযুরবেদ অধ্যায় ৩৩, শ্লোক নং ০৩ 'খোদা হলো নিরাকার ও সন্দেহহীন।' একই যযুরবেদ অধ্যায়-৪০, শ্লোক নং ০৮ বলে, খোদার কোনো প্রতিমূর্তি নেই, কোন দেহ নেই।

একই যযুরবেদ অধ্যায়-৪০, শ্লোক নং-৯ বলে যে 'ঐ সব লোক যারা অসৃষ্ট জিনিসের পূজা করে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত।' আরো বলা হয়েছে ঐ খোদা সম্পর্কে, 'খোদা মাত্র একজন, কোনো দ্বিতীয় নেই, সামান্যতেও নেই।' এটি ঋগ্বেদে ৬ নং ভলিউম-০৮, অধ্যায়-১, শ্লোক নং-০১-এ বলা হয়েছে– 'সকল প্রশংসা শুধু তাঁরই।' ঋগ্বেদে ভলিউম-৬, অধ্যায়-৪৫, শ্লোক নং-১৬-এ বলা হয়েছে ঃ 'খোদা একজনই, তাঁর পূজা কর।' আমরা এতে বিশ্বাস করি। বেদের এ সব অংশে বিশ্বাস করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। যেগুলো আল্লাহর বাণী হতে পারে এবং কুরআন হলো ভুল– নির্ভুল নিরূপণের মাপকাঠি। কারণ, এটিই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত নাযিলকৃত কিতাব।

আমরা মুসলমানরা, আমাদের কোনোই আপত্তি নেই এ সব বাণীকে আল্লাহর বাণী হিসেবে গ্রহণ করতে। যেখানে অন্য জিনিস হতে পারে, যেরূপ আমরা বলছি, সেখানে অন্যায় সংযোজন হতে পারে, যা সম্পর্কে আমি বলতে পারি, তবে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না। এখানে অন্যায় সংযোজন হতে পারে। যেখানে মানব কর্তৃক সংযোজন হয়ে থাকতে পারে, সেগুলোকে আমরা খোদার বাণী হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। বাইবেলে যেমন অবৈজ্ঞানিক ঘটনা আছে, বেদেও সেরকম আছে। আমি তা আলোচনা করতে চাই না। তবে আমাদের এ ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই যে, মূল বেদ হয়তো আল্লাহর বাণীও হতে পারে।

ধরুন, ইঞ্জিল– আল-কুরআন বলে যে, ইঞ্জিল হলো ওহী, যা ঈসা (আ)-কে প্রদান করা হয়েছিল। এটা হলো সে ওহী, যা যীশু-কে প্রদান করা হয়েছিল। সুতরাং ইঞ্জিল আল্লাহর বাণী হওয়ার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। নবীদের ব্যাপারে? অনেক নবী ছিলেন। রাম ও কৃষ্ণের নবী হওয়ার ব্যাপারে, আমরা বলতে পারি হতে পারে, তবে আমরা নিশ্চিত নই। কিছু মুসলমান আছেন, তাঁরা বলেন, 'রাম আলাইহিস সালাম'। এটা ভুল। দেখুন, তারা তাদের পিঠ চাপড়াচ্ছে। আমি হিন্দুদের পিঠ চাপড়ানোর পক্ষে নই। সুতরাং সে আমার পিঠ চুলকাচ্ছে। আমি যা বলছি তাহলো তারা হতে পারেন, যদিও তারা হয়ে থাকেন, রাম যদি আল্লাহর নবী হয়েও থাকেন, বেদ যদি আল্লাহর শাস্ত্রও হয়ে থাকে, যেমন আমি উল্লেখ করেছি, সেগুলো ছিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। সেগুলো ছিল ঐ সময়ের লোকদের জন্য এবং সেগুলোর স্থায়িত্ব আর নেই।

আল-কুরআন হলো আল্লাহর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বাণী, এমনকি ইঞ্জিল, বাইবেল অথবা বেদ যদিও আল্লাহর বাণী ছিল, সেগুলো ছিল তখনকার জন্য আজ আর এগুলো চলবে না। আল-কুরআন হলো আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত বাণী এবং সর্বশেষ রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ। আমাদেরকে কুরআন এবং নবী ﷺ-এর অনুসরণ করতে হবে। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ঃ ২২৬। আমার নাম মেহনাজ সাঈদ এবং আমি একজন ছাত্রী। আমার প্রশ্ন হলো, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : বোন একটি প্রশ্ন করেছেন যে, কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন? এটা এমন একটা প্রশ্ন সাধারণত নাস্তিক বা যুক্তিবাদীরা এ ধরণের প্রশ্ন করে থাকে। এটা আমাকে একটি ঘটনা মনে করিয়ে দিল যে, আমার এক বন্ধু যে ছিল আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মুম্বাই-এর এক যুক্তিবাদী গ্রুপের সাথে আলোচনায় গেলেন, তারা নাস্তিক গ্রুপ এবং সে তাদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বুঝাবার চেষ্টা করলেন। সে এভাবে শুরু করেছিল যে, এটি একটি কাপড়, কে একে তৈর করেছে? এটা কোত্থেকে আসল? তারা বলল একজন তাঁতী এটা সৃষ্টি করেছে। ভালো, এর একজন স্রষ্টা আছে। হ্যাঁ, এটি একটি বই, এটা কোত্থেকে আসল? কলমটি কোত্থেকে আসল? এরকম যে, তাদেরকে প্রমাণ করার চেষ্টা করল যে প্রত্যেক জিনিসেরই স্রষ্টা আছে। গাড়ি ফ্যাক্টরিতে তৈরি, ফ্যাক্টরি কে তৈরি করল? হতে পারে ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিনিয়ারকে কে তৈরি করল? সে চেষ্টা ও প্রমাণ করতে থাকল যে প্রত্যেক জিনিসের একজন স্রষ্টা আছে। অতঃপর সে প্রশ্ন করল সূর্য কে তৈরি করেছে? চাঁদ কে সৃষ্টি করেছে? এবং প্রশ্ন করার সময় সে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি একমত যে জিনিসের একজন স্রষ্টা আছে? যুক্তিবাদীরা হোচট খেয়ে বলল, আমরা একটা শর্তে এটা মেনে নিতে রাজি আছি যে, আপনি

আপনার বর্ণনা পরিবর্তন করতে পারবেন না এবং আপনার বর্ণনা থেকে পিছু হটতে পারবেন না।

আমার বন্ধু খুবই সুখী ছিল, আমি সফল হয়ে গেছি নাস্তিকদের বুঝাতে এবং সে পরবর্তী প্রশ্ন করে যাচ্ছিল কে সূর্য সৃষ্টি করেছে? কে চাঁদ সৃষ্টি করেছে? প্রত্যেক জিনিসের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। আপনাদেরকে চূড়ান্ত স্রষ্টার নাম বলতে হবে। আমি আমার মায়ের থেকে এসেছি, আমার মা তাঁর মায়ের থেকে, চূড়ান্তভাবে কে প্রথম স্রষ্টা? সে তাদেরকে উত্তর দিয়ে সাহায্য করল। প্রথম স্রষ্টা যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ। সে এ চিন্তা করল যে, সে আলোচনায় বিজয় লাভ করেছে। নাস্তিক একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, আমরা একটা শর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে বিশ্বাস করব, আপনি আমাদেরকে বলুন খোদাকে কে সৃষ্টি করেছেন? আমার বন্ধু এতে তার সারা জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত পান। তিনি উত্তর দিতে পারেন নি। তিনি বোবা হয়ে গেলেন। তিনি সারারাত ঘুমোতে পারলেন না।

পরের দিন তিনি আমার নিকট আসলেন এবং পূর্ণ ঘটনা আমাকে খুলে বললেন, এবং আমি বুঝতে পারলাম, তিনি এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, যে পদ্ধতি অনেক পণ্ডিত অবলম্বন করে থাকেন আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য। এ সব পণ্ডিত যুক্তির খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ত্যাগ করেন, যা হলো স্ববিশ্লেষণ। যদি আপনি আমার কথাকে বিশ্লেষণ করেন, আমার বক্তব্যে কখনো আমি বলি না যে, সবকিছুর একজন স্রষ্টা আছে। কখনো আমি তা বলি নি। যদি তা বলি তাহলে আমি ফাঁদে পড়বো। বাস্তবে আমি এমন এক ব্যক্তি, যে নাস্তিককে জিজ্ঞেস করতে এবং নাস্তিককে উত্তর দিতে হতো যে, প্রথম যে সত্তা সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে জানেন তিনিই স্রষ্টা বা ম্যানুফ্যাকচারার। আমি এরূপ বলতাম না সে এটিই বলত, এরূপ কেউ যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করে, ভাই জাকির সেই ব্যক্তি কে, যিনি অজ্ঞাত জিনিসের সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞাত? আমি তাকে বলতাম, প্রত্যেক জিনিস যার শুরু আছে, প্রত্যেক জিনিস যা সৃষ্ট, প্রথম সত্তা যিনি এ ধরনের জিনিসের সৃষ্টি সম্পর্কে বলতে সক্ষম হবেন, তিনিই স্রষ্টা। আমি আমার যুক্তি ব্যবহার করছি। আমি পুনরায় ফাঁদে পড়তে চাই না। আমি যদি বলি যে, উত্তর হবে প্রথম ব্যক্তিই হবেন ঐ সত্তা, যিনি সৃষ্ট যে কোন জিনিসের গঠন বলতে পারবেন, যার থেকে শুরু তিনিই স্রষ্টা, আপনি একই যুক্তি পেশ করে প্রমাণ করতে পারবেন যে, কুরআন আল্লাহর বাণী। চূড়ান্ত উত্তর হবে, যেহেতু বিজ্ঞান বলছে যে, সূর্যের শুরু আছে, চন্দ্রের শুরু আছে, মহাবিশ্বের শুরু আছে কে এর সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে জানে? স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ।

আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? এটা কিছুটা আমার বন্ধুর প্রশ্নের অনুরূপ। সে বলল যে, আমার ভাই টম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে একটি সন্তানও প্রসব করেছিল। আপনি কি বলতে

পারেন সন্তানটি ছেলে ছিল না মেয়ে? ডাক্তার হিসেবে আমি জানি পুরুষ কখনো অন্তঃসত্ত্বা হয় না এবং সন্তান প্রসব করতে পারে না। পুরুষের কোয়ালিটি এরকমই যে, সে অন্তঃসত্ত্বা হয় না এবং সন্তান প্রসব করতে পারে না। এটা একটা জগাখিচুড়ি প্রশ্ন। একইভাবে আল্লাহর পরিচয় যে, তিনি কারো দ্বারা সৃষ্ট নন। তার শুরু নেই। যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন? এটা একটা অদ্ভুত প্রশ্ন, যেমন– আমার বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তার ভাই টম সন্তান প্রসব করেছিল, তার সন্তান ছেলে শিশু ছিল, না কন্যা শিশু। আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২২৭। আমার নাম মুহাম্মদ আশরাফ। আমি একজন ছাত্র। আমার প্রশ্ন হলো অনেক প্রাচ্যবিদ দাবি করে বরং অভিযোগ করে যে, নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ আরবের লোকদের নৈতিক সংস্কারের জন্য কুরআন রচনা করে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার জন্য তা আল্লাহর প্রতি আরোপ করেছিলেন। এটি কি ঠিক?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটা প্রশ্ন করেছেন এবং আমিও তার সঙ্গে একমত যে, কিছু প্রাচ্যবিদ বলেছেন যে, আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ মিথ্যা বলেছিলেন (নাউযুবিল্লাহ) যে, কুরআন আল্লাহর বাণী যাতে তিনি আরবদের সংশোধন করতে পারেন। আমি আরো একমত যে, কুরআনের বাণী এবং নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উদ্দেশ্য শুধু আরবদের সংশোধনই নয় বরং সারা পৃথিবীর নৈতিক সংশোধন আপনি বলেন তা হলে আসুন আমরা এ দাবিকে বিশ্লেষণ করে দেখি। যদি তাঁর উদ্দেশ্যই থাকে আরবের সংস্কার তাহলে তিনি কেনই বা অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করবেন একটা নৈতিক সমাজ গঠনের জন্য? ধরুন, আপনি একটি নৈতিক নিরাপত্তা চান অথচ আপনি নিজেই মিথ্যা দিয়ে শুরু করলেন। এটা শুধু এ সব লোকদের দ্বারাই করা সম্ভব, যারা যশ এবং অর্থের লোভে এটা করে। তারা প্রকাশ্যে বলতে পারে তারা নৈতিক সংশোধন চায়; কিন্তু অপ্রকাশ্যে তারা অর্থই চায়। আর আমি এটা প্রমাণ করেছি যে, নবী করীম ﷺ অর্থের জন্য এটা করেন নি। সত্য যদি চূড়ান্ত ফল হয় তাহলে মাধ্যমও সত্যই হতে হবে। এটি আল-কুরআনের ৬ নং সূরা আনআমের ৯৩ নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ـ

অর্থ : 'সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে নানাবিধ মিথ্যা কথা রচনা করে বেড়ায় অথবা বলে যে, আমার ওপর ওহী

নাযিল করা হয়েছে, (যদিও) তার প্রতি কিছুই নাযিল করা হয় নি। আর যে বলে আমি অচিরেই আল্লাহ তাআলার নাযিল করা গ্রন্থের মত কিছু নাযিল করে দেখাব।'

যদি নবী করীম ﷺ সত্যিই মিথ্যা বলতেন তাহলে তিনি তাঁর গ্রন্থে একথা কখনো লিখতেন না যে, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে সে জালিম এবং আয়াতটি একটা শাস্তির বর্ণনা দিয়ে শেষ করা হয়েছে।

একথা ৬৯ নং সূরা আল-হাক্কার ৪৪ থেকে ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ـ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ـ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ـ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ـ

অর্থ : 'রাসূল যদি এ কিতাবটি নিজে বানিয়ে আমার নামে চালিয়ে দিত, আমি শক্ত হাতে তার ডান হাতটি ধরে ফেলতাম, অতঃপর আমি তার কণ্ঠনালী কেটে ফেলতাম। আর যে অবস্থায় তোমাদের কেউই তাকে আমার কাছ থেকে বাঁচাতে পারত না।'

এমনকি রাসূলকেও ক্ষমা করা হতো না। কোনো নবীর মিথ্যা ধরা হতো এমনকি নবী মুহাম্মদ ﷺ এরও (নাউযুবিল্লাহ)। তিনি কখনো এটা করতেন না। এমনকি যদি নবী করীম ﷺ মিথ্যা আবিষ্কার করেন, আল কুরআন বলে ঃ আমরা তার কণ্ঠনালী কেটে ফেলতাম। এমন অনেক চান্স ছিল যে, নবী করীম ﷺ যদি মিথ্যা বলতেন তাহলে তাঁর জীবনের কোন এক সময়ে আল্লাহ নিশ্চিতই তা প্রকাশ করে দিতেন এবং অবশ্যই কোন এক সময়ে লোকেরা তাকে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করাতো।

একই রকম শাস্তির কথা ৪২ নং সূরা শুয়ারা-এর ৪২ নং আয়াতে এরকম ১৬ নং সূরা নাহল-এর ১০৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে। এছাড়াও আরো বহু উদাহরণ আছে, যেখানে রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। যদি নৈতিক সংশোধনের জন্য রাসূল ﷺ নিজে কুরআন রচনা করে থাকতেন তাহলে তিনি এমন বিষয় এতে উল্লেখ করতেন না, যাতে রাসূল-এর কাজ আল্লাহর পছন্দ নয় এমন কথা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ এ ধরনের আয়াত রয়েছে ৮০ নং সূরা আবাসার ১ম থেকে।

عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاۤءَهُ الْاَعْمٰى ـ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى ـ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ـ

অর্থ : 'তিনি (নবী)– ভ্রূকুঞ্চিত করলেন ও মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কারণ তাঁর নিকট একজন অন্ধ ব্যক্তি হাজির হয়েছিল, তুমি কি জানতে হয়তো সে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিত, কিংবা সে উপদেশ গ্রহণ করত তা তার জন্য হয়তো উপকারীও হতে পারত।'

এ সূরা তখন নাযিল হয় যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) নামে একজন অন্ধ সাহাবী রাসূল ﷺ -এর কাছে আসেন। এতে রাসূল ﷺ -এর আলোচনার বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। এ সময় তিনি পৌত্তলিক আরব নেতাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, যেহেতু তিনি আরব নেতাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি যদি নবী ছাড়া অন্য কেউ হতেন, সাধক, সন্ন্যাসী বা কেউ তাহলেও কেউ আপত্তি করতো না। কিন্তু যেহেতু তিনি নবী যাঁর চরিত্র ছিল সুমহান, সুউচ্চ, যাঁর হৃদয় সব সময় অভাবী দরিদ্রদের জন্য কাঁদে। তাঁর জন্য ওহী নাযিল হলো এবং যখনই রাসূল তাঁর লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তিনি তাঁকে এ কথা বলে ধন্যবাদ জানাতেন যে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছ।'

আল-কুরআনে এ ধরনের বহু পুণঃপ্রমাণ দান করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ–

৬৬ নং সূরা তাহরীম, আয়াত নং-০১

১৬ নং সূরা নাহল, আয়াত নং-১২৬

৮ নং সূরা আনফাল, আয়াত নং-৮৪

যদি নবী করীম ﷺ নৈতিক সংশোধনের জন্য কুরআন রচনা করতেন তাহলে তিনি কুরআনে এগুলো ঢুকাতেন না। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২২৮। আসসালামু আলাইকুম ভাই, আমি একজন মেডিকেলের ছাত্রী। আপনার বক্তৃতায় আপনি বহু বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি তুলে ধরেছেন। কুরআনে কি গণিতের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বাস্তব ঘটনা আছে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ প্রশ্নকারী বোনটি বলছেন যে, আমি বহু বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা তুলে ধরেছি এবং প্রশ্ন করেছেন কুরআনে কি গাণিতিক বিষয় উল্লেখ আছে? বা কুরআনে কি গণিতের ওপরে কথা বলেছে?

হ্যাঁ, কুরআনে গণিতের বিষয়ে অনেক জিনিস আছে। গণিতের এরূপ একটি বিধান, পুরো গণিত এরিস্টৌটল-এর বিধানের ওপর ভিত্তি করে চলে 'মধ্যপদলোপী' বিধান। এতে বলা হয়েছে প্রত্যেক প্রস্তাবনা, যা প্রত্যেক বর্ণনা সত্য বা মিথ্যা হবে এবং বছরের পর বছর সকলে এ বিধান অনুসরণ করল। শত বছর আগে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে বসল যে, যদি প্রত্যেক বিবৃতি প্রত্যেক প্রস্তাবনা সত্য বা মিথ্যা হয় এটাও একটা বর্ণনা এবং এটাও মিথ্যা হতে পারে। যদি এটা মিথ্যা হয় তাহলে কি হবে? পূর্ণ গণিতই অচল হয়ে যাচ্ছিল। সকল গণিতবিদরা একত্রিত হলেন এবং নতুন সিদ্ধান্ত নিলেন, নতুন থিওরী বললেন, যখনই কেউ কোনো শব্দ ব্যবহার করবে, তখন যে কোন একটি অর্থে ব্যবহৃত হবে। যখন কোনো শব্দ ব্যবহার করবে, তখন অর্থ সম্পর্কেই বলবে শব্দ সম্পর্কে নয়। কিন্তু যখন শব্দ উল্লেখ করবে, অর্থ নয়।

আসুন আপনাদের একটা উদাহরণ দিই। যদি আমি বলি আকবর ছোট। অর্থানুযায়ী এটা সঠিক। সে ছোট বালক। আকবর ছোট কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি আরবি ভাষা জানে সে আপত্তি জানাতে পারে। আকবর ছোট নয়। আকবর অর্থ মহান, বিরাট। এখানে আমি শব্দটি উল্লেখ করেছিলাম, অর্থ নয়। আমাকে আরেকটি উদাহরণ দিতে দিন। ধরুন, যদি আমি বলি 3 সব সময় 4-এর আগে আসে, কারো কোনো আপত্তি নেই কারণ 3 সংখ্যাটি 4-এর আগেই আসে। কিন্তু কোন সংশয়বাদী বলতে পারে 3 আসে 4 এর পরে ডিকশনারীতে। কারণ 3 (Three) এর T- ডিকশনারীতে 4 (Four) F-এর পরে আসে। এখানে আমি যখন বলেছি 3, 4 এর পূর্বে আসে, আমি অর্থের দিকেই বলেছি। আমি শব্দের দিকে বলি নি। তার্কিক যে, আপত্তি তুলেছিল, সে শব্দের দিকে বলেছে, অর্থের দিকে নয়।

সুতরাং যখন একটি শব্দ ব্যবহৃত হয় তখন তা দুই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। শাব্দিক অথবা অর্থের দিকে। আমার বক্তব্যে আমি ৪ নং সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে উল্লেখ করেছি–

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِاللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا۔

অর্থ : 'তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি এটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো তাহলে তার মধ্যে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।'

অর্থানুযায়ী এটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার। কেউ এর মধ্যে কোনো একটি বৈপরীত্য পাবে না। সুতরাং কুরআন হলো আল্লাহর বাণী। কিন্তু তার্কিক বলবে যে, সে কুরআনে বৈপরীত্য পেয়েছে। আমি বলি, কোথায়? সে ৪ নং সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে এ বৈপরীত্য পেল। যেখানে اختلاف। শব্দ রয়েছে সুতরাং কুরআন ভুল প্রমাণিত। কুরআনে اختلاف। শব্দ রয়েছে, লেখক নিজেই ভুল স্বীকার করছে। আমি বলি অপেক্ষা করুন, পূর্ণ আয়াতটি পড়ুন।

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا ۔

এবং كَثِيْرًا। اخْتِلاَفًا ۔ اخْتِلاَفٌ। অর্থাৎ বৈপরীত্য শব্দটি আল-কুরআনে একবার এসেছে। সুতরাং আক্ষরিক দিক দিয়ে কুরআন নিজেও ভুল স্বীকার করেনি। এটা নিরাপদ।

اِخْتِلاَفٌ শব্দটি একবার উল্লেখ আছে এবং কুরআন বলে اِخْتِلاَفًا كَثِيْرًا অনেক বৈপরীত্য। সেগুলো নিরাপদ। অন্য তার্কিক এগিয়ে এসে বলে, আমি একমত اِخْتِلاَفٌ শব্দ মাত্র একবার এসেছে, কিন্তু কুরআন বলে–

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِاللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اِخْتِلاَفًا كَثِيْرًا.

অর্থাৎ اِخْتِلاَفًا كَثِيْرًا -অনেক বৈপরীত্য শব্দটি সেখানে আছে। সুতরাং কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে নি। আমি জানি এটা বুঝতে কিছুটা হলেও কঠিন কিন্তু আমি আপনাকে পরবর্তীতে আরো সহজ উদাহরণ দিব। একের বিপরীত অন্যটি مَفْهُوْمٌ مُخَالِفٌ - বিপরীত অর্থ সব সময় সঠিক হয় না।

আল-কুরআন বলে, যদি কুরআন না হতো .... তারা কি কুরআনকে যত্ন সহকারে বিবেচনা করে না? যদি এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে আসত, তাহলে অনেক বৈপরীত্য পেতে।

কুরআন একথা বলে নি যে, যদি এতে অনেক বৈপরীত্য থাকে তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। যদি কুরআন উল্লেখ করত যে, যদি সেখানে অনেক বৈপরীত্য থাকত এ কিতাব আল্লাহর নয়। অতএব, তখন কুরআন ভুল প্রমাণিত হতো। আল্লাহ তায়ালা তাঁর শব্দাবলি বাছাই করেছেন। কেননা, বিপরীত অর্থ সব সময় সঠিক হয় না।

আমাকে একটি উদাহরণ দিতে দিন। মনে করুন, আমি যদি বলি মুম্বাইর অধিবাসী অথবা মুম্বইয়ীরা সবাই ভারতীয়, এটা একটা সত্য বর্ণনা। কিন্তু এর বিপরীত বর্ণনা সত্য হওয়া জরুরি নয়। সব ভারতীয় মুম্বাইতে বাস করে না। মুম্বাইর কেউ কেউ বাস করে না। এভাবে নিয়ম বলছে ঃ ভাইস ভার্যা সব সময় সত্য হয় না। সুতরাং কুরআন যখন বলে ঃ

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ اَ حَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا .

অর্থ : 'অতএব, যদি যেখানে বৈপরীত্য হয়, যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাও হতে পারে। কুরআন নিজে নিজের ভুল ধরে নি।'

আসুন আপনাদেরকে আরো সহজ উদাহরণ দিই। এটি ২৩ নং সূরা মুমিনূন-এর ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে– 'সত্যিকার বিশ্বাসীরা নামাযে বিনয়ী হয়।' কেউ আমাকে বলবে, আমি একজন মুসলমানকে চিনি, যে পাঁচ বার নামায আদায় করে; কিন্তু সে

চুরি করে, সে প্রতারণা করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই অপরাধী থাকে। দেখুন কুরআন ভুল। কুরআন বলছে সত্য বিশ্বাসীরা নামাযে বিনয়ী হয়। আমি বলতে চাই, অপেক্ষা করুন! কুরআনের বাণী শুনুন। কুরআন বলে সত্যিকার বিশ্বাসীরা নামাযে বিনয়ী হয়। একথা বলে না যে, যারা নামাযে বিনয়ী, তারা সত্যিকার মুমিন। কুরআন যদি বলতো যারা নামাযে বিনয়ী, তারা সত্যিকার বিশ্বাসী, তাহলে হয়তো কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণিত করা যেত। সুতরাং আল্লাহ হলেন বড় গণিত বিশেষজ্ঞ। তিনি জানতেন যে, কিছু সন্দেহবাদী আছে, যারা কুরআনের ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করবে। এজন্যই তিনি শব্দাবলি বাছাই করেছেন।

আমি আরো একটি উদাহরণ দিতে চাই। ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

إِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ

অর্থ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসা এর দৃষ্টান্ত আদম (আ)-এর মতো। তাঁকে তিনি মাটি থেকে তৈরি করে বললেন হয়ে যাও, তো হয়ে গেলেন।'

অর্থানুযায়ী আমাদের কোনো আপত্তি নেই। উভয় যীশু খ্রিস্ট এবং আদম (আ) মাটি থেকে তৈরি হয়েছিলেন। অর্থানুযায়ী এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার কিন্তু আপনারা যদি কুরআনে ঈসা (আ) অর্থাৎ যীশু শব্দ গণনা করেন, তাহলে ২৫ বার পাবেন। হযরত আদম (আ)-এরও উল্লেখ আছে ২৫ বার। এভাবে অর্থ একই হওয়ার সাথে সাথে, উল্লেখও হয়েছে ২৫ বার করে।

এরূপ আরো উদাহরণ ৭ নং সূরা আরাফের ১৭৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ـ

অর্থ : 'তার উদাহরণ কুকুরের মতো, তার ওপর তুমি বোঝা চাপালে সে হাঁপাতে থাকে এবং তুমি বোঝা না চাপালেও হাঁপায়। এটা হলো ঐ কওমের উদাহরণ, যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে।'

আরবি বর্ণনা الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا উল্লেখ করা হয়েছে পাঁচ বার এবং আরবি শব্দ كَلْبٌ (কুকুর) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে পাঁচ বার। অর্থের সাথে সাথে উল্লেখও একইরূপ করা হয়েছে।

৩৫ নং সূরা ফাতির-এর ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ـ

অর্থ : 'অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে না।'

আল-কুরআনে ظُلُمٰتُ (অন্ধকার) উল্লেখ আছে ২৩ বার এবং نُوْرُ (আলো) উল্লেখ আছে ২৪ বার। অতএব অর্থ সঠিক হওয়ার সাথে সাথে উল্লেখও অন্ধকারের সাথে আলোর মিল নেই। ২৩ ও ২৪ বার। ২৩ সংখ্যাটি ২৪-এর মতো নয়। যেখানেই কুরআন বলছে এটা এটার মতো সেখানে দুটোর উল্লেখও একই। (কি আশ্চর্য ব্যাপার!) যেখানে বলছে এটা এটার মতো নয়, উল্লেখ করার সংখ্যা হিসেবেও একটি আরেকটির মতো নয়। এটা শুধু কুরআনের পক্ষেই এতো সুন্দর উদ্ধৃতি করা সম্ভব, কুরআন তো নয়ই কুরআনের মতো কোনো গ্রন্থ রচনা করা কম্পিউটার দ্বারাও সম্ভব নয়। আপনাকে ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ৫৯ নং আয়াতের যে উদাহরণ দিলাম–

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنَ ـ

অর্থ : 'নিশ্চয়ই ঈসা (আ)-এর দৃষ্টান্ত আল্লাহর নিকট আদম (আ)-এর মত, তাঁকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর বললেন হও, তারপর হয়ে গেল।'

আল্লাহ আপনাকে খাদ্য দিয়ে পরীক্ষা করেন না কিন্তু কিছু লোককে খাদ্য দিয়েও পরীক্ষা করেন, কিছু লোককে স্বাস্থ্য দিয়ে, কিছু লোককে দাম্পত্য জীবনে এবং এরূপ বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা করা হয়। যখন আপনি একটা পরীক্ষা দিবেন, আপনি বলতে পারেন না যে, পরীক্ষককে সকলের নিকট থেকে একই পরীক্ষা নিতে হবে।

কিন্তু পরীক্ষা যাই নেয়া হোক, বিচার ন্যায় হতে হবে। আল-কুরআন বলে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তিনি বিচার দিনের মালিক বা মনিব। আমি তোমাদের যে পরীক্ষাই দেই না কেন, বিচার সে অনুযায়ীই হবে। ধরুন, আপনি একজন খোঁড়া লোকের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছেন। আপনাকে প্রতিযোগিতায় ভারসাম্য আনতে হবে। সুতরাং আপনি তাকে ১০০ মিটার ড্যাশ দিবেন, আপনি তাকে ৫০ মিটার সামনে দিবেন এবং যার দুটি পা আছে, তাকে শুরু থেকেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে, যাতে উভয়ের একই সুযোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং পরীক্ষার ওপর নির্ভর করে আপনাকে তিনি বিচার করবেন। আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২২৯। আসসালামু আলাইকুম। আমি কাশ্মিরা নাজদা এবং আমি ধর্মান্তরিত মুসলমান। আমি M.A ফাইনাল-এর ছাত্রী। আমার প্রশ্ন আপনার বক্তৃতার প্রথম অংশের সাথে সম্পৃক্ত। আপনি বলেছেন, আল-কুরআনে কোনো বৈপরীত্য নেই, কিন্তু কুরআনের একটি আয়াত আছে, যার নম্বর আমি এ মুহূর্তে বলতে পারবো না, কিন্তু আল্লাহ কুরআনে বলেছেন যে, তিনি কিছু লোকের হৃদয়ে সীলমোহর মেরে দিয়েছেন, এজন্য তারা বুঝতে পারে না। কিন্তু আমরা জানি মন এবং মস্তিষ্ক চিন্তা করে (অন্তর নয়)। আমরা কি এটা পরিষ্কার করতে পারি?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন একটি খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমি তাকেও ইসলাম গ্রহণের জন্য তিনবার অভিনন্দন জানাতে চাই। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্ কুরআনের কোনো কোনো স্থানে, আমিও তাঁর সাথে একমত যে, আল্লাহ অন্তরে সীলমোহর মেরে দিয়েছেন যাতে লোকেরা সত্যের নিকটে আসতে না পারেন, তাদের সীল মেরে দেয়া হয়েছে।

তিনি প্রশ্ন করেছেন যে, আজ বিজ্ঞান অনেক অগ্রসর এবং আমরা জানি চিন্তার জন্য প্রধান অঙ্গ হলো মস্তিষ্ক, অন্তর নয়। পূর্বে মানুষ মনে করত এটা অন্তর ছিল। সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে কুরআনে কোনো ভুল নেই। আপনি যদি উপলব্ধি করেন, আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি কুরআনের আয়াত কোটেশন হিসেবে ২০ নং সূরা ত্বা-হার ২৫ থেকে ২৮ নং আয়াত পড়েছি যাতে বলা হয়েছে–

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ـ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ ـ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ ـ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ـ

অর্থ : 'হে আমার রব! আমার বুককে প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজকে সহজ করে দাও, আমার জিহ্বার জড়তাকে দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।'

এখানে صَدْرِىْ অর্থ হৃদয় দ্বিতীয়বার ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কেন আল্লাহ আমার হৃদয়কে প্রশস্ত করবেন, আরবি صَدْرٌ (ছদর) শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটা হলো অন্তর, আরেকটি হলো কেন্দ্র। যদি আপনি করাচি যান আপনি পাবেন, ছদর এরূপ এরূপ, কেন্দ্র এরূপ এরূপ। সুতরাং আরবি صَدْرٌ (ছদর) অন্তরের অর্থ ছাড়াও কেন্দ্র অর্থও দেয়। এখানে কুরআন বলেছে যে, আমরা তোমাদের কেন্দ্র, মস্তিষ্ককে সীল মেরে দিয়েছি। আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করি! হে প্রভু! আমার জ্ঞানের কেন্দ্রকে বৃদ্ধি করে দাও, আমার এবং শ্রোতাদের মাঝে বুঝের বাধা দূর করে দাও। আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২৩০। আসসালামু আলাইকুম আমার নাম খালিদ। এটা কি বৈপরীত্য নয় যে, কুরআন এক স্থানে ইবলিসকে ফেরেশতা এবং অন্যস্থানে তাকে জ্বিন বলেছে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটা প্রশ্ন রেখেছেন যে, কুরআনে কি এটা বৈপরীত্য নয় যে, বিভিন্ন স্থানে ইবলিসকে ফেরেশতা এবং এক স্থানে তাকে জ্বিন বলা হয়েছে। আল-কুরআনে বিভিন্ন স্থানে ইবলিস এবং আদমের কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। ২ নং সূরা বাকারায়, ৭ নং আরাফে, ১৫ নং সূরা হিজর, ১৭ নং সূরা ইসরা, ১৮ নং সূরা কাহফ, ২০ নং সূরা ত্বাহা, ৩৮ নং সূরা সা'দ এবং বিভিন্ন স্থানে আমি একমত যে কুরআন বলে–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ـ

অর্থ : 'আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা সিজদা কর, অতঃপর ইবলিস ছাড়া আর সবাই সিজদা করল।' (সূরা আল-বাকারা ঃ ৩৪)

যদি বিশ্লেষণ করেন, দেখবেন সাত স্থানে ইবলিসকে ফেরেশতা বলা হয়েছে। একস্থানে ইবলিসকে জ্বিন বলা হয়েছে। এটা কি বৈপরীত্য নয়? এটা হলো পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ, কিন্তু কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে, আরবীতে তাগলীব নামে ব্যাকরণের পরিভাষা রয়েছে। যাতে অধিকাংশকে সম্বোধন করা হয়। যদিও কম অংশও অন্তর্ভুক্ত। আমি একটি উদাহরণ দিই। মনে করুন, এক শ্রেণীতে ১০০ জনের মধ্যে একজন ছাত্রী এবং বাকি ৯৯ জন ছাত্র। আমি যদি আরবিতে বলি সকল ছাত্র দাঁড়াবে। এমনকি ছাত্রীটিও দাঁড়াবে, কারণ সে তো তাগলীব-এর নিয়ম জানে। (আরবিতে আরেকটি মূলনীতি আছে لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ। (Majority must be granted) অধিকাংশ সকলের বিধান বহন করে। অনুবাদক) কিন্তু যদি আমি ইংরেজিতে বলি সব বালক দাঁড়াও তাহলে শুধু ৯৯ জন বালকই দাঁড়াবে, বালিকাটি দাঁড়াবে না।

সুতরাং, কুরআন আরবিতে নাযিল হয়েছিল। যখন বলেছে, আমরা ফেরেশতাদের বললাম সিজদা কর, সব সিজদা করল, ইবলিস ছাড়া।

এটা বলেছে এখানে বেশিরভাগ ছিল ফেরেশতা। ইবলিস ফেরেশতা হতে পারে নাও হতে পারে। ১৮ নং সূরা কাহাফের ৫০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সে ছিল জ্বিন, অন্য স্থানগুলোতে যা বলা হয়েছে, তাতে সে হয়তো ফেরেশতা ছিল। এখানে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ, আপনাকে আরবি কায়েদা 'তাগলীব'-এর প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয়, ফেরেশতাদের নিজস্ব কোনো ইচ্ছে নেই। আল্লাহ্ যা বলেন, সাথে সাথে মান্য করেন। জ্বিনদের ইচ্ছের স্বাধীনতা রয়েছে এটাও একটা প্রমাণ যে, ইবলিস জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমি আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ঃ ২৩১। আসসালামু আলাইকুম। এখন আমরা বিশ্বাস করি যে, খোদা হলেন অতিপ্রাকৃত এবং তিনি সবকিছু করতে পারেন। আমার একজন অমুসলিম বন্ধু আছে তাঁর প্রশ্ন হলো– খোদা কেন মানুষের আকার ধারণ করতে পারেন না। আপনি কি ব্যাখ্যা করে বলবেন, প্লিজ!

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ বোনটি প্রশ্ন রাখলেন যে, খোদা হলেন অতি প্রাকৃত। তিনি সবকিছু করতে পারেন এবং তার বন্ধু একটা প্রশ্ন রেখেছেন যে, কেন সর্বশক্তিমান খোদা মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন না? যে সব লোক খোদায় বিশ্বাস করে, তারা বলে যে, খোদা অতিপ্রাকৃত এখানকার বাইরেও যারা খোদায় বিশ্বাস করে, তারাও এ বিশ্বাস করে যে, খোদা অতিপ্রাকৃত।

আমি জানতে চাই, কোন্ ব্যক্তি এখানকার বাইরে যে খোদায় বিশ্বাস করে আবার খোদাকে অতিপ্রাকৃত বলে না। প্রত্যেকে, যে খোদায় বিশ্বাস করে, এ বিশ্বাসও করে যে, খোদা অতিপ্রাকৃত। অতিপ্রাকৃত অর্থ প্রকৃতির ওপরে হলো খোদা। যদি বাস্তবতা কুরআন অনুযায়ী চলে যে, খোদা অতিপ্রাকৃত নন। আল কুরআনে দেয়া আল্লাহর ধারণা অনুযায়ী খোদা প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন, এটা কখনও হবে না যে, প্রকৃতি এটি বলেছে এবং খোদা বলেছেন তার বিপরীত। খোদা প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন, খোদা আপনার ফিতরাত সৃষ্টি করেছেন। মানুষের ভেতরে প্রকৃতি নিহিত।

আল কুরআনে প্রদত্ত আল্লাহর অবদানগুলোর একটি হলো 'ফাতির' যা হলো আল-কুরআনের ৩৫তম সূরাটির নাম। فَاطِر (ফাতির) শব্দটি فِطْرَةٌ (ফিতরাত) শব্দ থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ নিহিত প্রকৃতি فَاطِرٌ (ফাতির) অর্থ স্রষ্টা, সৃষ্টির মূল কারক; যিনি বস্তুর প্রাথমিক পরিমাপক যন্ত্রের স্রষ্টা, যার সাথে সর্বশক্তিমান আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টি যোগ হয়। অতএব, রমজানে আমরা যখন রোযা ভাঙ্গি, তাকে ইফতার বলে। ইফতার অর্থ ভাঙ্গা। একইভাবে فَاطِرٌ (ফাতির) শব্দের অর্থ স্রষ্টা, যার অর্থ আকৃতি প্রদানকারী, গঠনকারী এবং ফেঁড়ে বের করে আনেন যিনি। আল-কুরআন লোকদের বলে, তুমি কি ঐগুলো সম্পর্কে চিন্তা কর না? সূর্যের দিকে তাকাও, চন্দ্রের দিকে তাকাও, তারা প্রকৃতির বিধান মেনে চলছে। তারা কখনো তাদের বিধান পরিবর্তন করে না। তারা সবাই স্বাভাবিক।

একইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (তিনি প্রাকৃতিক নিয়মেই সব কিছু সমাধান করেন। – অনুবাদক)

৩৩ নং সূরা আহযাবের ৬২ নং আয়াতে আছে–

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً ـ

অর্থ : 'তুমি আল্লাহর প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন কখনও পাবে না।'

৩০ নং সূরা রূম-এর ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : 'অতএব হে নবী, আপনি আপনাকে সঠিক দ্বীনের ওপর দাঁড় করান। আল্লাহ তাআলার প্রকৃতির ওপর, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে কোনো পরিবর্তন নেই। এ হচ্ছে সঠিক দ্বীন কিন্তু তাদের বেশিরভাগ তা উপলব্ধি করে না।'

আজ বিজ্ঞান আমাদের কোয়ান্টাম সম্পর্কে বলে। আধুনিক বিজ্ঞান আরো বলে, পর্যবেক্ষক ছাড়া আপনি কিছু পেতে পারেন না। পর্যবেক্ষক ছাড়া মহাবিশ্ব নিরর্থক। বিজ্ঞানীরা একটা প্রশ্ন রেখেছেন, প্রথম পর্যবেক্ষক কে ছিলেন? আল্লাহর আরেক অবদান হলো 'আর রাশীদ' সাক্ষী। কুরআন বলে আল্লাহই প্রথম সত্তা, যিনি প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং আল্লাহ অতিপ্রাকৃত নন। তিনি প্রাকৃতিক।

আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের ভিত্তি অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে খোদা সবকিছু করতে পারেন। যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী তাদের অধিকাংশের প্রতি আমি এ প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেই; যাতে তারা আল্লাহকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারেন। আমি তাদের জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ কি যে কোন জিনিস এবং সব জিনিস সৃষ্টি করতে পারেন? তাদের অধিকাংশই বলবে হ্যাঁ। আমার তৃতীয় প্রশ্ন হলো, তিনি কি এমন জিনিস সৃষ্টি করতে পারেন, যা তিনি ধ্বংস করতে পারেন না? এবং তারা ফাঁদে পড়ে যান। যদি তারা বলেন হ্যাঁ, যে খোদা এমন জিনিস সৃষ্টি করতে পারেন, যা তিনি ধ্বংস করতে পারেন না, তাহলে তারা তাদের দ্বিতীয় বিবৃতির বিপক্ষে চলে যান যে, খোদা সবকিছু ধ্বংস করতে পারেন।

যদি তারা বলেন .... না, খোদা এমন জিনিস সৃষ্টি করতে পারেন না, যা তিনি ধ্বংস করত পারেন না। এর অর্থ তারা তাদের প্রথম বিবৃতির বিপক্ষে চলে যাচ্ছেন। যার অর্থ খোদা সবকিছু সৃষ্টি করতে পারেন। পুনরায় তারা তাদের যুক্তি ব্যবহার করতে পারছেন না, তারা ফাঁদে পড়ে গেলেন। একইভাবে খোদা একজন লম্বা-খাট লোক তৈরি করতে পারেন না। হ্যাঁ তিনি লম্বা লোককে খাট বানাতে পারেন; কিন্তু তিনি তো আর লম্বা থাকলেন না। তিনি একজন খাট লোককে লম্বা বানাতে পারেন, তাতে তো তিনি খাট থাকলেন না। কিন্তু আপনারা লম্বা-খাটো লোক পাবেন না। আপনি মাঝারি মানুষ পাবেন, যিনি লম্বাও নন খাটোও নন। কিন্তু খোদা এমন কোন মানুষ তৈরি করতে পারেন না (করেন না), যিনি একই সময়ে লম্বা এবং খাট।

একইভাবে সর্বশক্তিমান খোদা আল্লাহ্ একজন চিকন মোটা লোক তৈরি করতে পারেন না। হাজার হাজার জিনিস আছে আমি তালিকা দিতে পারি যা সর্বশক্তিমান খোদা করতে পারেন না (করেন না)। খোদা মিথ্যা বলতে পারেন না। যে মুহূর্তে তিনি মিথ্যা বলবেন সে মুহূর্তে তিনি খোদা হওয়ার ক্ষমতা হারাবেন। খোদা অবিচারী হতে পারেন না। যে মুহূর্তে তিনি অবিচারী হবেন, খোদা হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন। তিনি নিষ্ঠুর হতে পারেন না, তিনি ভুলে যেতে পারেন না। আপনি এক হাজার জিনিসের তালিকা করতে পারবেন। তিনি তার রাজত্বের বাইরে আমাকে নিক্ষেপ করতে পারেন না। সারা পৃথিবী, সারা মহাবিশ্ব তাঁরই। তিনি আমাকে হত্যা করতে পারেন, তিনি আমাকে মুছে ফেলতে পারেন। আমাকে শেষ করে দিতে পারেন কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর রাজত্বের বাইরে ফেলতে পারেন না। সবকিছু তাঁর। কোথায় তিনি আমাকে নিক্ষেপ করবেন?

কুরআনের কোথাও আল্লাহ বলেন নি যে, তিনি সবকিছু করতে পারেন। বাস্তবে আল-কুরআন বলে اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।' এটি বলে না যে, খোদা সবকিছু করতে পারেন। দেখুন :

২ নং সূরা বাকারা আয়াত নং ১০৬

২ নং সূরা বাকারা আয়াত নং ১০৮

৩ নং সূরা আলে ইমরান আয়াত নং-২৯

১৬ নং সূরা নাহল আয়াত নং-৭৭

৩৫ নং সূরা ফাতির আয়াত নং-১

বলা হয়েছে– اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

'আল্লাহ্ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান এবং আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন।' এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ৮৫ নং সূরা বুরূজের ১৫ ও ১৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ 'তিনি যা ইচ্ছে তাই করেন।'

দেখুন তিনি যা ইচ্ছে করেন, তিনি করতে পারেন; কিন্তু খোদা শুধু খোদায়ীত্বের কাজগুলোই করেন। তিনি অ-খোদার কাজ করেন না।

আপনার প্রধান প্রশ্নানুপাতে কেন খোদা মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন না? যেটা একজন অমুসলিম রেখেছেন। যে দর্শনে খোদা আকার ধারণ করে তাকে 'এ্যানথ্রোপোমোরফিজম' বলে। সর্বশক্তিমান খোদা আকার ধারণ করেন এবং তাদের একটা সুন্দর যুক্তি আছে, যেহেতু সর্বশক্তিমান খোদাকে বলতে হয়, জানতে হয়, লোকদের শিক্ষা দিতে হয়, যখন কোন ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন সে কেমন অনুভব করে, তাকে মানব আকৃতি গ্রহণ করতে হয়, মানুষকে বলার জন্য কেমন

অনুভব করে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তা বলার জন্য। যখনই তুমি সুখী, তখন তুমি কেমন অনুভব কর? যখন তুমি দুঃখিত, তখন তুমি কেমন অনুভব কর? মানুষের করণীয় এবং বর্জনীয় নির্ধারণ করার জন্যেও মানবাকৃতি গ্রহণ করতে হয়। সর্বশক্তিমান খোদা যে মানবাকৃতি ধারণ করেন তাকে 'এ্যানথ্রোপোমোরফিজম' বলে। কিন্তু আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, এ যুক্তি ধোপে টিকে না।

ধরুন! আমি একটি জিনিস তৈরি করলাম, আমি একটি টেপ রেকর্ডারের আবিষ্কারক। আমি একটি টেলিভিশন আবিষ্কার করলাম। টেপ রেকর্ডারের ভাল-মন্দ জানার জন্য আমার টেপ রেকর্ডার হবার প্রয়োজন নেই। টেলিভিশনের ভাল-মন্দ জানার জন্য আমার টেলিভিশন হবার প্রয়োজন নেই। আমার একমাত্র কাজ হলো ক্যাসেট চালানোর ক্যাটালগ লিখা। ক্যাসেট ঢুকানো, চলার বোতাম টিপে দেয়া, ক্যাসেট চলতে শুরু করবে। স্টপ চাপ দিলে বন্ধ হবে। দ্রুত সামনে যাওয়ার বাটন টিপলে দ্রুত সামনে যাবে। আমাকে একটি ক্যাটালগ তৈরি করতে হবে। একইভাবে মানবের ভাল-মন্দ জানার জন্য খোদার মানব হবার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষের মধ্যে থেকে একজন মানুষকে নির্দেশনা ও ক্যাটালগ দেবার জন্য বাছাই করেন। ক্যাটালগ কোনটি? আল-কুরআন হলো মানব জাতির জন্য ক্যাটালগ, যার মধ্যে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় রয়েছে, তাদের জন্য কি ভাল, কি মন্দ তা আল কুরআনে রয়েছে। তাঁর মানব হবার কোন প্রয়োজন নেই। কেন? আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, খোদা কি মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন না? হ্যাঁ তিনি পারেন, তবে যে মুহুর্তে তিনি মানবাকার ধারণ করবেন, সে মুহূর্তে তিনি খোদা হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন। কারণ, খোদা অমর। মানব মরণশীল, আপনি একই সাথে মরণশীল আর অমর হতে পারেন না। এটা একই ব্যক্তির একই সাথে লম্বা-খাট হওয়ার মতো অবাস্তব। মানবের কিছু সুনির্দিষ্ট গুণাবলি থাকবে, তাদের কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। যেমন তাদের খেতে হয়, ৬ নং সূরা আনআমের আয়াত নং-১৪ এ আছে–

قُلْ اَغَيْرَاللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ -

অর্থ : 'বলুন, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আমার রক্ষক হিসেবে গ্রহণ করবো? যে আল্লাহ আসমান ও দুনিয়ার স্রষ্টা, যিনি সবাইকে খাওয়ান কিন্তু তিনি নিজে খান না।'

মানবের খাবার প্রয়োজন। খোদার কি খাবার প্রয়োজন হয়? না। মানুষের ঘুমের প্রয়োজন আছে।

২ নং সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন : لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ 'তাঁকে তন্দ্রা কিংবা নিদ্রা স্পর্শও করে না।'

খোদার ঘুমের কোনো প্রয়োজন নেই। মানবের ঘুমের প্রয়োজন, বিশ্রামের প্রয়োজন, খাবার প্রয়োজন, খোদা কিভাবে আসবেন একই সময়ে মরণশীল এবং অমর হবেন। এটি অযৌক্তিক।

যদি আপনি বলেন, খোদা মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন, মানুষের গুণাবলি গ্রহণ করেন, আপনি নাস্তিককে একটা চাবুক তুলে দিলেন আপনাকে প্রহার করার জন্য। খোদা অতি প্রাকৃত নন, সবকিছু করতে পারেন, খোদা মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন না, খোদা প্রাকৃতিক। খোদার সকল কিছুর ওপর ক্ষমতা রয়েছে। তিনি তাঁর ইচ্ছেনুযায়ী সব কিছু করেন এবং তিনি মানব আকৃতি ধারণ করতে পারেন না।

প্রশ্ন ঃ ২৩২। আমার নাম অস্টিন ফিলিপস্। আমি একজন খ্রিস্টান। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই এ মুহূর্তে আমার মনে যা আসছে, তা হলো ইসলাম যীশুখ্রিস্ট সম্পর্কে কথা বলে। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, যীশুখ্রিস্ট ছিলেন। ইসলাম যীশুখ্রিস্টের বিশ্বাস, হত্যা এবং তাঁর পূর্ণাঙ্গ আগমনের ওপর বিশ্বাস করে না। এটা (ইসলাম) বিশ্বাস করে যে, তিনি প্রভু কর্তৃক উর্ধ্বে উত্তোলিত হয়েছিলেন। ইসলাম বলে যে, মুহাম্মদ ﷺ উত্তোলিত হন নি। একজন মুসলিম বন্ধু আমাকে বললেন যে, ইসলাম বিশ্বাস করে যে, যীশু কুমারী মাতার সন্তান এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা জন্ম লাভ করেন এবং স্বাভাবিক (প্রাকৃতিক নিয়মে) নিয়মে জন্ম গ্রহণ করেন নি। এটা এখন প্রমাণিত যে, যীশুখ্রিস্ট যদিও খোদা নন, তবুও তিনি অন্তত মুহাম্মদ ﷺ-এর চেয়ে বড়। এখন আপনি কেন বিবেচনা করেন না যদি আপনি মুহাম্মদের ﷺ শিক্ষা পেয়ে থাকেন। কেন আপনি যীশুর শিক্ষাও দেন না, যা বাইবেলে রয়েছে।

ডা. মুহাম্মাদ ঃ আমি কি এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি প্রশ্ন করতে পারি যা হ্যারল্ড পোর্টারের পক্ষ থেকে। তিনি আরো জিজ্ঞেস করেছেন যদি আপনি বলেন, খোদা একজন তাহলে যীশুখ্রিস্ট কিভাবে ছবিতে আসলেন?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটা খুবই ভালো প্রশ্ন করেছেন এবং এ ধরনের প্রশ্ন প্রধানত মিশনারীদের দ্বারা উত্থাপিত হয়। খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা। আমি জানি না তিনি কি একজন এবং তিনি কি ২-৩ টা দৃষ্টান্ত দিতে পারতেন কিনা যে, ইসলাম যীশু সম্পর্কে কি বলে? তিনি বলেছেন যে, কুরআন বলে যীশুখ্রিস্টকে জীবন্ত তুলে নেয়া হয়েছিল। নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে নয়। যীশুখ্রিস্ট একজন কুমারীর জন্ম। মুহাম্মদ ﷺ-এর পিতা-মাতা ছিলেন। কে বড়? মন উত্তর দেয়, কে বড়? যীশু? অতঃপর তিনি বলেন, এরকম আরো অনেক প্রশ্ন রয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, যীশুখ্রিস্টকে ২৫ বার এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নামে মাত্র ৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে। বড় কে? তারা প্রশ্ন রাখে মুসলিম হিসেবে আমাদের মন চিন্তা করে। কে বড়? যীশুখ্রিস্ট সুতরাং তাকে যীশু সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে বলেন।

ভাই, ইসলাম হলো একমাত্র অখ্রিস্টান বিশ্বাসের নাম, যাতে যীশু সম্পর্কে বিশ্বাসকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি অলৌকিকভাবে, যে কোনো ধরনের পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে জন্ম লাভ করেন, যা আধুনিক যুগের অনেক খ্রিস্টানরাও বিশ্বাস করে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি খোদার অনুমতি নিয়ে মৃতকে জীবিত করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি না যে, তিনি আল্লাহর জাত, আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন।

আপনার প্রশ্নে আসছি, কুরআন উল্লেখ করে যে, যীশু খ্রিস্টকে জীবন্ত উঠানো হয়েছিল, তা এ দিকে ইঙ্গিত করে না যে, খোদার পরে কেউ আছে কিনা? যদি কেউ কাউকে বলি দেয়, যদি কাউকে কুরবানী দেয়, তাদের মধ্যেকার সর্বোত্তম ব্যক্তিকেই কুরবানী দিতে হবে, তাদের মধ্যে যীশুখ্রিস্ট ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। আল-কুরআনের মতে তাকে কুরবানী করা হয় নি। আল-কুরআন বলে, وما قتلوه وما صلبوه 'তারা তাঁকে হত্যাও করে নি; শূলেও চড়ায় নি।'

আমরা একমত, আপনাদের বাইবেলের মতে, মিথ্যা রিডিং---- এর মতে বাইবেল আরো বলে! তাঁকে শূলে চড়ানো হয় নি ... যে ইহুদিকে শূলে চড়িয়েছিল বেশিরভাগ লোক তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে গ্রহণ করেনি। তারা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে গিয়েছে।

৪ নং সূরা নিসার ১৭১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لاَ تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ .

অর্থ : 'হে কিতাবধারিগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।'

বাড়াবাড়ি কি? দুটি বাড়াবাড়ি। ইহুদিরা বলে, তিনি ছিলেন জারজ সন্তান, খ্রিস্টানরা বলে তিনি ছিলেন আল্লাহ। বাড়াবাড়ি। আল্লাহ হওয়ার ব্যাপারে কথা বলা উচিত ছিল না, সত্য কথা সত্যিই থাকে, খোদা একজনই। তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল কারণ সেখানে ভুল ধারণা ছিল। তাঁর দ্বিতীয় আগমনে তিনি আমাদের নতুন কিছু শেখাবেন না।

৫ নং সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতে আল-কুরআন বলে :

وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا .

অর্থ : 'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করলাম এবং জীবনবিধান হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।'

আমরা মুসলমানরা বিশ্বাস করি যে, যীশু (আ) আগমন করবেন তবে তিনি আমাদের নতুন কিছু শিক্ষা দিবেন না, তিনি ভুল ধারণা দূর করার জন্য আসবেন।

আল্লাহকে বলবেন, হে আল্লাহ বারী তাআলা! তুমি আমার সাক্ষী থাক যে, আমি তাদেরকে কখনো বলিনি যে, তোমরা আমার ইবাদত কর। আমি তাদের কখনো বলিনি যে, তারা আমাকে খোদাজাত পুত্র বলবে। তিনি খ্রিস্টানদের (ভুল ধারণা অপনোদনের) জন্য আসবেন, মুসলমানদের জন্য আসবেন না। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি আসবেন।

আপনি বলেছেন যে, তিনি কুমারী মাতার সন্তান। মনে করুন, যদি কোনো ব্যক্তির পিতা না থাকে, যেহেতু তাঁর পিতা নেই এ কারণে যদি আপনি দাবি করেন যে, তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ। আল-কুরআনের ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ৫৯ নং আয়াতে এর জবাব দেয়া হয়েছে।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ -

অর্থ : 'নিশ্চয়ই ঈসা এর দৃষ্টান্ত আল্লাহর নিকট আদম (আ) এর মতো, আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, হয়ে গেল।'

'তাঁর পিতা ছিলেন না, আদম (আ)-এর পিতা-মাতা কেউই ছিলেন না। যদি কোনো ব্যক্তির পিতা না থাকার কারণে তাকে খোদা বলতে হয়, তাহলে আদম (আ) ছিলেন বড় আল্লাহ। এটা আপনাদের বাইবেলে বলে, কুরআন এরকম বলে না। বাইবেল আরেকজন অতিমানব সম্পর্কে বলে 'কিং মালচিসিডেক' সম্পর্কে, যিনি আগমন করেন নি, অবতরণ করেন নি, যার কোনো শুরুও নেই, শেষও নেই। তিনি আদমের চেয়েও বড় তাকে নাম ধরে ২৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে মাত্র ৫ বার কেন? যীশু-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল।

(সে অভিযোগগুলোকে খণ্ডন করার জন্য বারবার তার প্রসঙ্গ এসেছে, এটাও আল-কুরআন আল্লাহর বাণী হবার আরেকটি প্রমাণ। আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ কিতাবে তাঁরই একজন নবীর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। যদি এ কিতাব মুহাম্মদ ﷺ-এর রচিত গ্রন্থ হতো তাহলে, তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টাই বেশি করতেন। – অনুবাদক)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল না এবং কুরআন যখন নাযিল হচ্ছিল, তখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজে উপস্থিত ছিলেন।

সুতরাং আমি যদি কোনো (উপস্থিত) ব্যক্তিকে সম্বোধন করি তাহলে আমাকে শুধু বলতে হয় তিনি হে নবী, হে রাসূল! সব সময় তাঁর নাম নেয়ার প্রয়োজন নেই। যদি আমার অনুপস্থিত কোন বন্ধুকে সম্বোধন করি যে এখানে নেই, তাহলে তার নাম সর্বদা আমাকে নিতে হয়। যেমন জনাব X Y Z যেহেতু কুরআন নাযিলের

সময় যীশু সেখানে ছিলেন না, তাঁর নাম নিতে হয়েছে। এভাবেই কুরআনে মূসা (আ)-এর নাম ১৩২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। এটা কি এ কথা বুঝায় তিনি নবী মুহাম্মদ ﷺ, ঈসা (আ)-এ দুজনের চেয়ে বড়? না বরং তাঁরা দু'জনই অনুপস্থিত ছিলেন। যখনই তাদের কোন দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে তাঁদের নাম নিতে হয়েছে। যিনি উপস্থিত তাঁর নাম এতবার নেবার প্রয়োজন হয় নি। আশা করি প্রশ্নের উত্তর যথেষ্ট হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২৩৩। আসসালামু আলাইকুম, ভাই জাকির, আমার নাম ইসরাত আনসারী এবং আমি একজন বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েট, বর্তমানে আমি ইসলামিক স্টাডিজ এম. এ. করছি। আপনার প্রতি আমার প্রশ্ন হলো, কুরআনে উল্লেখ আছে যে, মায়ের গর্ভের শিশু পুত্র-কন্যা হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কেউই অবগত নয়। যাহোক, আধুনিক বিজ্ঞান কিছু পরীক্ষার ব্যাপারে এতোদূর অগ্রসর হয়েছে যে, যা দ্বারা মাতৃগর্ভের সন্তানের কন্যা-পুত্র হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। এটা কী বৈপরীত্য নয়?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ওয়া আলাইকুমুস সালাম, বোন! তিনি একটা প্রশ্ন রেখেছেন যে, কুরআন উল্লেখ করেছে যে, মাতৃগর্ভের শিশুর পুত্র-কন্যা হওয়ার বিষয়টা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না এবং আজ আমি তাঁর সাথে একমত যে, অনেক ডাক্তারি পরীক্ষা যেমন, এমিওনেটেনসিস, আলট্রাসনোগ্রাফী, যা শিশুর পুত্র-কন্যা হওয়ার বিষয়টা নিশ্চিত করতে পারে। সুতরাং এটা কি ভুল নয়— কুরআনের বৈজ্ঞানিক ভুল নয়?

বোন যেটা উল্লেখ করেছেন সেটা হলো ৩১ নং সূরা লুকমানের ৩৪ নং আয়াত :

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

অর্থ : 'অবশ্যই আল্লাহ তাআলার কাছে কেয়ামতের জ্ঞান আছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তিনি জানেন মায়ের গর্ভে কি আছে? কোনো ব্যক্তি জানে না আগামীকাল সেকি অর্জন করবে, কেউ জানে না কোথায় তার মৃত্যু হবে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু অবগত।'

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউ এ পাঁচটি জিনিস সম্পর্কে জানে না। তার মূল প্রশ্ন হলো যে, কুরআন বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ মাতৃগর্ভের সন্তানের পুত্র-কন্যা হিসেবে পরিচয় জানে না, তা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে তা জানা যাচ্ছে।

বোন! ভুল ধারণার কারণ হলো কিছু অনুবাদ, বিশেষ করে উর্দুতে যাতে বলা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া মাতৃগর্ভের সন্তানের পুত্র-কন্যা হওয়ার বিষয় আর কেউ জানে না। আরবিতে পুত্র-কন্যা হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ নেই। কুরআনে বলেছেন, 'আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মাতৃগর্ভে কি আছে তা জানে না।' আল-কুরআন এখানে নারী-পুরুষের উল্লেখ করেনি। একটা শিশু কিরূপ হবে সেদিকে ইঙ্গিত করে। সে কি সৎ হবে? নাকি অসৎ হবে? সে সমাজের জন্য অভিশাপ হবে নাকি আশীর্বাদ? সে কী হবে? সে কি প্রকৌশলী হবে? নাকি ডাক্তার হবে? এবং বিশ্বাস করুন! আপনাদের সকল চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নিয়েও বলতে পারবেন না যে, ঐ ব্যক্তি কি হবে? এটা ভুল অনুবাদ।

পরবর্তী প্রশ্ন আসার আগে, সেটা খুবই ভালো প্রশ্ন, তিনি বলেন যে, এটা ভাইকে বিরক্ত যেন না করে, আপনি যা বলতে চান আপনি মাইকের সামনে আসুন, ভাই এটা বেশি ভাল হয় যদি আপনি মাইকে এসে বলেন। আমি তাকে সুযোগ দিতে চাই, যদিও তিনি একজন অমুসলিম, সমস্যা নেই। তিনি বলেছেন, হতে পারে আমি ভুল দিকে নিচ্ছি, যদি আরবি মূল ভাষার মধ্যে, আরবি পরিভাষার মধ্যে কঠিন কিছু থেকে থাকে। অমুসলিমদের লিখিত অনেক অভিধান আছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো 'লেন লেক্সিকন'। 'লেন লেক্সিকন' দেখুন, অমুসলিমদের লিখিত, তারা বলবে আল-কুরআনের মূল আরবি টেক্স-এ পুত্র-কন্যার কথা নেই। তারা পুত্র-কন্যার ব্যাপারে বলবে না।

আরেকটি বিষয়, সেটা হলো বিচার দিবস (কিয়ামত) সম্পর্কে কিছু লোক আছে যারা ভবিষ্যদ্বাণী করে। এ ধরনের ঘটনা ১৯৯২ সালে ভারতে সংঘটিত হয়। একটা কোরিয়ান চার্চ ছিল, যারা ঘোষণা করল পৃথিবী ১৯৯২ সালের নভেম্বরে শেষ হয়ে যাচ্ছে? ঐ চার্চের ঘোষণা অনুযায়ী সব লোক সেখানে আসল, কিন্তু ঐরূপ কিছুই ঘটল না। আমরা এখনো জীবিতই আছি এবং লোকজন অর্থ নিয়ে দৌড়ালে। পৃথিবী কখন শেষ হবে তা কেউই জানে না।

বৃষ্টি সম্পর্কে, কিছু লোক বলে যে, এটি বিজ্ঞানের দ্বারা উন্নতি লাভ করেছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস কেন্দ্রের মাধ্যমে আপনি বলতে পারেন কোথায় এবং কখন বৃষ্টি হচ্ছে। আপনারা জানেন বৃষ্টির পূর্বাভাস কতখানি সঠিক, কতখানি সঠিক আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী, বিশেষ করে ভারতের। ঠিক আছে, কেউ আমেরিকার নাম নিতে পারে এবং একে সঠিক মনে করতে পারে। যুক্তির খাতিরে এ ব্যাপারে একমত হওয়া যায়। তাদেরকে ঝোলার জন্য রশি দিন। আবহাওয়ার পূর্বাভাস কেন্দ্র মেঘ দেখে এবং বাতাসের গতিবিধি বিশ্লেষণ করে। তারা বলে থাকে কখন এবং কি পরিমাণ বৃষ্টি হতে পারে? এটা বড় কিছু নয়, বৃষ্টি তো মেঘের মধ্যেই আছে। এটা এ রকম, ধরুন এক লোক পরীক্ষা দিল, রেজাল্ট একমাস পরে হবে, শিক্ষক উত্তরপত্রগুলো তিন সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষা করে জানলেন যে,

অমুক প্রথম হচ্ছে ইনি ৯৩ নম্বর পেয়েছেন। এ কারণে যে তিনি পূর্বে জানতে পেরেছেন। এটা বড় কিছু নয়, যেহেতু তিনি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছেন। নোটিশ বোর্ডে ঝোলাবার এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি জানতে পারলেন যে, কে প্রথম হলো, এটা বড় কিছু নয়।

বৃষ্টি মেঘের মধ্যেই আছে। বড় কিছু হত যদি আবহাওয়ার পূর্বাভাস কেন্দ্র সঠিকভাবে আজই বলতে পারতো ২০০ বছর পরে কোথায় কখন বৃষ্টি হবে মেঘ না দেখেই। আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি কোনো আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র ২০০ বছর পরে কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টি হবে তা যদি বলতে পারে? তারা কখনোই এটা করতে সক্ষম হবে না।

কোথায় কোন ব্যক্তি মারা যাবে। কোনো ব্যক্তি বলতে পারে, আমি আত্মহত্যা করব আমি এখানে মারা যাবো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা এটা করতে ব্যর্থ হয়। বেশিরভাগই এ বিষয়ে ব্যর্থ হয়। কত লোক আত্মহত্যা করতে চায়? খুবই কম সংখ্যক, একেবারে সামান্য সংখ্যক এবং এ ব্যাপারে উদ্যোগী তারা বেশির ভাগই ব্যর্থ হয়। বিষ গ্রহণের পর তারা যায় অথবা অন্যদেরকে বলে এবং হাসপাতালে যায়। তারা যখন লাফ দেয় তারা দেখে নিরাপদ অবতরণ কোথায় হয়। এমনকি যদি আপনি লাফ দেনও এবং আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করতে চান, তিনি আপনাকে রক্ষা করতে পারেন। যদি আপনি মারা যান তাও তাঁর অনুমতিতেই, তার অনুমতি ছাড়া নয়।

সর্বশেষ অংশের কথা, কেউই জানে না, সে কত অর্জন করবে? আপনি বলতে পারেন দেখুন ভাই জাকির আমি জানি যে, আমি মাসে ২ হাজার রূপী আয় করি, দেখুন কুরআনে ভুল আছে। আল কুরআন তাদের আয় সম্পর্কে এখানে বলে নি, অর্থের দিক দিয়ে বলে নি, এখানে تكسب বলা হয়েছে। আরবিতে تكسب শব্দটি ভালো-মন্দ কাজ অর্জনও বুঝায়। এটা শুধু বেতন অর্জনই বুঝায় না। এমনকি আপনি যদি দানও করেন তাতেও আপনি জানেন না কত ছওয়াব পাচ্ছেন? আপনি কখনো জানতে পারবেন না ভালো কাজ করে আপনি কত রহমত লাভ করলেন এবং খারাপ কাজ করে আপনি কত গুণাহ বা 'ঋণাত্মক পয়েন্ট' লাভ করলেন? প্রত্যেকটাই আল্লাহর সংরক্ষিত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২৩৪। আপনি জানেন অ্যারন শৌরী ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক আর্টিকেল ও বই লিখেছে। আপনি কেন তাকে জন বিতর্কে চ্যালেঞ্জ দেন না?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ইনি একটা প্রশ্ন রেখেছেন যে, আমি জানি অ্যারন শৌরী ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক আর্টিকেল ও বই লিখেছে। কেন আমি তাকে জন সমক্ষে বিতর্কের চ্যালেঞ্জ দিই না।

আমি ঐ সব আর্টিকেল পড়েছি। বেশির ভাগ আর্টিকেলই মূলত দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে রচিত :

এক. অ্যারন শৌরী নারীদের সম্পর্কে বলছে, যারা তাদের সমঅধিকার পায় নি।

দুই. ইসলাম সম্পর্কে যে, এটা সন্ত্রাসী ধর্ম, নির্দয় ধর্ম এবং কিছু এখানে সেখানে পয়েন্ট, যেমন এক ভাই বললেন, খোদা গণিত জানেন না ইত্যাদি। আসুন আমরা বিশ্লেষণ করি। বিশ্বাস করুন! তাদের সব, আমি যেমন উল্লেখ করেছি, মূলের বাইরে ভুল অনুবাদ এবং ভুল উদ্ধৃতি। ভাই ঠিকই বলেছেন আমি এটি পরিষ্কার করতে পারি এবং আমি তাই করছি।

প্রশ্নটি যা আসছে, তা হলো অ্যারন শৌরীকে আমি কেন জন সমক্ষে বিতর্কে ডাকছি না, যেহেতু সে ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক বই লিখেছে।

যদি আপনি তার সর্বশেষ বই "বিশ্ব ফাতওয়া বাস্তব শারিআ" পাঠ করেন, যেটা মুম্বাই থেকে এই সপ্তাহ খানেক আগে বের হয়েছে। এর কভারে সে কুরআনের ৪৮নং সূরা ফাতাহ-এর ২৯নং আয়াতের আরবি দ্বারা সুন্দর নাম দিয়েছে, যাতে বলা হয়েছে :

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۔

অর্থ : মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সঙ্গে যারা ঈমানদার তারা কাফিরদের সঙ্গে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

ফুলস্টপ, যদিও সেখানে কোনো ফুলস্টপ নেই, পুনরায় মূল উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় মুসলমানগণ অবিশ্বাসীদের ওপর নির্দয়। সে উদ্ধৃতি দিচ্ছে, যদি আপনি মূল অংশটি পড়েন। ৪৮ নং সূরা আল-ফাতাহ আয়াত নং ২৫-এ বলা হয়েছে :

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ۔

অর্থ : 'তারাই তো কুফরী করেছে এবং তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা দিয়েছে এবং বাধা দিয়েছে অবস্থানরত কুরবানীর জন্তুদেরকে যথাস্থানে পৌঁছুতে।'

এ অবিশ্বাসীরা মুসলমানদের হজ করা থেকে বাধার সৃষ্টি করেছিল। আমি জানতে চাই যদি কোনো ব্যক্তি কোনো খ্রিস্টানকে ভ্যাটিকান সিটিতে প্রবেশে বাধা দান করে তাহলে কি সে তাকে ভালোবাসতে পারবে? তাকে আলিঙ্গন করবে? এটাই স্বাভাবিক যে, যে তাকে ভালোবাসতে পারবে না। যদি ধরুন, একজন হিন্দু যদি তার তীর্থস্থান বেনারসে যাবার ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে তিনি এটা পছন্দ

করবেন? না! একইভাবে যদি আপনি মূল আরবি পড়েন, এতে বলা হয়েছে যে, ঐ সব লোক, যারা আপনাকে পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করা থেকে বাধা প্রদান করে এবং আপনাকে পশু কুরবানী করা থেকে বাধা প্রদান করে, আপনি তাদের ব্যাপারে শক্ত হোন এবং বিশ্বাসীদের ভালোবাসেন।

আমি আপনাকে যে বইয়ের কথা বললাম তার ৫৭১ ও ৫৭২ পৃষ্ঠায় তার খুব প্রিয় আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছে, তার খুবই প্রিয় আয়াত ৯ নং সূরা তাওবার ৫নং আয়াত যাতে বলা হয়েছে যে, নিষিদ্ধ চার মাস পরে অবিশ্বাসীদের ধরুন। ব্রাকেটের মধ্যে হিন্দুদের ধরুন, অবিশ্বাসীদের ধরুন এবং তাদের হত্যা করুন, তবে যদি তারা যাকাত দেয়, নামায আদায় করে তাহলে তাদের ছেড়ে দিন। এদিকে নির্দেশ করে যে, যদি কোন মুসলমান কোনো হিন্দুকে পায় তাহলে তাকে হত্যা কিংবা জবাই করবে। কিন্তু যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তাকে ছেড়ে দাও। এরপর সে আরো উদ্ধৃতি দিচ্ছে। ৯ নং সূরা তাওবার ১ম আয়াত থেকে মক্কার মুশরিক ও মুসলমানদের মধ্যে একটা চুক্তি ছিল। এ চুক্তি মুশরিকদের দ্বারা ভঙ্গ হয়েছিল। এ কারণে আল্লাহ সাবধান করে দিচ্ছেন।

জিনিসগুলো সোজা রেখে দিন, চারমাসের জন্য অথবা যুদ্ধের ঘোষণা দিন। এতে বলা হয়েছে যুদ্ধকালীন যখন আপনি এ ধরনের অবিশ্বাসীদের পাবেন যারা শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, তাদেরকে ছিনিয়ে আনুন এবং হত্যা করুন। ধরুন, ভিয়েতনাম ও আমেরিকার মাঝে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেন যে, যেখানেই ভিয়েতনামীদের পাও হত্যা কর। যদি আমি সে কথা আজ উদ্ধৃত করি এবং বলি যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'ভিয়েতনামীদের হত্যা কর যেখানেই তাদের পাও।' এটাই সঠিক হবে যে সে হন্তা। আমি মূল উদ্ধৃতি দিচ্ছি। মূলে, এটাই স্বাভাবিক যে সৈন্যের নেতা বা প্রেসিডেন্ট সর্বদা বলবে যে, যখনই শত্রু আসবে, যুদ্ধ করতে দ্বিধা করবেন না। এটাই নীতি। সুতরাং কুরআন যদি ঐরূপ বলে, তাতে দোষের কি আছে?

অত:পর ৫৭২ পৃষ্ঠায় আয়াত নং ০৫, সে লাফ দিয়ে আয়াত নং ৭, ৮-এ চলে গেছে। ৬ নং আয়াত বাদ দিয়েছে। আপনি কি জানেন, কেন? ৬নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি এ ধরনের কোনো মুশরিক, অবিশ্বাসীরা নিরাপত্তা চায় তাহলে তাদের দিয়ে দাও, যাতে তারা আল্লাহর বাণী শুনতে পারে এবং তাদেরকে নিরাপত্তা দান কর। আল-কুরআন বলেনি যে, তাদের নিরাপত্তা দিয়ে দাও, তাদের যেতে দিও না। আল কুরআন বলে তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে দাও; এমনকি মুশরিকরা যদি ইসলাম গ্রহণ নাও করে। যদি তারা নিরাপত্তা চায় তাহলে তাদের যেতে দিও না বরং নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। কোন সৈন্য বাহিনীর জেনারেল বলে যে, যখন শত্রু চলে যেতে চায়, তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। কোন্ সৈন্য বাহিনী ঐরূপ? আমি

জানতে চাই, সৈন্য বাহিনীর কোন্ জেনারেল আজ বলবে যে, যদি শত্রু শান্তি চায়, তাকে ছেড়ে দিও না, বরং তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। এটাই যা আল-কুরআন বলছে, মূল উদ্ধৃতি দিয়ে, তার পক্ষের বিষয় যে, মুসলমানরাই নির্দয়–মূলের বাইরে, সকল উদ্ধৃতি মূলের বাইরে।

একইভাবে এ আয়াতগুলো তাসলিমা নাসরিনের মতো লোকদের দ্বারা উদ্ধৃত হয়। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, কেন আমি অ্যারন শৌরীর সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হই না। আমি তাসলিমা নাসরীনের ব্যাপারে মুম্বাইতে সাংবাদিক সমিতির আয়োজনে এক বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলাম। যেটা ছিল প্রেস বিতর্ক, তাদের আয়োজনে। ঐ বিতর্কে যখন আমি তাদের বললাম, আমি বিতর্কটি ভিডিও রেকর্ড করবো, BUJ আমাকে অনুমতি দিল না। আপনারা জানেন বিষয়টা কি ছিল। বিষয় ছিল 'ধর্মীয় মৌলবাদীত্ব মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তরায় কিনা?' মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বক্তব্য অথচ মুনাফিকেরা আমাকে টেপ রেকর্ড করতে দিবে না? কেন?

আমি তাদের অঙ্গীকার দিলাম, আমি আপনাদের ঐ ক্যাসেটের একটা অনইডিটেড কপি দেখার জন্য দিব। তারা আমাকে অনুমতি দিল না। অনেক চাপ দেবার পর তারা শেষে অনুমতি দিল। আপনারা জানেন কি ঘটেছিল? আল্লাহর রহমতে বাইরে সবলোক ইসলামকে বানানোর জন্য, জাকিরকে বানানোর জন্য অপেক্ষা করছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে আমার বুদ্ধির জোরে নয়, এটা ছিল তারই রহমতে বিতর্ক খুবই সফল হয়েছিল। এটা এতই সফল হয়েছিল যে, একটা পেপারও রিপোর্ট করে নি।

এ বিতর্কে খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে ছিলেন ফাদার প্রেইরা, হিন্দুদের পক্ষ থেকে ছিলেন ডা. বেদ ভাইয়াস, ইসলামি দিকে আমি ছিলাম, সেখানে মারাঠি ভাষায় 'লজ্জা' বই-এর অনুবাদক মিঃ অশোক সাহানী ছিল, বিষয় ছিল তাসলিমা নাসরিন। যদি এই ক্যাসেট না থাকত তাহলে কে এগুলো জানত? বর্তমানে লাখ লাখ লোক এগুলো দেখছেন; শুধু মুম্বাইতেই নয়, বরং সারা পৃথিবী জুড়ে। তার দ্বিতীয় বিষয় ছিল 'নারী' সম্পর্কে। সব উত্তর ক্যাসেটে দেয়া হয়েছে। যা পরিষ্কার করেছে 'এ্যারন শৌরীসহ' এ ধরনের লোকদের ভুল ধারণাকে।

বিতর্ক সম্পর্কে আমার কথা হল– আমি জানতে চাই, বিতর্কের কি কোন মূল্য আছে? তার বিতর্কে কোন লাভ নেই, সে যদি চায় তাহলে বিতর্কে আসতে পারে। আমি স্বাগতম জানাই 'আহলান ওয়া সাহলান' বিজ্ঞ জনসমক্ষে। আমি জনসমক্ষে বিতর্ক করব, চলমান ভিডিও রেকর্ডারের সামনে, বদ্ধ ঘরে নয়, আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২৩৫। আমার নাম প্রীতি শেঠী। আমার প্রশ্ন হলো- আপনি আপনার বক্তৃতায় বলেছেন যে, ওসামা বিন লাদেনকে আমরা সন্ত্রাসী বলতে পারি না যেভাবে বি. বি. সি. এবং সি. এন. এন. খবর প্রচার করছে। কিন্তু এর পাশাপাশি এই চ্যানেলগুলো থেকেই আমরা এসব বিস্ফোরণের বিভিন্ন খবর, হতাহতের সংখ্যা জানতে পারছি। একই চ্যানেল থেকে, এই খবরটা কি আমরা বিশ্বাস করব, নাকি করব না?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি খুব সুন্দর প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন। আমি বলছি বি. বি. সি. যে ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসী বলছে এটা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু সেই বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা যেটা বলছে সেটা বিশ্বাস করব কিনা? এজন্যই বলেছিলাম মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। তার অর্থ এই নয় যে, বি. বি. সি.-এর সব খবরই মিথ্যা বা ভুল। য়েই খবরটাতে তারা একজন হিরোকে ভিলেন বানাচ্ছে সেখানে তাদের লাভটা কি, সেটা একটু ভাবতে হবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনি দেখবেন যেটা সরকারি চ্যানেলে হয়ে থাকে সেটা হলো- সেই দেশেই যদি বিস্ফোরণটা হয়ে থাকে, তাহলে নিহতের সংখ্যা সাধারণত কম বলা হয়। কারণ তারা দেখাতে চায় কম মানুষ মারা গেছে। যেমন পুলিশ কমিশনার আমাকে বললেন, ১৮৭ জন মারা গেছে। আর খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো ১৯৭ জন। আমি জানি না আসলে কে ঠিক, বা আমি বলছি না কমিশনার এ. এন. রায় মিথ্যা বলছে। আমাকে ভুল বুঝবেন না, তবে যখন আমরা একটা খবর পাই প্রথমেই তার প্রমাণ দেখব। ওসামা বিন লাদেনের এ খবরটা যখন দেখি এমনকি বি. বি. সি.-তেও বলা হচ্ছে প্রধান সন্দেহভাজন।

আপনি যদি আমেরিকার বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে যান দেখতে পাবেন, তারা সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর একটা তালিকা দিয়েছে। সন্ত্রাসী সংগঠন ৪৩টি। ৬০% হলো মুসলিম দল, বলতে পারেন সবচেয়ে জনপ্রিয় সন্ত্রাসী সংগঠন কোনটা? কোনটা মুসলিম সন্ত্রাসী সংগঠন? কোন মুসলিম সংগঠন সবচেয়ে জনপ্রিয়? আল-কায়দা। এই উত্তরের জন্য কোনো পুরস্কার পাবেন না। কারণ খুব সোজা উত্তর আল-কায়দা। আমেরিকার বিচার বিভাগের মতে এই আক্রমণের মধ্যে উলফা ৭৪৯টা, আল কায়দা ২৮টার মধ্যে ২৬টা আক্রমণের অভিযুক্ত আর বাকি ২টা আল-কায়দা দায়িত্ব স্বীকার করেছে। তাদের ওয়েবসাইডে দেখতে পাবেন সেখানে একটি আক্রমণও আল-কায়দা বলে প্রমাণিত হয়নি। আমি এখানে আল-কায়দাকে সমর্থন করছিনা। আপনারা জানেন 'ইয়োহাম রেডলী' যখন আফগানিস্তানে গেলেন, তাকে অপহরণ করা হয়েছিল। তিনি ফিরে আসলে তাকে প্রশ্ন করা হলো- 'আল কায়দা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?' তিনি বললেন, 'আমার সন্দেহ আছে আল-কায়দা আসলেই আছে কিনা?' তাই বোন, আপনাকে যেটা বলতে চাচ্ছি, আপনি যদি মিডিয়ার লোক হয়ে থাকেন অথবা মিডিয়ায় কাজ

করেন, তাহলে খবরটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন কোনটা ঠিক? আর কোনটা যাচাই-বাছাই করতে হবে? বি. বি. সি., সি. এন. এন. যদিও বলছে প্রধান সন্দেহভাজন। কিন্তু এমন ব্যবহার করছে যেন তারাই অপরাধী। আপনি কি আফগানিস্তানের হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলবেন সন্দেহের দায়ে? আমরা যখন খবর শুনি তখন আমাদের বুঝতে হবে কে খবরটাকে নিয়ন্ত্রণ করে? এর পেছনে তাদের উদ্দেশ্য কি? তাহলেই আমরা সঠিক খবরের সত্যতা যাচাই করতে শিখব।

প্রশ্ন ঃ ২৩৬। আমার নাম শামসুন্নাহার। আমি মারাঠি। মহানগর পেপারে কাজ করি। আপনার বক্তব্য শুনে প্রশংসার ভাষাও হারিয়ে ফেলেছি। আমার মনে হয় ভারতে হিন্দু আর মুসলিম এক হওয়ার জন্য কিছু একটা করা দরকার। আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই যে, ভারতের বিভিন্ন বস্তিতে যারা থাকে তারা গ্রাম থেকে মুম্বাই এসেছে রুটি-রুজির জন্য। এই বস্তিগুলোতে যে হিন্দু-মুসলিম আছে তারা একে অন্যকে অপছন্দ করে। আর এর পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য আপনি কি বলেন? হিন্দু-মুসলিম কিভাবে এক সাথে থাকতে পারবে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। এর উত্তরে আমি বলব আমার একটা ভিডিও বক্তব্য আছে হিন্দু-মুসলিমদের সাদৃশ্যগুলো নিয়ে। আমি মুম্বাই, চেন্নাই এবং ভারতের আরো বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য দিয়েছি, যেখানে হাজার হাজার মুসলিম অমুসলিম উপস্থিত ছিলেন। হাজার হাজার হিন্দুও এসেছিলেন। তাদের অনেকেই আমাকে বলেছিল জাকির ভাই, আমাদের এই হিন্দুধর্ম সম্পর্কে গত ৪০ বছরে যা জানতে পারি নি সেগুলো এই চার ঘণ্টায় জানতে পারলাম। আমি এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন মেনে চলি। যেটা সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে আছে–

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ .

অর্থ : 'হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা একটি কথা বা বিষয়ের দিকে আসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান আর তা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না।'

আমাদের বুঝতে হবে তবে আমার এটা কখনোই মনে হয় না যে, হিন্দু-মুসলিম একই জিনিস। ইসলাম ধর্ম আর খ্রিস্টান ধর্মও এক। এটা ঠিক নয়, হিন্দু কোনো পণ্ডিতকে মুসলমান হতে বললে, কোন মুসলমানকে খ্রিস্টান হতে বললে বা কোনো খ্রিস্টান যাজককে হিন্দু হতে বললে কেউই রাজি হবেন না সবাই না বলবেন, তাহলে এক জিনিস কোথায়? এগুলো মোটেও এক নয়, আমাদের কিছু পার্থক্য ও কিছু সাদৃশ্য আছে। আসুন আমরা সবাই আমাদের সাদৃশ্যগুলো মেনে নেই। আমাদের

মাঝে পার্থক্য না হয় কিছু থাকল। আমি যেটা বলি, আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে হতে পারে সেটা ভগবদগীতা, হতে পারে বেদ-উপনিষদ, বাইবেল, কুরআন, আসুন সাদৃশ্যগুলো দেখি। পার্থক্য নিয়ে পরে এক সময় আলোচনা করব, তবে যে কথাগুলো একই আসুন আমরা সবাই মেনে চলি। আমার বক্তব্যে আমি অনেক সাদৃশ্যতার কথা বলেছি, এজন্য আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন। আমাদের সাথে অনেকেই বিষয়টি সম্পর্কে ভালভাবে জানে না। কারণ, মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানে না। এমনকি অনেক মুসলমান প্রতিবাদ করেছে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মে সাদৃশ্য? অসম্ভব, অনেক লোক সেখানে এসেছিল শুধু তর্ক করার জন্য। আমি নাকি আজেবাজে বকছি। কিন্তু তারা যখন বক্তৃতা শুনল, তখন বিস্মিত হল। যারা তর্ক করতে এসেছিল, তারাও কথাগুলো মেনে নিল। অনেক হিন্দুও সেখানে ছিল। বিষয়টা আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং মেনে নিতে হবে।

আর প্রথম কথাটা হলো– 'আমরা উপাসনা করি একমাত্র আল্লাহর।' এটাই সবচেয়ে বড় মিল। এখানে আরো উদ্ধৃতি দেয়া যায়, বেদ, ভগবদগীতা, ছন্দোগিয়া উপনিষদের। ছন্দোগিয়া উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ, ১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে– 'স্রষ্টা মাত্র একজনই, দ্বিতীয় কেউ নেই।' এছাড়া শ্বেতাসত্র উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৯ নং অনুচ্ছেদে আছে– 'তাঁর কোনো প্রভু নেই, তাঁর কোনো বাবা-মা নেই।'

এটা একটা সংস্কৃত উদ্ধৃতি। তার মানে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কোনো মা-বাবা নেই। তার কোন মালিক নেই, এছাড়া এই গ্রন্থের ৪৯ অধ্যায়ে, ১৯নং অনুচ্ছেদে আছে– 'সর্বশক্তিমান স্রষ্টা তার কোনো প্রতিকৃতি নেই, কোনো প্রতিমা নেই, কোনো ফটোগ্রাফ নেই, তার কোনো মূর্তি নেই, তার কোন ছবি নেই। একই কথা বলছে যজুর্বেদ ৩২ নং অধ্যায়, ৩নং অনুচ্ছেদ-এ 'সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কোনো প্রতিকৃতি নেই।'

তাহলে আপনি যদি বেদ পড়েন এবং ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করেন, দেখবেন সেখানে একটাই স্রষ্টা। কয়েকদিন আগে স্টার নিউজ চ্যানেলের একটা সাক্ষাৎকারে এই প্রশ্নটা আমাকে করা হয়েছিল। তারা প্রশ্ন করেছিল, 'বন্দে মাতরম' শব্দটা সম্পর্কে আপনার মতামত কি? এটা কি মুসলিমরা বলতে পারবে? আমি এর উত্তরে তাদেরকে বললাম, এটা মুসলমান বলবে কিনা এ ব্যাপারে পরে আসছি। আগে বলি হিন্দুধর্ম কি বলে। আমি বললাম বেদের পণ্ডিতরা এ কথা স্বীকার করবে যে, বেদে বলা আছে 'স্রষ্টার কোনো প্রতিমা নেই।' তাই আপনি যখন বলছেন, 'বন্দে মাতরম' অর্থাৎ এদেশ আমার মা। তাকে স্রষ্টা বলছেন এখানেও আমি সাধারণ

লোকদের কথা বলছি না যারা ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে বেশি কিছু জানে না, তবে পণ্ডিত কাউকে করলেই তিনি বলবেন যে, 'বন্দে মাতরম' আর বেদের কথা পরস্পর বিরোধী। কারণ 'বন্দে মাতরম' কম করে হলেও তিন জায়গায় বলছে, 'আমি তোমার সামনে নতজানু হই, আমি তোমাকে পূজা করি।' আপনারা দেখবেন আর্য সমাজ এবং অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত তাদের মতে, বেদের ভাষ্য অনুযায়ী মূর্তিপূজা করা নিষিদ্ধ। ভগবদগীতার ৭ম অধ্যায়ের ২০নং অনুচ্ছেদে আছে– 'মূর্তি পূজা করা উচিত নয়।'

হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন। দূর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুরা এখন সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে। তবে বেদ কিন্তু বলছে একজন স্রষ্টার কথা। এছাড়াও বন্দে মাতরমে আমি তোমার সামনে নতজানু হয়ে পূজা করছি একটু আগে উপনিষদ থেকে যে উদ্ধৃতি দিলাম তার বিরুদ্ধে যারা ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী ১২টি লাইনে আমাদের আপত্তি আছে। তিনবার বলা হয়েছে, 'বন্দে মাতরম' যার অর্থ তোমার সামনে নতজানু হই। তিনবার বলা হয়েছে, 'এই দেশ আমার মা'। তিনবার বলা হয়েছে– আমি পায়ে চুমু দেব, আরো তিনবার বলা হয়েছে এদেশ স্বর্গীয়। দেশকে বলা হচ্ছে লক্ষ্মী, দূর্গা– এসব কিছুই আপত্তিকর। আমরা মুসলিম দেশকে অনেক ভালবাসি; কিন্তু সর্বশক্তিমান ছাড়া কারো কাছেই নতজানু হব না। এমনকি আমাদের মা, যে মা আমাদেরকে ৯ মাস গর্ভে ধারণ করেছেন। আমরা মাকে ভালভাসি, শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমরা মায়ের সামনে নতজানু হই না। আর যে মানুষটাকে আল্লাহ তায়ালার পরে সবচেয়ে বেশি ভালবাসি আমাদের সেই প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সামনেও আমরা নতজানু হই না। এই 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার আসলেই কোন প্রয়োজন বা কার্যকারিতা আছে? আসলে এটা একটা প্রাকটিক্যাল গেম... রাজনীতিবিদরা যেটাকে ভোট ব্যাংকের জন্য ব্যবহার করছে বা কাজে লাগাচ্ছে। তারা তারিখটা নিয়েও খেলা করছে।

আপনারা জানেন ১৮৭৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গানটা লিখেছিলেন আর সেটা ছাপা হয় ১৮৮২ সালে, তাহলে ১২৫ বছর এবং ৭ সেপ্টেম্বর কোত্থেকে আসে। এই ভুলটা করেছে রাজনীতিবিদরা, খেলাটা তাদেরই। এছাড়াও সৌদিতে যে অনেক মুসলমান আছে তারা তাদের দেশের কাছে নতজানু হয় না, পাকিস্তানের মুসলমান পাকিস্তানের কাছে নতজানু হয় না। কারণ এটা শির্ক। তাই যদি বলেন– ভারতের মুসলমানরা দেশপ্রেমিক না সে ক্ষেত্রে আমি বলব আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা এই দেশকে অনেক উন্নত করেছেন। আমরাও এই দেশকে অনেক অনেক ভালবাসি, প্রয়োজনে সত্যের জন্য দেশের হয়ে জীবন দিতে রাজি আছি; কিন্তু আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে নতজানু হবো না।

প্রশ্ন ঃ ২৩৭। আমার নাম সাইফ। আমার প্রশ্ন হল- মুসলমানরা কি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে? আর এজন্যই কি সন্ত্রাসী আক্রমণগুলো হচ্ছে? দয়া করে আপনার মতামতটা জানাবেন?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই বলেছি যে সন্ত্রাসী আক্রমণগুলোর পেছনের মূল কারণ হলো অবিচার, নিরাপত্তাহীনতা নয়। সন্ত্রাসী আক্রমণের একটা অংশ নিরাপত্তার অভাবে হতে পারে, তবে আসল কারণটা হলো অবিচার। কোন সংখ্যালঘু বিশেষ গোত্রের মানুষের ওপর নির্যাতন। আপনি যদি গতকালের 'সানডে মিডডে' খবরটা পড়ে থাকেন তাহলে জানবেন যে, উইলিয়াম নামে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব নাইন-ইলেভেন নিয়ে লিখেছেন। তিনি সেখানে একটা উপদেশ দিয়েছেন যে, মূল কারণ হলো অবিচার ও অন্যায়। তিনি মুম্বাই-এর কর্তৃপক্ষের সাথে একমত যে, এটা হতে পারে কাশ্মীরের বিদ্রোহীরাই মুম্বাইতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। কিন্তু তিনি বলেছেন এর কারণটা কি? তার মত অনুযায়ী কাশ্মীর যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। তারা শান্তি প্রিয় মানুষ, তবে কেন তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। উত্তরটাও তিনি নিজেই দিয়েছেন যে, এর মূল কারণ হলো- কাশ্মীরে গণতন্ত্রের নামে চলছে প্রহসন, এখানে গণতন্ত্রের অপব্যবহার হচ্ছে।

সেজন্যই সাধারণ নিরীহ মানুষগুলো প্রতিশোধের আগুনে দগ্ধ হয়ে লড়াই করছে। এটাও আমার মন্তব্য নয়, বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য। একই অবস্থা ফিলিস্তিনে। সেখানে তারা যুদ্ধ করছে কারণ তাদের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। তাই অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য তারা যুদ্ধ চালাচ্ছে, প্রতিশোধ নিচ্ছে। সুতরাং সন্ত্রাসের মূল কারণ হল কোন দল বা গোত্রের ওপর অন্যায়, অবিচার, যারা তাদের বিপক্ষে তারা এটাকে সন্ত্রাস বলছে, উদাহরণস্বরূপ ভগত সিং দেশের জন্য লড়েছিলেন। বৃটিশ সরকার তাকে 'সন্ত্রাসী' বলেছিল আর আমরা তাকে বলি মুক্তিযোদ্ধা। তাই এরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আপনি আপনার সুবিধামত কাউকে সন্ত্রাসী বলবেন, আর কাউকে বীর মুক্তিযোদ্ধা বলবেন, সন্ত্রাসের অনেক অর্থ আছে, অনেক সংজ্ঞা আছে, যেটা ভৌগোলিক অবস্থাভেদে পরিবর্তন হয় এবং ইতিহাসের কারণেও বদলায়। তাই এখানে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সন্ত্রাসের মূল কারণ খোঁজার চেষ্টা করতে হবে তাহলে যথার্থ প্রতিকার সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ ২৩৮। ক্রিস্টফার লোবো নামে একজন ভদ্রলোক চিরকুটে একটা প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন কিভাবে প্রমাণ করবেন যে, নাইন-ইলেভেন ঘটনা ভেতর থেকেই ঘটেছে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ নাইন-ইলেভেনের ঘটনা ভেতর থেকে হয়েছে এর স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মাত্র কয়েকদিন আগে সংবাদপত্রে একটা খবর ছাপা হয়েছিল যে, 'আমেরিকার ৭৫ জন প্রফেসর বিশ্বাস করেন যে, নাইন-ইলেভেনের ঘটনা ভেতরের কেউ ঘটিয়েছিল।' টাইমস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত এই

খবরে আরো বলা হয়েছে– আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ জন অধ্যাপক মন্তব্য করেন এই বিস্ফোরণটা ভেতরের কারো কাজ এবং হোয়াইট হাউজের কিছু রাজনীতিবিদদের পরিকল্পনাতেই টুইন-টাওয়ার ধ্বংস করা হয়েছে। আর তাদের মতে, এর প্রধান কারণ হলো যুদ্ধ করে তেল সমৃদ্ধ দেশগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। এটা একটা ওপেন সিক্রেট (সর্বজন বিদিত গোপন বিষয়)। তাদের মধ্যে জোন নামে একজন অধ্যাপক বলেছেন– আমরা বিশ্বাস করি না যে ১৯ জন ছিনতাইকারী আর আফগানিস্তানের কিছু গুহাবাসী এমন একটা পেশাদার কাজ করে বসবে একাই। কোনোভাবেই এটা হতে পারে না, তাই আমরা কথা দিচ্ছি আসল সত্যটা অবশ্যই বের করব এবং সকলকে সেটা জানাব।

আমরা সরকারের বানানো কথায় বিশ্বাস করি না। তিনি আরো বলেছেন, আমরা অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানী হিসেবে বলছি। আমরা জানি যে লোহার টুইন-টাওয়ারের লোহার বীমগুলো ছিল খুব মজবুত। বিমান বিস্ফোরণের সময় যে তাপের সৃষ্টি হয় সেই তাপে ঐ মজবুত ভীমগুলো গলে যাওয়ার কথা নয়। এখানে সব কিছু পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে, সে জন্যই পুরা অবকাঠামো ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারটি নিয়ে অনেক ভিডিও আর বই বের হয়েছে। আমি নিজেই অনেক দেখেছি, তার মধ্যে একটি হলো অধ্যাপক স্টিভজোন্স্-এর ভিডিও। গতকালকের কাগজে ঠিক এর তিনদিন পর একটা খবর দেখলাম যে, অধ্যাপক স্টিভ জোন্সকে অসুস্থতার ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। চিন্তা করুন, এরূপ আরো অনেক ভিডিও আছে যেগুলো আপনারা দেখে থাকতে পারেন। এর মধ্যে একটার নাম 'লুজ চেঞ্জ নাইন ইলেভেন।' ২১ বছর বয়সের এক আমেরিকান তরুণ এই প্রামাণ্য চিত্রটি বানিয়েছে। এটা সি.এন.এন ও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের ভিডিও চিত্র, কিছু সাক্ষাৎকারের সমন্বয়ে একটি ডকুমেন্ট। সেখানে তিনি বলেছেন– প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য মতে বিমান দুটো যাত্রীবাহী বিমান হতেই পারে না। দেখে মনে হচ্ছে একটা সামরিক বিমান। তারপর বিমানটি যখন টাওয়ারের কাছাকাছি আসল বিমানে ডানা থেকে গুলি বর্ষণ করা হচ্ছিল। এরপর প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেছেন, সেই কোম্পানির ম্যানেজারের সাথে তার কথা হয়েছে যারা টুইন-টাওয়ার বানিয়েছিল। সে বলেছে এটা একেবারেই অসম্ভব কারণ, টুইন-টাওয়ারটা এমনভাবে বানানো হয়েছে যে, ঝড় টর্নেডোতে কিছুই হবে না। আর সামান্য একটা বিমানের আঘাতে এভাবে ধ্বংস হতে পারে না।

কারণ, সেই বিস্ফোরণের সময় টুইন-টাওয়ারের তাপমাত্রা ছিল ১০০০° ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু এই তাপমাত্রা ২০০০° হলেও কিছু হওয়ার কথা ছিল না। দশদিন পর সেই ম্যানেজার নতুন কথা বলতে শুরু করল যে এটা অসম্ভব। বিমানের বিস্ফোরণে লোহার বীমের ক্ষতি হতে পারে।

আরেকজন অধ্যাপক এমন কথাই বলেছেন এবং পরে তিনি তার মত পাল্টান নি। তাই তার চাকরি গিয়েছিল। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, নিউ ইয়র্কের চল্লিশ, ষাট, সত্তর তলা বিশিষ্ট অনেক ভবনে আগুন ধরেছে; কিন্তু কোনোটাই এভাবে ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়ে নি। আমেরিকার ইতিহাসে টুইন-টাওয়ারই প্রথম ভবন যেটা এভাবে একেবারে ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়েছে। ছবিতে আমরা দেখেছি, ভবন ভাঙ্গতে গেলে বোমা দিয়ে যেভাবে ভাঙ্গা হয় এটা ঠিক সেভাবেই ভেঙ্গে পড়েছে। সেখানে উদ্ধার কাজে নিয়োজিত ফায়ারম্যান যারা ছিল তারা বলেছে, আমাদের মনে হচ্ছিল ওপর থেকে বোমার সুইচ টিপছে আর বোমা ফাটছে একের পর এক, তাহলে টুইন-টাওয়ার যেভাবে ভেঙ্গেছে তার প্রমাণ আছে।

এছাড়াও বলা হয়েছে সরকারের সব প্রমাণ তারা পরীক্ষা করে দেখেছে। বলা হয়েছে বিমান চালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৯ জন ছিনতাইকারী এই কাজটি করেছে। আপনারা দেখে থাকবেন বিমান যেভাবে টার্ন বা বাক নিয়েছে সেটা ছিল খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ আমি দীর্ঘদিন আকাশ পথে বড় বিমান চালকের সাথে কথা বলেছি, তারা বলেছে এভাবে বাঁক নেয়া অসম্ভব। তাহলে চিন্তা করুন কতদিন প্রশিক্ষণ নিয়ে একটা লোক এভাবে প্লেন বা বিমান চালাতে পারে? বিশেষজ্ঞরা বলেন, এটা অবশ্যই সামরিক বিমান। সরকার আমাদের আরো তথ্য দিয়েছে। তখন একটা ফোন এসেছিল যে বিমানটা ছিনতাই করা হয়েছে আর যাত্রীরা সবাই সেখানে বন্দি। সে সময় একটা ফোন করেছিল একজন ফ্লাইট অফিসার। সে বলছে যে, 'বিল্ডিং, পানি, ওহ ঈশ্বর! ওহ ঈশ্বর! যে সারা বছর বিমানে উড়ে বেড়ায় সেকি নিউইয়র্কে কখনো বিল্ডিং দেখে নি? আর একজন লোক বলছিল মা, আমি মার্ক বিংহ্যাম বলছি। মা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছে? আমাদেরকে ছিনতাই করা হয়েছে, তুমি বিশ্বাস কর।'

এখানে আমার প্রশ্নটা হলো যদি আমি আমার মায়ের সাথে কথা বলি, তখন বলি আমি জাকির। এরূপ বলি না যে, আমি জাকির নায়েক বলছি; কিন্তু সে ব্যক্তি বলেছিল মা, আমি মার্ক বিংহ্যাম। যদি মার্ক তার মায়ের সাথে কথা বলে, তাহলে এভাবে বলবে কেন? আর টেলিফোন কল আপনি পাবেন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বের মধ্যে। আমি একটা সার্ভে করেছিলাম ৬২,০০০ ফুট উপরে মোবাইল কাজ করে কিনা? ৪,০০০ ফুট উপরে মোবাইল কাজ করার সম্ভাবনা .৪%। আর ৮,০০০ ফুট উপরে সম্ভাবনাটা হবে ০.১% আর ৩২,০০০ ফুট উপরে এই সম্ভাবনা .০০৬%। অর্থাৎ মোবাইল কাজ করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এ প্রামাণ্য চিত্র বলছে আমেরিকার ফোন কোম্পানিগুলো এত উচ্চতায় সংকেত পাঠানোর চেষ্টা করছে আর লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালছে। প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে আরো জানা যায় যে, প্রত্যেক বিমানের দুটি 'ব্লাকবক্স' থাকে যেটা ৩,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট তাপমাত্রায়ও কিছু হয় না। অথচ ১,০০০ থেকে ২,০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সেই বক্সের সব শেষ।

এসব কিছুই এখন প্রমাণ। এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে 'উম্মাহ' নামে একটি সাময়িকীতে সাক্ষাৎকার দিলেন। তিনি বলেন, 'আমি একজন মুসলিম তাই কোনো মিথ্যা বলব না। আমার মত অনুযায়ী নিরীহ মানুষকে, নিরীহ নারী ও শিশুকে হত্যা করা জঘন্যতম অপরাধ। ইসলাম এটার তীব্র নিন্দা করে। ওসামা বিন লাদেন সাক্ষাৎকারে একথা বলেছিলেন। কয়েক দিন আগে 'আল-জাজিরায়' একটি ভিডিও চিত্র দেখলাম 'ওসামা বিন লাদেন নাইন-ইলেভেন।' যেহেতু ৭৫ জন অধ্যাপক বলছে এটা নিজেদের কাজ তাই সেটা ঘোরানোর জন্য পাঁচ বছর পরে এই খবর টিভিতে আসছে। এই ৭৫ জন অধ্যাপক কথা দিয়েছেন এর রহস্যভেদ করবেনই। এবার পেন্টাগনের দ্বিতীয় আক্রমণটা নিয়ে বলি, পেন্টাগনে যখন বিমান ধ্বংস হলো ঘাসের ওপর সেই বিমানের কোনো চিহ্ন নেই, শুধু পেন্টাগনের দেয়ালে একটা গর্ত। টিভিতে দেখেছি সেই গর্তটা বিমানের বডির সমান বড়। কিন্তু বিমানের ডানাটা কোথায় গেল? ডানার আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই পেন্টাগনে। যদি বিমানটা পেন্টাগনে ঢুকে যায় আর ডানা বাইরে থাকে, তাহলে ডানাটা হয় বাইরে থেকে যাবে অথবা দেয়ালের গায়ে গর্ত হবে। কিন্তু ভবনটিতে কিছুই হয় নি। সবকিছুই যেন সাজানো।

এছাড়া লোকে বলছে বিমানটা ৪০ ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেছে। বিজ্ঞান বলে– বোয়িং বিমান ৪০ ফুট উপর দিয়ে উড়ে গেলে একটা গাড়িও ছিটকে যাবে। একজন প্রাক্তন মিলিটারিম্যান বলেছেন, এটার শব্দ ছিল একটা মিসাইলের মত। বিমানের কিছুই সেখানে পাওয়া যায় নি, শুধু একটা যুদ্ধ বিমানের ইঞ্জিন পাওয়া গেছে। এমনকি অন্য জায়গায় মাটিতে শুধু একটা গর্ত হয়েছে। এর পক্ষে প্রচুর প্রমাণ আছে, কিন্তু সময় স্বল্প। একজন বোকাও বুঝতে পারবে এটা ভেতরের কাজ, কিন্তু মিঃ বুশ এ কথাটা বুঝতে পারেন নি।

আরো বলা হচ্ছে এসবের কারণেই আফগানিস্তানে আক্রমণ করা। তারপর ইরাক, সবশেষে ইরান। এটা ধারণা করা হচ্ছে যে, ইরানেও আক্রমণ করা হবে, তারা তেল সমৃদ্ধ দেশগুলো দখল করতে চায়। তাহলে এ সন্ত্রাসী আক্রমণ কেন? প্রথমতঃ এটা হলো অবিচার, দ্বিতীয়তঃ এটা টাকার জন্য, ক্ষমতার জন্য। যখনই রাজনীতিবিদরা দেখে তারা ভোট হারাতে যাচ্ছে তখনই মানুষের মনে ভয়ের সৃষ্টি করে যে, 'হয় আমাকে ক্ষমতায় বসাও নয়তো মুসলমানরা ক্ষমতায় বসবে, শাসন করবে।' গুজরাটেও একই ঘটনা, মানুষের মনে ভয় তৈরি করা হচ্ছে যে, আমাদের ক্ষমতায় না বসালে মুসলমানরা তোমাদের মেরে ফেলবে, তাই তারা আবার ক্ষমতায় আসল। আমরা যেটা বুঝি নাইন-ইলেভেনের ঘটনা আসলে এটা একটা ভেতরের কাজ। যার স্বপক্ষে অনেক তথ্য প্রমাণ রয়েছে, তাই এটা একেবারে ওপেন সিক্রেট (সর্বজনবিদিত গোপন তথ্য) যে, এই আক্রমণটায় বুশ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এক কথায় আক্রমণটা বুশ নিজেই করেছিল।

প্রশ্ন ঃ ২৩৯। আমার প্রশ্ন হলো– আমি বিশ্বাস করি যে, সন্ত্রাস হলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আরো মনে করি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধেও। কোনো মানুষের সাথে যদি অন্যায় করা হয়, তাহলে সে প্রতিশোধ নিতে অন্য মানুষকে হত্যা করে, তবে সেটা কি তার জন্য অপরাধ? আমার অবস্থাও যদি গুজরাটির মত হত, তাহলে তারা যা করেছে আমিও তাই করতাম। পুলিশ ন্যায় বিচার করে না, আদালতে গেলে ১০ বছর লেগে যায়, তাহলে একজন সাধারণ মানুষ এখানেও কি করবে? আপনি কি উপদেশ দিবেন?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ আমিও একমত যে, এই পরিস্থিতিতে আপনিও একই কাজ করবেন এবং যে কোন সাধারণ মানুষও এই কাজ করবে এটা স্বাভাবিক। যদি না আল্লাহর ওপর বিশ্বাস থাকে। এমনকি আমি নিজেও এ কাজ করতে চাইব, যখন আমি কুরআনকে জানব এবং এটা জানবনা যে, কুরআন এটা নিষেধ করেছে। কারণ, আমি যদি নিরীহ মানুষকে হত্যা করি, তাহলে আমিও সেই ব্যক্তির মতো কাজ করলাম যে আমার ওপর অন্যায়-অবিচার করেছে। অর্থাৎ, কেউ আমার ওপর অন্যায় করেছে এর অর্থ এই নয় যে, আমি নিরীহ মানুষকে হত্যা করব। কেউ আমার ঘরে ডাকাতি করলে, আমিও আরেকজনের ঘরে ডাকাতি করতে পারি না। তবে যদি আমরা অপরাধীকে ধরতে পারি এবং প্রমাণ করে শাস্তি দেই সেটা আলাদা কথা।

আল-কুরআনও একথাই বলেছে নিরীহ মানুষ হত্যা করা যাবে না। সুতরাং কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী এই উপায়ে প্রতিশোধ নেয়া সমীচীন নয়। আমি সাধ্যমত প্রমাণ জোগাড় করব, সরকারকে বুঝানোর চেষ্টা করব তারপরে? যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া পায়, তখন আমার কিছুই করার নেই। এই সন্ত্রাসী আক্রমণগুলোর জন্য যারা দায়ী তারা হচ্ছে– রাজনীতিবিদরা ও পুলিশ, আর যারা মারা গেছে অথবা বোমা ফাটিয়েছে যদিও এই পৃথিবীতে তাদের উপযুক্ত বিচার হয় না। তাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে হয়েছে–

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ـ

অর্থ : 'প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে।'

আসল বিচার হবে কিয়ামতের দিন। এটাই আমরা মনে করি। আমরা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করব তিনিই বিচার করবেন। যেমন আমরা যদি আজকে হিটলারকে ধরি, তাহলে তাকে আপনি কি শাস্তি দিবেন? ৬০ লক্ষ নর হত্যার শাস্তি আপনি দিতে পারবেন? তাকে আপনি সর্বোচ্চ একবার মারতে পারবেন। বাকি ৫৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৯৯ জনের কি হবে?

পবিত্র কুরআনে সূরা নিসায় ৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ.

অর্থ ঃ 'যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে তাদেরকে আমি দোযখের আগুনে দগ্ধ করব, আর যখনই তাদের চামড়া আগুনে দগ্ধ হয়ে যাবে, তখনই নতুন চামড়া সংযোজন করে দিন, যাতে তারা শাস্তি ভালভাবে আস্বাদন করতে পারে।'

বিজ্ঞান বলে মানুষের শরীরে ব্যথা অনুভবকারী আছে যেটা ব্যথা বা যন্ত্রণাকে ধরে রাখে, তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন– কিয়ামতের দিন তাদের চামড়া আগুনে পোড়ান হবে, যাতে তারা শাস্তির যন্ত্রণাটা পুরাপুরি উপভোগ করতে পারে।

আল্লাহ যদি চান হিটলারকে ৬০ লক্ষ বার মারতে পারবেন। যেটা আমরা কেউ পারব না। তাই আমরা তাদের বিচারের ভার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেব।

মোঃ জাকির নায়েক ঃ আপনাদের সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের কাছে জাকির নায়েকের উদ্দেশ্যে অনেক প্রশ্ন এসেছে, ভবিষ্যতে আমরা (ইনশাআল্লাহ) এসব প্রশ্নোত্তর ডা. জাকির নায়েকের মুখে শুনব।

ডা. জাকির নায়েককে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাদের অনুষ্ঠানে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার জন্য এবং আমাদের সম্মানিত অতিথিদেরও ধন্যবাদ জানাই অনেক আগ্রহ নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ, আস্‌সালামু আলাইকুম।

প্রশ্ন ঃ ২৪০। ডা. জাকির নায়েক আপনি যে মেয়াদ উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই। ধরুন, ২ বছর মেয়াদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হলো এবং উদ্যোক্তা এ সময়ের মধ্যে কোনো লাভ অর্জন করতে ব্যর্থ হলো এবং কোনো লোকসানও দিল না এবং সময় নিলো। সুতরাং ব্যাংক কি এ অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য হবে না কি?

উত্তর : ধরুন, এ ব্যাংক হলো ইসলামি ব্যাংক। এ ইসলামি ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ২ বছর মেয়াদে বিনিয়োগ করলো এবং ব্যবসায়ী কোনো প্রকার লাভ অর্জন করতে ব্যর্থ হলো লোকসানও দিল না। তাহলে এক্ষেত্রে ব্যাংক বিনিয়োগের অর্থ ফেরত নিবে কি নিবে না তা শর্ত নির্দিষ্ট থাকে যে, ২ বছরের জন্য অর্থ নেয়া হবে ব্যাংক থেকে তাহলে ইসলামি ব্যাংকের অধিকার আছে যে, এ অর্থ ফেরত নেয়া। লোকসান হোক কিংবা লাভ হোক। এক্ষেত্রে লাভ-লোকসান মুখ্য বিষয় নয়। কিন্তু যদি ব্যাংক মনে করে ব্যবসায়ীকে আরো ৬ মাস সময় দেয়া হবে

তাহলে ব্যবসায়ী হয়তো লাভ অর্জন করতে পারবে তখন ব্যাংক সময় ১/২ বছর কিংবা ২ বছর বাড়াতে পারে, তবে তা নির্ভর করে ব্যবসা কতটুকু লাভজনক। এটা সম্পূর্ণ ব্যাংকের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আর লোকসান বহনের মৌলিক পার্থক্য হলো, ব্যবসা যদি মুদারাবা সিস্টেমে হয় তাহলে ব্যবসায়ী সরাসরি লোকসান বহন করবে না, লোকসান বহন করবে ব্যাংক।

প্রশ্ন ঃ ২৪১। আমার প্রশ্ন ব্যাংকের জনগণকে যে হাউজিং লোন দেয় সে সম্পর্কিত। অনুগ্রহ করে আপনি কি বলবেন ইসলামি বিধানে ইসলামি ব্যাংকিং পদ্ধতিতে এ লোন কীভাবে হতে পারে– যা জনগণের বাসস্থান নির্মাণে সাহায্য করতে পারে?

উত্তর : ধরুন, একজন ব্যক্তি একটি বাড়ি কিনতে চায় এবং এজন্য ঋণ নিতে চায়। একটি আধুনিক ব্যাংকের আমানত গ্রহণ, ঋণদান এ হাউজিং-এর ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকের তুলনা কী হবে? আধুনিক ব্যাংকের আসল পার্থক্য হলো, মনে করুন, আপনি একটি বাড়ি কেনার জন্য হাউজিং লোন চান, কিন্তু সাধারণত এর জন্য আপনার নিজস্ব একটা হারে অর্থ অবশ্যই থাকতে হবে। এটা হতে পারে ১৫% অথবা ৫০%। ব্যাংক হারে যাহোক যা আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে তা হতে পারে ২৫% অথবা ৩০% অথবা ৫০%। এ পরিমাণ অর্থ আপনি দেয়ার পর বাকি ৭৫% বা ৫০% বা ২৫% পরিমাণ অর্থ ব্যাংক দিবে। মনে করুন, একটি বাড়ির দাম ৩-৪ লাখ টাকা। প্রথমত আপনি দিলেন ১ লাখ টাকা এবং বাকী ৩ লাখ টাকা দিবে ব্যাংক এবং ব্যাংক আপনাকে বললো আপনি ৩ বছর সময় পাবেন এ অর্থ পরিশোধ করার জন্য। যে ৩ লাখ টাকা আধুনিক ব্যাংক থেকে নেয়া হলো তাতে ৩ বছরের সুদের হার ধরা হলো তা হলে কতটুকু পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে তা হতে পারে ৪০ হাজার টাকা অথবা ৫০ হাজার টাকা।

সুতরাং হিসাব করা হবে আপনাকে দেয়া প্রাথমিক লোন (৩ লাখ) যোগ হবে সুদ। সুতরাং সুদ হলো ৫০ হাজার টাকা। এ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা ৩ বছর মেয়াদে পরিশোধ করতে হবে। এ হারে ৫০ হাজার টাকা মাসের সংখ্যা দ্বারা এটা হবে মাসিক প্রায় ১০ হাজার টাকা। এটা হলো মাসিক কিস্তি। তাহলে আপনাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ দিতে হচ্ছে। এটা হলো আধুনিক ব্যাংকের পদ্ধতি। আধুনিক ব্যাংকের পদ্ধতি হলো সুদভিত্তিক। আপনি যে কিস্তি দিলেন তা আপনাকে দেয়া লোনের সাথে সুদ যোগ হয়ে পরিশোধ হলো। কিন্তু এটা হলো সুদ এটা ইসলামে হারাম।

ইসলামি ব্যাংকের পদ্ধতিতে অনেক পার্থক্য আছে। আপনি ইসলামি ব্যাংক থেকে যে লোন নিবেন তা নেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি বা উপায় আছে। বিভিন্ন ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকল্প আছে। মনে করুন, আপনি ৪ লাখ টাকার একটি ফ্লাটের ২৫% বা ৩০% বা ৪০% বা ৫০% প্রথমেই দিলেন। আপনি যদি ১ লাখ টাকা দেন তাহলে ব্যাংক

দিবে ৩ লাখ টাকা। এখন ইসলামি ব্যাংক হিসেব করবে এ ফ্লাটের গড় মাসিক ভাড়া কত হবে? এটা হতে পারে মাসিক প্রায় ১৫ হাজার টাকা। যেহেতু আপনি প্রথমেই ১ লাখ বা ২৫% নিজে দিয়েছেন এবং বাকি ৭৫% ব্যাংক দিয়েছে, সুতরাং ২৫% আপনাকে দিতে হবে না, বরং বাকি ৭৫% আপনাকে দিতে হবে এবং ৭৫% ভাগ হিসেবে ভাগ হবে। তাহলে মাসিক ভাড়া কত দাঁড়াবে? যেহেতু ইসলামি ব্যাংক ৭৫% বিনিয়োগ করেছে এবং ২৫% আপনি বিনিয়োগ করেছেন।

সুতরাং আপনি ভাড়া হিসেব করবেন এবং ৩ বছর শেষে অবস্থা দাঁড়াবে এমন যে, ইসলামি ব্যাংক বললো সে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ নিবে। তা হতে পারে ৩০ হাজার বা ৪৫ হাজার টাকা। সুতরাং ৩০ হাজার টাকা ৩ লাখের সাথে যোগ হবে। ৩.৩ লাখ টাকা ৩৬ মাস দ্বারা ভাগ করলে যা হবে তা মাসিক কিস্তি বা ভাড়া হবে। এখানে এটাকে সুদ হিসেবে গণনা করা হচ্ছে না বরং তা লাভের ওপর লাভ হিসেবে গণনা করা হচ্ছে। আপনি প্রতি মাসে ঐ বাড়ির জন্য ভাড়া দিচ্ছেন এটা হলো লোন নেয়ার একটি উপায়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি আলামিন ব্যাংকে গেলেন, তাদের একটা আবাসন প্রকল্প আছে। যেখানে ব্যাংক আপনাকে বললো, আপনাকে এখন থেকেই সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহিত করলো। আপনি প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা বা ২ হাজার টাকা বা ৩ হাজার টাকা জমা করলেন। এ জমা পরবর্তীতে আসিয়ান স্কিমে পরিবর্তিত হলো। এ বিনিয়োগ মুদারাবা পদ্ধতিতে যোগ হলো। আপনি এখান থেকে লাভ পেলেন। ফলে ৩ বছর পর প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা। জমার টাকা দাঁড়াবে ৩,০০০ × ৩৬ = ১,০৮,০০০ টাকা। এ ১ লাখ ৮ হাজার এবং লাভ যোগ হয়ে এ পরিমাণ হতে পারে মোট ১ লাখ ৫০ হাজার, বাকি যা থাকবে তা আপনাকে দিবে আলামিন ব্যাংক। এ টাকা ভাড়ার ওপর ভিত্তি করে দেয়া হবে, এটা সুদ নয়। এটা লাভ। সুতরাং যাই কিছু সুদভিত্তিক তা হারাম বরং যা লাভ লোকসানের ভিত্তিতে হয় তা হালাল, বৈধ।

প্রশ্ন ঃ ২৪২। ধরুন, আপনার নিকট সুদ থেকে পাওয়া অর্থ আছে। কেউ কেউ বলেন, আপনি এ অর্থ দিয়ে টয়লেট, বাথরুম তৈরি করতে পারেন, এটা কি ঠিক?

উত্তর : আপনার প্রশ্ন হলো যে, আপনার নিকট সুদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ আছে, কেউ কেউ বলেন যে, এ অর্থ দিয়ে টয়লেট বাথরুম বানানো যাবে, আসলেই এটা করা যাবে কি-না?

প্রথমত, আপনি একজন মুসলিম, আপনি একজন মুসলিম হিসেবে কোনো ভাবেই সুদের সাথে জড়িত হতে পারেন না। সুতরাং আপনি যদি সুদের সাথে জড়িত না হন, তাহলে তো কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করবেই না। মনে করুন, আপনি কোনো সুদের সাথে জড়িত কোনো Institute বা সুদ ভিত্তিক ব্যাংকে টাকা জমা রাখলেন না। তাহলে আপনি যদি সুদী প্রতিষ্ঠানে অর্থ না রাখেন তাহলে তো তারা আপনাকে

সুদ দিবেই না। তাহলে তো এ প্রশ্ন উঠবেই না। মনে করুন, আপনি আজই জানলেন যে, সুদ হারাম এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে আপনি এখন থেকে সুদ থেকে বিরত থাকবেন। যদি কোনো মানুষকে তওবা করতে হয় তাহলে তাকে তিনটি বিষয় করতে হয়। প্রথমত, তাকে বুঝতে হবে যে, এ বিষয়টি বা কাজটি করা হারাম, এটা নিষেধ, দ্বিতীয়ত, তাকে তৎক্ষণাৎ তা করা থেকে বিরত হতে হবে এবং তৃতীয়ত, তাকে ভবিষ্যতে সে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

তখন আপনি যদি মনে করেন যে, আপনার নিকট যদি কোনো সুদী অর্থ জমা থাকে তাহলে আপনাকে বলা হবে, আপনি এগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, কোনো সুদভিত্তিক ব্যাংকে আপনার Fixed deposite এবং Current একাউন্ট আছে এবং এ ব্যাংক থেকে প্রতি বছর নিয়মিত যে অর্থ পান তা দিয়ে আপনি টয়লেট বানাতে চান। এই টাকা আপনি বাথরুম, টয়লেট তৈরির মাধ্যমে খরচ করবেন, কেউ কেউ যদি বলে থাকে আপনি এগুলো তৈরিতে ব্যয় করতে পারেন কিন্তু তারা এ কথা কোথা হতে পেল তা আমি জানি না। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ধরুন, কোনো একজন ব্যক্তি মাদকের ব্যবসা করে। তা কোকেনের বা হেরোইনের ব্যবসা হতে পারে। সে বললো, আমি মাদকের ব্যবসাতে ১ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছি এবং আমার এ টাকা বিনিয়োগ থেকে প্রতিমাসে ১ লাখ টাকা লাভ পাই।

যেহেতু মাদক হারাম, সেহেতু এ ব্যবসায়েই ১ লাখ টাকার এক পয়সাও নিব না, আমি টাকা গরিব লোকদের জন্য ব্যয় করবো। আপনি কি মনে করেন এটা ইসলামে বৈধ? সাধারণভাবে এটা ইসলামে বৈধ না। কিন্তু যেহেতু মাদক ইসলামে হারাম তাই মাদকের ব্যাখ্যাও ইসলামে হারাম, আপনি বলতে পারেন ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমি মাদক ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত অর্থ ভালো কাজে ব্যবহার করবো। এটা বৈধ নয়। একইভাবে আপনার অর্থ যদি কোনো সুদী ব্যাংকে Fixed deposit করেন এবং তা হতে প্রাপ্ত সুদ দ্বারাই আপনি গ্রামে বাথরুম, টয়লেট তৈরি করে দেন, আপনি বললেন যে, আমি ১ লাখ টাকা দিয়ে প্রত্যেক গ্রামে টয়লেট তৈরি করে দেবো আপনি কি মনে করেন এটা বৈধ?

যে হয়তো ব্যাখ্যা করে মাদকের ব্যবসায় সে কোটি কোটি টাকা মূল্যের হাজার হাজার জীবন ধ্বংস করে লাখ লাখ টাকা অর্জন করলো। এক্ষেত্রে ১ লাখ টাকা অতি তুচ্ছ। সুতরাং আপনি ১ লাখ টাকা দিয়ে বাথরুম তৈরি করে সামান্য ক্ষতি পূরণ করতে পারেন না। সুদ হারাম। সুতরাং আপনি সুদী প্রতিষ্ঠানে আপনার অর্থ না রাখলেই পারেন। তখন সুদী অর্থ ব্যয় করার প্রশ্নই ওঠে না। আপনাকে আজই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, সুদ হারাম এবং আপনার যেকোনো ধরনের আয় হবে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করবেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই তা কবুল করবেন।

প্রশ্ন ঃ ২৪৩। জাকির ভাই, আপনি কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, সুদ নেয়া হারাম। সুদ দেয়াও কি হারাম?

উত্তর : আপনি একমত যে, সুদ গ্রহণ হারাম। আপনার প্রশ্ন হলো সুদ দেয়াও কি হারাম? সুদ ও জুয়া সম্পর্কে সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও শুভ-অশুভ নির্ধারণের তীর অপবিত্র, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে বিরত থাক যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

কুরআন মাদক নিষিদ্ধ করেছে ঠিক আছে, তাই আমি যদি বলি, মাদক সেবন তো হারাম, তাহলে মাদক বিক্রি কি বৈধ হবে? যেহেতু মাদক কুরআন নিষিদ্ধ করেছে, সেহেতু মাদক বিষয়ক সব কারবার হারাম। এ বিষয়ে হাদীসে বিস্তারিত এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়। এ হাদীসে হযরত আনাস (রা) বলেন, ১০ প্রকার মানুষকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন। এ দশ প্রকার মানুষ অভিশপ্ত। তাদের মধ্যে সুদের সাথে লেন-দেনকারীর উল্লেখও রয়েছে।

সুতরাং সুদ হারাম। একইভাবে আমিও একমত যে, কুরআন বিভিন্ন স্থানে সুদ গ্রহণ করা, সুদ দেয়া, এসব করতে নিষেধ করেছে। সুদ গ্রহণও নিষেধ। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন আমি আগেই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করেছি, যেমন সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে এখানে বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ـ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ـ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ـ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ـ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ـ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ـ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

অর্থ : 'কিন্তু যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান তার স্পর্শ দিয়ে পাগল ও সুস্থ জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে ব্যবসা তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির নিকট তার

খোদার পক্ষ থেকে এ উপদেশ পৌঁছবে এবং ভবিষ্যতে সুদ হতে বিরত থাকবে সে পূর্বে যা কিছু খেয়েছে তা তো খেয়েছেই, সে ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। আর যারা এ নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে, তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

সুদ যদিও ব্যবসার মতো, আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন কিন্তু সুদকে করেছেন হারাম। আল্লাহ এখানে সুদ দেয়া বা নেয়া উল্লেখ করেন নি। সুদের সর্বপ্রকার লেনদেন নিষিদ্ধ, আরো জানার জন্য আপনাকে হাদীস থেকে বলছি, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং সাক্ষী সবাই অভিশপ্ত। তারা সবাই এক।' তারপরের আরেকটি হাসীস মুসলিম শরীফ থেকে উল্লেখ করছি, জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, 'সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক ও সাথী তাদের সবাইকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন, সবাই এরা সমান।' আপনি নিশ্চয়ই আপনার উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২৪৪। আমার মতে, Current Account সুদের সাথে জড়িত না। সুতরাং এক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাখ্যা কী?

উত্তর : আপনি প্রশ্ন করেছেন, মডার্ন ব্যাংকের Current Account এবং ইসলামি ব্যাংকে Current Account-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা?

হ্যাঁ, Current Account-এ আপনি অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন না এবং এ Account আপনাকে কোনো লাভ দেয় না। আপনি কেবল আপনার অর্থের নিরাপত্তার জন্য Current Account ব্যবহার করেন। হ্যাঁ, মডার্ন ব্যাংক যেহেতু Account-এ সুদ লেনদেন করে না তাই মডার্ন ব্যাংকের Current একাউন্ট ও অর্থ রাখা সরাসরি নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু আমি যৌক্তিক কিছু কারণ বলবো, যে কারণে মডার্ন ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টের চেয়ে ইসলামি ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্ট অধিক লাভজনক।

প্রথমত, যদিও ইসলামি ব্যাংকের এবং মডার্ন ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্ট কোনো লাভ দেয় না এবং এগুলো সুদের সাথে জড়িত নয় বা সুদ লেনদেন করে না তবুও মডার্ন ব্যাংকের Current Account-এ রাখা আপনার অর্থ কিছু কিছু প্রকল্পে ব্যবহৃত হতে পারে যেগুলো আসলেই সমাজের জন্য ক্ষতিকর। যেমন– এ অর্থ দিয়ে জুয়ার ব্যবসা হতে পারে কিংবা এমন একটি কারখানা করলো যা মাদকদ্রব্য তৈরি করে, সুতরাং স্বল্প মেয়াদে আপনি অর্থ জমা রেখে সমাজকে আরো পিছিয়ে দেয়ার কাজে সাহায্য করছেন। কিন্তু আপনি যদি আপনার অর্থ ইসলামি ব্যাংকের Current একাউন্টে রাখেন তাহলে ইসলামি ব্যাংক এমন একটি প্রকল্প গ্রহণ করবে না যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। ইসলামি ব্যাংকের সব প্রকল্প বিনিয়োগ শরিয়াহ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। সুতরাং সব মুসলমান এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে

কিন্তু অমুসলিমদের জন্য এটি ক্ষতিকর কিছু করে না। ইসলামি ব্যাংক বলে, আমি হলাম সমাজের জন্য ভ্রাতৃসুলভ। I am only for society.

তাহলে আপনি আরো বলতে পারেন ইসলামি ব্যাংক এবং মডার্ন ব্যাংকে অর্থ রাখার পার্থক্য কী?

ধরুন, আপনার অর্থ আপনি মডার্ন ব্যাংকে রাখলেন এবং ব্যাংক কোনো কারণে অকৃতকার্য হলো, তাহলে মডার্ন ব্যাংকের আইন অনুযায়ী ব্যাংকে Creditor-রা আগে অর্থ নিয়ে নিবে পরে Depositor-রা পাবে এবং সময়সাপেক্ষে Creditor -দেরকে অর্থ দিয়ে দেয়া হবে এবং অর্থ শেষ হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে আপনি অর্থ ফেরত পাবেন না। এভাবে আপনি আপনার অর্থ মডার্ন ব্যাংকে রাখলেন এবং মডার্ন ব্যাংক কোনো সমস্যায় পড়লে আপনার অর্থ ফেরত না পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আর আপনি যদি ইসলামি ব্যাংকে অর্থ রাখেন এবং ব্যাংক সমস্যায় পড়েন ইসলামি ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী আপনার তথা Depositor আগে অর্থ ফেরত পাবে। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। এখন বুঝতে পারছেন অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় ইসলামি ব্যাংকের Current Account-এ অর্থ রাখা মডার্ন ব্যাংকের Current Account-এ অর্থ জমা রাখার চেয়ে অধিক নিরাপদ।

প্রশ্ন ঃ ২৪৫। আমরা কোন্ ধরনের ব্যাংকে লেনদেন করবো? এবং চাকরি করবো?

উত্তর : আপনি কি একজন মুসলমান? মডার্ন ব্যাংকের কথা বলছেন না ইসলামি ব্যাংকের? আচ্ছা ধরলাম, আপনি ইসলামি ব্যাংকের কথা বলছেন বা আধুনিক ব্যাংকও হতে পারে। ধরলাম, আপনি আধুনিক ব্যাংকের কথা বলেছেন। আমি আগেই বলেছি যাই কিছু হোক না কেন, যা সুদের সাথে জড়িত তা নিষিদ্ধ। আপনি সুদ দেন, সুদ গ্রহণ করেন অথবা সুদের লেখক হন বা সাক্ষী হন না কেন, আমি সহীহ্ মুসলিম শরীফ থেকে উল্লেখ করতে পারি।

খণ্ড ৩, অধ্যায় ৬২৮, হাদিস নং ৩৮৮১। জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, "সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং সুদের সাক্ষী সবাই সমান।"

সুতরাং ব্যাংকে রেকর্ড রাখা হলো সাক্ষী হওয়া। তাহলে সহীহ্ মুসলিম থেকে জানা গেল আধুনিক ব্যাংকে লেনদেন করা, চাকরি করা হারাম। এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, 'আমি বর্তমানে আধুনিক ব্যাংকে চাকরি করছি। আমি এখন কি করবো? আমি কি এ ব্যাংক ত্যাগ করবো?' হ্যাঁ, যদি আপনার ব্যাংক ত্যাগ করার সুযোগ থাকে তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্যাগ করুন। আপনার কি করা উচিত? আপনার এখন অন্য কোনো বিকল্প খোঁজ করার চেষ্টা করতে হবে। আপনি এখন যে কাজ করছেন তা ত্যাগ করে অন্য কোনো পেশা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু

দূর্ভাগ্যজনক যে, এখন এমন অনেক লোক আছে যারা বলবে যে, আমি তো মডার্ন ব্যাংক ত্যাগ করতে চাই কিন্তু আমার তো সে সুযোগ নেই। কারণ, মডার্ন ব্যাংক থেকে ৪০ হাজার টাকা পাই। কিন্তু তারা অন্য কোথাও চাকরি করলে সেখান থেকে ৩০ হাজার টাকা পেতে পারে। তারা অন্য পেশা গ্রহণ করতে পারে।

আমি অন্য কোথাও চাকরি করলে তা মডার্ন ব্যাংকের মতো সমতুল্য বেতনের চাকরি পাবো না, অর্থাৎ বলা হচ্ছে, তাদের অন্য কোনো পছন্দ বা সুযোগ নেই বা বিকল্প নেই। অবশ্যই তাদের সুযোগ আছে বরং তারা ভয় পচ্ছে। তারা এ বেতন অন্য কোথাও থেকে পেতে পারে। যদি তারা ৪০ হাজার টাকা নাও পায় তাহলে তারা ৩০ হাজার টাকার চাকরি করবে। আসলে আরো অল্প সময়ে বেশি অর্থ চায় এবং তারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের সাথে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে। সুতরাং আপনি যদি মডার্ন ব্যাংকে চাকরি করে থাকেন, তাহলে আমি আপনাকে পরামর্শ দিব যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ব্যাংক ত্যাগ করেন এবং অন্য চাকরি করেন। যদিও তা কম বেতনের হোক। ইনশাআল্লাহ্ হয়তো আপনি পরবর্তীতে বেশি বেতন পাবেন। আর আপনি যদি বেশি বেতন নাও পান তাহলে আল্লাহ্ আপনাকে পরকালে এর পুরস্কার দিবেন। যদি এ কোম্পানির সাহায্য প্রাপ্ত না হন, সাহায্য না পান তাহলে আপনি প্রতিদান হিসেবে কমপক্ষে ৭০০ গুণ বেশি পেয়ে যাবেন। যদি আপনি আল্লাহ্কে ভয় করেন। কিন্তু আপনি যদি বলেন, আমি এখন মডার্ন ব্যাংকে চাকরি করছি এ উদ্দেশ্যে যে, আমি এখন আধুনিক অর্থ ব্যবস্থা বুঝার চেষ্টা করছি যাতে আগামী চার বছর পর যে ইসলামি ব্যাংক শুরু করতে যাচ্ছি তা যেন আরো ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারি। আধুনিক ব্যাংকের চেয়েও ভালোভাবে।

আশা করা যায়, আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করবেন। কারণ, আপনার আসল উদ্দেশ্য হলো, ইসলামি ব্যাংকিং সিস্টেম আরো ভালোভাবে পরিচালনার জন্য এবং বাস্তবায়নের জন্য মডার্ন ব্যাংকিং শেখা। একইভাবে আপনি যদি কোনো কলসপের কথা, যদি আপনি কলসপে কাজ করেন তা অবশ্যই হারাম হবে। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, আমি এখানে ২-৩ মাসের জন্য চাকরি করবো এ উদ্দেশ্যে যে, এটাকে বন্ধ করে দিব এবং এটাকে আমি মেডিকেল সেন্টারে পরিবর্তিত করে ফেলবো। তাহলে আমি মনে করি, আল্লাহ্ আপনাকে সহযোগিতা করবেন। সুতরাং আপনি মডার্ন ব্যাংকে চাকরি করতে পারেন যেন এ মডার্ন ব্যাংককে ইসলামি ব্যাংকে পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি শুধু বেতনের জন্য বেশি বেতনের উদ্দেশ্যে মডার্ন ব্যাংকে চাকরি করেন তাহলে আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করবেন না।

প্রশ্ন ঃ ২৪৬। ইসলামি ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ কি মডার্ন ব্যাংকের সুদ আদায়ের মত নয়? ইসলামি ব্যাংক গ্রাহকদের আকর্ষণ করার জন্য এ বিকল্প শব্দ ব্যবহার করে থাকে?

উত্তর : আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, ইসলামি ব্যাংক সার্ভিস চার্জ হিসেবে যে ফী নেয় তা মর্ডান ব্যাংকের সুদ চার্জ করার মতো কিনা। শুধু মুসলিমদেরকে আকর্ষণ করার জন্য শব্দ পরিবর্তনের কৌশল নয়? এটা কি মুসলমানদের সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করা নয়? আমি আমার বক্তব্যের তৃতীয় অধ্যায় বিশ্লেষণ করেছিলাম যে, এটি একটি বিতর্ক-ই বটে। আধুনিক ব্যাংক যে সুদ গ্রহণ করে থাকে তা আমি ১১% বলে উল্লেখ করে থাকলে আমি দুঃখিত। এটা ১৪% থেকে ১৫% এর মতো। এটা প্রকল্পের ওপর নির্ভর করে। এটা ২০% পর্যন্তও হতে পারে। আপনি যদি ইসলামি ব্যাংকের বায়তুন নসর থেকে কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ নিতে চান তাহলে ইসলামি ব্যাংক আপনার নিকট থেকে সার্ভিস চার্জ আদায় করবে, তা হতে পারে ১০% থেকে ১৫% এর মধ্যে। এটা ৮% থেকে ১০%-এর মধ্যে ওঠা-নামা করে। কিন্তু ২ বছর পর এটা ১৪% হতে পারে।

এক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন যে, মডার্ন ব্যাংকের ১৬% সুদ আদায় করা আর ইসলামি ব্যাংকের ১৪% সার্ভিস চার্জ আদায় করা একই কথা। আপনি বলতে পারেন ২% পার্থক্য সামান্য। এক্ষেত্রে কেবল শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। আমাদের প্রথমে বিশ্লেষণ করতে হবে যে, ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন ইসলামি ব্যাংক যে সার্ভিস চার্জ নেয় তা আসলে লাভ-লোকসানের ওপর ভিত্তি করে। এটা সুদভিত্তিক নয়। কিন্তু আধুনিক ব্যাংকগুলো নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করে এটা ১৫% থেকে ১৬% হতে পারে। অথচ ইসলামি ব্যাংক যে সার্ভিস চার্জ নেয় তা ১ বছরের লাভ লোকসানের ওপর ভিত্তি করে। তা কোনো নির্দিষ্ট Company বা Institute-এর পার্থক্য হতে পারে।

সুতরাং যত বেশি মানুষ ইসলামি ব্যাংকিং-এর সাথে জড়িত হবে সার্ভিস চার্জ ততই হ্রাস পাবে। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে এটা ৮% হতে ৯%-এর মধ্যে রাখতে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে বুঝতে হবে যে, যদি আপনি বিশ্লেষণ করে দেখেন, কোনো ইসলামি ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিতে Fixed deposit করেন, ধরুন বরকত Investment-এ। বর্তমানে ইন্ডিয়াতে কোনো Investment company নেই যা পুরোপুরি ইসলামি Investment rule মেনে চলে। কেননা IRB এগুলোকে ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম চালাতে অনুমতি দেয় না। এগুলো কোনো চেক ইস্যু করতে পারে না। IRB তাদের এ অনুমতি দেয় না। ইসলামি ব্যাংক যে ধরনের বিনিয়োগ প্রাধান্য দেয় তা হবে এমন যে, উদাহরণস্বরূপ, বরকত ইনভেস্টমেন্ট। যদি আপনি আপনার অর্থ মুশারাকা অথবা মুদারাবা পদ্ধতিতে স্থায়ী আমানত করেন তাহলে আপনি যে মুনাফা পাবেন বা তারা আপনাকে যে লাভ দিবে

তা ১৬% হতে ২৬%-এর মধ্যে হতে পারে। তারা যে যে খরচ দেখায় তা একটির ক্ষেত্রে ১৬%, আবার আরো বেশি ১৭%, আবার অন্যের আরো বেশি ১৮%।

উদাহরণস্বরূপ, বরকত ইনভেস্টমেন্ট ১৯% লাভ বা মুনাফা দেয় এবং ব্যাংক আপনার নিকট থেকে যে সার্ভিস চার্জ আদায় করে যদি আপনি বায়তুন নসর যা কিনা বরকত ইনভেস্টের সাথে সম্পর্কিত, ঋণ নেন তাহলে তারা আপনার নিকট থেকে ১৪% সার্ভিস চার্জ আদায় করবে। আপনি যদি চালাক হন তাহলে ব্যাংকে বায়তুন নসরে ১ লাখ টাকা জমা বা বিনিয়োগ করুন এবং ৯০ হাজার অথবা ১ লাখ টাকা নিন। যেহেতু আপনি একই সময়ে ১ লাখ টাকা ফেরত পাচ্ছেন, আপনি বায়তুন নসর থেকে আপনার ডিপোজিটের ওপর ভিত্তি করে ১ লাখ টাকা লোন নিতেও পারেন এবং এর জন্য আপনাকে শুধু ১০% সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। সুতরাং সরাসরি আপনি যদি ১ লাখ টাকা ডিপোজিট করছেন তখনই ৯০ হাজার টাকা পেতে পারেন। একই দিন ১ লক্ষ টাকার ভিত্তি করে বায়তুন নসর থেকে পাবেন এবং বছর শেষে আপনাকে ১৪% হারে ১৪ হাজার টাকা দিতে হবে।

কিন্তু আপনি যদি বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, আপনি বরকত ইনভেস্টমেন্ট থেকে যে ১৯% মুনাফা পেলেন এবং যে ১৪% সার্ভিস চার্জ দিলেন তা আদৌ পরস্পর সম্পর্কিত নয়। আধুনিক ব্যাংকে এটা পরস্পর সম্পর্কিত। একটা ব্যাংক যে Fixed deposit করে তা সুদের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এটা ১০% থেকে ১১% হতে পারে। আপনি যদি এ ব্যাংক থেকে কোন ঋণ নেন তাহলে তারা আপনার থেকে ১৬% আদায় করবে। তাদের এ শতকরা হার সর্বদাই ৫% বেশি হয় যা তারা আমানতকারীকে দেয় তার থেকে। ইসলামি ব্যাংক কখনোই এমন করে না। সুতরাং সার্ভিস চার্জ এবং সুদের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপনি যদি চান সার্ভিস চার্জ কমাতে তাহলে আপনার উচিত হবে অধিক সংখ্যক মুসলিমকে ইসলামি ব্যাংকের সাথে জড়িত হতে রাজি করা, এ ব্যাংকের ওপর আস্থা সৃষ্টি করে অধিক বিনিয়োগ করতে রাজি করা। ইনশাআল্লাহ সার্ভিস চার্জ আরো কমে যাবে।

প্রশ্ন ঃ ২৪৭। ডা. বাকের 'বেদ'-এর অর্থনৈতিক সিস্টেম অধ্যয়ন করে বলেছেন, 'বেদ'-এ লেখা অর্থনৈতিক সিস্টেম সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তিনি আরো দাবি করেন, যদি বেদ-এ বর্ণিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা India-তে বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে সামাজিক বৈষম্য দূর হবে আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে। সুতরাং বেদ-এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি কুরআনে বর্ণিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমতুল্য হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে 'বেদ'-এর লেখক একজন আল্লাহর নবী?

উত্তর: অধ্যাপকের নাম, ড. বাকার বা বাকরে। তিনি বলেছেন যে, 'বেদ' যদি সুদমুক্ত অর্থনীতি বিষয়ে বলে থাকে তাহলে তা কি কুরআন বর্ণিত অর্থনৈতিক

বিধানের মতো এক? এবং এ 'বেদ'-এর বর্ণনা যদি কুরআনের বর্ণনার সাথে মিলে যায় তাহলে কি 'বেদ'-এর গ্রন্থকার একজন আল্লাহর নবী?

প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে আমিও একমত। কুরআন যেমন সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে বেদও তেমনি সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণনা করেছে। কিন্তু এর বাস্তবায়ন পার্থক্য হতে পারে? এটা পার্থক্য হতে পারে যেমন আপনারা সুদমুক্ত অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে পার্থক্য দেখেছেন। এর বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে পার্থক্য হতে পারে। সুদমুক্ত পদ্ধতি যেমন বাস্তবায়নে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন হাদীস থেকে মত পার্থক্য দেখান একইভাবে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে মতপার্থক্য করেন। বেদ যদি সুদমুক্ত ব্যবস্থার কথা বলে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি সুদমুক্ত হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ এটা স্থায়ী হবে।

এবার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে বলছি। এই প্রশ্ন এ অর্থ বুঝায় যে, 'বেদ' যদি ওহী হয়ে থাকে তাহলে এর গ্রন্থকার কি আল্লাহর নবী হবেন না? একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, কুরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে আরো অনেক আসমানী কিতাব এসেছে। এর মধ্যে চারটির নাম হলো : তাওরাত, যাবুর, ইনজিল এবং ফুরকান। ফুরকান হলো কুরআন।

তাওরাত হলো হযরত মুসা (আ)-এর ওপর নাযিল হওয়া আল্লাহর কিতাব।

যাবুর হলো হযরত দাউদ (আ)-এর ওপর নাজিল হওয়া আল্লাহর কিতাব।

ইনজিল হলো হযরত ইসা (আ)-এর ওপর নাজিল হওয়া আল্লাহর কিতাব।

আর ফুরকান হলো কুরআন, কুরআন হলো শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর নাযিল হওয়া আল্লাহর দেয়া সর্বশেষ চূড়ান্ত কিতাব। এ কিতাব নাযিল হওয়ার পূর্বে আরো অসংখ্য কিতাব নাযিল হয়েছে যেগুলোর নাম উল্লেখ নেই। সুতরাং আপনি কুরআন থেকে সব নবীর নাম জানতে পারবেন না। কুরআন মোট ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করেছে। তার মধ্যে কতকগুলো হলো আদম, ইব্রাহীম, সুলাইমান, দাউদ, ইয়াকুব, মুসা, ঈসা, মুহাম্মদ ﷺ ইত্যাদি। হাদীসে মোট ৯৯ জন নবীর নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু হাদীস থেকে জানা যায়, মোট ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবীর সংখ্যা, যেমন কুরআন বলে, প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক ও সতর্ককারী পাঠানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর বাণী বিভিন্নভাবে নাযিল হয়েছে।

এসব বাণী আল্লাহর নবীর নয়, আল্লাহর নাজিলকৃত। কিন্তু আপনি আমাকে কুরআন ও বাইবেলের কিছু অংশের মিল সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন। যদি বাইবেলের কিছু অংশ কুরআনের সাথে মিলে যায় তাহলে কি আপনি বলবেন, বাইবেল আল্লাহর বাণী? 'বেদ' এর কিছু কিছু অংশও যদি মিলে যায় তাহলে কি আপনি বলবেন, বেদ আল্লাহর বাণী। আপনি তা বলতে পারেন না। যদিও কোনো কোনো অংশ মিলে যায় তাহলে, এটা হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে, আবার এটা হয়তো আল্লাহর পক্ষ

থেকে নাও আসতে পারে। যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেও থাকে, তবুও আপনি এর সাথে একমত হতে পারেন না। কারণ এটা চূড়ান্ত, শেষ নাযিলকৃত ওহী বা কিতাব নয়। শেষ কিতাব হলো কুরআন। এ সম্পর্কে কুরআনের সূরা বাকারার ১০৬ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে–

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْمِثْلِهَا ـ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থ : 'আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর শক্তিমান?'

যাহোক কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিল থাকতে পারে, কোনো কোনো বাণী কুরআনের আয়াতের মতো হতে পারে। তাই বলে আপনি বলতে পারেন না যে, এগুলো কুরআনের বাণী।

উদাহরণস্বরূপ, বাইবেলের অনেক বাণী আছে যা কুরআনেরও বাণী। আবার বাইবেলের কোনো কোনো বাণী ইনজিলেও আছে। তাই বলে আপনি বাইবেলের সব শব্দকে আল্লাহর বাণী বলতে পারেন না। একইভাবে আপনি বেদকে আল্লাহর বাণী বলতে পারেন না। হয়তো বা এটা আল্লাহর বাণী হতে পারে। কিন্তু আমি নিশ্চিত না। তবে নিশ্চিতরূপে বলা যায় ইনজিল-এর কিছু অংশ আল্লাহর বাণী।

প্রশ্ন ঃ ২৪৮। ডা. জাকির, আপনি কুরআন থেকে উল্লেখ করেছেন যে, রিবা অর্থ হলো সুদ। সুতরাং সুদ বা Interest হলো Usary-এর একটি রূপ। এখন আমার প্রশ্ন হলো আমি ব্যবসা করার জন্য প্রকল্প পাস করতে চাই। কিন্তু বর্তমান ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতিতে এমন একটি প্রকল্প পাস করানোর জন্য সুদ দেয়া বাধ্যতামূলকই বলা যায়। এখন এ ব্যবস্থা করে আমি লাভ করলাম, তখন আমার এ উপস্থিত অর্থ কি সুদ হবে?

উত্তর : আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তা সংক্ষেপে সুদ বৈধ কিনা। যেহেতু আমরা সুদভিত্তিক তথা আমরা যে পদ্ধতির মধ্যে জীবনযাপন করি তা সুদের সাথে জড়িত। তাহলে আপনি যদি কোনো প্রকল্প হাতে নেন এবং এ থেকে যে সুদী অর্থ পাবেন তা ঘুষ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কি না? প্রশ্ন হলো, আপনি ইসলামি ব্যাংক থেকে ব্যবসার জন্য অর্থ ঋণ নিলেন এবং আপনি একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে চান। সমাজ ঘুষ চক্রের কারণে এ প্রকল্পের জন্য ইসলামি ব্যাংক থেকে নেয়া অর্থ হতে সুদ দিতে হলো, এখন এ প্রকল্প থেকে যে লাভ উপার্জন হবে তা কি সুদ হয়ে যাবে?

সংক্ষেপে আপনার প্রশ্ন হলো ঘুষ বৈধ কিনা? আপনিই সংক্ষেপে বলুন, ঘুষ বৈধ না অবৈধ? আপনি ব্যাংক থেকে যে হালাল অর্থ নিলেন তা দিয়ে কি ঘুষ দেয়া যাবে? আপনি কি দায়ী হবেন না? মনে করুন, আমি ৫০ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করলাম এবং ৫ হাজার টাকা ঘুষ দিলাম। তাহলে আপনি বলতে পারবেন যে ৫০ হাজার টাকা ৫ হাজার টাকা সুদের ফিস। সুতরাং নিট মুনাফা হবে ৪৫ হাজার যদি ৫ হাজার টাকা ঘুষের জন্য ব্যয় হয়।

ভাই, আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে যে, ঘুষ ইসলামে নিষিদ্ধ। আপনি কি হারাম অর্থ প্রত্যাশা করেন না হালাল অর্থ? জবাবদিহিতার ব্যাপার তো পরের ব্যাপার। ঘুষ দেয়া আপনার জন্য জায়েয নয়। এ সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্টভাবে এসেছে সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে। এ আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : 'তোমরা পরস্পর পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। অন্যায়ভাবে এক ধরনের মানুষের সম্পদ খাওয়ার জন্য শাসকদের নিকট সমর্পণ করো না, অথচ তোমরা জানো।'

কুরআন ঘুষকে হারাম রেখেছে এবং ঘুষ দেয়াও হারাম। আমি কি ঘুষ নিতে পারবো? আমি এ সম্পর্কে অনেক উল্লেখ করতে পারি। আহমদ থেকে একটি হাদীস স্পষ্টভাবে এসেছে, যে ঘুষ গ্রহণ করে বা যে ঘুষ দেয় এবং যে ঘুষের মধ্যস্থতাকারী তাদের সবাইকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন। সুতরাং ঘুষ (দেয়া-নেয়া) লেনদেন হারাম। এরপর প্রশ্ন ওঠার সুযোগ নেই যে এটা সঠিক বা সঠিক নয়। ইসলামি ব্যাংকে আপনি ঘুষ দিতে পারবেন না।

আপনি যদি বলেন আমি ঘুষ দিব তাহলে আপনাকে বলবে আপনি টাকা নিবেন না।

এটা কি ইন্ডিয়াতে অনুমোদিত? আমি জানি না। ইসলামি শরিআতের....আপনি যদি বলেন আমি একটি শিল্প কারখানা করার জন্য টাকা চাই এবং এজন্য আপনাকে টাকা দিব তাহলে এটা হারাম হবে, আমি এটাকে হারাম বলবো। আপনি এ অর্থ ঘুষের কাজে ব্যবহার করতে পারেন না। ইসলামি আইনে এটা বৈধ নয় এবং এটা জানার পর যদি আপনি এটা করেন তাহলে তা হবে আল্লাহর সাথে প্রতারণা। দায়িত্বশীলতা থেকে তা জবাবদিহিতা যাই বলুন না কেন ঘুষ হারাম। কেননা, আল-কোরআনে ইনজিল শব্দটি উল্লেখ আছে। এটা আল্লাহর বাণী, কিন্তু 'বেদ' সম্পর্কে কুরআনে কিছুই বলা হয় নি। সুতরাং এটা হতেও পারে, নাও হতে পারে। এটা আপনার ভাবনার বিষয় নয়। আপনার দায়িত্ব হলো আপনাকে সর্বশেষ কিতাব কুরআনের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

প্রশ্ন ঃ ২৪৯। ইসলামে কি ইন্স্যুরেন্স বৈধ? বিশেষ করে লাইফ ইন্স্যুরেন্স? যদি এটা ইসলামে বৈধ না হয় তাহলে অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা আছে কি? অথবা অন্য কোনো ইসলামিক সমাধান আছে?

উত্তর : বীমার ধারণাটি অনেক পুরাতন। কোনো সম্প্রদায়ের লোকজন অর্থ জমা করতে পারে এবং এটা প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনার কোনো দূর্ঘটনায় বা জরুরি প্রয়োজনে আপনাকে সাহায্য করতে পারে। এ জমা রাখা অর্থ ব্যবহার একটি ভালো কনসেপ্ট। কিন্তু যদি জীবনবীমার কথায় আসি তাহলে এটাকে কি বৈধ বলা যায়? মিসরের মাওলানা মোঃ আবু জরার দেয়া ফতোয়া অনুযায়ী জীবনবীমা, যাতে আপনি মাসিক কিস্তি হিসেবে টাকা জমা দেন এবং আপনার কোনো দূর্ঘটনা ঘটলে আপনি পুরো অর্থ বা দ্বিগুণ পরিমাণ ফেরত পান কিংবা এ সেবার শেষে আপনি পুরো অর্থ লাভসহ ফেরত পান তাহলে তা রিবা ছাড়া কিছুই নয়।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়, যে বিনিয়োগই হোক না কেন, তা জীবনবীমা হোক, গাড়ি বীমা হোক আর মুনাফা বীমা হোক তা যদি সুদভিত্তিক হয় তাহলে তা হারাম। যেকোনো সুদী বিনিয়োগই হারাম। মাওলানা সাহেবের নিয়ম অনুযায়ী বর্তমানের জীবনবীমা করপোরেশনগুলোর অধিকাংশ বিনিয়োগই Fixed Money Market-এর। সুতরাং যে অর্থই হোক। যেমন আপনার একটি ১০ বছর মেয়াদি পলিসি আছে যেখানে প্রতি বছর ১ লক্ষ টাকা জমা দিতে হয় এবং যদি আপনি এর মধ্যে মারা যান কিংবা দূর্ঘটনার শিকার হন আপনি যদিও মাত্র দুই কিস্তির অর্থ পরিশোধ করেন (১ লক্ষ টাকা) তাহলেও আপনি দ্বিগুণ তথা দুই লক্ষ টাকা ফেরত পাবেন। আর আপনি যদি স্বাভাবিকভাবে মারা যান তাহলে আপনি পুরো অর্থ ফেরত পাবেন। আপনার পলিসি ম্যাচিউরিটির আগেই যদি মারা যান। আপনি পুরো ১০ লক্ষই লাভসহ ফেরত পাবেন। কিন্তু আপনাকে এ লাভ কোথা হতে দেয়া হবে? জীবনবীমা করপোরেশনের অধিকাংশ বিনিয়োগই ফিক্সড মানি মার্কেট হার থাকে, যা কিনা সুদভিত্তিক। আপনি তো জানেনই যে, সুদ হারাম। আপনি যদি জানেন, কোনো প্রতিষ্ঠান যারা বীমা দিয়ে থাকে এবং তারা Fixed Money Market-এর সাথে জড়িত নয় এবং শেয়ার, ইকুইটির সাথে জড়িত তাহলে এ বীমা বৈধ হবে।

সম্প্রতি এই কিছুদিন আগে আমি ইংল্যান্ডের লন্ডনে পরিচালিত 'গোল্ডেন বন্ড' নামক একটি ফার্ম থেকে দেখে এলাম, তাদের সর্বনিম্ন বিনিয়োগের পরিমাণ আড়াই হাজার পাউন্ড। অর্থাৎ আপনাকে কমপক্ষে ২.৫ হাজার পাউন্ড বিনিয়োগ করতে হবে যা কিনা ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার সমান। তারা (Golden Bond) আপনার নিকট থেকে এ পরিমাণ অর্থ নিবে এবং তা শেয়ার ও ইকুয়িটি-তে বিনিয়োগ করে থাকে, যা ইসলামে বৈধ।

শেয়ার এবং ইকুয়িটি Fixed Money Market-এর সাথে জড়িত নয়। তারা আপনাকে সম্ভাব্য একটি পরিমাণ মুনাফা দিবে, কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নয় বলা যায় তা হতে পারে ১% বা $\frac{১}{২}$% এটা নির্দিষ্ট অংক নয় বরং কাছাকাছি সম্ভাব্য একটা পরিমাণ এবং তারা আপনাকে আরো কিছু সুবিধা দিবে যদি আপনি মারা যান, এক্ষেত্রে অতিরিক্ত বোনাস পেতে পারেন। ফলে এ ধরনের বিনিয়োগ যা সুদের কারবারের সাথে সম্পর্কিত নয় তা অনুমোদিত। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ জীবনবীমা কোম্পানিগুলো Fixed Money Market-এর সাথে জড়িত তা ইসলামে বৈধ নয়। এগুলো হারাম। যেসব বীমা সুদের বা রিবা নিয়ে কারবার করে তা সম্পূর্ণই হারাম।

এখন আপনার প্রশ্ন ছিল অন্য কোনো বিকল্প আছে কিনা? কিংবা জীবনবীমা ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক হতে পারে কিনা? আপনি যদি ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক দেখতে বা পেতে পারেন তাহলে কেন ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক জীবনবীমা হতে পারবে না? কেন আপনি শরিয়াহভিত্তিক বীমা পাবেন না?

পাকিস্তানের করাচীর দারুল উলুম এর মুফতি মোহাম্মদ শফী (র) এ ব্যাপারে একটি ভালো সমাধান দিয়েছেন। তিনি বলেন, আপনি অবশ্যই শরিয়াহভিত্তিক জীবন বীমা পেতে পারেন। তার মতে, আপনি কীভাবে মাসিক প্রিমিয়াম, মাসিক কিস্তি জীবনবীমা করাবেন, আপনি কীভাবে ইসলামি জীবনবীমা করাবেন। আপনি যে মাসিক কিস্তি দিবেন তা মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হবে। আপনি মাসিক কিস্তি হিসেবে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিবেন তা মুদারাবা সিস্টেমে বিনিয়োগ হবে। তখন আপনি যে অর্থ বিনিয়োগ করলেন তা থেকে লভ্যাংশ পাবেন, এ লাভের নির্দিষ্ট অংশ যেমন তা হতে পারে $\frac{১}{৪}$ বা $\frac{১}{৩}$ ভাগ আলাদা একটি বক্সে রেখে দিলেন। আপনার লাভের নির্দিষ্ট পরিমাণ আলাদা করে রাখলেন।

এখন মনে করুন এ ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক জীবনবীমার কোনো শেয়ার হোল্ডার, বিনিয়োগকারী কোনো সমস্যায় পড়লে যেমন তা হতে পারে কোনো দূর্ঘটনা, তাহলে আপনি তাকে চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য আপনার ঐ নির্দিষ্ট বক্স থেকে অর্থ দিতে পারেন এবং আপনার এ দেয়ার পরিমাণটা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে পারেন, এ দেয়ার পরিমাণটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে, আপনিও যেসব কারণে পেতেও পারেন, আপনার যদি কোনো রোগ হয় তাহলে আপনি নির্দিষ্ট পরিমাণ পাবেন, আবার নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্যের রোগ হলে দিবেন। এসব বিষয়গুলো শর্তের ওপর নির্ভর করবে। ইসলাম আপনার এ নিজস্ব বক্সের অর্থ ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। কারণ, আপনার এ বক্সের অর্থ আপনার লাভের একটা অংশ।

আধুনিক জীবনবীমা পদ্ধতিতে আপনাকে মাসিক কিস্তি হিসেবে অর্থ জমা দিতে হবে এবং আপনি যদি আপনার মাসিক কিস্তি পরিশোধ বন্ধ করে দেন তাহলে আপনার পূর্বের জমা দেয়া সব অর্থ ফেরত পাবেন না। তারা আপনাকে একটি পয়সাও ফেরত দিবে না।

আপনি যদি আপনার কিস্তি দেয়া বন্ধ করে দেন, তাহলে প্রিমিয়ামসহ পূর্বের সব অর্থই বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। আপনার অতীতের সর্ব অর্থই লাভসহ মার খাবে।

প্রশ্ন ঃ ২৫০। আমি মোঃ ফরিদউদ্দিন, ফিজিওরেথাপি নিয়ে পড়াশুনা করছি। ইসলাম আর খ্রিস্টান ধর্মে মুক্তি লাভের ন্যূনতম শর্তের মধ্যে কী সাদৃশ্য রয়েছে?

উত্তর : যদি পবিত্র কোরআন পড়েন সেখানে বলা আছে যে, একজন মানুষ কীভাবে বেহেশ্‌তে যেতে পারবে। (সূরা আল আসর, আয়াত নং ১০৩-এ) উল্লেখ আছে যে, 'কালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' তাহলে যদি কেউ বেহেশ্‌তে যেতে চান কমপক্ষে ৪টি শর্ত পূরণ করতে হবে। ১। ঈমান ২। সৎকর্ম ৩। মানুষকে সৎকর্মের উপদেশ দেয়া ৪। আর ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের উপদেশ দেয়া। এ ৪টি শর্তের যদি একটিও বাদ থাকে সাধারণভাবে কোনো লোক বেহেশ্‌তে যেতে পারবে না। যদি আল্লাহ্ ক্ষমা করেন সেটা আলাদা কথা। আর এগুলোই হচ্ছে ন্যূনতম শর্ত। আর আল্লাহ যে অপরাধকে ক্ষমা করবেন না সেটা আমি আগেও বলেছি (সূরা নিসা, আয়াত নং ৪৮); (সূরা নিসা, আয়াত নং ১১৬) সেটা হলো 'শিরক' আর খ্রিস্টান ধর্মে চার্চ যেটা বলে, প্রথমে চার্চ-এর কথা বলছি, তারপর বাইবেলের কথা বলবো।

চার্চ বলে যে, 'যীশুখ্রিস্ট আমাদের পাপের জন্যে মারা গেছেন। আমাদের অপরাধের জন্যে মারা গেছেন। যদি সেটা বিশ্বাস করেন আপনি মুক্তি লাভ করেছেন। যদি বিশ্বাস করেন যে, যীশুখ্রিস্ট আপনার অপরাধের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, তাহলে আপনি মুক্তি লাভ করেছেন। এ প্রমাণটা আপনি বাইবেলেও পাবেন যে, যীশুখ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হন নি। এটার ওপর আমার একটা ভিডিও ক্যাসেট আছে, যেখানে আমি প্রমাণ করেছি যে, যীশুখ্রিস্ট ক্রুসবিদ্ধ হন নি।

প্রমাণ করেছি পবিত্র কোরআন দিয়ে নয়, পবিত্র বাইবেল দিয়েই। কোরআন সেটা বলে আমরাও মানি। এমনকি বাইবেল যদি সঠিকভাবে পড়েন একথা বলে না যে যীশু ক্রুসবিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু চার্চ বলে, যদি আপনি এটা বিশ্বাস করেন যীশুখ্রিস্ট আপনার পাপের জন্যে মারা গেছেন, আপনি মুক্তি লাভ করবেন। কিন্তু যদি আপনি বাইবেল পড়েন তবে দেখবেন যে, যীশুখ্রিস্ট ঠিক উল্টোটি বলেছেন। যদি গ্রজবেল অভ্ মেথিও পড়েন অধ্যায় ১৯, অনুচ্ছেদ ১৬-১৮ বলেছে, একজন লোক

যীশুখ্রিস্টের কাছে এসে বললেন যে, 'হে ভালো প্রভু কোন কাজটি করলে আমি চিরস্থায়ী জীবন পেতে পারি?' যীশুখ্রিস্ট তখন বললেন, 'কেন, তুমি আমাকে ভালো বলছ? ভালো শুধু একজনই তিনি আমার পিতা যিনি স্বর্গে আছেন। আর যদি তুমি স্থায়ী জীবন পেতে চাও, ঈশ্বরের নির্দেশ মানো।'

তিনি বলেন নি যে, চিরস্থায়ী জীবন পেতে আমাকে ঈশ্বর মানতে হবে। তিনি বলেন নি যে, এটা বিশ্বাস করতে হবে যে আমি তোমাদের পাপের জন্যে ক্রুসবিদ্ধ হয়ে মারা গেছি। তিনি বলেছেন যে, চিরস্থায়ী জীবন পেতে হলে ঈশ্বরের যে নির্দেশ সেগুলো মেনে চলতে হবে। তার মানে আপনি যদি বেহেশ্‌তে যেতে চান, বাইবেল অনুযায়ী আপনাকে ঈশ্বরের সব নির্দেশ মেনে চলতে হবে। শূকরের মাংস খাবেন না, মদ খাওয়া যাবে না, জুয়া খেলা যাবে না, নামাজ আদায় করতে হবে। সিজদায় যেতে হবে। সবকিছু আপনাকে মানতে হবে। যদি বলেন, যীশুখ্রিস্টের নির্দেশ মানলেই খ্রিস্টান হওয়া যায় তাহলে আলহামদুল্লিাহ। যদিও আমরা মুসলিম আমরা খ্রিস্টানদের চেয়েও বেশি খ্রিষ্টান। আর যীশুখ্রিস্টও ছিলেন একজন মুসলমান। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২৫১। আমি ব্যাঙ্গালোর থেকে খাইরুন্নেসা, একজন গৃহিণী। যীশু মানুষকে ভালোবাসার কথা বলেছেন, আর মুহাম্মদ ﷺ তার অনুসারীদের ধর্মের জন্যে যুদ্ধের কথা বলেছেন। আর সে জন্যে আপনার কি মনে হয় না যে, ধর্ম দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে?

উত্তর : বোন, আপনি বলেছেন যে, যীশুখ্রিস্ট তার অনুসারীদের বলেছেন মানুষকে ভালোবাসতে আর মহানবী ﷺ বলেছেন, প্রয়োজন হলে তোমরা যুদ্ধ করবে ইত্যাদি আর দুটো ধর্মের মধ্যে পার্থক্য। বোন, যদি আপনি জানেন এটা আছে (গজপেল অভ্ মেথিও, অধ্যায় ৫) যে, এই আইনটা প্রাচীনকালের আইন যে, চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁত এটা ছিল মূসা (আ)-এর আইন। তিনি আইনটা এনেছিলেন যদি কেউ আপনার চোখ তুলে নেয় আপনি তার চোখ তুলে নিবেন। সুবিচারের কোনো সুযোগ তখন ছিল না। সে সময় কোনো আদালত ছিল না। আপনি আমার চোখ তুললে আপনারটাও আমি তুলব। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। সোজা কথা সব কিছুই সংক্ষিপ্ত। আদালতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু যদি কোনো বাচ্চা ছেলে খেলতে খেলতে আপনার চোখে আঘাত করে, যদি ভুল করে কেউ আঘাত করে, এখনকার দিনে তা চোখ তুলে নেবেন না। কিন্তু তখন মানুষ এটা মেনে চলত। যীশু এটার প্রতিকার করলেন। এটা আছে (গজপেল অভ্ মেথিও, অধ্যায় নং ৫-এ) যে, এটা প্রাচীনকালের নিয়ম চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যদি কেউ তোমার একগালে থাপ্পড় মারে, তাহলে তুমি অন্য গালটি বাড়িয়ে দাও। যদি তোমার কাছে

কেউ গরম কাপড় চায়, তুমি কম্বল দিয়ে দাও। যদি তার সাথে এক মাইল হাঁটতে বলে, তুমি দুই মাইল হাঁটো। মানুষ তখন সেই আইনটাই মেনে চলতো। তারা মূসার আইন মেনে চলতো। যীশুখ্রিস্ট এর প্রতিকার চাইলেন আর নতুন আইনের কথা বললেন। যে কেউ একগালে থাপ্পড় মারলে অন্য গাল বাড়িয়ে দিতে। সেটা তখনকার জন্যে ভালো ছিল।

তবে আমি প্রশ্ন করছি এখনকার দিনে কোনো খ্রিস্টান কি এটা মেনে চলেন? যদি একগালে থাপ্পড় মারেন আর লোকজন সামনে থাকলে হয়তো আরেক গাল বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু যদি আপনি কোনো ফাদার কিংস যাজকের কাছে যান। তারপর জোরে একটা থাপ্পড় মারেন হয়তো মানুষের সামনে একটা থাপ্পড় খাবেন কিন্তু থাপ্পড় মারতে থাকলে তিনি গাল বাড়িয়ে দেবেন না। এখন সেই সময় নয় যে, কেউ থাপ্পড় মারলে অন্য গাল বাড়িয়ে দেবে। যদি কেউ ভুল করে আপনাকে থাপ্পড় মারে আপনি ক্ষমা করে দিতে পারেন। যদি কেউ ইচ্ছে করে থাপ্পড় মারে আর আপনি গাল বাড়িয়ে দেন তাহলে প্রতিদিন সে আপনাকে থাপ্পড় মারবে। হয়তো একদিন বা দু দিন ফাদার রাজি হবেন কিন্তু প্রত্যেক দিন রাজি হবেন না। তাহলে মুহাম্মদ ﷺ তিনি আল্লাহর আরেকজন নবী। তিনি বলেছেন, 'তোমরা পরিস্থিতি বিচার করবে।' পবিত্র কোরআন (সূরা নিসা, আয়াত নং ১৪১-এ) বলছে যে, 'তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না।'

ইসলাম মধ্যম পন্থা অবলম্বনের কথা বলে। যদি ভুল করে আপনাকে আঘাত করে, আপনি ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছে করে আঘাত করে, আপনিও আঘাত করুন। ইসলামিক আইন বলে, যদি কারো ওপর অত্যাচার করা হয় আর সে যদি প্রতিবাদ না করে, তাহলে যার ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে সেও অপরাধী। যে অত্যাচার করে তাকে শিক্ষা দেয়া উচিত, যদি না করে তবে সেও অপরাধী। যেমন ধরুন, কোনো একটা লোক অন্যায় করছে আর আপনি দেখছেন, কেউ চুরি করছে, কেউ মহিলাদের উত্যক্ত করছে। আমাদের নবী করীম ﷺ হাদিসে বলেছেন, যদি কোনো অন্যায় কাজ দেখ সেটা হাত দিয়ে থামানো সবচেয়ে ভালো। যদি হাত দিয়ে না পারো তবে মুখ দিয়ে থামাও। যদি সেটাও না পারো, মনে মনে তাকে ঘৃণা কর। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এখনকার দিনে মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর কাছ থেকে যে আইনটা পেয়েছেন সেটাই শ্রেষ্ঠ আইন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২৫২। আমি একটি কলেজের থিওলোজিক্যাল। আজকের আলোচনার বিষয় ছিল ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য। কিন্তু আমি এখানে যা শুনলাম তা হচ্ছে দুই ধর্মের মধ্যে পার্থক্য। আমার মনে হয় পার্থক্যের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আপনি বলেছেন যে, যীশু এসেছেন শুধু ইহুদিদের জন্যে। আর মুহাম্মদ এসেছেন পুরো মানবজাতির

জন্যে। আমার মনে হয় না এটা সত্য। আর বাইবেলেও এমন কথা বলা হচ্ছে না আর আপনি বলেছেন যে, যীশু ঈশ্বর নন। কিন্তু এ ব্যাপারে কি বলবেন যে যীশু বলেছেন, 'আমিই সত্য এবং জীবনের একমাত্র পথ। আমার পিতা এবং আমি এক। যারা আমাকে দেখছো, তারা পিতাকেই দেখছো।' আর বাইবেলেই পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে, যীশুখ্রিস্টই ঈশ্বর? আর সে কথাটাই আমরা বিশ্বাস করি এবং পুরো পৃথিবীর মানুষই বিশ্বাস করে।

উত্তর : কোনো সমস্যা নেই ভাই। আপনি যতগুলো ইচ্ছে প্রশ্ন করতে পারেন আমাকে। আপনি বলেছেন যে, আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য। কিন্তু আমি সাদৃশ্য থেকে পার্থক্য নিয়েই বেশি আলোচনা করেছি। যদি দেখেন আমি বাইবেল থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছি। আমি এখানে বলব যে, ইসলাম ও বাইবেলের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। আর এখানে আমি সেই সাদৃশ্যগুলোর প্রতি বেশি জোর দিয়েছি, যেগুলোর কথা বাইবেল ও কোরআনে আছে। কিন্তু খ্রিস্টানরা সেগুলো মানে না। আমি এমন কথা বলছি না যে, খ্রিস্টানরা বাইবেল মানছে কি মানছে না। এ বিষয়টা যদি আসে হতে পারে ইসলাম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে পার্থক্য। আজকের বিষয় ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে পার্থক্য নয়। আজকের বিষয় ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য। খ্রিস্টানধর্ম আর এ ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পার্থক্য আছে। তেমনি ইসলাম আর মুসলিমদের মধ্যেও পার্থক্য আছে। সেজন্য ভাই আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিই যে, আজকের বিষয় ইসলাম আর খ্রিস্টানদের মধ্যে সাদৃশ্য নয়, ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য।

খ্রিস্টান ধর্মের ভিত্তি হলো 'বাইবেল'। আমি যে সাদৃশ্যগুলো নিয়ে বলেছিলাম সেগুলো কোরআন আর বাইবেলের। কোরআন আর বাইবেল দুই-ই বলছে শূকর খেও না, কিন্তু খ্রিস্টানরা খায়, আর মুসলিমরা খায় না। কোরআন আর বাইবেল দুই বলছে, তোমরা মদ খেও না, খ্রিস্টানরা খায় আর মুসলিমরা খায় না। মুসলিমরা করে আর খ্রিস্টানরা করে না। যীশুখ্রিস্ট বলেছেন, তোমরা এক ঈশ্বরের উপাসনা কর কিন্তু আপনারা ট্রিনিটিকে বিশ্বাস করেন। যীশু বলেছে, তোমরা আমার উপাসনা কর না। কিন্তু আপনারা করেন ইত্যাদি ইত্যাদি.....। যদি আপনারা আমার ক্যাসেট দেখেন। আমি এমন কোনো পার্থক্যের কথা বলি নি বাইবেল যে কথা বলছে কোরআনে তার বিরুদ্ধে। কিন্তু না আমি সাদৃশ্য নিয়ে কথা বলেছি। আমি সেখানে পার্থক্যের কথা বলেছি যেখানে খ্রিস্টান মিশনারিদের আমি বলেছিলাম তারা আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল যে, ডিওটোরনমীর ১৮ সেটা হলো যীশুখ্রিস্ট সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী। সেখানে যুক্তি দিতে গিয়ে আমি হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)-এর পার্থক্যটা বলেছিলাম। আপনি বুঝতে পেরেছেন।

যদি ভালো করে দেখেন আমি যে সাদৃশ্যের কথা বলেছিলাম বাইবেল আর

কোরআনের সেগুলো খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের ভিত্তি। এবার প্রশ্নতে আসি। আপনি বলেছেন যে, আমি একটা কথা বলেছি আর সেটা আমি আবারও বলছি– যীশুখ্রিস্ট বলেন নি পরিষ্কারভাবে পুরো বাইবেলে যে, 'আমি ঈশ্বর তোমরা আমার উপাসনা কর।' আপনি তিনটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যীশু বলেছেন, 'আমি সত্যি এবং জীবনের একমাত্র পথ। কেনো মানুষ আমার এবং পিতার মাঝখানে আসবে না। যারা আমাকে দেখছে তারা পিতাকেই দেখছো এবং আমি ও আমার পিতা এক।' আপনি তিনটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন কোনো রেফারেন্স ছাড়া। আমি তিনটিরই রেফারেন্স দিচ্ছি। প্রথম দুটো অনুচ্ছেদ আছে (গ্রসবেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ৬ ও ৯) যাচাই করতে পারেন বাইবেলে।

আমি আমার স্মৃতি থেকে বলছি না কিন্তু বাইবেল থেকে বলছি। আপনি একজন রেফারেন্স আর থিওলজিকাল কলেজে পড়ান, যদি উল্টো-পাল্টা বলে থাকি, এখানে বাইবেল আছে যাচাই করতে পারেন। তবে ভাই এখানে প্রসঙ্গটা দেখতে হবে। আপনি প্রসঙ্গ ছাড়া কোনো উদ্ধৃতি দিতে পারবেন না। প্রসঙ্গটা জানতে ১ নং অনুচ্ছেদে যান গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৪, দেখলে বুঝতে পারবেন যীশুখ্রিষ্ট নিজেই বলেছেন, "আমার পিতার রাজ্যে অনেক প্রাসাদ আছে, অনেক প্রাসাদ যদি এরকমটা না হতো, আমি তোমাদের বলতাম না। আমি সেখানে যাচ্ছি তোমাদের একটা জায়গা তৈরি করতে। আর তোমরা জানো আমি কোথায় যাচ্ছি। থমাস বললো, আমি জানি না আপনি কোথায় যাচ্ছেন। আমরা সে পথ চিনি না আপনি যেখানে যাচ্ছেন। যীশু বললেন, 'আমিই সত্য এবং জীবনের একমাত্র পথ। কোনো মানুষ আমার আর আমার পিতার মাঝে আসতে পারে না।'

আমিও এটার সাথে একমত যে, যীশুখ্রিস্ট জীবনের একমাত্র পথ। কোনো মানুষ আল্লাহর কাছে যাবে না যীশুখ্রিস্টকে বাদ দিয়ে। এটা তার সময়ে। প্রত্যেক নবীই তার সময়ে ছিলেন আল্লাহর পথে সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ। কোনো মানুষই আল্লাহ ও মূসার মাঝখানে আসবে না। আর নবীজি ﷺ-এর সময় তিনিই ছিলেন সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ। তাহলে প্রত্যেক নবীর সময়ে তিনিই ছিলেন সত্যের পথ। আমিও একমত। এর অর্থ যদি আমাকে অনুসরণ করো তাহলে ঈশ্বরকে মেনে চলছো, তিনিই ছিলেন পথ। এরপরও যদি বাইবেল পড়েন যীশুকে তার শিষ্যরা বললো যে, 'আমরা তো ঈশ্বরকে দেখি নি।' তখন যীশু তাদের বললেন, যারা আমাকে দেখছো তারা ঈশ্বরকে দেখছো। আমাকে দেখছো মানে যারা আমার নির্দেশ মেনে চলছো তারা আসলে ঈশ্বরের নির্দেশই মেনে চলছে।

যদি প্রসঙ্গটা দেখেন প্রথম অনুচ্ছেদেই আছে, 'আমার পিতার রাজ্যে অনেক প্রাসাদ আছে'। তিনি বলেন নি যে, আমার রাজ্যে অনেক প্রাসাদ আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনি মহান ঈশ্বরের কথা বলছেন। একইভাবে সব নবী রাসূল যে নির্দেশ

দিয়েছেন সেগুলো যদি মেনে চলেন, আপনি পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের নির্দেশই মানছেন। আর একথাটা মেনে নিতে আমার কোনো রকম আপত্তি নেই। আরেকটি অনুচ্ছেদের কথা বললেন যে, 'আমি ও আমার পিতা এক।' এটা আছে (গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১০, অনুচ্ছেদ ৩০-এ)।

আর এখানেও আপনাকে প্রসঙ্গটা বলবো, এরপর আপনি বলবেন আপনি মানেন কি না যে যীশুখ্রিস্ট সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। যদি প্রসঙ্গটা পড়েন সেটা জানতে ২৩ নং অনুচ্ছেদে যান। (গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১০) যে, 'যীশুখ্রিস্ট যখন মন্দিরের সলোমনের বারান্দায় গেলেন, ২৪ নং অনুচ্ছেদ বলছে ইহুদিরা তার চারপাশে জড়ো হলো। আর বললো আমাদের কতদিন দ্বিধার মধ্যে রাখবেন? আপনি যদি খ্রিস্ট হোন সরাসরি বলুন। ২৫ অনুচ্ছেদে বলছে, 'আমি তোমাদের বলেছি কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর নি। আমি যে কাজগুলো করি আমার পিতার নামে তারাই আমার হয়ে এখানে সাক্ষ্য দেবে।' ২৬ অনুচ্ছেদ বলছে, 'আমি বলেছি কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর নি। কারণ তোমরা আমার অনুসারী নও।' ২৭ অনুচ্ছেদ, 'আমার অনুসারীরা আমার কথা শোনে, আমি তাদের চিনি, তারা আমার অনুসরণ করে।' ২৮নং অনুচ্ছেদ, 'আমি তাদের চিরস্থায়ী জীবন দিয়েছি তারা কখনো ধ্বংস হবে না। কেউ তাদের আমার হাত থেকে নিতে পারবে না।' ২৯ অনুচ্ছেদ, 'আমার পিতা আমাকে যা দিয়েছেন তিনি সবার চেয়ে বড়। কেউ তাদের আমার পিতার হাত থেকে তুলে নিতে পারবে না।' ৩০ অনুচ্ছেদ বলছে, 'আমি এবং আমার পিতা এক।' প্রসঙ্গটা পড়লে বুঝতে পারবেন উদ্দেশ্যের দিক থেকে যীশু এবং তার পিতা এক। আমার বাবা হলেন একজন ডাক্তার আর আমিও একজন ডাক্তার।

আমি যদি বলি, আমরা দুজন এক, তার মানে কি আমরা দুজন একই লোক? না আমরা পেশার দিক থেকে এক। এর মানে এই নয় যে, আমরা একই ব্যক্তি। এটা খুবই পরিষ্কার। তারপরও যদি বলেন, এই একমাত্র একজন ব্যক্তি আমি বলবো ঠিক আছে। এরপর যদি বাইবেল পড়েন (গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ২১) যে, "আমার পিতা আমার মধ্যে রয়েছে, আমি তোমাদের মধ্যে।" যীশুখ্রিস্ট তার ১২ জন শিষ্যকে বলছে আমরা সবাই এক। যদি একজন ধরেন তবে ১৪ জন ঈশ্বরকে মানতে হবে। মহান স্রষ্টা, যীশুখ্রিস্ট আর ১২ জন শিষ্য। আর আপনি যদি মূল বাইবেলটা পড়েন সেখানে এক শব্দটা দুই জায়গায় একই রকম। (গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১০, অনুচ্ছেদ ৩০-এ) এখানে যে এক শব্দটা আছে এই একই শব্দটা আছে (গসপেল অভ্ জন অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ২১-এ) একই শব্দ 'আমার পিতা আমার মধ্যে, আমি তোমাদের মধ্যে আর আমরা সবাই এক।'

এ কথাটার মানে হলো মহান স্রষ্টা, যীশুখ্রিস্ট আর শিষ্যরা তারা একই নির্দেশ দিচ্ছেন। আর এ নির্দেশের ক্ষেত্রে সবাই এক। কিন্তু যদি বলেন, তারা একজন ব্যক্তি তবে ট্রিনিটিকে বদলাতে হবে। অন্য ধারণা লাগবে ১৪ জন ঈশ্বরের। আপনি

প্রসঙ্গটা করলেই বুঝবেন। কিন্তু যদি এটার সাথে একমত না হোন, যদি বলেন যে, এখানে একই উদ্দেশ্যের কথা বলা হচ্ছে না তাহলে আপনাকে এটাও মানতে হবে যে যীশুর ১২ জন শিষ্যও ঈশ্বর। এরপর আরো দেখেন (গসপেল অভ্ জন অধ্যায় ১০, অনুচ্ছেদ ৩১-এ) যখন যীশু বললেন, আমি ও আমার পিতা এক তখন ইহুদিরা পাথর মারতে চাইল। আমি বলি, ঠিক আছে যদি মারতে চান তবে অজুহাত দরকার।

৩২নং অনুচ্ছেদে এর উত্তর দেয়া আছে যে, যীশু বললেন, আমি আমার পিতার অনেক ভালো কাজ তোমাদের দেখিয়েছি। তোমরা কোন ভালো কাজটির জন্যে আমাকে পাথর মারতে চাইছ? ৩৩ নং-এ আছে 'ইহুদিরা বললো, আমরা আপনাকে ভালো কাজের জন্যে পাথর মারছি না। আপনাকে পাথর মারছি, কারণ আপনি মানুষ হয়ে ধর্মের অবমাননা করেছেন। নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন। এরপর যীশু বললেন (৩৪-৩৫) অনুচ্ছেদে এটা কি তোমাদের ধর্মগ্রন্থে বলা নেই যে, তোমরাই ঈশ্বর। আর যে ব্যক্তির কাছে মহান স্রষ্টার নির্দেশ আসে তবে সেই ব্যক্তিকে যদি ঈশ্বর বলো ধর্মগ্রন্থের নিয়ম ভাঙা হবে না। একই ধরনের কথা আছে সামস-এ ৮২ নং অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৬-এ 'যে তোমরাই ঈশ্বর' তাহলে যদি আপনি প্রসঙ্গটা পড়েন যীশুখ্রিস্ট কখনোই নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেন নি। তবে উদ্দেশ্যের দিক থেকে মহান স্রষ্টা ও যীশুখ্রিস্ট একই নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন। আপনার পরের প্রশ্ন।

প্রশ্ন ঃ ২৫৩। যে লোক একবার যীশুখ্রিস্টকে চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। যীশু বলেছিল, ঈশ্বরের নির্দেশ মানে, তখন লোকটি বলেছিল, আমি সারা জীবন ধরে ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করে এসেছি। তখন যীশু বললেন, 'তাহলে তোমার সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমাকে অনুসরণ কর।' এ কথাটার অর্থ কী?

উত্তর : ঠিক আছে আমি আপনাকে প্রসঙ্গটা রেফারেন্সসহ বলছি। (মেথিও, অধ্যায় ১৯, অনুচ্ছেদ ১৬) যে, 'একজন লোক যীশুখ্রিস্টের কাছে এসে বললেন, হে ভালো প্রভু আমি কোন ভালো কাজটি করব যাতে চিরস্থায়ী জীবন পেতে পারি? পরের অনুচ্ছেদ, কেন তুমি আমাকে ভালো বলছ? ভালো কেবল একজনই, তিনি আমার পিতা যিনি স্বর্গে আছেন।' যদি তুমি চিরস্থায়ী জীবন পেতে চাও ঈশ্বরের নির্দেশ মানো।' এটুকুই বলেছিলাম এবং এটুকুই যথেষ্ট। তাছাড়া ১৮, ১৯ ও ২০ অনুচ্ছেদ বলছে, আমি ঈশ্বরের নির্দেশ মানি। এখন সেই লোক হয়তো জান্নাতুল ফেরদৌস পেতে চায়। সে লোক বলল, আমি বেশি পেতে চাই তাহলে আমাকে কী করতে হবে? আমি ঈশ্বরের নির্দেশ মানি। তখন যীশু বললো, তোমার কাপড় বেচে দাও, সম্পদ বেচে দাও, অর্থ কড়ি দান করে দাও। এটা বাইবেলেই আছে। তোমার সব সম্পদ ত্যাগ করে আমাকে অনুসরণ কর। সে লোক ভাবল এটা

কঠিন। খুবই কঠিন। অনুসরণ করা মানে সব নবীই অনুসরণ করতে বলেছেন। কোরআন বলছে, 'আল্লাহর ও তাঁর রাসূলকে মান।' তার মানে কি নবী নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন? প্রত্যেক মানুষই নবীকে অনুসরণ করবে।

তার মানে এই নয় যে, তিনি নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেছেন। মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, মূসা (আ) বলেছেন, তাদের অনুসরণ করতে। আল্লাহ বলেছেন নবীদের অনুসরণ করতে। কোনো নবীকে অনুসরণ করা মানে তিনি নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেন নি। তার মানে আপনি নবীদের নির্দেশ মেনে চলবেন যা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। যীশু বলেন নি, আমাকে উপাসনা কর; তিনি বলেছেন, আমাকে অনুসরণ কর। তিনি বলেন নি, আমি ক্রুসবিদ্ধ হয়ে মারা গেছি– এটা বিশ্বাস কর। তিনি বলেছেন, ঈশ্বরের নির্দেশ মেনে চলো আর ঈশ্বরের নির্দেশ মেনে চলা ও নবীদের কথা মেনে চলা একই কথা। কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে প্রসঙ্গটা পড়ে জানতে পারবেন যীশু নিজের মুখেই বলেছেন, 'আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে যে নির্দেশ পেয়েছি তা মেনে চলো। তাহলে তোমরা বেহেশতে যেতে পারবে। তিনি কখনোই বলেন নি যে, আমাকে ঈশ্বর মানলে তোমরা বেহেশতে যেতে পারবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২৫৪। আমি মেরি ডি কস্টা। আপনি কি পাপের উৎস সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন?

উত্তর : বোন, আমরা ইসলাম ধর্মে কোনো রকম পাপের উৎস সম্পর্কে বিশ্বাস করি না। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সব শিশুই নিষ্পাপ হয়ে জন্মায়। আর কোরআন স্পষ্টভাবে বলেছে যে, কোনো মানুষ কখনো অন্যের ভার বহন করতে পারবে না। এখন এই পাপের উৎস সম্পর্কে চার্চ আপনাদের যা শেখায় সে সম্পর্কে বলি। আর বাইবেল কি বলছে সেটাও বলবো। আমি বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ের ছাত্র হিসেবে দুটি ধারণাই বলবো। চার্চ যেটা শেখায় যে ইব্ (বিবি হাওয়া) তিনি আর আদম গন্ধবফল খেয়েছিলেন। আর এ ঘটনাটা আপনারা পাবেন (বুক অব জেনোসিস, অধ্যায় ৩) যে তিনি আদমকে প্রলোভন দেখিয়েছিলেন গন্ধব ফল খাওয়ার জন্য। আর এজন্যে মানুষ জন্মায় পাপের ভেতরে।

পবিত্র কোরআনে আদম ও হাওয়ার ঘটনাটা উল্লেখ আছে। পবিত্র কোরআনে এমন কোনো আয়াত নেই যেখানে শুধু বিবি হাওয়াকে দোষ দিয়েছে। আর পবিত্র কোরআনের (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১৯-২৭-এ) বলা হয়েছে যে, আদম (আ) আর বিবি হাওয়া (আ) তাদের অনেক বার সাবধান করে দেয়া হয়েছিল। বলা আছে, তারা দুজনেই আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছেন। তারা দু জনেই অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তাদের দুজনকেই ক্ষমা করা হয়েছিল। তাদের দুজনেই এ অপরাধে সমান অপরাধী। কোরআনের এমন কোনো আয়াত নেই যেখানে শুধু বিবি হাওয়াকে দোষ দেয়া হয়েছে। তবে কোরআনের একটি আয়াতে শুধু আদম

(আ)-এর কথা বলা হয়েছে। (সূরা ত্বো-হা, আয়াত নং ১২১-এ) উল্লেখ আছে যে, আদম (আ) আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করেছিলেন। তবে যদি পুরো কোরআন পড়েন দেখবেন তাদের দু জনকেই সমান অপরাধী করা হয়েছে।

আর বাইবেলে এই দোষটা শুধু দেয়া হচ্ছে বিবি হাওয়াকে। (বুক অভ্ জেনোসিস, অধ্যায় ৩, অনুচ্ছেদ ১৬-এ) বলছে, 'সৃষ্টিকর্তা বলছেন, তোমরা নারী, তোমরা এখন থেকে গর্ভধারণ করবে, আর প্রসব বেদনা ভোগ করবে।' তাহলে বাইবেল অনুযায়ী গর্ভধারণ একটা শাস্তি। কারণ বিবি হাওয়া আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিলেন। এর সঙ্গে যদি কোরআনকে তুলনা করেন তবে (সূরা নিসা, আয়াত নং ১-এ) বলা হচ্ছে যে, 'মাতৃগর্ভকে শ্রদ্ধা কর।' (সূরা লোকমান, আয়াত নং ১৪-এ); (সূরা আহ্যাব, আয়াত নং ১৫-এ) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভধারণ করে কষ্টের সাথে আর প্রসব করে কষ্টের সাথে। গর্ভধারণ নারীকে উপরে তোলে বাইবেলের মতো নিচে নামায় না। পাপের উৎস সম্পর্কে বলি। তারা যেটা বলে যেহেতু বিবি হাওয়া আদমকে নিষিদ্ধ ফল খেতে প্রলোভন দেখিয়েছিল তাই মানুষ জাতি পাপের ভেতর জন্মাবে। প্রত্যেক শিশুই পাপী হয়ে জন্মায়। আমি তাদের প্রশ্ন করব, বিবি হাওয়া কি গন্ধব খাওয়ার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল?

যদি বলতাম, হে! খাও, তাহলে আমি দায়ী থাকতাম। আর আদম কি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তারা এ ফল খাবেন কি-না? তারা যেহেতু আমাকে জিজ্ঞেস করে খান নি তবে আমি দায়ী থাকব কেন? এটা অযৌক্তিক। তাই বলছি এটার জন্যে আমি দায়ী নই। কিন্তু খ্রিস্টান চার্চ শেখায় যেহেতু হাওয়া ঈশ্বরকে মানেন নি, আদম হাওয়া দুজনেই মানেন নি, হাওয়ার কারণে মানেন নি। তাই মানবজাতি পাপের ভেতর জন্মায়। আর এ কারণেই তারা যেটা বলে যে, সৃষ্টিকর্তা একারণেই তার নিজের পুত্রকে উৎসর্গ করেছেন। তারা এখানে বলে যে, (গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ৩, অনুচ্ছেদ ১৬) যে 'ঈশ্বর পৃথিবীকে এতো ভালোবাসেন যে একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করেছেন। যারা এটা বিশ্বাস করে তারা মারা যাবে না, চিরস্থায়ী জীবন পাবে। এই 'সন্তান' শব্দটা মূল বাইবেলে ছিল না বলে ধারণা করেন ৩২ জন উচ্চ খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞ। তারা বলেছেন, মূল বাইবেলে এই 'সন্তান' শব্দটা ছিল না। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন চার্চ আমাদের শেখায় প্রত্যেক মানুষ পাপী হয়ে জন্মায়। তারা বলে, যে আত্মা পাপ করে সে মারা যাবে।

আর এটা বাইবেলের উদ্ধৃতি, আমিও একমত, এটা আছে (ইজিকিয়েল, অধ্যায় ১৮, অনুচ্ছেদ ২০), যে আত্মা পাপ করে সে মারা যাবে। তবে এ কথাটাই কিন্তু শেষ হয়ে যায় নি। পরে আছে ভালো লোকের ভালো কাজ তার সঙ্গে থাকবে, আর খারাপ লোকের খারাপ কাজ তার সঙ্গে থাকবে। পিতা তার পুত্রের অপরাধের ভার বহন করবে না। পুত্রও পিতার ভার বহন করবে না। বাইবেল বলছে পাপ করলে

আত্মা মারা যাবে। ভালো লোকের ভালো কাজ তার সঙ্গে থাকবে, খারাপ লোকের খারাপ কাজ তার সঙ্গে থাকবে। কিন্তু কোনো খারাপ লোক যদি ঘুরে দাঁড়ায়, সে মারা যাবে না। পুরো অনুচ্ছেদটি এমন কথাই বলছে। তাহলে কোনো বাইবেলের কথা অনুযায়ী পাপ জন্ম থেকে আসে না। চার্চ সেটা বলে যে পাপ জন্ম থেকে আসে সেটা বাইবেলের বিরুদ্ধে। খ্রিস্টান ধর্মের শিক্ষণীয় বিষয় কী? সেটা বাইবেল থেকে জানতে হবে।

কিছু মুসলিম লোক নারীদের ছোট করে দেখে তার মানে এই নয় যে, ইসলাম নারীদের ছোট করে দেখে। ইসলাম কীভাবে নারীদের দেখে সেটা জানতে কোরআন ও হাদিস পড়ুন। সেজন্যে কোনো বাইবেল দেখেন, যেখানে পাপের কোনো উৎস নেই। বাইবেল অনুযায়ী ছেলে তার পিতার পাপের বোঝা বইবে না তাহলে আমরা কীভাবে পাপী হয়ে জন্মালাম? ইসলাম অনুযায়ী প্রত্যেক শিশুই জন্মায় নিষ্পাপ হয়ে। যে শিশু যেকোনো ধর্মেই জন্মাক। যে শিশু জন্মায় মুসলিম হয়ে। আমাদের নবীজি বলেছেন, প্রত্যেক শিশুই নিষ্পাপ হয়ে জন্মায়। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২৫৫। আমার নাম সদানন্দ। আমি এখানকার থিওলজিকাল কলেজের প্রিন্সিপাল। দুই ধর্মের সমান দখল দেখে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি এই প্রলাপটার ব্যাপারে কি বলবেন, জনের গসপেল অনুযায়ী 'শব্দটা মাংসে পরিণত হলো', শব্দটা মানুষে পরিণত হলো। আর এখান থেকেই আমরা বিশ্বাসটা পেয়েছি যে ঈশ্বর যীশু রূপে পৃথিবীতে এসেছেন। শব্দটা ছিল 'ঈশ্বর'। যা শুরুতে ছিল।

উত্তর : ভাই আপনি একটি সুন্দর উদ্ধৃতি দিলেন বাইবেল থেকে। রেফারেন্স হলো (অনুচ্ছেদ ১, অধ্যায় ১, গসপেল অভ্ জন)। আর আমিও একমত যে, শুরুতে যে শব্দটা ছিল তা ছিল ঈশ্বরের সাথে। আর শব্দটাই ছিল ঈশ্বর। আপনারা যদি বাইবেল পড়েন, যদি বুঝতে না পারেন তবে বিষয়ের গভীরে যান। আপনার সাথে আমিও একমত। যীশুখ্রিস্ট কথা বলতেন হিব্রু ভাষায়, কিন্তু মূল বাইবেল আছে গ্রিক ভাষায়। যীশুখ্রিস্ট এটা নিজ হাতে লেখেন নি। যদি গ্রিক ভাষা পড়েন সেখানে যে শব্দটা প্রথমে ছিল তা হলো ঈশ্বরের সাথে। আর শব্দটাই ছিল 'ঈশ্বর'। প্রথম যখন শব্দটা এলো আর যদি বলেন শব্দটা ছিল ঈশ্বর। এখন এই শব্দটাকে ঈশ্বরের সাথে পাল্টে নেন। শব্দটা হয়ে যাবে শুরুতে ছিল ঈশ্বর। শব্দটা ছিল ঈশ্বরের সাথে, হয়ে যাবে ঈশ্বর ছিলেন ঈশ্বরের সাথে।

এটা কোনো অর্থ হয় না, ঈশ্বর ছিলেন ঈশ্বরের সাথে। এটা বুঝা খুব কঠিন। আপনাকে আরো গভীরে যেতে হবে। যদি আপনি মূল গ্রিক ভাষায় পড়েন। প্রথমবার যে শব্দটা লেখা আছে, শুরুতে ছিল শব্দটা, আর শব্দটা ছিল ঈশ্বরের সাথে। এই ঈশ্বর শব্দটা হলো 'ইতিয়াস' অর্থাৎ 'দি গড'। বড় হাতের (G)। ২য়

বার শব্দটাই ছিল ঈশ্বর এটা হলো 'টনথিয়স'। 'টনথিয়স' মানে আমাদের গড। ছোট হাতের (g) অর্থ একজন মহান ব্যক্তি। কিন্তু যদি বাইবেল দেখেন দুই জায়গাতেই বড় হাতের (G)। এখানে কে ভুল করেছে মহান স্রষ্টা করেন নি, করেছেন অনুবাদকরা। গ্রিক ভাষায় প্রথম শব্দটা হলো 'ইতিয়াস', ২য়টি হলো 'টনথিয়াস'। তাহলে দুই জায়গাতেই বড় হাতের (G) কেন? আপনারা কাকে ঠকাচ্ছেন? বলার জন্যে দুঃখিত। তাহলে শুরুতে ছিল শব্দটা, শব্দটা ছিল ঈশ্বরের সাথে, 'মহান ঈশ্বর'।

আর ২য়টি ছিল ঈশ্বর। মানে ঈশ্বরের দূত। আমরাও মানি। কোরআন বলছে যীশুখ্রিস্ট আল্লাহ তাআলার প্রেরিত দূত। আল্লাহর রাসূল। আর প্রত্যেক দূতই আল্লাহর কথা বলেন। তাহলে এ কথাটা মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই যে, যীশুখ্রিস্ট ছিলেন মহান গড। অর্থাৎ ছোট হাতের (g)। আর আপনারা ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়লে দেখতে পারবেন যেখানে বলা হয়েছে মূসাকে ফারাওদের কাছে ঈশ্বর হিসেবে পাঠানো হয়েছে। ঈশ্বর মানে কী? তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন? তাকে পাঠানো হয়েছে ঈশ্বরের একজন দূত হিসেবে। কিন্তু মূল ধর্মগ্রন্থটা আমাদের কাছে আছে। সেটার সঠিক অনুবাদ হবে মহান ব্যক্তি। তাহলে ভাই প্রসঙ্গটা দেখলে বুঝতে পারবেন, এখানে যদি সঠিক অনুবাদ করি যীশুখিস্ট ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি। আর শব্দটা মাংসে পরিণত হলো। অর্থাৎ যীশুখ্রিস্ট পৃথিবীতে এসেছেন রক্ত মাংসের মানুষ হিসেবে। আর যীশুখ্রিস্ট পরিষ্কার করেই বলেছেন (গসপেল অভ্ লুক, অধ্যায় ২৪, অনুচ্ছেদ ৩৬)– তিনি যখন উপরের ঘরে গেলেন 'সালামালাইকুম' সবাই তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। তারা ভেবেছিল যীশুখ্রিস্ট ক্রুসবিদ্ধ হয়েছেন। তারা এটা বিশ্বাস করতে পারল না। যীশু বললেন, তোমরা আমাকে ছুঁয়ে দেখ।

কারণ আত্মার কোনো শরীর থাকে না যেমনটা আমার কাছে। অর্থাৎ তিনি রক্ত মাংসের মানুষ। তারপর বললেন, এখানে কি খাওয়ার মতো কিছু আছে? তারা তাকে মধু দিল, আর তিনি খেলেন। কী প্রমাণ করতে? যে তিনি ঈশ্বর নন, ক্রুসবিদ্ধ হন নি, জীবিত ছিলেন। আর কোনো সমস্যা থাকলে মূল গ্রন্থটা পড়েন, তাহলে বুঝতে পারবেন সত্যটা আসলে কী? আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২৫৬। এ ব্যাপারে কী বলবেন যে, টমাস বলেছেন তিনি আমার প্রভু, আমার ঈশ্বর।

উত্তর : ভাই, আপনি আরো একটি উদ্ধৃতি দিলেন। একশো উদ্ধৃতি দিতে পারেন আপনি। আমার কথা হলো প্রথম যে উদ্ধৃতিটি আমি দিয়েছি সে ব্যাপারে কি একমত? এটা মানলে আমি পরের অনুচ্ছেদে যাব। তবে পরের অনুচ্ছেদে যাওয়ার আগে আপনি বলেছেন, আসুন আমরা সবাই মত-বিনিময় করি। এ ব্যাপারে কোরআন বলেছে যে, এসো সেই কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক।

আমার ভুল হলে আমি বদলাবো, আপনার ভুল হলে আপনি পাল্টে ফেলবেন। আমাদের মধ্যে সাদৃশ্যটা দেখতে হবে। সূরা মায়িদার ৮২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে। মুসলিম অথবা বিশ্বাসীদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো তারা, যারা পৌত্তলিক। মূর্তিপূজারি আর ইহুদি। কিন্তু তাদের নিকটতম বন্ধু তারা যারা খ্রিস্টান। আমরা আপনাদের ভালোবাসি। যদি মতের অমিল হয় তবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো।

আপনি আরেকটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমিও একমত যে টমাস বলেছেন, 'আমার ঈশ্বর।' একটা উদাহরণ দিই, একজন লোক আমার কাছে এসে বললো যে, ভাই জাকির, সে বললো, 'আপনি তো লেট, এখন তো অনুষ্ঠান শেষ করে দিতে হবে।' আমি বললাম 'ও মাই গড'। এর মানে কি আমি তাকে 'ঈশ্বর' বলে ডাকছি? যদি ভালো করে প্রসঙ্গটা দেখেন। যীশু বলছে, 'আমাকে ভালো বলো না' তাহলে ঈশ্বর বলার ব্যাপারইতো আসছে না। এখানে আমি উত্তেজিত হয়ে বলছি 'ও মাই গড' দেরি হয়ে গেছে , তাহলে ব্যাপারটা সবাই বুঝতে পারবে যে আমি লোকটিকে ঈশ্বর বলছি না। টমাস এখানে বলছেন না যে, যীশু হলেন তার ঈশ্বর। আর যীশু এটা বলেন নি, মন্তব্যটা করেছেন টমাস। আমি আপনাকে যে চ্যালেঞ্জটা দিয়েছি সেটা এরকম না। আমার চ্যালেঞ্জটা ছিল পুরো বাইবেলে কোথাও পাবেন না যে, যীশু বলেছেন, 'আমি ঈশ্বর আমার উপাসনা কর।' কিন্তু আপনার এই উদ্ধৃতিটি ছিল টমাসের। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২৫৭। আমার নাম সোনিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আপনি বললেন যে, মুহাম্মদ ﷺ পুরো মানবজাতির জন্যে এসেছেন। আর যীশু এসেছেন শুধু ইসরাঈলের জন্যে। আমরা খ্রিস্টান ও মুসলিমরা বিশ্বাস করি যীশু আবার পৃথিবীতে আসবেন। সেটা হলে কীভাবে বলবেন যে, মুহাম্মদ হলেন শেষ নবী?

উত্তর : আমিও আপনার সাথে একমত যে, যীশু পৃথিবীতে আবার আসবেন। এর জন্যে সব মিলিয়ে ৭০টির মতো হাদিস আছে। সহীহ্ হাদিস বলছে যে, যীশুখ্রিস্ট পৃথিবীতে আবার আসবেন। বাইবেলেও বলা আছে যে, যীশু ২য় বারের মতো পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। তবে পবিত্র কোরআনেও একথা আছে (সূরা আহ্যাব, আয়াত নং ৪০-এ) যে, 'মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন। বরং সে আল্লাহর রাসূল। তিনি হলেন সর্বশেষ নবী। এখন দুটোই ঠিক, কীভাবে? কারণ ঈসা (আ) তিনি আবারও আসবেন। তিনি কী জন্যে পৃথিবীতে আসবেন? তিনিই একমাত্র নবী যাকে আল্লাহ জীবিত অবস্থায় তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তার কোনো রাসূলকেই জীবিত অবস্থায় তুলে নেন নি। পবিত্র কোরআনে (সূরা নিসা-আয়াত নং ১৫৮-এ) আছে যে, যীশুখ্রিস্টকে জীবিত অবস্থায় তুলে নেয়া হয়েছে। ১৫৭ নং আয়াতে বলছে, 'তারা তাকে হত্যাও করে নি, ক্রুশবিদ্ধও করে নি। কিন্তু

তাদের মধ্যে এমন বিভ্রান্ত সৃষ্টি হয়েছিল। তারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছিল তাদের মনেও সংশয় ছিল। তারা শুধু অনুমানই করতে পারে। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করে নি।

আমরা মানি যে, যীশুখ্রিস্ট মারা যান নি। এমনকি বাইবেলও বলছে যীশুখ্রিস্ট জীবিত ছিলেন। হাদিসও একথা বলে, বাইবেলও বলে। তবে আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ তাআলা যীশুখ্রিস্টকে তার নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। কারণ তিনিই মহান স্রষ্টার একমাত্র দূত, যার অনুসারীরা ভাবে তিনিই ঈশ্বর। আর কোনো রাসূল নেই। যেমন : মূসা, নূহ্, ইব্রাহিম, আয়জারা, ইসহাক, সুলাইমান, আদম এই নবীদের অনুসারীরা কেউ-ই বলেন নি তাদের নবীরা নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন। একমাত্র যে নবীর অনুসারীরা এটা মানে এমনকি আজকের দিনেও মানে যে তাদের নবী ঈসা (আ) ঈশ্বর। পবিত্র কোরআনের সূরা মায়িদার, আয়াত নং ১১৬ তে আছে যে, যীশু বলেছেন, 'হে আমার ঈশ্বর, আমার প্রভু আপনি সাক্ষী থাকুন আমি কখনোই বলি নি আমার উপাসনা কর। বরং আমি বলেছি, আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি আমার এবং তোমাদের প্রভু।'

তাহলে যীশুখ্রিস্ট যখন পৃথিবীতে আসবেন তার অনুসারীদের একথা বলতে যে, তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলেন নি। আর যীশু তখন কোনো রাসূল হিসেবে পৃথিবীতে আসবেন না। তিনি নতুন কোনো নির্দেশ নিয়ে পৃথিবীতে আসবেন না। কারণ, নবুয়ত পাওয়া বন্ধ। তিনি তখন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত হিসেবে পৃথিবীতে আসবেন। পবিত্র কোরআনে (সূরা মায়িদার আয়াত নং ৩-এ) উল্লেখ আছে যে,

'আমি আজ তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম। এই কিতাবের পরে আর কোনো নির্দেশ আসবে না। যীশু যখন পৃথিবীতে আসবেন তিনি তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত হিসেবে আসবেন। তিনি পূর্বেও মুসলিম ছিলেন। পরেও তিনি মুসলিম থাকবেন। আর বাইবেলে আছে (গসপেল বলছে, যীশু ২য় বার আসলে খ্রিস্টানরা তাকে বলবে 'হে প্রভু আমরা কি তোমার নামে বিস্ময়কর কাজ করি নি।' যীশু তখন তাদের বলবেন, 'আমি তোমাদের চিনি না তোমরা সবাই অপরাধী, তোমরা এখান থেকে চলে যাও।' আমি একথা বলছি না গসপেলই একথা বলছে। তিনি একথা কাদের বলবেন? মুসলিমদের? হিন্দুদের, নাকি খ্রিস্টানদের বলবেন? যারা বলবে আমরা আপনার নামে বিস্ময়কর কাজ করেছি। সুতরাং যীশু ২য় বার পৃথিবীতে এসে বলবে, আমি নিজেকে ঈশ্বর বলি নি বরং আমি বলেছি আল্লাহর উপাসনা কর। আমার প্রভুই তোমার প্রভু। (ওয়া আখিরী দা ওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বীল আ'লামিন)।

প্রশ্ন ঃ ২৫৮। আমি ভিয়াস, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি। আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। আমি প্রথমে এ ধরনের একটি আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্যে আয়োজকদের ধন্যবাদ

জানাতে চাই এবং এ ধরনের আরো অনুষ্ঠানের যদি আয়োজন করা হয় ও প্রচার করা হয়; তাহলে আমরা ইসলাম সম্পর্কে অনেক নতুন কিছু জানতে পারবো যা ইতিপূর্বে জানতাম না। আমার প্রশ্নটি হলো, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য একটি ধারণা। তাহলে কেন সালমান রুশদীকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়েছে? শিয়া এবং সুন্নীদের মৌলিক মতবিশ্বাসের পার্থক্যটি ঠিক কোথায়? কোন বিষয়টি তাদেরকে অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে, এ সমস্যা সমাধানের উপায় কি? ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ ভাই আপনি অত্যন্ত ভালো একটি প্রশ্ন উথাপন করেছেন যে, ইসলাম কি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে? যদি তা করে তাহলে কেন সালমান রুশদীকে মৃত্যুর পরওয়ানা পাঠানো হয়েছে? ভাই, এর পরিপূর্ণ উত্তর আমার ক্যাসেটে দেওয়া আছে। যা মুম্বাইর সাংবাদিক সমিতির সাংবাদিক বিতর্ক সংগঠনের কাছে রয়েছে। দ্যা টাইমস অব ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস জার্নালিস্ট, মুম্বাই ইউনিট অব জার্নালিস্টে রয়েছে। বিষয়টি ছিল 'ধর্মীয় মৌলবাদ কি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্যে একটি বাধা'। তসলিমা নাসরীনের 'লজ্জা' উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর যখন তার হত্যার হুমকি দেয়া হয় তখন এই আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে সব বিস্তারিত বলা রয়েছে এবং সেই বিতর্কে একজন হিন্দু পাদ্রি, একজন খ্রিস্টান পাদ্রি, যিনি 'লজ্জা' উপন্যাসটি অনুবাদ করেছেন তিনি এবং ইসলামের পক্ষ থেকে আমি ছিলাম। সেটা একটা খুব ভালো বিতর্ক ছিল। সেখান থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিস্তারিত বিবরণ* আমরা পেয়েছিলাম। কিছু মানুষ বলে অন্যান্য ধর্মে পরিপূর্ণভাবে প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। আপনি ধর্ম সম্পর্কে যে কোনো কিছু বলতে পারেন। আবার কিছু মানুষ বলছে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ধর্ম একটি বাধা। যখন আরেকজন বক্তা কেম্প বলেছিলেন, ইসলামে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। এটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। আমি কোনো কিছু চাপা দিচ্ছি না। সংক্ষেপে, আমি বলছি যদি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে উদাহরণস্বরূপ যদি একজন আরেকজনের সুনাম করে গুণগান গায়, ইসলাম সে ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সম্মতি প্রদান করছে। যেহেতু সে কারও ক্ষতি করছে না এবং এটা প্রমাণিত।

পয়েন্ট নং ১. সে যেকোনো কিছু বলতে পারে যদি তা কারও ক্ষতি না করে। যদি তা কারও ক্ষতি না করে তবে সেটা ভালো।

পয়েন্ট নং ২. যদি সেটা কারও ক্ষতি করে, এটা দুটো বিষয় প্রমাণ এবং প্রমাণ ছাড়া। যদি সেটা কারো ক্ষতি করে। উদাহরণস্বরূপ পরনিন্দা করা।

পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে তোমরা কেউ কাউকে ক্ষুদ্র নামে ডেকো না, পরনিন্দা কর না তাই সেটি প্রমাণিত হোক বা না হোক। শুধু অপবাদ দেয়ার জন্যে, এটা জায়েজ নয়। আপনি যদি কারো বিরুদ্ধে প্রমাণসহ বলেন এটা গ্রহণযোগ্য আমি

ইসলাম আবারও বলছে, আমি যদি কোনো মহিলা সম্পর্কে কিছু বলি, যেমন তার সতীত্ব নিয়ে অভিযোগ করি, তার শালীনতাবোধ এর বিরুদ্ধে কিছু বলি। পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে আমাকে অবশ্যই চারজন সাক্ষী দেখাতে হবে, যদি আমি তা না দেখাতে পারি তাহলে আমাকে আশি বেত্রাঘাত করা হবে। এর অর্থ আপনি আমেরিকা, ইউরোপের মতো মেয়েদের কটুবাক্য বলে ছাড় পেয়ে যেতে পারেন না। ইসলামে বলা হচ্ছে, আপনি যদি মেয়েদের সম্পর্কে কটুবাক্য বলেন, তাদের নামে খারাপ কিছু রটিয়ে দেন। আপনি যদি তা চারজন সাক্ষীসহ প্রমাণ করতে না পারেন তবে আপনাকে আশি বেত্রাঘাত করা হবে। আপনাকে অবশ্যই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণ দেখাতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন এবং আপনার কাছে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ আছে যে, সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান দুর্নীতিবাজ। সে মানুষদের ঠকাচ্ছে, আপনি এটি পরিপূর্ণভাবে প্রমাণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ইসলাম আপনাকে তা প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করছে। আবার কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। যেমন– আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করি। আমি এর অনেক গোপন তথ্য প্রমাণসহ জানি। কিন্তু আমি এটা ইচ্ছে করলেই আমাদের শত্রুদের কাছে বিক্রি করতে যেতে পারি না। সুতরাং এখানে প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বৈধ নয়। যদি এটা মানুষের ক্ষতি করে, সরকারের বিরুদ্ধে যায়। যদিও আমি এটা কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে আমাদের বিরোধী বা শত্রুদের কাছে বিক্রি করে নিজে অনেক মুনাফা অর্জন করি। কারণ, আমার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। ইসলাম তা অনুমোদন করে না।

সুতরাং মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সেটি কোন ধরনের তথ্য বা মতামত তার উপর নির্ভর করে। আপনি যদি মনে করেন, আমি যে কাউকে অপবাদ দিব, আমি কারো বিরুদ্ধে কটুকথা বলবো এবং তারপর বলব এটা আমার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। ইসলাম এসব করতে অনুমতি দেয় না। আপনি যদি ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সালমান রুশদীর বইটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখবেন একই বিষয় ঘটেছে। আমি এ বিষয়ের ওপর আমার মতামত প্রকাশ করেছি। আপনি সেই ভিডিও ক্যাসেটটিরও কথা বলতে পারেন যেখানে আমেরিকা থেকে একজন মানুষ এসেছিল এবং তিনি মার্গারেট থেচার'স পলিসি সম্পর্কে চার বর্ণের একটি শব্দ বলেছিল এবং যখনি সে মার্গারেট থেচার-এর বিরুদ্ধে কিছু বলেছিল ইংল্যান্ড তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছিল। যদিও ইংল্যান্ড মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে।

সুতরাং এই সালমান রুশদী, যাকে আমি চিনি, সে আবারো ভুল করছে, সে আমাদের নবী করীম ﷺ-কে কটাক্ষ করছে, আমাদের সম্পর্কে কটুবাক্য বলছে,

সে কটুকথা বলছে এবং ভুল করছে। সে সমস্ত মানবতাকে কটাক্ষ করেছে। হয়তো মানুষ তার বই পুরোপুরিভাবে পড়েনি। যা সে বলেছে আমি সেগুলোও বলতে চাচ্ছি না। বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় সে সৃষ্টিকে কটাক্ষ করেছে। আমি সেই শব্দটি ব্যবহার করতে চাচ্ছি না কারণ, সেটা একটি আক্রমণাত্মক শব্দ। সে তাকে Magi (ম্যাগী) বলেছে, সে তাকে মহিলা কুকুর বলেছে। ইসলাম আপনাকে এসব বলার অনুমতি দেয় না। আপনি কি তাকে 'মহিলা কুকুর' কি জন্যে বলছেন তা প্রমাণ করতে পারবেন? আমি সেই সব শব্দ ব্যবহার করতে চাচ্ছি না যা তিনি ব্যবহার করেছেন। তিনি আক্রমণাত্মক হয়ে Magi ম্যাগী বলেছেন যা Margarat Thatcher (মাগারেট থ্যাচার) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। তার বইয়ে তিনি এমন কি রাম এবং সীতাকেও কটাক্ষ করেছেন যা মানুষ জানে না।

আমি এটা বলতে চাই না ঠিক কি বিষয়ে রাম এবং সীতা সম্পর্কে লিখেছেন। আমি যেটি করতে চাই তা হল রাজীব গান্ধীকে স্বাগত জানাতে চাই। কারণ, তিনি পৃথিবীর মধ্যে প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি প্রথমেই তার বই অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন। আমি সত্যিই তাকে ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানিয়ে। তিনি হয়তো জানেন না যে, এ বইয়ের মধ্যে রাম ও সীতাকে কটাক্ষ করা হয়েছে। হয়ত রাজীব গান্ধী জানতেন না সালমান রুশদী রাম ও সীতাকে কটাক্ষ করেছেন। আমি বইটি পড়েছি এবং চিন্তা ভাবনা করেও দেখেছি এটা ভারতের নিষিদ্ধ করা উচিত। আমি খুব ভালোভাবে বইটি পড়েছি এবং পড়ার পর নিশ্চিত হয়েই একথা বলছি। সুতরাং যদি কেউ কাউকে এমনকি আপনার মা বা বোনকে কোনো প্রমাণ ছাড়া কটুবাক্য বলে এটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি এটি বাইবেলেও রয়েছে, আপনি যদি এটা পড়েন তাহলে দেখবেন Leviticus (লিভিটিকাস) বইয়ে বলা হচ্ছে 'যদি কেউ ঈশ্বর বা ধর্মমতের প্রতি তীব্র কটাক্ষপূর্ণ কথা বলে তবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাকে পাথর মারো। সুতরাং যদি কেউ অন্যায়ের চরম সীমায় পৌঁছে যায় তবে আপনি তাকে অবশ্যই শাস্তি দিবেন। তাই যদি কেউ কোন প্রমাণ ছাড়া, কোন কিছু ছাড়াই কাউকে কটাক্ষ করে, ইসলাম তাকে সে অনুমতি দেয় না। এজন্যেই কেউ কেউ তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা বা কখনও কখনও জীবননাশের হুমকি দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ৪টি বিকল্পের কথা বলা হয়েছে।

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ـ

অর্থ ঃ 'যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে

চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।' (সূরা মায়িদাহ : ৩৩)

চারটি পথ যথা– হত্যা করা, শূলীতে চড়ানো, হাত পা কেটে নেয়া অথবা বহিষ্কার। দেখুন অত্যন্ত কঠিন শাস্তি, কিন্তু কেন? কারণ দেখুন ইসলামে কেউ অন্যায় সুবিধা নিতে পারে না। কেউ যদি জেনা করে, তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অনেকে ভাবে এটা একটি বর্বরচিত আইন। অনেকে বলে আধুনিক বিজ্ঞানের এই যুগেও অর্থদণ্ড কেন? দেখুন সব ধর্মই ভালো কথা বলছে। হিন্দু ধর্ম বলছে আপনি কোন মেয়েকে কটাক্ষ করবেন না, কোন নারীকে ধর্ষণ করবেন না। খ্রিস্টান ধর্মও তাই বলছে, ইসলাম ধর্মও।' ইসলামের ভিন্নতা হল আপনি কিভাবে এমন একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করবেন যেখানে কেউ একজন নারীকে ধর্ষণ করবে না। যেকোনো পুরুষ যখন কোন মহিলার দিকে তাকান এবং তার মনে খারাপ কোন চিন্তা আসার আগেই যেন তিনি দৃষ্টি নামিয়ে নেন। যখন সে কোন নারীর দিকে তাকাবে কুরআন বলছে, সে যেন তার দৃষ্টি সংযত করে। মহিলার জন্যে এটাই পুরুষের 'হিজাব'। আর নারীরা অবশ্যই সারা শরীর খুব ভালোভাবে ঢেকে রাখবে। কেবল দুটি অংশ বাইরে থাকবে তা হল তার মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জির পূর্ব অংশ পর্যন্ত। যদি দুই জমজ বোন কোন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় এবং একজন ইসলামিক হিজাব পরিধান করে যা তার পুরো শরীরকে ঢেকে রাখে, শুধু তার মুখ এবং কব্জির ওপর অংশ পর্যন্ত হাত ছাড়া এবং অন্য বোন যদি স্কার্ট এবং মিনি পরিধান করে এবং যদি তারা সমান সুন্দরী হয় তাহলে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মাস্তান দ্বারা কে কটাক্ষ শুনবে? অবশ্যই যে বালিকা স্কার্ট ও মিনি পরিধান করেছে সে। পবিত্র কুরআনে মুসলমান নারীদের হিজাব (বোরকা) পরতে বলা হচ্ছে–

ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ـ

অর্থ ঃ 'এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না।' (সূরা আহযাব : ৫৯)

আমেরিকাতে প্রত্যেক দিন ১৯০০ ধর্ষণের মামলা হয় এবং যদি কেউ ধর্ষণ করে তাহলে ইসলাম বলছে তার মৃত্যুদণ্ড দিতে। অনেকে এটিকে বর্বরচিত আখ্যায়িত করেন আমি প্রশ্ন করতে চাই, যদি কেউ আপনার বোন বা স্ত্রীকে কেউ ধর্ষণ করে? আর আপনি তার বিচারক হন; আপনি কি করবেন? তাদের অধিকাংশ বলেন, আমি ধর্ষককে হত্যা করবো। তাকে মৃত্যুদণ্ড দিবো। কেউ কেউ এমন আক্রমণাত্মক হয়ে যায় যে বলে তাকে পিটিয়ে হত্যা করবো। আমি এখন প্রশ্ন করতে চাই "যে আমেরিকায় প্রত্যেক দিন ১৯০০ ধর্ষণের মামলা হয়। সেখানে যদি শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং সব মহিলারা সারা শরীর ঢেকে চলাফেরা করে পাশাপাশি পুরুষরা তাদের দৃষ্টি সংযত করে। তাহলে ধর্ষণের মাত্রা কি বাড়বে, কমবে, না অপরিবর্তিত

থাকবে? এটা অবশ্যই কমবে। সৌদি আরবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম ধর্ষণ হওয়ার এটাই একমাত্র কারণ। প্রত্যেক ধর্মই ভালো কথা বলে, আর ইসলাম আপনাকে ভালো কথা বলার পাশাপাশি পথ দেখায় কিভাবে সে ভালো অর্জন করতে হয়। এজন্যেই ইসলাম মিথ্যা অপবাদে বিশ্বাস করে না। কেউ আমার মা সম্পর্কে কটাক্ষ করতে পারবে না সেটি মুসলিম দেশ হোক আর অমুসলিম দেশ হোক। হ্যাঁ আমি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলছি কিন্তু তা অবশ্যই মানুষের জন্যে উপকারী হতে হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে–

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

অর্থ ঃ 'বলুন! সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।' (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮১)

যদি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষের মঙ্গল বয়ে আনে তবে সেই মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে ইসলাম স্বাধীনতা দেয়। যদি তা মানুষের জন্যে খারাপ হয়। ইসলাম অনুমতি দেয় না।

আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে আপনি জানতে চেয়েছেন শিয়া এবং সুন্নীদের মধ্যে বিশ্বাসগত মত পার্থক্য ঠিক কোথায়? ভাই, পার্থক্যটি হল রাজনৈতিক পার্থক্য। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে শিয়া এবং সুন্নীর মত আলাদা আলাদা করে আসলে উল্লেখ নেই। পবিত্র কুরআনের কোনো জায়গায় 'শিয়া' বা 'সুন্নীর' কথা আলাদাভাবে নেই। পবিত্র কুরআনে সূরা আলে ইমরানে বলা হচ্ছে–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ

অর্থ ঃ 'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।' (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

ইসলামে 'শিয়া', 'সুন্নী' মত বলতে কিছু নেই। এগুলো পরবর্তী বর্ষে এসেছে ইসলামের ভেতরে রাজনৈতিক পার্থক্যের ভিত্তি ধরে। মুসলিম এক এবং একমাত্র সারি। মুসলিমদের ভেতরে কোনো বিভাজন নেই। 'শিয়া', 'সুন্নী' বা অন্য যেকোন কিছুর মত। কারণ পবিত্র কুরআনে সূরা আনআমের মাঝে পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ ـ

অর্থ ঃ 'নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।' (সূরা আনআম : ১৫৯)

এর অর্থ দাঁড়ায় ধর্মের বিভাজন বা খণ্ডীকরণ ইসলামে নিষিদ্ধ। তাই 'শিয়া' এবং 'সুন্নী'দের মধ্যে যে পার্থক্য এটি কোন ধর্মীয় পার্থক্য নয়। এটা একটি রাজনৈতিক পার্থক্য। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের সদুত্তোর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২৫৯। মাননীয় ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়গণ, শুভ সন্ধ্যা। আমার নাম বালাচন্দন, আমি মুম্বাই শহরের একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরি করি। ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে আমার প্রশ্ন, আজকের দুনিয়া যে রকম ধারণা করে যে, ভারতীয় মুসলমানদের ২টি পরিচয় রয়েছে। একটি হল ধর্মীয় পরিচয় যেটা তারা পেয়েছে মুসলমান হওয়ার কারণে, আর তা হলো তারা মুসলিম এবং অন্য পরিচয় হল বিধিসম্মত/আইনত পরিচয়, যা মূলত "হিন্দু উপাদান" দ্বারা গঠিত এবং এ ব্যাপারে মুসলমানদের মনে বিশেষত তাদের মধ্যে কতিপয় মুসলমানদের মনে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। আমি বিস্তারিতভাবে না বলে সংক্ষেপে বললে-- আমার কিছু বন্ধু আছে তাদেরকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় তাদের মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার আছে যা স্বভাবগতভাবেই হিন্দু আদর্শের মনে হয়। তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে যে রাশিফল নিয়ে জ্যোতিষ চর্চা করে। মুসলমান বন্ধু, মানুষ যাদের "রাহকালাম" ভাবে। সুতরাং এটি কি মুসলমানদের মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না? এখানে কি কোন দ্বন্দ্ব থাকার কথা ছিল– এই দ্বন্দ্ব কি চলতে থাকবে? কুরআন এ ব্যাপারে কি বলে? আপনি কি তাদের এই বলে চালিয়ে দিবেন যে, তারা আপনার চেয়ে কম ধর্মীয় অনুভূতিসম্পন্ন মুসলিম। আমি আশা করব ডা. জাকির নায়েক এ বিষয়ের ওপর দৃষ্টি দিবেন।

উত্তর ঃ ভাইজান একটি ভালো প্রশ্ন করেছেন, ভারতীয় মুসলমানদের প্রসঙ্গে। এটি এমনই এক প্রশ্ন যা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের যে কোনো মুসলমানদের ব্যাপারে করা যেতে পারে যে, যদি তুমি একজন মুসলিম হও তবে তুমি কি অন্য ধর্মের, অন্য জাতির, অন্য সম্প্রদাযের, অন্য সংস্কৃতির কোনো বিষয়কে অনুসরণ করতে পার হোক সেটি ভারত বা আমেরিকা বা ইউরোপের কোনো একটি দেশ। মূলত 'মুসলিম' এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার সমস্ত ইচ্ছে বিসর্জন দেয়। আমরা ভারতীয় বা আমেরিকান বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যতদূর সম্ভব অনুসরণ করতে পারব, যদি এটি ইসলামের মূলনীতির বিপরীত না হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 'মানুষ প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করে একজন মুসলিম মহিলা কি শাড়ি পরতে পারবে। যেহেতু এটি ভারতীয় সংস্কৃতি? উত্তর হচ্ছে– হ্যাঁ, তিনি পরতে পারবেন, যদি তিনি পাঁচটি বিষয় মেনে চলেন। ইসলামে পর্দার ক্ষেত্রে এই পাঁচটি বিষয় হল– ১. তার মুখ এবং হাতের কব্জি পর্যন্ত ছাড়া বাকি শরীর ঢাকা থাকতে হবে। ২. যে কাপড় সে পরিধান করবে সেটি অবশ্যই ঢিলা-ঢালা হতে হবে, টাইট হওয়া যাবে না যাতে এটি শরীরের ভাঁজকে প্রকাশ করে। ৩. এটি এমন স্বচ্ছ হওয়া যাবে না যাতে কাপড় ভেদ করে শরীর দেখা যায়। ৪. এটি এতটা আকর্ষণীয় হওয়া যাবে না যাতে বিপরীত লিঙ্গকে মোহনীয় করে। ৫. এই কাপড়টি বিপরীত লিঙ্গের সদৃশ হওয়া যাবে না।

এখন যদি আপনি শাড়ি পরতে চান তবে ইসলামি পদ্ধতি হলো– যেটি আপনি পরবেন সেটি যাতে আপনার মাথা ঢাকতে পারে, যাতে আপনার মাথার চুল দেখা না যায় এমনকি পেট দেখা না যায় সাথে সাথে শরীরের অন্য কোন অংশও যাতে দেখা না যায়। যদি আপনি এটি অনুসরণ করতে পারেন, তবে আপনি ভারতীয় সংস্কৃতি অনুকরণ করতে পারেন, কোনো আইন ভঙ্গ করা ব্যতীত। কিন্তু যদি আপনি বলেন, আমি এমনভাবে শাড়ি পরবো যাতে কোন ব্লাউজ থাকবে না এবং পেট দেখা যাবে, তবে এক্ষেত্রে ইসলাম শাড়ি পরার অনুমতি দেয় না। একইভাবে আপনি যদি আমেরিকাতে বলেন যে, আমি স্কার্ট বা মিনি স্কার্ট পরতে চাই, সেক্ষেত্রেও ইসলাম অনুমতি দেবে না। সুতরাং আপনি ইসলামের শিক্ষার বিপরীতে না গিয়ে অন্য যেকোন সংস্কৃতির অনুসরণ করতে পারবেন, ইসলামে এক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। কারণ, আমাদের জন্য আমাদের সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত আদর্শ বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের জাতিকে সার্বিক সহায়তা করতে হবে, তবে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং লালন পালন করে চলছেন তিনি হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। সুতরাং আমাদেরকে তার কৃতজ্ঞতাপাশেই অধিকারবদ্ধ থাকা উচিত, বিশ্বের অন্য যে কারো চেয়ে যেকোন সরকারের চেয়ে। তবে আমাদেরকে অবশ্যই মানুষকে সম্মান করতে হবে। যদি ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী না হয় তবে আপনি এ ধরনের সংস্কৃতি অনুসরণ করতে পারবেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে আপনি বলেছেন, আমরা কি ভাগ্য সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি? এ ব্যাপারে আল-কুরআনের সূরা মায়িদায় বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : 'হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ধারণী তীর এগুলো অত্যন্ত গর্হিত, শয়তানি কাজ। সুতরাং তোমরা এটি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক, তবেই তোমাদের কল্যাণ হবে।' (সূরা মায়িদা : ৯০)

আমি বলছি না যে, কেউই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে পারে বা পারে না– অধিকাংশ মানুষ যারা বলে, তারা ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারে, তারা একটু বেশিই বলছে। কুরআন এটি বলেনি যে, কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে বা মানুষ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে। তবে কিছু মানুষ এমন থাকতে পারে যারা এই বিজ্ঞান শিখেছে। কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষ যারা সেসব লোকদের কাছে যায়, তারা সবাই বলে যে আমি যার কাছে গিয়েছি তিনি একজন ভালো জ্যোতিষী। আসলে তাদের অধিকাংশই প্রতারিত হয়। ঐ সমস্ত জ্যোতিষীর কাছে কম্পিউটার থাকে, সেখানে আপনি

আপনার বয়স প্রবেশ করাবেন, আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন। এ ব্যাপারে আমেরিকাতে এক জরিপ হয়েছিল সেখানে মনোবিজ্ঞানের এক প্রফেসর তার ক্লাসের ১০০ ছাত্রকে নিয়ে এক সপ্তাহ যাবত চিন্তা-ভাবনা করলেন। এক সপ্তাহ পর তিনি বললেন, আমি তোমাদের প্রত্যেকের স্বভাব এক একটি চিরকুটে লিখে দিতে পারব। তারপর তিনি তাই করলেন এবং প্রত্যেকের হাতে তাদের চিরকুট দিলেন। তিনি এবার তাদেরকে বললেন, সবাই একসাথে চিরকুট খোল এবং তোমাদের মতামত বল আমার ধারণা কি সত্য না মিথ্যা।

সুতরাং প্রফেসর লিখলেন যেমন ছাত্র 'A' এবং তার স্বভাব ও তার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। এভাবে প্রত্যেককে তিনি একটি চিরকুট দিলেন। তারপর প্রফেসর বললেন, 'এখন চিরকুট খোল এবং পড়' তৎক্ষণাৎ সবাই চিরকুট খুলে পড়তে লাগল এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৯০-৯২ শতাংশই বলল যে 'প্রফেসর ১০০% সঠিক। বাকি ৮-৯% বললেন প্রফেসর ৯৫% সঠিক। এবার প্রফেসর বললেন, 'আমি সবার জন্য একই কথা লিখেছি।' সুতরাং আমি যদি বলি 'আগামী একমাসের মধ্যে আপনার জন্য খারাপ কোনো সংবাদ আছে' যদিও সেখানে সহস্রাধিক ভাল জিনিস থাকে তথাপি দুই-একটি খারাপ সংবাদ তো থাকবেই। আর আমি যদি বলি 'বিগত বছরে আপনার ভাল কোন ঘটনা ঘটেছিল যদিও সেখানে সহস্রাধিক দূর্ঘটনা ঘটেছিল তথাপি সে সময় দু-একটি ভালো ঘটনা তো ঘটতেই পারে।'

সুতরাং এইসব অস্পষ্ট বক্তব্য, যেগুলো সর্বদাই সত্য হয়ে থাকে। সুতরাং যখন আপনি পত্রিকায় পড়েন যে আজ তুলা রাশির এই এই হবে, সিংহ রাশির এই এই হবে........এগুলো সব মানুষের মধ্যে কেবল এক ধরনের উত্তেজনাই সৃষ্টি করে। সুতরাং আল-কুরআন বলেছে 'প্রশ্রয় দিয়ো না'। এমন কিছু লোক থাকতে পারে যারা বিশেষজ্ঞ আমি বলছি না 'না'। বরং কুরআন বলে যে 'যদি তুমি এমন জিনিস জান যা তোমার জানা উচিত নয়'.......এটি কিভাবে মানুষের জন্য ক্ষতিকর? কুরআন এ প্রসঙ্গে বলেছে, 'ভবিষ্যদ্বাণী করা থেকে বিরত থাক; কিন্তু কেন? কারণ যা তোমার জানা উচিত নয়, এখন এটি তোমার ক্ষতির কারণ হবে যদি তুমি এটি জানতে আস। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি জ্যোতিষির কাছে যান এবং সে যদি বলে 'আপনি কোন একটি ব্যাপারে অকৃতকার্য হয়ে যাচ্ছেন।' এই লোকটি বা ছেলেটি সর্বদা আগে ক্লাসে আসে, যেহেতু জ্যোতিষি বলেছে 'তুমি ব্যর্থ হবে' তাই সে পড়াশুনা ছেড়ে দিল এবং সে অকৃতকার্য হল। এবার ভাবুন সে কাকে দোষারোপ করবে?......সে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে দোষারোপ করবে। দেখুন জ্যোতিষিটি কি সমস্যা সৃষ্টি করল। এখন দেখা যাবে যে, জ্যোতিষির কথা সত্যি হবে, কিন্তু কেন? কেননা জ্যোতিষির ওপর লোকটির অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু লোকটি যদি তার কথা বিশ্বাস না করে পড়াশুনা করত তবে সে পাস করত। সেজন্যই ইসলাম

বলেছে, কুরআন বলেছে, 'ভবিষ্যৎবাণী করাকে প্রশ্রয় দিয়ো না।' যদি কোন মুসলমান এ কাজটি করে তবে সে নিশ্চিতভাবেই কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করল– সে অবশ্যই ভাল মুসলিম নয়, সে ইসলামের এই নীতি অনুসরণ করল না, ইসলামের অন্য সব নীতি হয়তো সে পালন করে থাকতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ২৬০। 'ইসলাম' ও 'হিন্দুত্ববাদ' আদর্শের মধ্যে পার্থক্য কী কী? পবিত্র কুরআন বলেছে, 'আল্লাহই প্রথম এবং তিনিই শেষ।' হিন্দু উপনিষদগুলো বলে, 'আল্লাহ এক.........তিনি সর্বত্র বিরাজমান। আপনার মন্তব্য কী?

উত্তর ঃ ভাইজান, খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন যে, 'ইসলাম' এবং 'হিন্দুত্ববাদ'-এর মধ্যে মিল কী কী? এবং তাদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য কী? আমি নিজে পড়েছি হিন্দু উপনিষদগুলো বলে, 'আল্লাহ এক........তিনি সর্বত্র উপস্থিত'। পবিত্র কুরআনও বলেছে, 'তিনিই শুরু, তিনিই শেষ'। কিন্তু আপনি যদি এ দু' আদর্শের মধ্যে প্রধান পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে চান তবে আপনি একজন হিন্দুকে প্রশ্ন করুন 'আপনি কতজন দেবতাকে পূজা করেন?' কেউ হয়তো বলবেন তিনজন, কেউ বলবেন দশজন, কেউ হয়ত বলবেন একশো জন, আবার কেউ বলবেন তেত্রিশ কোটি দেবতা। কিন্তু যদি আপনি একজন শিক্ষিত হিন্দুকে প্রশ্ন করেন যেমন কোন আইনজীবী যিনি সাধারণত খুব পটু হন তাদের ধর্মগ্রন্থে যে 'হিন্দুরা কতজন দেবতাকে পূজা করে?' তারা আপনাকে বলবে 'একজন'–কিন্তু তারা বিশ্বাস করে 'এনথ্রোপোমরফিজম' নামক দর্শনতত্ত্বে যার অর্থ 'দেবতা সর্বশক্তিমান'। এ দর্শনটি কেবল হিন্দু ধর্মেই নয় বরং অন্যান্য ধর্মেও আছে.........যেমন খ্রিস্টান ধর্ম, এ ধর্ম বলে যে, 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান– তিনি এত খাঁটি, এতই পবিত্র যে, তিনি জানেন না যখন তিনি আহত হন বা যখন কেউ তাকে সমস্যায় ফেলে তখন মানুষ কিভাবে অনুভব করে? সুতরাং সর্বশক্তিমান মানুষ রূপে পৃথিবীতে নেমে আসেন মানুষের জন্য আইন কানুন রচনা করার জন্য যে কোন্‌টি মানুষের জন্য ভাল আর কোনটি খারাপ।

এই দর্শনের দিকে তাকালে মনে হয় এটি খুব ভালো যুক্তি যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ এত পবিত্র যে, তিনি মানব জাতির জন্য নিয়ম-কানুন স্থির করে দেন– তিনি পৃথিবীতে আসেন কেবল মানব জাতির চলার পথের নিয়ম কানুন বেধে দিয়ে পৃথিবীকে শান্তিতে রাখার জন্য কেননা তিনি খুব পবিত্র, তিনি এতোই পবিত্র যে মানব জাতির জন্য কোনটি ভাল আর কোনটি খারাপ তা তিনি জানেন না! আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি– ধরুন, আমি একটি ভিসিআর (ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার) তৈরি করেছি– আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার, আমি কি জানতে পারব, কোনটি ভাল আর কোনটি মন্দ? না কারণ আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, 'যখন তুমি ক্যাসেট চালু করতে চাও, তবে ভিডিও ক্যাসেট প্রবেশ করাও Play বাটন চাপ দাও তবেই এটি

চালু হবে। Stop বাটন চাপ দাও, তবে ক্যাসেট বন্ধ হয়ে যাবে। উঁচু থেকে এটি ফেলে দিও না, তবে ভেঙ্গে যাবে। এটিকে পানিতে ফেলো না এটি নষ্ট হয়ে যাবে– এরকম আমি নির্দেশনা পত্র লিখে দিয়েছি।

এখন যদি আপনি বলেন, মানুষও একটি মেশিনের মতো, আমি বলব এটি সবচেয়ে জটিল মেশিন। তবে কি এটি চালু করার জন্য বা চালানোর জন্য কি নির্দেশনাপত্র দরকার নেই? আর মানব জাতির জন্য কুরআন হলো সেই নির্দেশনা পত্র। কুরআন বলে এটি 'কর' এটি 'করনা'। মানুষের জন্য সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নির্দেশনা পবিত্র কুরআনে দেয়া হয়েছে যে, কোনটি ভালো আর কোনটি খারাপ। সাধারণত হিন্দুরা বিশ্বাস করে 'পেনথেইজন' দর্শনে তার মানে হল 'সব কিছুই ঈশ্বর'। তাই প্রায় সব হিন্দুই বলে, গাছ আমাদের প্রভু, সূর্য আমাদের প্রভু, চাঁদ আমাদের প্রভু, মানুষও আমাদের প্রভু, এমনকি বানর, সাপও আমাদের প্রভু।

কিন্তু হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল মুসলমানরা বলে, 'Everything is God's মানে সবকিছু আল্লাহর। আর হিন্দুরা বলে, 'Everything is Gods' মানে সব কিছুই প্রভু/দেবতা। আমরা যদি এই God's এর মধ্যে s এর উদ্ধরণ চিহ্নের সমাধান করতে পারি তবে হিন্দু ও মুসলমানরা একত্র হতে পারে। তুমি এটি কিভাবে পারবে? পবিত্র কুরআনের সূরা আল ইমরানে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই'...... আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করব না এবং আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ত্যাগ করে অন্য কাউকে রব স্থির করব না, তারপরও যদি তারা বিমুখ হয় তবে তোমরা বলে দাও তোমরা সাক্ষী থাক আমি মুসলিম (মান্যকারী)। (সূরা ইমরান : ৬৪)

হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মগ্রন্থ বিশ্লেষণ করে আপনি কিভাবে একই এবং অভিন্ন অবস্থানে আসবেন? আপনি যদি 'ভগবদগীতা' পড়েন, দেখবেন এটি বলেছে, 'এ সমস্ত মানুষ যারা উপদেবতার পূজা করে, অলীক দেবতারপূজা করে তারা বস্তুবাদী মানুষ; কে এটি বলেছে? ভগবতগীতার ৭নং অধ্যায়ের ১৯-২৩নং পংক্তিতে এটি বলা হয়েছে। হিন্দুদের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'ইয়াযুরভেদ'-এর ৩২নং অধ্যায়ের ৩নং পংক্তিতে বলা হয়েছে, 'ঐ সকল দেবতাদের কোন আকার নেই'। এই 'ইয়াযুরভেদের' ৪০ নং অধ্যায়ের ৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে 'দেবতারা কোন আকারবিহীন, শরিক নেই, তার কোনো গঠন নেই'। ইয়াযুরভেদ ৪০ নং অধ্যায়ের ৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'ঐ সমস্ত লোক যারা প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের পূজা করে যেমন– বাতাস, পানি, আগুন, তারা অন্ধকারে রয়েছে, তারা আরো গভীর অন্ধকারে পড়তে যাচ্ছে। আর ঐ সব লোক যারা 'সামভূতি' তথা সৃষ্ট জিনিসের পূজা করে এসব লোকের ক্ষেত্রে আমি কুরআন থেকে উদ্ধৃতি করছি না আমি ইয়াযুরভেদের ৪০ নং অধ্যায়ের ৯ নং শ্লোক থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, "যদি তোমরা পূজা কর

'সামভূতি' তথা 'সৃষ্ট জিনিসের'– চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি তবে তোমরা অধিক অন্ধকারে পতিত হবে।'

সব বেদগ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে পূজনীয়, সম্মানিত গ্রন্থ ঋগবেদ-এ বলা হয়েছে, 'দেবতা কেবল একজনই, দ্বিতীয়টি নেই, মোটেই নেই, ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রও নেই।' ঋগবেদের ৮নং খণ্ডের ১ নং অধ্যায়ে ১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে 'সমস্ত প্রশংসা কেবল তারই জন্য।' যেমনটি কুরআনের সূরা ফাতিহার ১ম আয়াতে বলা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।' ঋগবেদের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪৫ নং অধ্যায়ের ১৬ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'দেবতা কেবল একজনই.......শুধু তারই পূজা কর।' যেমনটি কুরআনের সূরা ইখলাসের ১নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে নবী আপনি বলুন। আল্লাহ এক, তার কোনো অংশীদার নেই।'

সুতরাং যদি আমরা হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মীয় গ্রন্থগুলো পড়ি এবং বিশ্লেষণ করি, তবে আমরা জানব বিভিন্ন ধর্মের সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ স্রষ্টার 'একত্ববাদ' সম্পর্কে একই কথা বলেছে– আর তা হলো 'এক স্রষ্টা'। সুতরাং যদি আমরা এগুলো অধ্যয়ন করি এবং যদি আমরা Everything is God's এবং Everything-এর মধ্যেকার পার্থক্য বুঝি.......তবেই হিন্দু এবং ইসলাম ধর্ম এক হতে পারি।

প্রশ্ন ঃ ২৬১। আপনি আপনার বক্তৃতার শুরুতে কুরআনের ১টি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে, শুধু চন্দ্রই পরিভ্রমণ করছে না এবং বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে সূর্যও পরিভ্রমণ করছে। কিন্তু আপনার এ বক্তব্য মনে হয় প্রাচীন বিশ্বাসের সাথে মিলে যাচ্ছে যে, পৃথিবী ঘুরছে এবং সমস্ত স্বর্গীয় সত্তা সূর্যসহ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এটি হচ্ছে 'জিও-সেন্টিক তত্ত্ব'–আপনি জানেন যে, সমস্ত নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে–এই তত্ত্বের অধীনে, যেখানে পৃথিবী সমস্ত কিছুর কেন্দ্র। সুতরাং আপনার বক্তব্য কি এই প্রাচীন মতো বিশ্বাসের সাথে মিলে যাচ্ছে না?

উত্তর ঃ ভাইজান, চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন। আর এই জন্য আমি আপনাকে আমার 'কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান– দ্বন্দ্ব না আপস নামক ভিডিও ক্যাসেটের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড দেখার জন্য অনুরোধ করছি। এটি একটি চার ঘণ্টার ক্যাসেট, যেটা মুম্বাইতে পাওয়া যায়। আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি আমাকে সংক্ষেপে বলতে বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে সংক্ষেপে এটি বোঝানো কঠিন এবং ভাই সঠিকই বলেছেন যে, এরকম একটি তত্ত্ব ছিল যা টলেমি প্রদান করেছেন খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে যেটি 'জিওসেন্ট্রিজম' নামে পরিচিত। 'জিওসেন্ট্রিজম' মানে হলো– 'পৃথিবী হল মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু এবং সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ এমনকি সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরত'– যেটা কুরআনের বক্তব্যের সাথে পুরোপুরী সাংঘর্ষিক। প্রকৃতপক্ষে ভাইজান যেটি বলেছেন আমি কুরআনের সূরা আম্বিয়ার ৩৩নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থ : 'তিনিই সেই (মহান) আল্লাহ 'যিনি দিন এবং রাত্রি সৃষ্টি করেছেন আরো সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র ও সূর্য, তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। (নিজস্ব গতিতে) (সূরা আম্বিয়া : ৩৩)

এখানে বলা হচ্ছে সূর্য এবং চন্দ্র প্রত্যেকেই একটি কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে একটি নির্দিষ্ট গতিতে তার মানে উভয়েই তাদের নিজ নিজ গতিতে তাদের আপন কক্ষপথে ঘুরছে। কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে ব্যবহৃত 'ইয়াসবাহুন' নামক আরবি শব্দটি বুঝায় 'গ্রহ বা নক্ষত্রের চলার পথের গতি'। এটি চক্রাকারে ঘুরছে ও পরিভ্রমণ করছে। কিন্তু কুরআন এটি বলেনি যে, চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর চারপাশে পরিভ্রমণ করছে। আজ বিজ্ঞান অনেক উন্নতি লাভ করেছে তাই আগের দেয়া তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আজকে বিজ্ঞান বলে সৌর জগতের কেন্দ্রে বাস করে সূর্য। বিভিন্ন গ্রহ যেমন মঙ্গল, পৃথিবী, বৃহস্পতি ইত্যাদি সবাই তাকে আবর্তন করছে। কিন্তু সূর্য নিজেও আপন গ্যালাক্সির চতুর্দিকে ২০ কোটি বছরে একবার পরিভ্রমণ করে। যদি আপনি এই সর্বশেষ তত্ত্বটি জানেন যে, সৌরজগৎ তার আপন গ্যালাক্সির একটি পয়েন্টকে কেন্দ্র করে ঘোরে এমনকি গ্যালাক্সি ও মহাবিশ্বকে কেন্দ্র করে ঘোরে। সুতরাং কুরআন বলেনি যে, সূর্য ও চন্দ্র, সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে– যে রকম তসলীমা নাসরীন অপব্যাখ্যা করেছেন। সে বলেছে– কুরআন বলে যে, সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে। সে যেরকম অপব্যাখ্যা দিয়েছে এরকম একটি বক্তব্যও কুরআনে নেই। পবিত্র কুরআন বলেছে সূর্য এবং চন্দ্র পরিভ্রমণ করছে এবং চক্রাকারে ঘুরছে। কুরআন বলেনি যে, এগুলো পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে যেটা তসলীমা নিজে সংযোজন করেছে। ছোট বেলায় আমি যখন স্কুলে পড়ি, আমি ভাবতাম সূর্য পরিভ্রমণ করে........এটি আবর্তন করে না বরং এটি স্থির।

আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে আপনি সূর্যের ছবি দেখতে পারেন টেবিলের ওপর। যেহেতু আমরা সূর্যের প্রতি সরাসরি তাকাতে পারি না, সুতরাং আপনি টেবিলের ওপর তার ছবি দেখতে পারেন এবং আমরা জানতে পারব সূর্যের কালো দাগ পড়বে এবং একবার প্রদক্ষিণ করতে সূর্যের কালো দাগগুলোর প্রায় ২৫ দিন দরকার হয়। সুতরাং বিজ্ঞান যা বলেছে আজ তা প্রমাণিত হয়েছে, স্কুলে আমি জানতাম না। বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করেছে সূর্য আবর্তন করে এবং চক্রাকারে ঘোরে যেটি কুরআন ১৪০০ বছর আগেই বলে গেছে। কুরআনে এমন একটি বাক্যও নেই যা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের বিপরীতে যায়। কিন্তু কিছু তত্ত্ব রয়েছে যেগুলো কুরআনের সাথে বিপরীতমুখী অবস্থানে আছে যেমন ডারউইনের তত্ত্বসমূহ, পরবর্তীতে যেটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ঐসব তত্ত্বসমূহ যেগুলো আজ সুপ্রতিষ্ঠিত এমন

একটি তত্ত্বও কুরআনের একটি আয়াতেরও বিপরীতে যায় না। আশা করি উত্তরটি ভাইজানকে সন্তুষ্ট করবে।

প্রশ্ন ঃ ২৬২। ইসলাম কেন অনিরামিষ খাদ্য বা আমিষ খাদ্য খেতে পরামর্শ দেয়? এবং কেন রাজনীতিবীদরা ধর্মীয় ব্যাপার টেনে আনে (রাজনীতিতে)? ধর্ম কি রাজনীতি ছাড়া স্বাধীনভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না?

উত্তর ঃ ভাইজান ২টি প্রশ্ন করেছেন। ২য় প্রশ্নটি হলো ইসলাম ও রাজনীতি সম্পর্কিত.......ধর্ম কি রাজনীতি ব্যতিত অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে? ভাইয়েরা পূর্বেই আমি বলেছি ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে অবশ্যই রাজনীতি আছে তবে আধুনিক যুগের মত রাজনীতি নেই; যেখানে সবাই তার পকেট ভরার কাজে ব্যস্ত থাকে। সুতরাং ইসলাম বর্তমান যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধী। কিন্তু ইসলামে অবশ্যই একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। যেহেতু আমি আগেই বলেছি ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আপনি একজন ভালো মুসলিম হতে পারবেন না– একজন ভালো পার্থিব মানুষ হওয়া ব্যতিত। সুতরাং ইসলাম একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে রাজনীতির কথা বলেছে। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই ইসলাম আধুনিক যুগের রাজনীতি থেকে অনেক দূরে। ইসলাম নিশ্চয়ই ঐসব রাজনীতির বিরুদ্ধে যেখানে সবাই চেষ্টা করে তাদের পকেট পূর্ণ করতে– এক্ষেত্রে তাদের পকেট খুব গুরুত্বপূর্ণ, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, তাদের অধিকার তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আপনার প্রথম প্রশ্ন প্রসঙ্গে বলি যেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমরা প্রশ্নোত্তর সেশনের পরই ডিনার করব। আপনি প্রশ্ন করেছেন, কেন ইসলাম আমিষ খাবারের অনুমতি দিয়েছে? এটি একটি ভালো প্রশ্ন। আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, তৃণভোজী প্রাণীর দাঁতসমূহ নিয়ে যেমন গরু, ছাগল এবং ভেড়া তারা শাকসবজি খায়।

আপনি যদি মাংশাসী প্রাণীর দাঁত নিয়ে বিশ্লেষণ করেন, যেমন : সিংহ, বাঘ অথবা চিতা তাদের সবার রয়েছে সূচালো ও তীক্ষ্ণ দাঁত, তারা কেবলই আমিষ খাবার গ্রহণ করে। আপনি যদি এবার মানুষের দাঁত নিয়ে চিন্তা করেন তবে দেখবেন মানুষের রয়েছে সূচালো ও তীক্ষ্ণ দাঁত, যেহেতু মানুষ মাংশাসী সাথে সাথে তৃণভোজী– তাই মানুষের রয়েছে সর্বভুক দাঁত। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ? আমাদের সৃষ্টিকর্তা চাইতেন যে, আমরা কেবল নিরামিষভোজী হই, তবে তিনি আমাদের মসৃণ দাঁত দিতেন। কেন তিনি আমাদের তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়েছেন? এখানে একটি উদ্দেশ্য আছে, আর তা হলো গরু, ছাগল, ভেড়া এই সকল তৃণভোজী প্রাণীর হজম প্রক্রিয়া আমিষ জাতীয় খাবার হজম করতে পারে না তা বুঝিয়ে দেয়া।

একইভাবে মাংশাসী প্রাণী হজম প্রক্রিয়া শাকসবজি হজম করতে পারে না। কিন্তু মানুষের হজম প্রক্রিয়া আমিষ, নিরামিষ সবই হজম করতে পারে। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের নিরামিষভোজি হিসেবে দেখতে চাইতেন তবে কেন তিনি

আমাদের হজম প্রক্রিয়া তৈরি করে দিলেন যাতে সবই হজম হতে পারে। আপনি যদি হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ বিশ্লেষণ করেন, আপনি যদি পড়েন তবে দেখতে পাবেন সাধু এবং ঋষিগণ অনিরামিষভোজি ছিলেন, এমনকি যদি রামায়ণ পড়েন, আপনারা লক্ষ্য করুন আমি রেফারেন্স দিচ্ছি, আমি সবসময় রেফারেন্স উল্লেখ করি। মানুষের এটি ভাবা ঠিক হবে না যে আমি তাদের প্রতারিত করছি– আমি কাউকে প্রতারিত করছি না, কারণ আমি রেফারেন্স দিচ্ছি। যখন আমি মুসলমানদের সামনে কোনো তথ্য উপস্থাপন করি যে, এটি কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে, তারা আঘাত পায় আবার যদি হিন্দুদের সামনে রামায়ণ এবং বেদ থেকে উল্লেখ করি তারাও বিক্ষুব্ধ হয়। আমিষ খাওয়া প্রসঙ্গে 'অযোধ্যা খানদম'-এর ৯০ নং অধ্যায়ের ২৬ নং পংক্তিতে বলা হয়েছে, 'যখন রামকে বনবাসে পাঠানো হল, সে তার মাকে বলল, 'আমাকে সুস্বাদু মাংসের স্বাদ ত্যাগ করতে হবে।' এটি থেকে বুঝা যায় রাম আমিষ জাতীয় খাবার খেত– সে মাংস খেত। পরবর্তীতে হিন্দু ধর্মের দর্শন কেন পরিবর্তিত হয়ে নিরামিষভোজি হয়ে গেল? কারণ, তখনকার মানুষ ক্রমে 'অহিংসা' (যা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমত) দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করল। কারণ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম 'অহিংসা' নীতিতে বিশ্বাস করে। সুতরাং মানুষকে হিন্দু ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে রূপান্তরিত হওয়া থেকে নিবৃত রাখতে তারা নিরামিষভোজী হয়ে গেল।

আপনি যদি ঐসব জৈন ধর্মের লোকদের প্রশ্ন করেন 'কেন আপনারা কেবল শাকসবজি খান? তারা আপনাকে বলবে, 'উদ্ভিদ হলো প্রাণহীন, আর জীবজন্তুর প্রাণ আছে.........এবং যেকোন জীবিত সৃষ্টিকে হত্যা করা অন্যায়। আপনি যদি কোনো কারণ ছাড়া কোন সৃষ্টিকে হত্যা করেন তবে এটি ইসলামেও হারাম। আপনি যদি কোন কারণ ছাড়া একটি পিঁপড়াও হত্যা করেন তবে এটিও ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু এখানে একটি ভুল ধারণা আছে যে, গাছপালার প্রাণ নেই। আজকাল বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে এবং তা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে । সুতরাং তাদের যুক্তি ব্যর্থ হয়ে গেল। সুতরাং তারা নতুন যুক্তি নিয়ে আসল যে, যদিও উদ্ভিদের প্রাণ আছে তথাপি তারা ব্যথা পায় না; কিন্তু জীবজন্তু ব্যথা অনুভব করে। সুতরাং উদ্ভিদ হত্যা করার চেয়ে প্রাণী হত্যা আরো বড় অন্যায়। আজকে বিজ্ঞান আরো উন্নত হয়েছে এবং এমনকি এটিও জানা যাচ্ছে যে গাছপালাও ব্যথা অনুভব করে; এমনকি কাঁদে এবং সুখ-আনন্দও অনুভব করতে পারে। আপনি জানেন যে, উদ্ভিদের স্নায়ুতন্ত্র রয়েছে, কিন্তু একথাটি সঠিক নয়। এ ব্যাপারে আমেরিকায় একটি গবেষণা হয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয়েছে উদ্ভিদও কাঁদে এবং সুখ-আনন্দ অনুভব করতে পারে। উদ্ভিদের কান্না মানুষ শুনতে পারেনা, কারণ, মানুষের কানের শোনার ক্ষমতা প্রতি সেকেন্ডে মাত্র ২০ থেকে ২০,০০০ চক্র। আপনি জানেন যে একটি কুকুরের শ্রবণ শক্তি সেকেন্ডে ৪০,০০০ চক্র।

সম্ভবত উদ্ভিদের কান্নার সীমা অনেক বেশি তাই যখনই একজন কৃষক যন্ত্র নিয়ে আসে এবং পানি পায় না তখন সে কাঁদে এবং সে এটি শুনতে পারে। সুতরাং উদ্ভিদ ব্যথা অনুভব করে, এমনকি তারা সুখ-আনন্দও অনুভব করে; এমনকি তারা কাঁদতেও পারে। সুতরাং একজন মানুষ আমাকে সর্বোচ্চ যুক্তি দিতে পারে এই বলে যে, জাকির ভাই, আমি আপনার সাথে একমত যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে, তারা ব্যথা অনুভব করে। কিন্তু আপনি দেখেন যদি আপনি যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করেন, যে প্রাণীদের ৫টি ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু উদ্ভিদের ২ বা ৩টি ইন্দ্রিয় আছে। সুতরাং ৫ ইন্দ্রিয় সম্পন্ন একটি সৃষ্টি হত্যা করা ২ বা ৩ ইন্দ্রিয় সম্পন্ন একটি সৃষ্টি হত্যা করার চেয়ে নিশ্চিতভাবেই বেশি অপরাধ। আমি বলি, কথাটায় যুক্তি আছে। তর্কের খাতিরে আমি আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। ধরুন, আপানার ভাই বধির ও বোবা হয়ে জন্ম নিল, যখন সে বড় হল তখন যদি একজন অপরাধী এসে তাকে মেরে ফেলে তখন আপনি কি বিচারককে গিয়ে বলবেন, মাননীয় আপনি হত্যাকারীকে কম শাস্তি দিন, কারণ আমার ভাইয়ের ২টি ইন্দ্রিয় কম ছিল? আপনি কি এটি বলবেন? বরং আপনি বললেন মাননীয় আদালত আপনি হত্যাকারীকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিন কারণ, সে একজন অসহায়কে হত্যা করেছে।

সুতরাং ইসলাম ধর্মমতে আপনি সবই খেতে পারেন। আল্লাহ পাক সূরা বাক্বারার ১৬৮ নং আয়াতে বলেছেন, 'আমি তোমাদের (খাদ্যরূপে) যা দিয়েছি সেইসব পবিত্র খাদ্য খাও।'

কিন্তু একজন মুসলিম, একজন খুব ভাল মুসলিম হতে পারবে শুধু নিরামিষ খেয়েও। কুরআন এটি বলে নি যে তোমরা নিরামিষ খাবার খেতে পারবে না। আপনি শুধু শাকসবজি খেয়েও ভাল মুসলিম হতে পারেন। কিন্তু যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন, দেখবেন উদ্ভিদের মধ্যে কোন প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন নেই। আপনি কি জানেন যে উদ্ভিদের মধ্যে বা শাকসবজির মধ্যে সর্বোচ্চ যে প্রোটিন পাওয়া যায় সেটি হল 'সয়াবিন' যেটি প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন? প্রাণীজ খাবারের মধ্যে রয়েছে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন, যেটি উদ্ভিদের মধ্যে নেই। কিছু কিছু বিজ্ঞানীদের তৈরি অনুচ্ছেদে লিখা রয়েছে যে অউদ্ভিদের চেয়ে উদ্ভিদজাতীয় খাবারে বেশি উপকারী বস্তু রয়েছে; কারণ তারা এটি লিখে এজন্য যে এটি তাদের জীবন দর্শন। অন্যদিকে অউদ্ভিদজাত বিজ্ঞানীরা তাদের অনুচ্ছেদে/রচনায় দেখিয়েছেন যে এটি প্রমাণিত সত্য নয়। সুতরাং আপনি যদি এমন লোক হন যিনি উদ্ভিদজাত ও অউদ্ভিদজাত উভয় প্রকার খাবারের গুণাগুণ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তখন আপনি জানতে পারবেন, অউদ্ভিদজাত খাবার মানুষের শরীরের জন্য উপকারী। সুতরাং যখন আল্লাহ আমাদের ভাল খাদ্য দিয়েছেন, যা আমাদের কাছে রয়েছে, তবে কেন আমরা এসকল খাবার খাওয়া থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ঃ ২৬৩। কিছু মানুষ মনে করে মুসলমানগণ অউদ্ভিদজাত খাবার, যেমন : পশুর মাংস খায়, ফলে তারা তাদের আবেগ ও অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না– এটি কি সঠিক? দয়া করে-এর উপর আলোকপাত করুন।

উত্তর ঃ ভাইয়া একটি ভালো প্রশ্ন করেছেন এবং এটা ঠিক যে খাবারের প্রভাব মানুষের আচরণের ওপর পড়ে। আমি এ যুক্তির সাথে একমত যে, আপনি যে খাবার খান তার একটি প্রভাব অবশ্যই আপনার আচরণের ওপর পড়বে। আর এ জন্যই ইসলাম আমাদেরকে শুধু তৃণভোজী প্রাণী খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন– গরু, ছাগল এবং ভেড়া। আর তাই মুসলমানগণ শান্ত প্রকৃতির হতে যাচ্ছে। তাই আমাদের জন্য সিংহ, বাঘ, কিংবা চিতার মতো মাংশাসী প্রাণী খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। আপনি যদি এসব প্রাণীর মাংস খান তবে আপনি সিংহ, বাঘ বা চিতার মতো হয়ে যাবেন......সঠিক তাই না? আপনি যে খাবার খান, বিজ্ঞান বলে যে, তার প্রভাব আপনার আচরণের ওপর পড়বে। এই কারণে আপনাকে কেবল তৃণভোজী প্রাণী যেমন– গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশু খাবারের অনুমতি দেয়া হয়েছে, যেখানে আপনি জানেন যে, গরু খুব নম্র প্রাণী। আমরা এই সব প্রাণী খাব কারণ, আমরাও নম্র হতে চাই।

অ-উদ্ভিদজাত খাবার যেমন পশুর মাংস বিশেষত সিংহ, বাঘ এবং চিতা,–এ সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, যে কোনো মাংশাসী প্রাণী যার ছেদক দাঁত এবং হিংস্র নখর রয়েছে তার মাংস খাওয়ার অনুমতি তোমাদের দেয়া হয় নেই। আমেরিকায় এ ব্যাপারে গবেষণা করা হয়েছে যে, এক শ্রেণীর মানুষ যারা কয়েকমাস যাবত শুধু উদ্ভিদজাত খাবার খেয়েছে এবং অন্য শ্রেণী যারা অউদ্ভিদজাত খাবার খেয়েছে।

যখন আপনি বলবেন অউদ্ভিদজাত তখন আপনি কেবল অউদ্ভিদজাত খাবারই খাবেন এবং এটি বুঝায় অউদ্ভিদজাত খাবারের সাথে উদ্ভিদ খাবারও বটে। যখন আপনি উদ্ভিদজাত বলেন, এটি সাথে সাথে উদ্ভিদজাত খাবারও অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং ঐসব লোক যারা অউদ্ভিদজাত খাবার খায়, তাদের সামাজিক আচরণ অনেক সুন্দর হয় ঐ সমস্ত লোকের চেয়ে যারা কেবল উদ্ভিদভোজী। এটি একটি গবেষণার ফলাফল যার নথিপত্র এখানে রয়েছে। কিছু মানুষ এ ব্যাপারটি নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে, আপনি যদি উদ্ভিদভোজী হন, তবে পার্থক্য খুব বেশি কিছু নয়। যারা উদ্ভিদভোজী তাদের আচরণ কিছুটা কম আন্তরিক হয়, অ-উদ্ভিদভোজীদের চেয়ে গবেষণায় তাই দেখা যায়।

কিন্তু অনেক উদ্ভিদভোজী আছেন যারা নরম মনের অধিকারী, কারো আচরণ হিংস্র, আবার অনেক অউদ্ভিদভোজী আছেন যাদের আচরণ নম্র-ভদ্র আবার কেউ কেউ হিংস্র আচরণের অধিকারী। এটি আবহাওয়ার প্রভাবে হয়ে থাকে। কিংবা ছোট বেলার শিক্ষার কারণে হয়ে থাকে–খাদ্যাভ্যাসের কারণে নয়। সম্ভবত

গবেষণাকারিগণ যাদের নিয়ে গবেষণা করেছেন, তারা ছিল হিংস্র আচরণের অধিকারী এবং তারা তাদেরকে বলেছে যে তারা এরূপ আচরণ করে। অন্যথায়, ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যার মূল শব্দ 'সালাম' যার অর্থ শান্তি। সুতরাং সর্বদা আমরা শান্তি বজায় রাখি এবং শান্তি আনতে চেষ্টা করি। ইসলাম সত্যিকার অর্থেই একটি শান্তিপ্রিয় এবং দয়ার ধর্ম। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২৬৪। পবিত্র কুরআন বলছে, আল্লাহ্ মহাক্ষমাশীল। পরবর্তীতে এটাও বলা হচ্ছে যে, অমান্যকারীদের জন্যে খুব কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং তিনি কি একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ? আল্লাহ্ কি প্রতিহিংসাপরায়ণ নাকি আল্লাহ্ ক্ষমাশীল?

উত্তর ঃ ভাই আপনি খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন। আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি। আমি এ ক্ষেত্রে রয়েছি তাই আপনার প্রশ্নটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। ভাই আপনি যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন তা হল পবিত্র কুরআন বলছে আল্লাহ্ তায়ালা পরম করুণাময় অসীম দয়ালু, তার পরও তিনি কেন শাস্তির বিধান করছেন? এজন্য আপনি বলছেন আল্লাহ্ প্রতিহিংসাপরায়ণ অথবা আপনাকে আতঙ্কগ্রস্ত করছেন এবং আপনার জন্যে রয়েছে শাস্তি। যেমন আমি বলছি পৃথিবীতে ধর্ষণের জন্যে অর্থনৈতিক দণ্ডের বিধান রয়েছে। কুরআনে কিছু শাস্তির কথায় বলা হয়েছে দোজখের আগুনে জ্বালানো হবে।

ভাই, আপনাকে একটি বিষয় অনুভব করতে হবে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পাশাপাশি আল্লাহ্ একজন ন্যায়বিচারক। পবিত্র আল-কুরআনে তাঁর ৯৯টি নামের কথা বলা হচ্ছে। যার মধ্যে ক্ষমাশীল ও ন্যায়বিচারক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ জেনা করে, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী আপনি বলতে পারেন না আল্লাহ্ মহাক্ষমাশীল। সুতরাং আল্লাহ্ ধর্ষণকারীকে মুক্তি দিয়ে দেবেন। এটা কোন ক্ষমাশীল আল্লাহ্ নন এবং একজন অবিচারক আল্লাহ্। যদি আপনি ধর্ষককে মুক্ত করে দেন তাহলে ধর্ষিতাকে কি জবাব দিবেন? বর্তমান বিজ্ঞান বলছে, যে ব্যক্তি একবার জেনা করে এবং আবার সমাজে ফিরে আসে তার মধ্যে আবারো জেনা করার ৯৫ শতাংশ সম্ভাবনা থাকে। সবাই বলছে প্রথমত, তাকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দাও এবং যদি সে আবারও করে তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দাও।

বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানে আমেরিকা সম্পর্কে বলা হচ্ছে যখন একজন মানুষ ধর্ষণ করে এবং আবারো সমাজে ফিরে যায় ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে সে আবারো ধর্ষণ করে। আল্লাহ্ তায়ালা একই সাথে ক্ষমাশীল এবং ন্যায় বিচারক। যে মহিলা ধর্ষিত হয় আল্লাহ্ তার কাছে ন্যায় বিচারক। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল সেই ব্যক্তির কাছে যে আবারও ধর্ষণ করছে, যে ধর্ষণ করা তার জন্যে খারাপ। একইরকমভাবে যদি তুমি চুরি কর, পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে তার হাত কেটে দাও। আপনি এটাকে খুব নৃশংস আইন বলতে পারেন এবং বলতে পারেন ওহ্ ইসলাম খুবই নৃশংস;

হাতকাটার ক্ষেত্রে। প্রথমত ইসলাম বলছে যাকাত প্রথার কথা। যেমন : আমি প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির জমাকৃত সম্পদের শতকরা ২.৫ (আড়াই) ভাগ গরিবকে দেয়ার বিধানের কথা বলেছি। এটা দেয়ার পর যদি কেউ চুরি করে তখন তার হাত কেটে নেয়ার কথা বলা হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদা-এ বলা হচ্ছে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ 'যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও। তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দণ্ড হিসাবে।' (সূরা মায়িদা : ৩৮)

মানুষ ভাবতে পারে, আপনি যদি সৌদি আরবের এদিক থেকে ওদিকে যান প্রত্যেক দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একজনের হাত কাটা থাকবে। আমি সৌদি আরবে গিয়েছি আমি একজনও মানুষ দেখিনি; যাদের হাত কাটা। সেখানে কিছু মানুষ এরকম থাকতে পারে কিন্তু আমি তাদের মধ্যে দিয়ে আসি, এটা খুব সাধারণভাবে চোখে পড়ে না। আপনি যদি বর্তমানে আমেরিকাতে শরিয়াহ্ চালু করতে চান, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি যাকাত আদায় করবে অথবা দান করবে এবং তারপর যদি কেউ চুরি করে তার হাত কেটে নেয়া হবে। এটা কি আমেরিকার খারাপ কাজকে বাড়াবে? একই রকম রাখবে? না কমাবে? এটা অবশ্যই আমেরিকার খারাপ কাজ কমাবে। সুতরাং আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং ন্যায়বিচারকের পাশাপাশি এ দুটি কাজ করতে তিনি খুবই সতর্ক। এই তিনটি বিষয় একই সাথে তখনই করা সম্ভব, যদি কেউ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য কিছু করতে চায়। সব মানব জাতির জন্যে তিনি ক্ষমাশীল। সুতরাং তিনি জেনা বন্ধ করতে চান না। এটা কি ক্ষমাশীলতা নাকি ক্ষমাশীলনতা না, আপনিই বলুন? ঠিক আছে এটা ক্ষমাশীলতা। সুতরাং আপনি বলছেন মানুষ আনন্দ করুক। আর আজ আপনি ১,০০০ ধর্ষণ কবছেন কাল থেকে প্রত্যেক দিন ১০,০০০ (দশ হাজার) করে করবেন এবং এটা বাড়তে থাকবে।

সুতরাং আল্লাহর এই আইন সমগ্র মানব জাতির জন্যে ক্ষমাশীলতাস্বরূপ। কোন একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য নয়। কেবল সৌদি আরবের জন্যে অনুমোদিত নয়। শুধু আমেরিকার জন্যে নয়। তিনি ক্ষমাশীল সমগ্র মানব জাতির জন্যে। এজন্যেই এ ধরনের শাস্তি রাখা হয়েছে, যার ফলে অন্যায়কারীরা নিজেদেরকে উন্নত করতে পারে এবং সুবিধাটা সকল মানবজাতি ভোগ করতে পারে। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ঃ ২৬৫। আজ সবাই নারী অধিকার নিয়ে যেভাবে আওয়াজ তুলছে সেই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই নারীকে পুরুষের সমান অধিকার পেতে হলে

তো তাকে পুরুষের সমান দায়িত্বও পালন করতে হবে, কিন্তু তারা দায়িত্ব পালন কম করে কিভাবে সমান অধিকারের কথা বলে?

উত্তর : ভাই আপনি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, নারীদের নিজেদেরকে উন্নতির স্তরে নিয়ে যেতে তাদের অনেক দায়িত্ববোধ রয়েছে। আমি আপনার কথার সাথে একমত, এর বিস্তারিত আমার ভিডিও ক্যাসেটে রয়েছে। এটা কথার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এখনো তাদের অধিকার সমান। কুরআন তাদেরকে নিচের স্তরে রাখেনি। কুরআন পরিষ্কারভাবে বলছে– 'নারীদের পুরুষের ওপর তেমনি ন্যায়ানুগ অধিকার রয়েছে; যে রকম রয়েছে পুরুষের নারীর ওপর।'

তাদের সমান অধিকার রয়েছে। তাদের সেই অধিকারগুলো কি? ভাই আপনি আমার বক্তব্যের ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন। তাদের অধিকার রয়েছে কিন্তু তারা সমান। এর অর্থ এটি নয় যে, তাদের ওপর অধিক বোঝা চাপানো হয়েছে, সুতরাং পুরুষরা আরাম করতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিক চাপ গ্রহণ করতে হয় যেখানে পুরুষরা কম চাপ বহন করে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের অধিক বোঝা বহন করতে হয় সেখানে মহিলাদের কম দায়িত্ব গ্রহণ করলেও চলে। যেমন পরিবারের ভরণপোষণ পরিচালনার দায়িত্ব বা বোঝা পুরুষের ওপর বর্তায়। এটা পুরুষের দায়িত্ব যে, মহিলাদের থাকার, খাওয়ার ও পরিধানের ব্যবস্থা করবে। তার বিবাহ এর পূর্ব পর্যন্ত এই খাওয়ার, থাকার ও পরিধানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তার পিতার ও ভাইয়ের এবং বিবাহের পর তার সব কিছু দেখার দায়িত্ব তার স্বামীর ও সন্তানের। যদি আপনি আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখেন, দেখবেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি পুরুষদের চেয়েও নারীদের দায়িত্ব বেশি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের দায়িত্ব বেশি। সামগ্রিকভাবে তারা সমান। আশা করি এ উত্তর আপনাকে সন্তুষ্ট করবে।

প্রশ্ন ঃ ২৬৬। আপনি কি কাশ্মীরে গিয়েছেন এবং সেখানকার হিন্দু ও মুসলিমকে বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে সাফল্য লাভ করেছেন?

উত্তর ঃ ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন আমি কাশ্মীরে গিয়েছি কিনা এবং সেখানকার মানুষকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিয়েছি কিনা এবং কৃতকার্য হয়েছি কিনা? আমি আশা করি কেউ সেখানে চেষ্টা করবেন। আমি কাশ্মীর গিয়েছিলাম যখন আমি খুব ছোট ছিলাম ঘুরে দেখার জন্যে। কিন্তু বর্তমান সময়ে যাই নি। কিন্তু প্রত্যেকেরই কুরআনের পুরো অংশ মেনে চলা উচিত। আপনি কুরআনের একটি অংশ অনুসরণ করে বলতে পারেন না এটা কৃতকার্য হয় নি। যদি কেউ কাশ্মীরে বসবাস করে এবং সে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান যাই হোক না কেন কুরআন পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। আশা করি এটা আপনার প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন ঃ ২৬৭। আমি একটি প্রশ্নে পরিষ্কার হতে চাই যে, চিরাচরিত ইচ্ছে আসলে কি? সেখানে ইসলামে বলা হচ্ছে আল্লাহর হুকুম বা ইচ্ছে এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছের কথা। ইসলাম ধর্মের মতবাদ অনুযায়ী বলা হয় আল্লাহর চিরাচরিত ইচ্ছের ওপর ভিত্তি করে সব শক্তি পরিচালিত হয়। আবার বলা হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষ তার কৃতকর্মের জন্যে সে নিজেই দায়ী। মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছে সম্পর্কে পরিষ্কার ব্যাখ্যা চাই।

উত্তর ঃ ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন যে আল্লাহর ইচ্ছে এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছের মধ্যে পার্থক্যটা ঠিক কোথায়? এটা ঠিকভাবে সমর্থনযোগ্য যে, পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে আল্লাহর হুকুম বা ইচ্ছে ছাড়া একটি গাছের পাতাও পড়ে না। সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছে অনুযায়ী হয় তাহলে মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছের কি ক্ষমতা থাকলো? ব্যক্তিগত ইচ্ছে বলতে বুঝায় প্রত্যেকটি মানুষের যে নিজস্ব ইচ্ছে থাকে সেটি। উদাহরণস্বরূপ, আমি আপনাকে বললাম, বিদ্যুৎ সরবরাহ মূলত আসছে প্রধান শক্তিকেন্দ্র থেকে এবং আপনি এখানে তার সাথে সংযুক্ত হচ্ছেন মাত্র। মূল শক্তিটি কিন্তু আসছে প্রধান শক্তিকেন্দ্র থেকে। একজন মানুষ যদি চলন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহে হাত দেয় সে শট করবে এটাই স্বাভাবিক। এর জন্যে কে দায়ী? সে নিজেই। আল্লাহ তাকে স্বাধীনভাবে বেছে নেয়ার সুযোগ দিয়েছেন সে তার হাত দিতেও পারে, নাও দিতে পারে। এর জন্যে তুমি শক্তি কেন্দ্রকে দোষারোপ করতে পারো না। তুমি সেই মানুষকে দোষারোপ করতে পারো কেন সে চলন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহে হাত দিলো? সেই শক্তি কি আসছে আল্লাহর কাছ থেকে! আল্লাহর শক্তি ছাড়া কিছুই ঘটবে না। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর শক্তি রয়েছে, সুতরাং আল্লাহ আপনাকে বেছে নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন খারাপের মধ্যে থেকে ভালোকে। তিনি আপনাকে একটি খুন করা থেকে বিরত রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি আপনাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন, কেন? কারণ আমি আগেই বলেছি সূরা মুলুক-এর মাঝে আল্লাহ বলছেন–

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً .

অর্থ ঃ তিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন– কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ। (সূরা মুল্‌ক : ২)

আমাদের সর্বোচ্চ গড় আয়ুষ্কাল ৬০ বছর। কোন কোন মানুষ ২০ বছর বেঁচে থাকে। কেউ কেউ আশি (৮০) বছর, আবার কেউ ৯০ বছরের জন্য। গড়ে মানুষ ৫০ থেকে ৬০ বছর বাঁচে। সুতরাং আল্লাহ বলেন, এই জীবনটা পরবর্তী অনন্ত জীবনের জন্যে একটি পরীক্ষা মাত্র। আল্লাহ আপনাকে স্বাধীন ইচ্ছে দিচ্ছেন। পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ তা দেখিয়ে দিচ্ছেন। যদি তুমি কুরআন অনুসরণ কর তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, যদি তুমি অনুসরণ না কর তুমি অকৃতকার্য হবে। আল্লাহ আপনাকে স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন। আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২৬৮। আমাদের মুসলমানদের মধ্যে একটি অংশের ভ্রাতৃগণ মিলাদ মাহফিল করতে নিষেধ করেন। আমি কেন শহরে মিলাদ মাহফিল করা থেকে বিরত থাকবো? মিলাদ অনুষ্ঠান সম্পর্কে ইসলামে কী বলা হচ্ছে?

উত্তর ঃ নবাব সাহেব একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন এবং আমি এই তথ্যটি সৌদি আরব থেকে পেয়েছিলাম যে মাদ্রাজের কিছু নওয়াব মিলাদ অনুষ্ঠানের বিপক্ষে বলছেন এবং আমি বলেছিলাম আমি একজন নওয়াবকে চিনি যিনি প্রিন্স সারকত এবং আমি অন্য কাউকে চিনি না যারা একথা বলছে। সুতরাং আমি ভেবেছিলাম এটি একই ব্যক্তি যিনি মিলাদ অনুষ্ঠান থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করছেন। বিষয়টি হচ্ছে এই যে, যে বিষয়ে কুরআন এবং সহীহ হাদীসে কিছু উল্লেখ নেই এমন কিছু যদি ইসলামে সৃষ্টি করা হয় তাহলে তাকে 'বিদআত' অর্থাৎ আবিষ্কার বলে। আমি জীবন চলার পথে নতুন কিছু আবিষ্কার করি নি। আপনি কিভাবে একজন ডাক্তার হতে পারেন। যদি আমার একটি নতুন পদ্ধতি, নতুন আবিষ্কার থাকে তাতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে আপনি নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না। হযরত মুহাম্মদ ﷺ কখনোই বলেন নি তোমরা আমার জন্মদিনে অনুষ্ঠান পালন কর অথবা আমার মৃত্যুর দিনে। আপনি হয়ত জানেন ১২ই রবিউল আউয়াল নবী করীম ﷺ-এর জন্ম ও মৃত্যুর দিন। সুতরাং আমি লোকদের জিজ্ঞেস করি আপনারা কি তাঁর জন্ম অথবা মৃত্যুদিনে অনুষ্ঠান পালন করতে চান? যদিও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, তিনি ৯ই রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২ রবিউল আউয়াল মৃত্যুবরণ করেন। যা হোক, এটা কোন সহীহ হাদীসে নেই এই দিনগুলো আপনি উদ্‌যাপন করতে পারেন। আপনি যদি একটি ভালো আলোচনা সভা করেন, ভালো কথা বলেন, অন্য মানুষকে নবী সম্পর্কে ভালো শিক্ষা দেন সেটা অবশ্যই ভালো। কিন্তু আপনি অনুষ্ঠান করে টাকার অপচয় করবেন, আপনি মিছিল করবেন, বাদ্য বাজনা করবেন, এগুলো সব ইসরাফ। পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈল এর মধ্যে বলা হচ্ছে–

إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ـ

অর্থ ঃ 'নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।' (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৭)

আমাদের কিছু মুসলমান ভাই আছেন যারা ঐ দিন গান বাজনা করেন, বাজি ফোটান এবং রাস্তায় অনেক বড় র‍্যালি বের করে মিছিল করেন। স্লোগান দেন নবীরে কখনও ছাড়বো না কখনো ছাড়বো না। আমি তাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই কোথায় পেলেন বা ধরলেন যে, তা ছাড়বেন না। ছাড়ার প্রশ্ন তখনই জাগে যখন আপনি ধরেন। সুতরাং প্রথমে ধরুন "আতি-আল্লাহ-আতিউর রসূল" বুঝে বুঝে কুরআন ও হাদীস পড়ুন এবং সেখানে আপনি প্রকৃত সত্য জানতে পারবেন। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২৬৯। আল্লাহ এক, তিনি অনেক নবী পাঠিয়েছেন এই পৃথিবীতে, মুসলমানরা ঈসা (আ)-কে তাদের নবী হিসেবে বিশ্বাস করেন, খ্রিস্টানরাও তাদের নবী হিসেবে বিশ্বাস করেন। ঈসা (আ) সৃষ্টি, বহির্গমন, নবী সংখ্যাও বাইবেলের পঞ্চম পুস্তক অনুযায়ী মানবতাবাদের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, তিনি দশটি বিষয়ের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, এখানে খুব ভালো করে লেখা আছে– "সৃষ্টিকর্তাই হচ্ছে একমাত্র প্রভু" এর মধ্যে এক্সুডার্স এর ২০তম অধ্যায়ের ৪ নং পংক্তিতে শনিবারকে পবিত্র দিন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, বলা হয়েছে, "শনিবারকে পবিত্র দিন মান্য করো, সৃষ্টিকর্তা ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, ইসলাম দাবি করে ঈসা (আ) তাদের নবী এবং খ্রিস্টানরা বলে তাদের নবী তবে কেন সেই গুরুত্ব ভিন্ন ভিন্ন?

উত্তর ঃ ভাই খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন, আমি প্রশ্নের প্রতিটি পয়েন্ট এর উত্তর সুন্দর করে দিতে ভালবাসি। আপনি কিছু বাক্য বললেন এবং আমি বিশ্বাস করি সেখানে আমার জন্য ১০টি প্রশ্ন রয়েছে।

আমি একজন ধর্মীয় ছাত্র। আমি বাইবেল, কুরআন, বেদ, ভগবতগীতা পড়েছি এবং আমি পছন্দ করি এসব নিয়ে আলোচনা করতে, সত্যটা জানতে, যীশু বলেছেন– যা এক্সুডাসে উল্লেখ আছে, কিন্তু আপনি প্রথম কিছু আয়াত-এর কথা বলেন নি। আমি প্রথম আয়াতগুলোর কথা উল্লেখ করছি, আপনি যদি এক্সুডাস পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন, ২০ নং অধ্যায়ের ২ নং পংক্তিতে বলা হয়েছে– তুমি ছাড়া অন্য কোন প্রভু নেই, তুমি কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তৈরি করনি। যেমন– বেহেশত, আসমান, জমিন, মাটির নিচের পানি। তুমি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ কর না এবং তুমি তাদের ওপর অনুগ্রহ কর না, তুমি ঈর্ষান্বিত প্রভু, একথা কে বলেছে? সরাসরি এক্সুডাসে একথা বলা হয়েছে, কিন্তু আপনি চলে গেছেন ৮ম পংক্তিতে।

যীশু খ্রিস্ট ঠিক একই কথা বলেছেন যেমন মসীহ তার ডিউটেরনমি গ্রন্থের, ৬ অধ্যায়ের ৪৭ নং পংক্তিতে বলেছেন, 'হে ইসরাঈলবাসী, ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র প্রভু।' এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক, এখানে অনেক প্রশ্ন আছে, কিন্তু সময় আমাকে সব প্রশ্নের উত্তর দেবার অনুমতি দিবে না। মূল প্রশ্নটা হল "রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য কেন? ইহুদিদের মতে, শনিবার হচ্ছে বিশ্বসৃষ্টির দিন এবং যীশু তার প্রচারিত বাণীতে বলেছেন– তুমি হচ্ছ ধর্ম যাজক, তোমাকে প্রভুর বাণী অবশ্যই জানতে হবে, আমি মনে করি, আমি আইন ভাঙ্গতে আসিনি, আমি নবী এবং পরিপূর্ণতার জন্য।

যীশুখ্রিস্ট বাইবেলে বলেছেন, আমি ধ্বংস করতে আসিনি আইন এবং ধর্মযাজককে। আমি ধ্বংসের জন্য নয়, পরিপূর্ণতার জন্য এসেছি। এজন্য যতক্ষণ

না পর্যন্ত বেহেশত এবং পৃথিবী আলাদা, ততক্ষণ আইনের বাইরে কেউ না পরিপূর্ণতার আগ পর্যন্ত, সেজন্য যে একটি নীতি ভাঙ্গবে এবং তা অন্যকে করতে বলবে তাকে বেহেশতে সবার পরে প্রবেশ করতে দেয়া হবে এবং যে নীতি শিক্ষাগ্রহণ করবে এবং অন্যকে করতে বলবে তাকে বেহেশতে সম্মান জানানো হবে। ক্রাইচ এবং ফারাসেসদের থেকে– যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমার সততা বেশি হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। যীশু খ্রিস্ট বলেছেন– কেউ যদি ভাল খ্রিস্টান হতে চাও তাহলে তাকে তুরাহ এর প্রতিটি বিষয় অনুসরণ করতে হবে ঈসা বলেছেন– তোমাদেরকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। যদি কেউ আংশিক পালন করে তাহলে তারা বেহেশত-এ প্রবেশ করবে না। এটা কে বলেছে? যীশু বলেছেন– তাই খ্রিস্টানদের জন্য প্রশ্ন হচ্ছে কেন তারা শনিবারকে পবিত্র দিন হিসেবে মানে না।

যীশু বলেছেন, আমি নিয়ম ভাংতে আসিনি, আমি নবী এবং এসেছি পরিপূর্ণতার জন্য কিন্তু যখন হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছিলেন তিনি তা বলেন নি। কুরআনের সূরা বাকারার ২য় পারার ১০৬ নং আয়াতে আছে, 'তোমাদের কাছে শেষ গ্রন্থ পাঠানো হলো, তোমাদেরকে আয়াত দেয়া হলো।' কিন্তু আমরা সেই সব জিনিস পরিবর্তন করতে পারি পূর্বের চেয়ে ভালো বা একই রকম। কুরআন বিশ্বাস করে মূসা (আ) আল্লাহর প্রদত্ত নবী, ইসলাম হচ্ছে অখ্রিস্টানদের বিশ্বাস, যারা যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে, আমরা বিশ্বাস করি, তিনি আল্লাহর পাঠানো একজন নবী, আমরা আরো বিশ্বাস করি তিনি আশ্চর্যজনকভাবে পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন– (যা আধুনিক খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে না) আমরা বিশ্বাস করি যীশুকে জীবন দেয়া হয়েছে মৃত্যুর জন্য প্রভুর নির্দেশে। আমরা আরও বিশ্বাস করি তিনি অন্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করেছেন প্রভুর নির্দেশে।

কিন্তু আমরা কি বিশ্বাস করি এতক্ষণ যা বললাম? পূর্বের সব নবী এসেছেন নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠী বা জাতির জন্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কুরআনের সূরা আলে-ইমরানের ৩ পারার ৪৯ নং আয়াতে 'ঈসাকে পাঠানো হয়েছিল বনী ইসরাঈলদের কাছে, যীশু তার বাণীতে বলেছেন– তার ১২টি নীতির কথা ১০ নং পারার ৫-৬ নং আয়াতে তোমরা যেওনা ইহুদি ছাড়া অন্যদের পথে। কারা অইহুদি ছিল? ইহুদি নয় এমন হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান। যীশু বলেছেন, তোমরা ইহুদি ছাড়া অন্যদের পথে যেওনা। তোমরা সামারিটাস শহরের দিকে যেওনা বরং খারাপ থেকে বিরত রাখে এমন ইসরাঈলের দিকে যাও। যীশু তার বিধানে বলেছেন আমাকে ইসরাঈল ছাড়া অন্য কারো জন্য পাঠানো হয় নি। অর্থাৎ যীশু শুধু ইহুদিদের জন্য এসেছিলেন অন্য কোন সম্প্রদায়ের জন্য নয়। এটা যীশু বলেছেন, এই কথা বাইবেলে উল্লেখ আছে, কিন্তু হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পাঠানো হয়েছিল সমগ্র বিশ্বের শান্তিস্বরূপ। সুতরাং হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে গ্রন্থ পেয়েছেন তা

অন্যান্য গ্রন্থের মত না। তবে প্রকৃত কথা একই– খোদা এক, তোমরা মূর্তিপূজা করো না। প্রকৃত কথা একই কিন্তু নীতি/নিয়ম আলাদা। অর্থাৎ শুধু বাহ্যিক কানুনগুলোর পরিবর্তন, ইহুদিরা ইবাদত করে শনিবারে, কিন্তু খ্রিস্টানরা রবিবারে, কিন্তু কেন করে তা জানি না, যীশু বলেছেন, তোমরা সামান্য নীতিও পরিবর্তন করো না। আমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানবাদ থেকে আলাদা।

প্রকৃত পক্ষে ঈসা (আ) খ্রিস্টবাদ শিক্ষা দেয়নি। যা দিয়েছেন তা হচ্ছে ইসলাম। 'খ্রিস্টান' শব্দটি একটি ডাকনাম, যা খ্রিস্টের শত্রুদের দেয়া, এটা বাইবেলের উল্লেখ্য আছে, ধর্মযাজকগণ মনে হয় জানেন, খ্রিস্টের অনুসারীদের নাম হচ্ছে খ্রিস্টান, এটা একটি কটুকথা– যা আজ হচ্ছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনের সূরা আলে-ইমরানে বলা হয়েছে– যীশু ছিল মুসলিম, কুরআন বলেছে ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান ছিল না। সুতরাং সারকথা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা একই। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, মূর্তিপূজা না করা। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর আল্লাহ ফাইনাল বার্তা পাঠিয়ে দেন, এরপর আর কোন বার্তা পাঠাবেন না, অন্য কোন আইন আসবে না। আর আজকের আইন/নীতি হচ্ছে সবচেয়ে বাস্তবিক। যেমন, ঈসা (আ) বলেছেন : দাঁতের পরিবর্তে দাঁত, চোখের পরিবর্তে চোখ এটাই ছিল আইন, আর এখন বলা হয়, যদি কেউ তোমার এক গালে থাপ্পর মারে তবে তাকে অন্য গাল পেতে দাও। কেউ যদি তোমার কাছে জামা চায় তবে তাকে আলখাল্লা দিয়ে দাও। কেউ যদি বলে একমাইল হাঁটতে তবে তুমি দুই মাইল হাঁট। এটাই হচ্ছে সংশোধন। কেউ যদি কাঠি দিয়ে খেলার সময় ভুল করে তোমার চোখে লাগায় তার কারণে তুমি তার চোখ নিয়ে নিতে পার না। এটাই হচ্ছে সংশোধন, যীশুর নীতিতে সংশোধন আনা হয়েছে। তখন সঠিক ছিল, এজন্য যে তুমি ফেরত দিতে পারতে, আর এখন নির্ভর করছে সমাধানের ওপর। যদি ভুলক্রমে হয় তার জন্য আইন আছে, ভুল-সঠিক নির্ধারণের জন্য আছে আইন। পবিত্র কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ কিতাব যা চিরকাল থাকবে এবং তা বাস্তবিকভাবে প্রমাণ করা যায়, আশা করি উত্তর পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন ঃ ২৭০। ধর্মের কারণে হিন্দুদের সাথে বৈষম্য করাটা কি ঠিক? কাজের জন্য সৌদি আরবে বলা হয়, শুধু মুসলিম এবং খ্রিস্টানরাই আবেদন করতে পারবে।

উত্তর ঃ আপনি খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন, আমি সৌদি আরবে গিয়েছি কয়েকবার। এটা বাস্তবিক যে, আমি এর উল্টো অভিযোগ করেছি কয়েকবার। সৌদি আরবের উচ্চপদস্থ পদগুলো দখল করে আছে অমুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টানরা। আমি তাদের কাছে অভিযোগ করেছি সমান অধিকার দেয়ার জন্য। মুসলিমরা সেখানে ঝাড়ুদার

আরো অন্য অনেক ছোট পদে আছে। বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখতে পাবেন উচ্চপদস্থ পদগুলো যেমন– জেদ্দার ট্রাইডেন্ট হোটেল একটা পাঁচতারা হোটেল। সেখানে আছে সব শ্বেতাঙ্গ অমুসলিমরা।

আর সেই সময়ের প্রধান অতিথি ছিল ভারতের বিমানের পরিচালক এবং সেখানে দেখেছি খুব কম অনারব মুসলিমদের; কিন্তু কেন? তা জানি না। সুতরাং এটা একটা ভুল ধারণা। তারপরও কিছু কাজের জন্য যেমন : মসজিদের ইমাম, এসব কাজের জন্য একজন মুসলিমই প্রয়োজন। যেহেতু অমুসলিমরা নামায পড়াতে পারে না। সুতরাং কাজের ক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করে লোক নেয়া হয়। যদি একজন হিসাব রক্ষক দরকার হয়, তাহলে এমন লোকই নেয়া হবে যে ভাল হিসাব জানে। সৌদি আরবে বৈষম্য আছে এটা ভুল ধারণা, এমনকি উচ্চ প্রতিনিধি যারা লোক পাঠায়, তারা অমুসলিম। সুতরাং এটা ভুল ধারণা, মুম্বাইতে উচ্চ ব্যক্তিবর্গ, প্রধান প্রধান ভ্রমণ প্রতিনিধিরা হচ্ছে অমুসলিম।

যদি আপনি একজন ভালো ডাক্তার হন, কি মুসলিম আর অমুসলিম আর যদি আমার মা অসুস্থ হয় এবং জানতে পারি যে আপনি একজন হিন্দু ডাক্তার তাহলে আমি কার কাছে যাব? আমি অমুসলিমের কাছে যাব, কারণ কুরআন বলেছে "যদি তুমি না জান তাহলে তাকে জিজ্ঞেস কর যে জানে" কুরআনের সূরা আল-নাহল পারা ১৬, আয়াত ৪৩ এবং সূরা ফুরকান-এর পারা ২৫, আয়াত ৫৯-তে বলা হয়েছে– 'যদি তোমার সন্দেহ থাকে তবে তার কাছে যাও যে জানে' বিশেষজ্ঞের কাছে যাও, কুরআন বলে নাই মুসলিমের কাছেই যাবে, যদি বিশেষজ্ঞটি মুসলিম হয় ইনশাআল্লাহ, আমি মুসলিমের কাছেই যাব। আর যদি অমুসলিম হয় তাহলে তার কাছে যাব, তবে অবশ্যই তাকে দক্ষ হতে হবে, আশা করি উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ঃ ২৭১। ইসলামে কি সন্ন্যাসী জীবন আছে? আল্লাহকে ধ্যান, ইবাদত, ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা পাওয়া যায়? ইসলাম উদার অর্থনীতি সম্পর্কে কী বলে?

উত্তর ঃ ভাই, ভাল একটা প্রশ্ন করেছেন উদার অর্থনীতি সম্পর্কে আমার একটা বক্তব্য আছে– 'সুদ মুক্ত অর্থনীতি আলোচনা' এর ওপর অনেক ক্যাসেট আছে এটা জানবে কিভাবে সুদহীন অর্থনীতি, ইসলামিক অর্থনীতির বিষয়ে মালয়েশিয়া এটা অনুসরণ করেছে এবং তারা উন্নতি করেছে, দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে– ধ্যান, ইন্দ্রিয় শক্তি ইত্যাদি নিয়ে। আমাদের প্রধান ইবাদত হচ্ছে ধ্যান করা, যাকে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারেন। বিভিন্ন অর্থের মাধ্যমে, আমরা আল্লাহর ইবাদত করি। আল্লাহর ইবাদতের একটা পথ হচ্ছে নামায। যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা মুসলমান, আমরা ইবাদত করি আল্লাহকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্য আমরা নামাযের মাধ্যমে সঠিক পথটি বেছে নিতে পারি, কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল মানুষের জন্য?

আপনার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ইসলামে কি সন্ন্যাসী জীবন অনেকটা পুরোহিতদের মত, সাধু জীবন বলতে যদি মনে করেন জন্মগত কিছু, তাহলে কিছুই নেই, ইসলামের মতে প্রত্যেক মানুষ জন্ম গ্রহণ করে, সাধু হিসেবেই আমাদের নবী বলেছেন– প্রত্যেক মানুষ জন্মগ্রহণ করে 'দিন-উল-ফিতর' নিয়ে। 'দিন-উল-ফিতর' মানে, মুসলিম হয়ে, যদিও সে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, এমনকি একজন হিন্দু পরিবারের শিশু যদি পাঁচ বছর বয়সের আগে মরে যায় তাহলে সেও জান্নাতে চলে যাবে সরাসরি।

পরবর্তীতে সেই শিশুটি ভুলের দ্বারা জর্জরিত হতে পারে– 'কিন্তু প্রতিটা শিশু পাপমুক্তভাবে জন্ম গ্রহণ করে', পুরোহিত জন্মগ্রহণ বা পুরোহিত পরিবারে জন্মগ্রহণের মত কিছুই নেই। যে ব্যক্তি যোগ্যতাসম্পন্ন, যেমন আমাদের ইমাম। যেকোনো মুসলিম ভাল করে কুরআন পড়তে পারে, আর যে ভাল করে পড়তে পারে, সে ইমাম হতে পারে, কোন জ্ঞানী ব্যক্তির অর্থাৎ যার বিশেষ কোন দিকে জ্ঞান আছে তাকে জিজ্ঞেস করা যায়। কুরআন বলেছে– তাকে জিজ্ঞেস কর যে জানে? সুতরাং আপনি যদি ওষুধ সম্পর্কে জানতে চান আপনাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। আপনাকে বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে হলে একজন বিজ্ঞানীর কাছে যেতে হবে আর আপনাকে কিতাব সম্পর্কে জানতে হলে অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে জানতে হলে আপনাকে একজন মাওলানার কাছে যেতে হবে যে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ, কিন্তু এমন কিছু নেই যে জন্মগত/পরিবারগত মাওলানা, আমাদের ইমাম আছে যিনি নামায পড়ান, আমাদের নেতা আছেন কিন্তু তিনি জন্মগত কারণে মাওলানা বা নেতা হন নি। আশা করি আপনি খুশি হয়েছেন ভাই।

সব মানুষই সমান। কেবল আপনি মহান হচ্ছেন, উচ্চতর মানব হচ্ছেন তা হচ্ছে আপনার সততা। আপনি যত বেশি সৎ হবেন আপনি তত ভালো মানুষ হবেন অন্য মানুষজন থেকে, আশা করি আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ঃ ২৭২। কেন বহুবিবাহ ছেলেদের জন্য, মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য নয়? কেন ইসলাম জন্ম নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করে না?

উত্তর ঃ প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে কেন বহুবিবাহ ছেলেদের/পুরুষের জন্য মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য নয়?

বহুবিবাহ বলতে বুঝায়, একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী অর্থাৎ একের অধিক স্ত্রী থাকাকে বুঝায়। আর বহুপতি একজন মহিলার একের অধিক স্বামী থাকাকে বুঝায়। আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, 'পৃথিবীতে কুরআনই হচ্ছে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে বলা হয়েছে 'একটি বিয়ে কর' যদি আপনি রামায়ণ পড়েন, বেদ পড়েন, বাইবেল পড়েন, আরও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন– কোন ধর্মেই বলা হয় নি একটি বিয়ে কর। আপনি যদি খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থ পড়েন

তাহলে দেখতে পাবেন, তাদের নবী হযরত সোলায়মান (আ)-এর ছিল ১০০ শত স্ত্রী, ইব্রাহিম-এর ছিল একের অধিক স্ত্রী, বাইবেল-এ তিনটি বিয়ের উল্লেখ আছে এবং হিন্দু ধর্মে একাধিক বিয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়, রামের পিতা দশরথের একের অধিক স্ত্রী ছিল।

কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে বলা হয়েছে, 'একটি মাত্র বিয়েই কর' পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৪ নং আয়াতে আরও বলা হয়েছে তোমার পছন্দমত দুটা, তিনটা, ৪টা পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করতে পার, কিন্তু যদি ন্যায্য অধিকার দিতে না পার তাহলে একটি বিয়েই কর, ইসলাম একটা সর্বোচ্চ সীমা দিয়েছে, বিয়ের ক্ষেত্রে, অন্য কোন ধর্মে বলা হয়েছে "তুমি যতটা ইচ্ছে ততটা বিয়ে করতে পার। কোন সর্বোচ্চ সীমা দেয়া নেই; ইসলামেই সর্বোচ্চ চারটা বিয়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আরও বলা হয়েছে একের অধিক বিয়ে তখনই করতে পার যদি তুমি স্ত্রীদের মধ্যে সম অধিকার প্রদান করতে পার; আর স্ত্রীদের মধ্যে সম অধিকার প্রদান করাটা খুব কঠিন একটা কাজ, আর যদি ন্যায্য অধিকার দিতে না পার তাহলে একের অধিক বিয়ে করো না। এটা কোথাও উল্লেখ নেই যে, 'যদি তুমি একের অধিক বিয়ে কর তাহলে তুমি সৃষ্টিকর্তার অধিক অনুগ্রহ পাবে, কোথাও এটা উল্লেখ্য নাই।' এটাই সর্বোচ্চ, তবে কেন ইসলামে একের অধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে? এর কারণটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব, ছেলে-মেয়ের জন্মহার প্রায় সমান, কিন্তু আমরা যদি কোনো শিশু চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করি তাহলে সে বলবে মেয়ে শিশুর জীবাণু ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা ছেলে শিশুটির চেয়ে বেশি, তারা যৌন দিক থেকেও অধিক শক্তিশালী, সেজন্য ছেলে শিশুর মৃত্যুর হার মেয়ে শিশুর মৃত্যু হার অপেক্ষা বেশি। এছাড়াও শিশুরা যখন বড় হয়, বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ দূর্ঘটনা, সংগঠিত হয় এবং সেখানে নারীদের তুলনায় পুরুষদের মৃত্যুর হার বেশি।

বিশ্বের পরিসংখ্যান আলোচনা করে দেখা যায়, ভারত হচ্ছে একমাত্র দেশ, যেখানে পুরুষের সংখ্যা নারীর চেয়ে বেশি, আপনি কি জানেন এর কারণ কি? বি.বি.সি.-তে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিল, 'তার মৃত্যুর জন্য' নামক একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে এসিলি চেক হিন্যান এক ব্রিটিশ ভারতে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন, পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখানে প্রতিদিন ৩,০০০-এর বেশি ভ্রূণ হত্যা করা হয়, যখন জানতে পারে যে, শিশুটি হবে মেয়ে তামিলনাড়ুর এক সরকারি হাসপাতালের তথ্য অনুযায়ী 'দশজন মেয়ে শিশু জন্মগ্রহণকারীর চারজনকে মেরে ফেলা হচ্ছে' ইসলামে মেয়ে শিশুর ভ্রূণ হত্যাকে নিষিদ্ধ করেছে, আল-কুরআনের সূরা আল তাকভীরের ৮ ও ৯ নং আয়াতে।

কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলের ৩১ নং এবং সূরা আনামের ১৫১ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা খাদ্যের জন্য তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন। এই ভ্রূণ হত্যা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। তা

ছেলে কিংবা মেয়ে শিশুর ভ্রূণই হোক। আর এজন্যই ভারতে নারীদের চেয়ে পুরুষদের সংখ্যা বেশি, যদি মেয়ে ভ্রূণ হত্যার মত খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা যায় তাহলে কয়েক দশকের মধ্যে ভারতে নারীদের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে, এছাড়া আমেরিকার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধু আমেরিকাতে, ৭-৮ মিলিয়ন মেয়ে বেশি, শুধু নিউইয়র্কেই ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা প্রায় ১ মিলিয়ন বেশি। নিউইয়র্কের জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ পুরুষ সমকামী, যারা মেয়ে সঙ্গীর সাথে থাকে না। এরকম পুরুষ সমকামীর সংখ্যা আমেরিকাতে প্রায় ২৫ মিলিয়ন। যদি পরিসংখ্যান দেখি তাহলে দেখা যাবে, এরকম ইংল্যান্ডে/যুক্তরাজ্যের মেয়ের সংখ্যা ছেলের তুলনায় বেশি ৪ মিলিয়ন। শুধু জার্মানিতে মেয়ের সংখ্যা ছেলের তুলনায় বেশি ৫ মিলিয়ন। শুধু রাশিয়াতে বেশি ৭ মিলিয়ন। আর সর্বশক্তিমান আল্লাহই জানেন কত মিলিয়ন মেয়ে বেশি আছে ছেলের তুলনায় পৃথিবীতে। আর যদি এই রীতিতে বিশ্বাসী হয় যে, যতটা ইচ্ছে অতটা বিয়ে করতে পারবে একজন নারী অথবা শুধু একটি বিয়ে আর আমার বোনটি যদি ভাগ্যক্রমে আমেরিকায় বাস করে আর যদি একটি পুরুষ যদি মাত্র একটি নারীকেই বিয়ে করে তাহলে ৩০ মিলিয়ন নারী, যারা তাদের স্বামী খুঁজে পাবে না।

যদি আমার বোনটি ঐ দূর্ভাগা নারীদের একজন হয়, তার জন্য শুধু একটি রাস্তাই খোলা থাকবে, তাকে বিয়ে করা যে ইতোমধ্যেই একজন পত্নীগ্রহণ করেছে, অথবা সকলের সম্পদে পরিণত হওয়া, তৃতীয় কোন পথ খোলা নেই। আর আমি ভদ্রলোকদের কাছে জানতে চাই আপনি আপনার বোনের জন্য কোনটি চান? সকল ভদ্রলোকই বলবেন– তারা প্রথমটিই পছন্দ করবেন। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে, কেন একজন মুসলিম নারী একের অধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না? একের অধিক স্ত্রী থাকলেও বাবা-মা চিহ্নিত করা সম্ভব কিন্তু একের অধিক স্বামী থাকলেও মা চিহ্নিত করা গেলেও বাবা চিহ্নিত সম্ভব হবে না। যদিও বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে, রক্ত পরীক্ষা ও ডি.এন.এ.-এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা সম্ভব; যা আদালতে আইনের জন্য প্রয়োজন হয়। এটা একটা কারণ যা পূর্বের জন্য প্রয়োজন।

আরও একটি কারণ হচ্ছে যে, একজন পুরুষ একজন মহিলার চেয়ে অধিক যৌন ক্ষমতার অধিকারী এবং একজন পুরুষের যদি একের অধিক সঙ্গিনী থাকে তাহলে যৌন রোগের কোন সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু একজন নারীর যদি একাধিক স্বামী থাকে তাহলে বিভিন্ন যৌন রোগের সম্ভাবনা থাকে, অধিক সম্ভাবনা থাকে এইডস হওয়ার। সেই জন্যই ইসলাম একের অধিক পতি গ্রহণের অনুমতি দেয়নি। আশা করি উত্তর পাওয়া গেছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝায়, জন্মগ্রহণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, যে শব্দটা প্রায় সবাই ব্যবহার করে, ভারতে একটা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে– আমাদের জন্য সকলের জন্য– 'একটি হলে দুটো নয়, দুটি হলে আর নয়,' ধনী

গরিব সকলের জন্য। দেখুন, যদি আমার পিতা-মাতা, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন তাহলে আমি এখানে থাকতে পারতাম না।

আমি আমার পিতা-মাতার পঞ্চম সন্তান, যে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পারত না। আর এজন্যই ইসলামে জন্ম নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়া হয়নি। জন্ম নিয়ন্ত্রণ– অর্থাৎ পরিবার পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আমার ভিডিও ক্যাসেট আছে কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে, এটি একটি দীর্ঘ উত্তর। আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ঃ ২৭৩। আপনি বলেছেন বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে, কিন্তু যদি একজন অমুসলিম ছেলে একজন মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করে তাহলে কেউ মেনে নেয় না। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব কোথায় গেল?

উত্তর ঃ আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন, তা সুন্দর একটা প্রশ্ন। আপনার মতো একটি বিষয় আমাকেও প্রশ্ন বিদ্ধ করে। ধরুন– 'আমরা একটি গাড়ি বানাব' যার একটি চাকা হবে সাইকেলের, আর একটি হবে ট্রাকের, তাহলে গাড়িটা কি চলবে? দেখুন– জীবনটাও ঠিক তেমনই। স্ত্রী হচ্ছে জীবন সঙ্গী, কুরআনে বলা হয়েছে বিয়েটা হচ্ছে 'মিসআক' পবিত্র বন্ধন, একটি পবিত্র চুক্তি, এটি এমন না যে সে তোমার গোলাম হয়ে গেল। এটি একটি পবিত্র বন্ধন। যেখানে দুজনেরই সমান অধিকার রয়েছে। যদি দু'জন ভিন্ন ধর্মের হয় একজন বলবে আজ গীর্জায় যাব, অন্যজন বলবে আমি মসজিদে যাব এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের উপাসনা করবে। তাহলে এটা একটা সঠিক যান হবে না। গাড়ি সঠিকভাবে চলবে না। সেজন্য পরিবারকে সঠিকভাবে চালানোর জন্য দু'জনেরই একই মতের মতাদর্শী হতে হবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি আদর্শ ভিন্ন হয় তাহলে সত্যিই চলবে না। যাহোক, আমি বলেছি ইসলাম বিশ্বাস করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে– সমান মানুষই আমরা ভাই ভাই, কিন্তু মুসলমানরা হচ্ছে আমার মতাদর্শে বিশ্বাসী ভাই ভাই। যদি একজন খ্রিস্টান আর একজন খ্রিস্টানের মতাদর্শী না হয় তাহলে সেই খ্রিস্টান এই খ্রিস্টানকে বিয়ে নাও করতে পারে, যাত্রা কত সুন্দর কত সহজ, আর এজন্যই দু জনের জীবন পথ, আদর্শ একই হতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ২৭৪। ইসলাম শান্তির শিক্ষা দেয় মানুষকে, তবে কেন অনেক হিংস্র ঘটনার সাথে মুসলিমরা জড়িত? যেমন– মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ। ইসলাম সমান অধিকারের কথা বলে তবে কেন আফগানিস্তানে নারী মুসলিমদেরকে কাজের ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রদান করা হয় না?

উত্তর ঃ ভাই, আপনি প্রশ্ন করেছেন ইসলাম শান্তিতে বিশ্বাস করে, এটি একটি সার্বজনীন ধর্ম, তবে কেন সেখানে মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, কেন মহিলাদের সমান অধিকার প্রদান করা হয় না?

ভাই, আপনার প্রশ্নের জন্য আমার ভিডিও ক্যাসেটগুলো ইসলামে মহিলাদের অধিকার, আধুনিকতা নাকি সেকেলে? এটা হচ্ছে দুই ঘণ্টার একটি বক্তৃতা এবং সেখানে আমি প্রমাণ করেছি যে, ইসলামে নারী-পুরুষ সবাই সমান।

প্রথমতঃ বিশেষ কোন জাতি-গোষ্ঠির ওপর মহিলাদের অধিকার প্রদানের কথা বলা হয়নি, তার মানে এই না যে, ইসলাম ভুল। আমি বলব যে, ইসলামে মহিলাদের অধিকার প্রদানের বিষয়টি বিশেষ কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তি দ্বারা যাচাই করা সম্ভব নয়, নারী অধিকারের বিষয়টি প্রমাণাদির ওপর ভিত্তি করে করতে হবে। ইসলামই মহিলাদের দিয়েছে সবচেয়ে বেশি অধিকার। এমনকি পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোর চেয়েও বেশি ইসলাম নারীদের এই অধিকার দিয়েছে ১৪০০ বছর আগে। কি কি অধিকার নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার, আত্মিক অধিকার, ন্যায্য অধিকার, সামাজিক অধিকার, শিক্ষার অধিকার, কেন একটি নির্দিষ্ট সমাজ এমন করছে তাদের কাছে যান এবং জিজ্ঞেস করুন ইসলাম তাদের এই অধিকার দেয় নি?

মৌলবাদ প্রসঙ্গে মুসলমানরা হচ্ছে শান্তিপ্রিয় মানুষ। কেন তারা মৌলবাদী হল? তবে আমি গর্বিত এই বলে যে, আমি মৌলবাদী, ডা. জাকির নায়েক মৌলবাদী হওয়াতে গর্বিত। যে ব্যক্তি মৌলিক বিষয়গুলো মেনে চলে তাকে বলা হয় মৌলবাদী। যেমন : আপনি যদি একজন ভাল গণিতবিদ হতে চান, আপনাকে জানতে হবে, অনুসরণ করতে হবে গণিতের মৌলিক বিষয়গুলোকে, মৌলিক বিষয়গুলো যদি আপনি না জানেন তাহলে আপনি একজন ভালো ডাক্তার হতে পারবেন না। ঠিক একইভাবে, আমি গর্বিত এই জন্য যে, আমি একজন মৌলিক মুসলিম। আমি জানি, অনুসরণ করি এবং অনুশীলন করি ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোকে, আপনাকে জানতে হবে আধুনিক অর্থে মৌলবাদ। মৌলবাদ বলতে বুঝায় সন্ত্রাসবাদ, এর মানে এই নয় যে, প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায়? একজন হিন্দুর জন্য আদর্শ হিন্দু হতে হলে তাকে অনুসরণ করতে হবে এবং পালন করতে হবে, মৌলিক হিন্দুত্ববাদ সম্পর্কে। আর এজন্য আপনাকে হিন্দু মৌলবাদী হতে হবে।

একজন ভাল খ্রিস্টান হতে হলে আপনাকে খ্রিস্টান ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে হবে, মানতে হবে এবং অনুশীলন করতে হবে, আর এই মৌলিক বিষয়গুলো না জানতে পারা পর্যন্ত আপনি একজন ভাল খ্রিস্টান হতে পারবেন না। আমি জানি যে, ইসলামের প্রতিটি মৌলিক বিষয়গুলো মানবতার পরিপন্থী নয়। ইসলামের সূক্ষ্ম কোন মৌলিক বিষয়ও মানবতার পরিপন্থী নয়। আপনি আপনার জ্ঞানের অভাবের কারণে বলেন যে, এটা মানবতার পরিপন্থী। আপনি হয় ইসলামিক আইন ভাল করে জানেন না, না হয় আপনি বিশ্বের পরিসংখ্যান সম্পর্কে জ্ঞাত নন, সন্ত্রাসবাদী প্রসঙ্গে একজন ব্যক্তি ধরুন, ভারতে একজন মুক্তিযোদ্ধা, আপনি জানেন তাদেরকে আমরা দেশভক্ত বলি। আর ব্রিটিশরা তাদেরকে বলেছে সন্ত্রাসী, ঠিক একই লোক একই কাজের কারণে।

ভারতবাসী মনে করে, ব্রিটিশদের ভারত শাসনের কোন অধিকার নেই। আর ব্রিটিশরা ভাবেন ভারতের ওপর তাদের অধিকার আছে এবং ব্রিটিশরা ভাবে ভারতীয়রা সন্ত্রাসী। একই মানুষ, একই কাজ শুধু স্তর দুটো আলাদা, এটা নির্ভর করে আপনার বিষয়টি কিভাবে মেনে নিচ্ছেন তার ওপর। যদি আপনি ব্রিটিশদের অভিমত মেনে নেন তাহলে তারা সন্ত্রাসী, আর যদি ভারতবাসীর অভিমত মেনে নেন তাহলে তারা দেশভক্ত। একই মানুষকে আলাদা আলাদা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা যায়, আপনি যদি সঠিকভাবে একজন মানুষকে বিচার করেন তাহলে কোনো প্রকৃত মুসলমানই কোনদিন সন্ত্রাসী হতে পারবে না, সত্যি বলতে প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু না কিছু খারাপ লোক থাকবেই যেমন– হিটলার, ছয় মিলিয়ন ইহুদি হত্যা করেছে। যে একজন খ্রিস্টান, তাই বলে আপনি বলতে পারেন না যে খ্রিস্টধর্ম খারাপ। ঠিক তেমনি মুসোলিনি হাজারও সম্প্রদায়কে হত্যা করেছে। তাই বলে খ্রিস্টধর্ম খারাপ? ঠিক তেমনিভাবে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু না কিছু খারাপ লোক থাকবেই, কিন্তু এর স্তরটা নির্ভর করবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। আশা করি উত্তর পেয়ে গেছেন।

আফগানিস্তানে মুসলিম মহিলাদের কেন সমান অধিকার দেয়া হয় না?

বিষয়টা এমন নয় যে, ইসলাম নারীদের সব কাজে সমান অধিকার দিয়েছে, তবে তা অবশ্যই হতে হবে শরিয়াহ ভিত্তিক। যেমন : একজন মহিলা মদের দোকানে কাজ করতে পারেন না, যেখানে একজন পুরুষ পর্যন্ত পারে না, একজন মহিলা জুয়ার আসরে কাজ করতে পারে না, একজন মহিলা শরীর প্রদর্শন করে কাজ করতে পারেন না। যেমন : মডেলিং, অভিনয়, আমরা চাই আমাদের নারীদেরকে সম্মান দেখাতে, কিন্তু এসব কাজে হাজারও পুরুষ মহিলাদের সামনে বসে থেকে তাদেরকে দেখে এবং শিস দেয়। আমরা ভদ্র জীবন যাপনে বিশ্বাসী, তাই শরীর প্রদর্শন করে যেসব কাজ করা হয় তা ভদ্র জীবন দিতে পারে না। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে মহিলাদের প্রতি উদারতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এটা হচ্ছে মেয়েদের অসম্মান, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করার একটা নতুন পথ। পশ্চিমা বিশ্ব বলছে মহিলাদের উপরে উঠানো হচ্ছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদেরকে আরও নিচে নামানো হচ্ছে। ইসলাম এসব কাজে কখনো সমর্থন দেয় না, অন্যথায় অন্য যেকোন চাকরি, যে কাজই হোক তা অবশ্যই হতে হবে, ভদ্রতার মধ্যে, পর্দার ভেতর থেকে এবং যৌন বিষয়গুলো থেকে দূরে থেকে।

আমরা পত্রিকায় সংবাদ দেখি কিন্তু কখনো যাচাই করি না তা সত্য কি মিথ্যা। পবিত্র কুরআনের সূরা হুজুরাতে বলা হয়েছে, 'যখন কোন সংবাদ পাও তখন তা খতিয়ে দেখ। আমি ভারতীয় পত্রিকায় পড়েছি, আফগানরা, মুজাহিদরা মহিলাদের হত্যা করে, তারা মহিলাদের কাজে যেতে দেয় না, এমনকি মহিলা ডাক্তারদের কাজে যেতে দেয় না এবং তাদের বেতন বন্ধ করে দেয়, এরকম আরো অনেক

কিছু। আমি 'টাইমস' ম্যাগাজিনে পড়েছি যে– মুজাহিদরা মহিলাদের অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে, কিন্তু মহিলা ডাক্তারদের কাজে বাধা দেয় না এবং মহিলা শিক্ষিকাদের নিষেধ করে না, মুজাহিদরা যাদের কাজে যেতে বাধা দেয়, তাদের বাসায় বাসায় গিয়ে বেতনাদি পৌঁছে দিয়ে আসে, তাদেরকে অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য। দেখুন, আপনি যদি কোনো অশোভনীয় কাজ করেন, তাহলে আমরা বলি আপনি খারাপ; এরা অশোভনীয় কাজকে প্রশ্রয় দেয় না। মডেলিং করো না, নাচ করো না, অভিনয় করো না। কিন্তু বিনিময়ে যা পেতে তা তোমাদের বাসায় দিয়ে আসা হবে। সুতরাং বিষয়টি এমন যে, পত্রিকায় আমরা ভিন্ন রকম সংবাদ পাই। আপনি এখানে বসে বলতে পারবেন না কোনটা সঠিক 'টাইমস অব ইন্ডিয়া 'না' 'টাইমস ম্যাগাজিন' আমরা জানি না, সেজন্য আল-কুরআন বলে, যে জানে তাকে জিজ্ঞেস কর, কর্মক্ষেত্রে কর্মদক্ষ লোক আছে, কিন্তু আমরা যে সংবাদ পাই এবং আপনাদের যা দেয়া হয় তার সবই প্রচার মাধ্যম থেকে পাওয়া। আর প্রচার মাধ্যমগুলো পশ্চিমা বিশ্বের হাতে, তারা প্রচার মাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, আর তারা অহেতুক ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ° ২৭৫। (পুরুষ) : আমার নাম আজিমদ্দিন ইলিয়াস। আমি একজন দায়ী। আমি ইসলামের সুমহান বার্তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিই। আমার প্রশ্ন রবিশংকরের কাছে এই যে, ডা. জাকির নায়েক সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদ ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে বিভিন্ন শর্ত বললেন কুরআন ও বেদ থেকে। আপনি কি এই ঈশ্বরের ব্যাপারে একমত? বেদ ও কুরআন অনুযায়ী। নাকি একমত না? আশা করি আমার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন।

উত্তর : রবিশংকর : উনি! কুরআন ও বেদের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেখানে আর কোনো ভিন্নমত থাকতে পারে না। অবশ্যই আমি তার মতের সাথে একমত।

মোহাম্মদ নায়েক : দ্বিতীয় প্রশ্ন করবেন ডানপাশের জন, তিনি প্রশ্ন করবেন ডা. জাকির নায়েক?

প্রশ্ন ঃ ২৭৬। (পুরুষ) : আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু ডা. জাকির। আমার নাম সিকান্দার আহমদ সায়ালি। আমি একজন ব্যবসায়ী। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হলো, 'হিন্দুইজম অ্যান্ড ইসলাম দ্য কমন গ্রেট' বইটা সম্পর্কে, আর এটি লিখেছেন শ্রী শ্রী রবিশংকরজী। তিনি বইটা লিখেছেন পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে। আমার বাবা মুসলমান হওয়ার আগে হিন্দু ছিলেন। আমি ২০ বছর বয়স পর্যন্ত হিন্দু ছিলাম। আমার বাবা বেদ, বাইবেলসহ ধর্মগ্রন্থসমূহ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা সঠিক পথে এসেছি। আমি

আমার বাবাকে অনুসরণ করছি আর আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি। আমিও বই নিয়ে গবেষণা করি। সেটা করতে গিয়েই 'হিন্দুইজম ইসলাম' বইটা পড়েছি। বইটা লিখেছেন শ্রী শ্রী রবিশংকর। বইটি পড়তে গিয়ে আমি দেখলাম যে, এর কিছু কিছু তথ্য বিভ্রান্তিকর। কখনো এটা কখনো ওটা। বলা হচ্ছে তিনি আসলে কী বলতে চাচ্ছেন?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : ভাই প্রশ্ন করেছেন। আমার মতামত জানতে চেয়েছেন রবিশংকরের বই সম্পর্কে। বইটা বেশ বিভ্রান্তিকর। একটা কথা বলতে হয়। এই বইটা লেখার উদ্দেশ্য ছিল ঠিক। আমার মতে, তিনি চেয়েছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানরা একত্রিত হোক। হিন্দু, মুসলমানদের একত্রিত করার জন্যেই তিনি বইটা লিখেছেন। আমাদের মানতে হবে যে, বইটা তিনি তাড়াহুড়ো করে লিখেছেন, যা তিনি নিজেও মঞ্চে এসে বলেছেন। বইটাতে বেশ কিছু ভুল আছে, তিনি তা স্বীকার করেছেন। যদি আমার পুরো মতামত জানতে চান তাহলে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে তা বিশ্লেষণ করতে। সময় যেহেতু কম তাই আমি কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে বলি, যে বিষয়গুলো আজকের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। এখানে আমি বলতে চাই, বইটাতে মুসলমানদের বিভিন্ন রীতিনীতি সম্পর্কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় নি। তিনি তার বইয়ের ৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন। আরবি 'রমজান' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত 'রামা' শব্দ থেকে এবং 'ধ্যান'। ধ্যান মানে উপাসনা 'রামা' মানে উজ্জ্বলতা। তাই তার মতে 'রমজান' শব্দটা সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হল উপাসনার মাস। এই কথার সাথে আমি একমত না। কেননা আমি বিভিন্ন ধর্মের ধর্ম বিষয়ের ছাত্র। তাই আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারলাম না।

'রমজান' আরবি 'রামাদা' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ সূর্যের প্রখর তাপে পৃথিবী গরম হয়ে আসছে। ইসলামী পঞ্জিকায় দেখবেন মাসগুলোর ক্রমধারায় রমজান হচ্ছে নবম মাস তখন থাকে গ্রীষ্মকাল। এভাবেই নামটা এসেছে। তাই যদি বলা হয় শব্দটা সংস্কৃত থেকে এসেছে তাহলে এর সাথে আমি মোটেও একমত না। সেভাবে বলা হয়েছে 'নামাজ' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত 'নাম' শব্দ থেকে, যার অর্থ উপাসনা করা। আর যাজা থেকে যার অর্থ ঈশ্বরের কাছাকাছি। কথা হলো 'নামাজ' শব্দটা কোনো আরবি শব্দ না। এই শব্দটা কুরআন ও হাদীসের কোথাও পাওয়া যাবে না। উপাসনা করা। ইবাদত করাকে কুরআনে বলা হয়েছে 'সালাত'। 'নামাজ' শব্দটা মূলত ফারসি শব্দ, ভারত উপমহাদেশেও এই শব্দটা ব্যবহার করা হয়। এটি ইসলামিক শব্দ না। 'নামাজ' ফারসি শব্দ যার অর্থ হল অধীনতা। এটা কোনো ইসলামিক শব্দ না আরবি শব্দও না। এরপর যদি আরো দেখেন, শ্রী শ্রী রবিশংকর তিনি তাঁর বইয়ে যে 'কাবা' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'গারবাহ' থেকে এবং গ্রহ থেকে। একথা 'গাহবাহ' থেকে আমি এটা কোথাও পাইনি যে, 'কাবা'

শব্দটার উৎপত্তি এভাবে হয়েছে। 'কাবা' শব্দটি আরবি শব্দ। যার উৎপত্তি হয়েছে আরবি শব্দ 'কাব' থেকে। যার অর্থ হল 'ফোলানো'। এছাড়া কাবা অর্থ কোনো বাড়ির গম্বুজ, কাবাতুল্লাহ কোনো বাড়ির উপর ফুলানো গম্বুজ। তাই আমি বলতে চাই যে, কাবা শব্দটা সংস্কৃত থেকে এসেছে এটা কোনো অবস্থায়ই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এছাড়াও ঐ বইয়ে আরো বলা হয়েছে যে, 'হাজরে আসওয়াদ' কালো পাথর, যেটা রয়েছে কাবা শরীফের পাশে, এই শব্দটির মূল 'সঙ্গো আশওয়াতা' যার অর্থ গাঢ় রঙের পাথর বা শিবলিঙ্গ। এ বিষয়েও আমি একমত না এ জন্যে যে, 'হাজরে আসওয়াদ' উৎপত্তি আরবি শব্দ 'হাজার' যার অর্থ 'পাথর' 'আসওয়াদ' হল কালো। দুটো মিলে হলো 'কালো পাথর'। এটাকে শিবলিঙ্গের সাথে তুলনা করা ঠিক না। এটি আরবি শব্দ-এর মূল শব্দগুচ্ছও আরবি ভাষায়।

যারা ইসলাম সম্পর্কে পূর্ব থেকে জানেন না, তারা বুঝবেন এ বইয়ে যা বলা হয়েছে তা সঠিক এবং এ কথাগুলো বিশ্বাস করতে শুরু করেবেন। তবে যারা ইসলাম সম্পর্কে আগে থেকে জানেন তাঁদের তেমন সমস্যা হবে না।

রবিশংকর : আমি ইতোপূর্বেই বলেছি যে, এই বইটা দিয়ে আমাকে বিচার করবেন না। এখানে আমি বইটা ঠিক না ভুল সেটা বলতে আমি এখানে আসি নি। এর পেছনের উদ্দেশ্যটা দেখুন, আমি হয়তো খুব বেশি জানতাম না। তবে আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, হিন্দু মুসলমানদের একত্রিত করা। বইটা যদি ভুল কথা বলে তাহলে পড়ার দরকার নেই। তবে আমি যদি একটা ধর্ম ছেড়ে দিয়ে আরেক ধর্ম গ্রহণ করি তাহলেই কিন্তু সমাধান হবে না। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ডেনিশ কুকি খাওয়ার জন্যে আমাকে ডেনিশ হতে হবে না। সব জায়গা থেকে শেখার চেষ্টা করুন। আর একই সাথে অনুরোধ করতে চাই শুধু অন্যের ভুল খোঁজার চেষ্টা করবেন না।

আমি এই বইটা মাত্র ৩ দিনে লিখেছিলাম। আমি জানি ভালো করেই জানি, এই বইয়ের আরো অনেক ভুল আমি এখন আপনাদের বলতে পারি এবং এ বইয়ের অনেক ভুলের কথা আমিও আপনাদের সামনে বলেছি। তাই আমি বলতে চাই, বইটাতে যে ভুল আছে থাকুক সেটা। সেটা যেন আমাদের হৃদয়ে গেঁথে না যায়। বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি? বইটাকে বাদ দিন, বইটা পড়ার দরকার নেই। আমি নিজেও জানি বইটাতে ভুল আছে তাই। বইটা আর দ্বিতীয়বার কপি করা হয় নি। এটা একবারই ছাপা হয়েছিল। সব মানুষকে একত্রিত হতে হবে এটাই ছিল আমার বইয়ের মূল উদ্দেশ্য। এটা কোনো পাণ্ডিত্যের বই না। আমি এই কথা বইয়ের ভূমিকাতেই লিখেছি। আর মুখেও বারবার বলেছি। বইটা যদি সব মানুষকে একতাবদ্ধ করতে পারে তাহলে ভালো। তা না হলে আমি স্বীকার করছি বইটাতে ভুল আছে। আর আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছন আমি কী বুঝাতে চেয়েছি।

মোহাম্মদ নায়েক : আমি আমাদের বক্তাদের আরো এ অনুষ্ঠানের কিছু নিয়ম-কানুন মনে করিয়ে দিতে চাই। প্রত্যেক বক্তাই পাঁচ-ছয় মিনিট সময় পাবেন তাদের কাছে করা প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে। আমি অনুরোধ করব যে, এখানে ২-৩ মিনিট বেশি লেগে গেলে এতে বেশ অসুবিধা হয়। যদিও আমার সামনে স্টপওয়াচ আছে, সময় বেশি গেল না কম গেল, সেটা হিসাব করার জন্যে। এতে করে আমার হিসাব রাখতে সমস্যা হয়। আমি আমাদের বক্তাদের অনুরোধ করব, আপনারা মেনে চললে অল্প সময়েই এ অনুষ্ঠান আরো ফলপ্রসূ হবে। আমি আবার শ্রোতাদের অনুরোধ করব আপনারা প্রশ্ন করবেন সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে। শেষ ভদ্রলোক প্রশ্ন করতে গিয়ে প্রায় দশটি বাক্য বলেছেন, প্রশ্নটা তিনি চারটা বাক্যে বলতে পারতেন। তখন প্রশ্ন বুঝতে ও উত্তর দিতে আরো সহজ হতো। এখানে আমরা প্রায় ২-৩ মিনিট সময় নষ্ট করলাম। আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে ডা. জাকির নায়েককে ২-৩ মিনিট সময় দিতে চাই। আমি বক্তাকে অনুরোধ করব তিনি যেন প্রশ্নটার উত্তর দেন।

যে প্রশ্নটা করা হয়েছে সেটার উত্তর সরাসরি দিতে বলছি। আপনারা এ সময়ের মধ্যে পরের উত্তরটার সাথে আগের উত্তরটাও দিতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে।

ডা. জাকির নায়েক : শ্রী শ্রী রবিশংকর বললেন যে, তিনি বইটা তাড়াহুড়ো করে লিখেছেন। আমাদের মানতেই হবে যে, তার আন্তরিকতার কোনো কমতি ছিল না বা নেই। তিনি বলেছেন যে, বইটা দ্বিতীয়বার ছাপানো হয় নি। খুবই ভালো কথা, এজন্যে তাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। যারা হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আমার লেখা হিন্দুধর্ম ও ইসলামের সাদৃশ্য বইটি পড়তে পারেন। ব্যাপকভাবে বইটি ছাপা হয়েছে। খুব শিগগিরই বইটার লক্ষ কপি ছাপা হবে। আপনাদের সবাইকে বইটা পড়ার অনুরোধ করছি। নিশ্চয়ই এই বই হিন্দু ও মুসলমানদের একত্রিত করবে। এতে আমি সঠিক উদ্ধৃতি দেয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করি আমাদের কারো অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না। সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ নায়েক ঃ এবার প্রশ্ন করা হবে শ্রী শ্রী রবিশংকরজীর কাছে। মহিলাদের মধ্যে থেকে তিন নম্বর মাইক।

প্রশ্ন ঃ ২৭৭। (মহিলা) : আস্‌সালামু আলাইকুম। আমার নাম আসিয়া সামিরা হাদিব। আমি পেশায় একজন কোয়ালিটি এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, লিডস সিসকো সিস্টেমস। আমার প্রশ্নটা রবিশংকরের কাছে। আপনি বলেছেন ভালোবাসা সম্পর্কে। অন্যকে না বদলানোর কথা বলেছেন। আরো বলেছেন পৃথিবীর সবাইকে ভালোবাসার সময় যুক্তি ব্যবহার না করতে। আমি তার সাথে একমত। কিন্তু আমার একটা বিষয় পরিষ্কার জানা

দরকার, আর তা হলো পৃথিবীতে আমরা প্রায়ই শুনি আত্মঘাতী বোমা হামলা, সন্ত্রাসী আক্রমণ ইত্যাদির কথা। এ ধরনের ঘৃণ্য অপরাধে যারা জড়িত তাদের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তাই তাদের উদ্দেশ্যকে আমার শ্রদ্ধা করতে হবে। তাহলে আপনি বললেন সবাইকে ভালোবাসতে হবে এবং আমিও তাদের ভালবাসব। তা ছাড়াও আপনি যুক্তি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

তাহলে কী দাঁড়ালো, সে যে ভুল করছে, এটা বলার কি কোনো অধিকার আমার নেই। এ ব্যাপারটি কি আমাকে একটু পরিষ্কার করে বলবেন?

উত্তর : রবিশংকরজী : ধন্যবাদ আপনাকে। আমি কখনোই যুক্তি ব্যবহার করতে নিষেধ করি নি। প্লীজ আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা করবেন না। আমি বলেছি তর্ক করবেন না। ভুল যুক্তি ব্যবহার করবেন না। যুক্তি প্রদান করাই একমাত্র কথা নয়। হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই আত্মঘাতী হামলাকারীদের থামাবেন। কেননা তারা মনে করে, শুধু তারাই ঠিক। আর শুধু তাদেরই বাঁচার অধিকার আছে। অন্য মানুষ বা অন্য কোন ধর্মের বিশ্বাসের উপর তাদের কোনো রকম শ্রদ্ধাবোধ নেই। তারা এতোবেশি উগ্রপন্থী যে, তাদেরকে এ থেকে থামাতেই হবে। আমি কখনো বলি নি যে, যুক্তি ব্যবহার করবেন না। আমি বলেছি এমন যুক্তি দেবেন না যাতে মানুষ আলাদা হয়ে যায়। ভুল যুক্তি বা উক্তি ব্যবহার করে অন্য কাউকে দোষারোপ করতে যাবেন না। মানুষকে দোষারোপ করার জন্যে আমরা আসি নি। সবচেয়ে বড় অপরাধী যারা কারাগারে শাস্তি ভোগ করছে এমন লোক ১ লক্ষ ২৫ হাজার হবে যারা আমাদের প্রোগ্রাম অনুসরণ করছে। যার নাম ব্রিদিং এক্সারসাইজ বা সুদর্শন ক্রিয়া। দেখবেন তাদের ভেতরে এবং জীবন ধারায় কী পরিবর্তন এসেছে। তাই আমি আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলতে চাই আমি কখনো যুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান করি না, আমি আপনাদের অযৌক্তিক হতে বলছি না, বলছি না তাদের কিছু শিখবেন। তবে যুক্তির কথা বলে অন্য মানুষের ঐতিহ্যকে অশ্রদ্ধা করবেন না। এটাই সবার প্রতি আমার অনুরোধ।

মোহাম্মদ নায়েক : পরের প্রশ্ন মহিলাদের মধ্যে থেকে করবে ডা. জাকিরের কাছে।

প্রশ্ন ঃ ২৭৮। (মহিলা) : হ্যাঁ আমার প্রশ্ন ডা. জাকির নায়েকের কাছে। তবে প্রথমেই আমি রবিশংকরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই আজকের অনুষ্ঠানে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করার জন্যে। ধন্যবাদ রবিশংকরজী। আমার প্রশ্ন জাকির ভাইয়ের কাছে। মহানবী ﷺ এর কথা কি হিন্দুধর্মে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : বোন, আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, হিন্দুধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ-এর কথা বলা হয়েছে কিনা? আমি আবারো রবিশংকরের বইটার ২৬ নং

পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিতে চাই। তিনি লিখেছেন, নবী মোহাম্মদ ﷺ' শিরোনামে। নবী মোহাম্মদ ﷺ- সম্পর্কে বেদের ভবিষ্যৎবাণী। তিনি রেফারেন্স দিয়েছেন ভবিষ্য পুরাণ-৩, খণ্ড-৩, অধ্যায় ৩, শ্লোক ৫ ও ৬ থেকে। গুরুজী এই একটা রেফারেন্সই আপনার বইটাতে উল্লেখ করেছেন। এটা একদম খাঁটি, একদম ঠিক। আমি আপনার সাথে পুরোপুরি একমত। নবী মুহাম্মদ ﷺ শিরোনামের ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে শ্রী রবিশংকর অনেক স্থানে বেদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শুধু নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর কথা বলার সময় তিনি ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমি এজন্যে রবিশংকরকে ধন্যবাদ দিতে চাই, ধন্যবাদ রবিশংকর। তিনি আরো উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেটা হলো, ভবিষ্য পুরাণ পর্ব-৩, খণ্ড-৩, অধ্যায়-৩, শ্লোক ৫ ও ৬ থেকে। আপনি যা বলেছেন একদম ঠিক, একশত ভাগ ঠিক।

আমি আরো বলি রেফারেন্স দেয়া থাকলেও শ্লোকটা সেখানে দেয়া নেই। যদি আপনি ভবিষ্য পুরাণ পর্ব-৩, খণ্ড-৩, অধ্যায়-৩, শ্লোক ৫ থেকে ৮ পর্যন্ত পড়েন তাহলে দেখবেন, সেখানে বলা হয়েছে– 'একজন বহিরাগত আসবেন। একজন বিদেশী অন্য ভাষায় কথা বলবেন। সংস্কৃত ছাড়া। তিনি আসবেন তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে অর্থাৎ সাহাবাগণ এবং তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ ﷺ। আর ভোজ রাজা এই ব্যক্তিকে স্বাগত জানাবেন সম্মানের সাথে এবং বলবেন হে মানবজাতির গর্ব! হে আরবের অধিবাসী'। সংস্কৃত শব্দটা হল 'মবোস্থাল' সেই ব্যক্তি আসবেন বালির স্থান থেকে। একটি মরুভূমি থেকে এবং তিনি বিশাল বাহিনী তৈরি করবেন, শয়তানকে ধ্বংস করার জন্যে।

মুহাম্মদ ﷺ -এর কথা আরো উল্লেখ আছে ভবিষ্য পুরাণের পর্ব-৩, খণ্ড-৩, অধ্যায়-৩, শ্লোক ১০ থেকে ২৭ পর্যন্ত। সেখানে বলা হয়েছে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলেছেন, এর আগের শত্রুকে হত্যা করা হয়েছে। এবার আরো শক্তিশালী শত্রু আসছে। আমি একজন ব্যক্তিকে পাঠাব যার নাম হবে 'মুহাম্মদ' যাতে করে মানুষজাতি সঠিক পথে থাকে এবং ও রাজা, তুমি পিশাচদের রাজ্যে কখনো যেও না। আমি আমার দয়া দিয়ে তোমাকে শুদ্ধ করব। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি এসে বলবেন, ঈশ্বর পরমাত্মা তাকে পাঠিয়েছেন এজন্যে যাতে আর্যধর্ম বা সত্যধর্ম টিকে থাকে। আমি সত্যধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে যাব। আমার অনুসারীদের খাৎনা দেয়া হবে। আমরা জানি যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসারীদের খাৎনা করানো হয়। তাদের মাথার পিছনে কোনো লেজ থাকবে না এমনকি কোনো পিণ্ডিও থাকবে না।

তাদের মুখে দাড়ি থাকবে, তারা একটা বিপ্লব সৃষ্টি করবে। তাদের ইবাদতের পূর্বে আযান দেয়া হবে। তারা সব হালাল প্রাণী খাবে। তবে শূকরের মাংস খাবে না। আর কুরআনের ৪ জায়গায় বলা হয়েছে, সূরা আল বাকারা-১৭৩, সূরা মায়িদা-৩, সূরা আনআম ১৪৫ নং আয়াতে এবং সূরা নাহল-এর ১১৫ নং আয়াতে বলা আছে

যে, শূকর খাবে না। বলা আছে যে, তারা নিরামিষভোজী হবে না, তারা আমিষভোজী হবে। তাদের বলা হবে 'মুসলমান'। মহানবী -এর কথা আরো বলা হয়েছে ভবিষ্য পুরাণের পর্ব-৩, খণ্ড-১, অধ্যায়-৩, শ্লোক ২১ থেকে ২৩-এ। তাঁর কথা আরো উল্লেখ আছে অথর্ববেদ-এর ২০ নং গ্রন্থের ১২৭ নং অনুচ্ছেদের ১ থেকে ১৪নং অনুচ্ছেদে যাকে বলা হয় 'কুনতাপ সুপতাস'। 'কুনতাপ' হলো লুকানো গ্রন্থি, সময় কম, তাই পরে জানা যাবে, সময় কম তাই পুরো বলছি না। তবে প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'তিনি 'নারাশাংসা', 'যাকে প্রশংসা করা হয়। তিনি হলেন 'কাওরামা' অর্থাৎ 'শান্তির রাজপুত' বা যিনি 'ক্ষমতাবান ব্যক্তি'। তাকে রক্ষা করা হবে ৬০ হাজার ৯০ জন শত্রু থেকে। এসবই মুহাম্মদ নির্দেশ করে বলা হয়েছে। তাঁর কথা আরো বলা হয়েছে অথর্ববেদ ২০ নং গ্রন্থের ২১ নং অনুচ্ছেদের ৭ নং পরিচ্ছেদে, সেখানে বলা হয়েছে যে, তিনি ২০ জন নেতাকে পরাজিত করবেন। সে সময় মোটামুটি এ কয়জন নেতা ছিল মক্কায়। এছাড়াও আরো উল্লেখ আছে ঋগবেদের গ্রন্থ-১; অনুচ্ছেদ-৫৩, পরিচ্ছেদ ৯-এ। তাঁর কথা উল্লেখ আছে সামবেদে। অগ্নিমন্ত্র ৬৯ নম্বর-এ। বলা হয়েছে তিনি তার মায়ের দুধ পান করবেন না। আমরা জানি মহানবী মায়ের দুধ পান করেন নি। তাকে আরো বলা হয়েছে 'আহম্মদ' 'যে নিজের প্রশংসা করেন'। যে নামটা এখানে বলা হয়েছে এটি 'মুহাম্মদ' -এর আরেকটি নাম। সামবেদের উত্তরচিক ১৫০০ নং মন্ত্রে, সামবেদ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৫২ নং অনুচ্ছেদে তাঁকে যযুর্বেদ অধ্যায়-৩১, অনুচ্ছেদ-১৮-তে বলা হয়েছে– 'আহম্মদ'।

অথর্ববেদের গ্রন্থ-৮, অনুচ্ছেদ-৫, পরিচ্ছেদ-১৬-এ অথর্ববেদ গ্রন্থ-২০ অনুচ্ছেদ-১২৬, পরিচ্ছেদ-১৪-এ। ঋগবেদ গ্রন্থ-৮, অনুচ্ছেদ-৬, পরিচ্ছেদ-১০-এ তাঁকে বলা হয়েছে 'নারাশাংসা'। নারাশাংসা একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ হলো 'নর' অর্থ মানুষ 'শাংসা' অর্থ হলো প্রশংসনীয়। 'সেই মানুষ যিনি প্রশংসনীয়'। এই শব্দটিরই আরবি বলা হয় "মুহাম্মদ "। তাহলে দেখা গেল নবী মুহাম্মদ কে 'নারাশাংসা' নামে হিন্দুধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ আছে ঋগবেদ-এর গ্রন্থ-১, অনুচ্ছেদ-৯ ঋগবেদ গ্রন্থ-১, অনুচ্ছেদ-১০৬, পরিচ্ছেদ-৪, ঋগবেদ গ্রন্থ-১, অনুচ্ছেদ-১৪২, পরিচ্ছেদ-৩, ঋগবেদ গ্রন্থ-২, অনুচ্ছেদ-৩, পরিচ্ছেদ-২, ঋগবেদ গ্রন্থ-৫, অনুচ্ছেদ-৫, পরিচ্ছেদ-২, ঋগবেদ গ্রন্থ-৭, অনুচ্ছেদ-২, পরিচ্ছেদ-২এ।

আরো আছে– যযুর্বেদ ২০ নং অধ্যায়ের ৫৭ নং অনুচ্ছেদে। যযুর্বেদ ২১ নং অধ্যায়ের ৩১ নং অনুচ্ছেদ। যযুর্বেদ এর অধ্যায় ২১ অনুচ্ছেদ-৫, যযুর্বেদ অধ্যায়-২৮, অনুচ্ছেদ-২, যযুর্বেদ অধ্যায়-২৮, অনুচ্ছেদ-১৯, যযুর্বেদ অধ্যায়-২৮, অনুচ্ছেদ-২-এ মুহাম্মদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য জায়গায় আরো বলা হয়েছে।

রবিশংকর ঃ তাহলে এখন আপনারা বেদকে সবাই শ্রদ্ধা করবেন। ডা. জাকির নায়েক নিজেই বলেছেন সবারই বেদকে শ্রদ্ধা করা উচিত। আর কথা হলো আপনারা ভাববেন না যে, এটা কাফির মুশরিকদের বই। প্রত্যেক মুসলমানেরই এই গ্রন্থকে শ্রদ্ধা করা উচিত। আর আমি ডা. জাকির নায়েককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। কারণ তিনি বেদের সত্যটাকে সবার সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। বেদ একই শিক্ষা ,একই জ্ঞান, মানবতা, ভালবাসার কথা বলে থাকে। ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ নায়েক : এর পরে প্রশ্ন পুরুষদের মধ্য থেকে তিনি প্রশ্ন করবেন রবিশংকরকে।

প্রশ্ন ঃ ২৭৯। (পুরুষ) : আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি সাইদ মহিউদ্দিন শামির। আমি এম, এম, এন, এ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ল্যাব ম্যানেজার। আমার প্রশ্ন শ্রী শ্রী রবিশংকরের কাছে। আপনি খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। আপনি বলছেন আমরা সব ধর্মকে ভালোবাসব। কিন্তু কিছুদিন আগে এখানে একটা সন্ত্রাসী ঘটনা হল। আর আমি ঐ রাতে হাসপাতাল থেকে এর কিছুটা দেখেছিলাম। ১ জন প্রত্যক্ষদর্শী মিডিয়ার সামনে বলেছিল যে, সে একজন লোককে সেখানে গুলাগুলি করতে দেখেছে। তখন ছিল রাত পৌনে আটটা। তবে দেখা গেল যে, কেউ সে লোকের কথায় গুরুত্ব দিচ্ছে না। আর তারপরের দিন মিডিয়ায়, ভারতের মিডিয়ায় সমালোচনা করা হলো শুধু ইসলামকে। আমার প্রশ্ন, আপনি সব ধর্মের মানুষকে ভালোবাসতে বলেছেন। কিন্তু ভারতের মিডিয়া সন্ত্রাসের কথা বলতে গিয়ে শুধু ইসলামের কথা বলা হয় কেন? কিন্তু ভারতে সন্ত্রাসের কথা বলতে গিয়ে শুধু ইসলামের সমালোচনা করা হয় কেন?

রবিশংকর : আজকের আলোচনা হলো ঈশ্বরের ধারণা নিয়ে। না তবে আমি–
মোহাম্মদ নায়েক : আপনি চাইলে প্রশ্নটা বাতিল করতে পারেন। পরের প্রশ্ন করতে বলি?

উত্তর : রবিশংকর : আমি আপনাদের বলতে পারি যে, আমি মিডিয়ার মুখপাত্র নই। আমি সরকার কিংবা পুলিশের মুখপাত্র নই, আমি অন্য কারো হয়ে কথা বলতে পারি না। সেই একইভাবে আপনাদের ধর্মের মুখপাত্র শুধু, আপনি একা নন। আরো মানুষ আছে, প্রতিটি মানুষই তার নিজের ধর্মের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতে পারেন।

এখন এমন এক অবস্থা চলছে যে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মানুষ এখন আতঙ্কিত। আর দূর্ভাগ্যজনকভাবে শুধু ইসলামকে এর সাথে জড়ানো হয়, যা একেবারেই ঠিক নয়। এ চেহারাটা, এ মন মানসিকতা আমাদের বদলাতে হবে। ইসলাম ধর্মের

অনুসারীরা অন্য ধর্মকে মেনে নিতে পারে না। এই চেহারা পাল্টে মুসলমানদের সংযমী হতে হবে। আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে অনেকেই রয়েছেন। আপনারই এটা শুরু করতে হবে। যাতে করে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টে যায়। আমার ধারণা এটাই হলো প্রথম পদক্ষেপ। আজ যেমনভাবে আমরা হিন্দু-মুসলিম একত্রিত হয়েছি। আবারো আমরা একত্রিত হব। আর আমরা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিতে চাই আমরা শান্তিকে ভালোবাসি। একে অপরকে শ্রদ্ধা করি। কাউকে দোষারোপ করি না। আমরা শান্তিপ্রিয়। ধন্যবাদ সবাইকে।

মোহাম্মদ নায়েক : পরের প্রশ্ন ডা. জাকির নায়েককে।

প্রশ্ন ঃ ২৮০। (মহিলা) : আমার প্রশ্ন শ্রী শ্রী রবিশংকরজীর কাছে। তিনি তার বক্তৃতায় বলেছেন যে, হিংসাকে কোনো ধর্মই অনুমোদন করে না। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে কৃষ্ণ কেন অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিল, সে যেন তার নিজের ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

উত্তর : রবিশংকর : আপনি যদি যুদ্ধের পক্ষে যুক্তি খোঁজেন সেটা তাহলে সব ধর্মের মধ্যেই পাবেন। জিহাদীরা আছে। এছাড়াও খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে যিশুখ্রিস্টই বলেছেন যে, আমি শান্তির জন্যে আসি নি, ঝগড়া বাঁধাতে এসেছি। বাবার সাথে ছেলের ঝগড়া, মায়ের সাথে মেয়ের ঝগড়া। এসব কথাকে ভুল পথে ব্যাখ্যা করলে চলবে না, মহাভারতে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে, কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, যুদ্ধ করো কিন্তু ক্রোধ নিয়ে নয়। ন্যায়ের জন্যে যুদ্ধ কর। ধর্ম স্থাপনের জন্যে যুদ্ধ কর। আত্মঘাতী বোমা মেরে নিরীহ লোকজন মেরে আপনি পৃথিবীতে আতংক ছড়াতে পারেন না।

আপনাকে অবশ্যই ধর্ম আর ন্যায় পালন করতে হবে। আর গীতাতেও একই কথা বলা হয়েছে। একজন যোদ্ধাকে লড়তে হবে। আমি এটা বলছি না যে, কোথাও গোলমাল দেখলে পুলিশ চুপচাপ বসে থাকবে। পুলিশ সেখানে অবশ্যই আসবে এবং যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় নিয়ন্ত্রণ করবে। আর যদি কোনো দাঙ্গা হয় তাহলে মানুষকে রক্ষা করবে। সেটাই হলো তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অর্জুন একজন যোদ্ধা হিসেবে সে তার দায়িত্বে গাফিলতি করছিল, সে তার দায়িত্ব পালন করছিল না। তাই কৃষ্ণ তাকে বুঝিয়েছিল দায়িত্ব পালনের জন্যে। প্লীজ আপনারা এটাকে এই বুঝবেন না যে, এখানে যুদ্ধকে সমর্থন করা হয়েছে। কৃষ্ণ একথা বলেন নি, এভাবে বুঝান নি। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন তোমার মধ্যে কারো প্রতি কোনো রকম রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা ইত্যাদি পুষে রাখবে না। (সংস্কৃত) এই শ্লোকটা দেখেন না কেন? এ পৃথিবীর কোনো সৃষ্টিকে ঘৃণা করবেন না।

সমবেদনা আর বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব রাখুন সবার প্রতি। তবে মনে রাখবেন, আপনার কর্তব্য আগে। আমি আপনাদের সবাইকে একটা অনুরোধ করব, প্লীজ অন্য ধর্মের

সম্পর্কে কোনো ধরনের খারাপ ধারণা পোষণ করবেন না। আর তা না হলে আপনারা আমাকে এ ধরনের প্রশ্নই করবেন। অর্জুন কি ঠিক ছিল? বা রাম কি ঠিক ছিল? কেন সে গীতাকে ত্যাগ করেছিল? এ সব ব্যাপারই আসলে গভীর একটা চক্রান্ত; যা আপনাকে অনেক পড়তে হবে। মাত্র দু-একটি কথায় এর উত্তর শেষ করা সম্ভব নয়। এখানে আমরা বিতর্ক করতে আসি নি, আমরা এখানে পৃথক হওয়ার জন্যে আসি নি, আমরা এখানে এসেছি একত্রিত হওয়ার জন্য। আমরা একে অপরকে শ্রদ্ধা করব, সম্মান করবো, ভালবাসবো। সে জন্যেই আপনাদের বলি আপনারা গীতা পড়ুন। গীতার মধ্যে আপনারা ভালো অনেক কিছুই পাবেন। কি বুঝাতে পেরেছি?

প্রশ্ন ঃ ২৮১। (মহিলা) : আস্‌সালামু আলাইকুম। আমার নাম আরশিয়া রাজা। আমার প্রশ্ন ডা. জাকির নায়েকের কাছে। তবে আমার প্রশ্নটা করার আগে একটা কথা বলতে চাই, আমি শ্রী শ্রী রবিশংকর-এর ব্রিদিং টেকনিকটা নিয়ে অনুশীলন করছি। আর এ অনুশীলন থেকে আমি যেটা পেয়েছি তাহলো এটা অনুসরণ করে আমি যতটা আল্লাহর কাছাকাছি যেতে পেরেছি, আগে কখনো অনুভব করি নি। এজন্যে আমি রবিশংকরজীর কাছে কৃতজ্ঞ। ডা. জাকির নায়েক সাহেবের কাছে আমার প্রশ্ন হলো, ইসলাম ধর্ম আমি যতটা বুঝি সৃষ্টিকর্তার ধারণা সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার হলো যে, সৃষ্টিকর্তা হলেন সর্বব্যাপী। এর অর্থ এই নয় যে, সৃষ্টিকর্তা এই জগতের প্রত্যেকটা অণুতে প্রত্যেকটা পরমাণুতে উপস্থিত। এ ব্যাপার কি পরিষ্কার করবেন?

উত্তর ঃ মোহাম্মদ নায়েক : এক্সকিউজ মি! আপনি আপনার প্রশ্ন করবেন ভালো কথা, কিন্তু এত ভণিতা কেন? আমার ভলান্টিয়ার তথা স্বেচ্ছা সেবকদের এটা খুব খেয়াল রাখতে। আমাদের বক্তারা যথেষ্ট জানেন। তারা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ।

আপনি প্রশ্ন করবেন সরাসরি প্রশ্ন করুন। প্রশ্ন কোনো রকম ভূমিকা ছাড়া। ধরে নিচ্ছি আমাদের বক্তারা আপনাদের প্রশ্ন শুনলেই বুঝে নিতে পারবেন ভূমিকা কী। আর অনুগ্রহ করে প্রশ্ন করতে গিয়ে কোনো মন্তব্য করবেন না। প্লীজ, আপনাদের সবার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা আমাদের অনেক সহযোগিতা করেছেন, ধৈর্য ধরেছেন, অনেক ভদ্রতা করেছেন। আর প্রশ্ন করার সময় যদি এগুলো খেয়াল করেন তাহলে আমরা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটা শেষ করতে পারব। হ্যাঁ ভাই।

প্রশ্ন ২৮২। (পুরুষ) : ডা. জাকির নায়েক যখন তাঁর লেকচার দিচ্ছিলেন তখন তিনি 'বিষ্ণুর' কথা বললেন, বিষ্ণু আসলে পাঁচটি উপাদান, যা দিয়ে পুরো পৃথিবীটাই তৈরি, আরো অনেক কিছু। আমি আপনাকে বলি বিষ্ণু

সহস্র হাজার কিন্তু একথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে। এটা দিয়ে আপনি আমাকে বিষ্ণুর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না।

আমি এখানে থেমে গেলাম এখন আপনার কাছে প্রশ্ন হলো :

মোহাম্মদ নায়েক : এক্সকিউজ মি, ভাই। দেখেন আপনি যা করেছেন প্রথমে বিশাল বড় একটা ভূমিকা নিয়ে তারপর প্রশ্নটা করেছেন। প্লীজ, আপনাদেরকে বারবার বলছি কোনো ভূমিকা ছাড়া সরাসরি প্রশ্ন করুন। ধরে নিচ্ছি আমাদের বক্তাগণ আপনার প্রশ্ন শুনে আপনারা ভূমিকাও বুঝে নেবেন। হ্যাঁ আপনার মাইক চালু করা হলো, আপনাকে ১ মিনিট সময় দেয়া হলো। আর আপনাকে এই প্রশ্নটা শেষ করতে হবে এই এক মিনিটেই। হ্যাঁ, আপনার মাইক চালু করা হলো।

প্রশ্ন ঃ ২৮৩। (পুরুষ) : এক্সকিউজ মি, গুরুজী। এখন আপনি অনুগ্রহ করে যে বিষ্ণু সহস্র নামটা বললাম, সেটির সারমর্মটা বলেন। আমি জানি আপনি পারবেন না। আমি এখানে দাঁড়িয়ে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আল্লাহ একদিন আপনাকে হেদায়েত দান করবেন। আপনি দেখবেন সেদিন বেশি দূরে নেই। শুধু আপনিই না আপনার ভক্তদের হেদায়েত দান করবেন। আমি বলে রাখলাম।

উত্তর ঃ মোহাম্মদ নায়েক : এক্সকিউজ মি! স্বেচ্ছাসেবকদের আমি বলব দয়া করে খেয়াল রাখবেন, প্রশ্নকর্তা ইমোশনাল না হয়ে যায়। এ অনুষ্ঠানের খাতিরে ভদ্র করে প্রশ্ন করুন। দয়া করে কোনো রকম মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন। আপনারা আপনাদের প্রশ্নটুকু করবেন। তারা এখানে তাদের প্রশ্নগুলো করবে এটা মোটেই উচিত হচ্ছে না। আমাদের এখানে দুজন জ্ঞানী লোক আছেন। তাদেরকে সম্মান করতে হবে। যদি এ ধরনের প্রশ্ন আর কেউ করেন, আমি বলব স্বেচ্ছাসেবকদেরকে যে, তাকে পেছনে পাঠিয়ে দেবেন। প্রয়োজন হলে যদি বের করে দিতে হয় তাহলে তাদেরকে বের করে দিবেন। ধন্যবাদ।

রবিশংকর : এ যুবকের জন্য দুঃখ হচ্ছে। সে ভুল উদ্ধৃতি দিল, সে উন্মাদ হয়ে আছে। আর সে ভাবছে আল্লাহ একদিন হয়তো আমাকে আশীর্বাদ দেবেন। বাবাজী, তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। তিনি আমার অনেক কাছে।

আর তাই সে কারণেই আমি বুঝতে পারি, আপনার মতো যুবকদের কারণেই পৃথিবীতে ইসলামের এতো বদনাম ছড়াচ্ছে। আপনার ধারণা আপনি একাই শুধু সত্যি কথাটা জানেন আর কেউ জানে না? বাবাজী, বুঝার চেষ্টা করুন। একটু সম্মান করুন। এসব ধর্মগ্রন্থের কথাগুলো অনেক গভীরভাবে। আপনি যতখানি বললেন, তারপরে আরো আছে। সেগুলো পড়ুন। সেগুলোর গভীরে প্রবেশ করুন, শুধু শুধু বইয়ের মলাট দেখবেন না। কথাগুলোর গভীরে প্রবেশ করুন। ঠিক আছে আপনি একটা হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারপর ইসলাম ধর্মগ্রহণ

করেছেন। খুব ভালো কথা, কিন্তু মনে রাখবেন কোনো কিছু বাতিল করে দিয়ে অন্য কিছু গ্রহণ করা শুধু এটাই বুঝায় যে, আপনি কতখানি অজ্ঞ। এটা দিয়ে বুঝা যায় জ্ঞানের ব্যাপারে আপনি কতখানি বিজ্ঞ বা জ্ঞানী। এটা দিয়ে বুঝা যায় জ্ঞানের ব্যাপারে আপনি কত সীমিত এবং হিন্দুধর্মের ঈশ্বর সম্পর্কে আপনি কতটুকু অন্ধকারে আছেন। তাই আপনি যদি 'সহস্রনামা' বুঝতে চান এটা একটা বিশাল জিনিস। এর প্রত্যেকটা শব্দ দিয়ে বিশাল বড় বই লেখা যায়। অনেক জ্ঞান অর্জন করা যায়। কিন্তু এমন পণ্ডিত হলে তো সমাজের ক্ষতি হবেই।

এমন পণ্ডিতের দরকার নাই, যে সামান্য পড়া পড়েই নিজেকে বড় পণ্ডিত মনে করে। একমাত্র ভালোবাসার সাথে পড়াশুনা করলেই পণ্ডিত হওয়া যায়। জ্ঞানকে আহরণ করা যায়। আপনি যে ধর্ম পালন করছেন, সে ধর্মের জন্যে আপনি সুনাম বয়ে আনতে পারেন যদি কখনো উগ্রপন্থী না হন এবং এটা মনে করতে পারবেন না যে, সবাইকে আমার ধর্ম মানতে হবে। এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আপনি আমাকে বদলাতে পারবেন না। এই জীবনে না। কারণ আমি শরীর মন সবই সঁপে দিয়েছি। আর আমাদের মধ্যে অনেকেরই শরীর-মন বদলাতে হবে। প্রত্যেক মানুষকে বুঝতে হবে তাদের নিজেদের হৃদয় দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, আর জ্ঞানের প্রতিটি অভিজ্ঞতা দিয়ে। মনে রাখা দরকার কেবল উদ্ধৃতি আর বিবৃতি দিয়ে আর কথা বলে নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে সমাজের সমস্যাগুলো বাড়তেই থাকবে। অন্য আর কিছু হবে না। আসুন আমরা সবাই বন্ধুর মতো পাশাপাশি থাকি, ভাই বোনের মতো বসবাস করার চেষ্টা করি। একে অপরকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। কোনো সমালোচনা না করি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ নায়েক : এবারের প্রশ্ন পুরুষদের থেকে ডা. জাকির নায়েকের কাছে।

প্রশ্ন ঃ ২৮৪। (পুরুষ) : আমার নাম মোহাম্মদ অখিল। আমি একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট। আমার প্রশ্নটা শ্রী শ্রী রবিশংকরজীর কাছে, তার লেকচারের সময় বেদের একটা শ্লোক বলেছেন, যেটা আসলে ঈশ্বর বলেছেন 'আমি একজন, কিন্তু অনেকের মধ্যে আছি।' এটা আপনি কতখানি মানেন? যদি মেনে থাকেন তাহলে কারণটা কী?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আপনি বলেছেন যে, আমার মতামত কি এই বিষয়ে যে, শ্রী শ্রী রবিশংকর বলেছেন, ঈশ্বর একজন আর সবার মধ্যে আছেন। এটাই জানতে চেয়েছেন বলে আমি মনে করি। আপনার কথা যা শুনেছি, সেই বিষয় যদি বুঝতে পারি পবিত্র কুরআনের সূরা হিজর-এর ২৯ নং আয়াতে ও সূরা সাজদা'র ৯নং আয়াতে আছে, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা মানবজাতিকে রুহ আর জ্ঞান দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন। তাই সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কথা জ্ঞান মানবজাতির সবার মধ্যেই বিদ্যমান। এখন যদি মেলান, বিরোধ বাদ দিয়ে সাদৃশ্যগুলো দেখি, কুরআন আর বেদের সাদৃশ্য।

কুরআন বলছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, সৃষ্টিকর্তা তার জ্ঞান দিয়েছেন। এর মানে এই নয় যে, সব কিছুই সৃষ্টিকর্তা। এর মানে হলো প্রত্যেক মানুষের কাছে সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান আছে। মানেন বা না মানেন সেটা আলাদা কথা। তবে একথা মানতেই হবে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান সবার মধ্যে কম-বেশি আছে। আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন।

মোহাম্মদ নায়েক : পরের প্রশ্ন রবিশংকরজীর কাছে।

প্রশ্ন ঃ ২৮৫। (মহিলা) : আমি তানভীর ফাতেমা। আমি বিবিএস-এর ছাত্রী, আরজিডিসি কলেজ। আমার প্রশ্ন শ্রী শ্রী রবিশংকরজীর কাছে।

মহাভারতে একথা বলা আছে যে, অভিমন্যু মায়ের পেটে থাকার সময় কীভাবে চক্রব্যুহে ঢুকতে হবে সেটা শুনে ফেলেছিল। কিন্তু একথা বিজ্ঞানে প্রমাণিত যে , পেটের ভেতরে ভ্রুণ কিছুই শুনতে পায় না। আপনি এ ব্যাপারে কী বলবেন?

উত্তর : রবিশংকর : আসলে একটা কথা বহুল প্রচলিত আছে যে, পৃথিবী রহস্যে ভরপুর। আর আমরা আসলে জানি না। আমি এখানে অভিমন্যুর পক্ষ নিয়ে বলব না। আপনি যেভাবে বলেছেন তাতে যদি ভালো কিছু পান গ্রহণ করেন। আর যদি মনে করেন এটা হতে পারে না। ঠিক আছে হতে পারে না।

তবে আর কয়েক বছর পর আপনি জানতে পারবেন এটা সম্ভব। কারণ এক সময় বিজ্ঞান মনে করত টেস্টটিউব বেবী জাতীয় কিছু করা সম্ভব নয় কিন্তু মজার ব্যাপার হলো আজ তা সম্ভব। দেখুন মহাভারতে লেখা আছে 'কুন্তী' তার সন্তানের ভ্রুণ বিভিন্ন জায়গায় রেখে দিয়েছিল। আর এই যেসব 'পুরাণ' আর 'ইতিহাস' এগুলো বইয়ের বাইরের অর্থটা নিলে চলবে না, এগুলোর গভীরে প্রবেশ করতে হবে। এটাকে নিতে হবে অন্যভাবে। কারণ এটা কোনো ঐতিহাসিক দলিল না। সেভাবে এটা লেখা হয় নি। আসলে কি জানেন 'মহাভারত' আর 'পুরাণে' অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত আমরা এসব গ্রন্থ নিয়ে কোন গবেষণা করি নি। এই মুহূর্তে আমাদের সেটা উচিত এবং জরুরি। আমি এটুকু নির্দ্বিধায় বলতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে।

প্রশ্ন ঃ ২৮৬। (পুরুষ) : আমার নাম রাসেল। আমি বি.কমের ছাত্র। আমার প্রশ্ন শ্রী শ্রী রবিশংকরের কাছে। আমার প্রশ্নটি হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন মতবাদের উপরে। ইসলামের কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে যেকোনো বিশ্বাস ও মতবাদকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়। আর ইসলামে যেসব ধর্মীয় নেতা আছেন তারা সবাই সেগুলো মানেন। কিন্তু দেখা যায়, হিন্দুধর্মে বিভিন্ন পুরোহিতরা বা উঁচু বর্ণের লোকেরা যেসব কিছু করে বা মেনে চলে অনেক ক্ষেত্রে তা বেদের সাথে মিলে না। আপনি বললেন যে, বেদ নিয়েই আমরা

আমাদের মতবাদগুলো পরখ করতে পারি। কিন্তু হিন্দুধর্মে পুরোহিতরা মাংস খাওয়ার ব্যাপারে বেদের বিপরীত কথা বলে। অথচ বেদে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মাংস খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। বেদ বলছে ঈশ্বরের কোনো মূর্তি বা ছবি নেই, কিন্তু পুরোহিতরা বলছে অন্য কথা। তাহলে একজন সাধারণ মানুষ কি করবে? কোন্টা মানবে? আর কোন্টা মানবে না? আপনি যদি বলেন পুরোহিতদের দরকার নেই, ধর্মগ্রন্থ মানতে হবে। পুরোহিতরাই যদি ভুল পথে থাকে তাহলে সাধারণ হিন্দু কীভাবে নিজেকে ঠিক পথে রাখবে? কীভাবে সে হিন্দুধর্ম পালন করবে?

উত্তর : রবিশংকর : হ্যাঁ, সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমার বক্তৃতার প্রথমেই আমি বলেছিলাম, ধর্মগ্রন্থগুলো আছে, যদি আপনি প্রথম আলোচনা শুনে থাকেন তাহলে খুব সহজেই বুঝবেন। কিন্তু মানুষ এগুলো মেনে চলছে না। মানুষজন পবিত্র কুরআনের বিধিবিধান মানছে না। শান্তির কথা বললেও মানুষ বিভিন্ন রকমের অশান্তি ধ্বংসাত্মক আর সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে। শান্তিকে ছড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না সামান্য কয়েকজনের কারণে।

ঠিক একইভাবে যদি আপনি দেখেন যে, কোনো পুরোহিত ভুল বলছে তাহলে সেটা হিন্দুধর্ম নয়। হিন্দুধর্মে এটা পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে, বেদ পরিষ্কার অনুমতি দিয়েছে, উপনিষদও দিয়েছে, বেদান্ত অনুমতি দিয়েছে। যোগের মাধ্যমে আপনি পৃথিবীতেই স্বর্গের সুখ অনুভব করতে পারবেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগ সাধনা করছে উপকারও পাচ্ছে। আমাদের ভারতে যুগে যুগে অনেক সাধু সণ্যাসী এসেছেন। তারা হচ্ছেন মহাপুরুষ তারা হচ্ছেন নারদ, চৈতন্য, মহাপ্রভু, গুরুনানক, গুরুগোবিন্দ, সিংজীসহ আরো অনেকে। এজন্যেই বেদে বলা হয়েছে ঋগবেদ-এর ২নং শ্লোকে 'ঋষিরা অতীতে এসেছেন এবং তারা ভবিষ্যতেও আসবেন।' এই বিশ্বজগৎ মূলত অসীম-এর কোনো শেষ নেই, কিনারা নেই। আর বিভিন্ন সময়ে কৃষ্ণ বলেছেন 'আমি প্রত্যেক যুগে আসব, পৃথিবীর ভুলগুলো শুধরাণোর জন্যে আসব। এখানে বিশেষভাবে আপনাদের বলতে পারি যে, শ্রীমদ্ভগবতগীতা ভালো করে পড়ুন। আর অন্য আরো একটা বই আপনাদের পড়তে বলব সেটা হল 'যোগবৈশিষ্ট্য'। এই বইটা বৈজ্ঞানিক, বিস্ময়কর, আর গভীর জ্ঞানসমৃদ্ধ। এ বিশ্বজগৎ সম্পর্কে। আজকের এই দিনে পুরো পৃথিবী বইটার গুরুত্ব মেনে নিচ্ছে। এ 'যোগবৈশিষ্ট্য' বইটা আমাদের সচেতনতা শেখায় এবং জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করে। তাই আমি বলতে চাই আমাদের যা করা উচিত তাহল, সব জায়গা থেকে জ্ঞান ও ভালো জিনিস গ্রহণ করতে হবে। জ্ঞানের ভালো জিনিস নিতে হবে উপনিষদ থেকে গীতা আর বেদান্ত থেকে। আর আশেপাশের সবাইকে মন থেকে ভালোবাসতে হবে আর সহযোগিতা করতে হবে ঠিক আছে।

প্রশ্ন ঃ ২৮৭। (মহিলা) : আমার নাম নুসরাত ফাতিমা। আমি একজন গৃহিণী। আমি প্রথমে ডা. জাকির নায়েককে তার সুন্দর লেকচারের জন্যে ধন্যবাদ জানাই।

মোহাম্মদ নায়েক : এক্সকিউজ মি, তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করুন। আমাদের হাতে সময় একদম কম।

মহিলা : আমার প্রশ্নটা হলো, আজ কথা বললাম শান্তি আর ভালোবাসা নিয়ে, যাতে করে আমরা এই পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বাস করতে পারি। অন্য কথায় আমাদের জীবন হবে সহজ-সরল, নিরাপদ। শ্রী শ্রী রবিশংকরের কাছে আমার প্রশ্ন, আমাদের কর্তব্য কি? আমাদের দায়িত্ব কি? এই পৃথিবীর সব মানুষের প্রতি নাকি আমাদের দায়িত্ব এই পৃথিবীর মানুষ আর সৃষ্টিকর্তার প্রতি? ধন্যবাদ।

উত্তর : রবিশংকর : হ্যাঁ একটা ব্যাপারে আমি ভিন্নমত পোষণ করি সেটা হলো 'পুনর্জন্ম'। আগের প্রশ্নটার ব্যাপারে বলছি।

আমরা ভারতের হিন্দুরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি। পৃথিবীজুড়ে মনোবিজ্ঞানীরা রিগ্রেশনের মাধ্যমে সুস্থতার জন্যে রোগীদের চিকিৎসা করে থাকেন। যারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না তাদের কিছু চমৎকার অভিজ্ঞতা আছে। তারাও সেটা মেনে নিচ্ছেন। কারণ হলো মন বা সচেতনতা আসলে শক্তি আর বুদ্ধি ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। থার্মোডায়ামিকসের প্রথম সূত্র এটা বলে যে, সচেতনতা অসীম। এমনকি বিজ্ঞানেও এটা প্রমাণিত যে, সচেতনতা হচ্ছে চলমান। এটা চলতেই থাকে। এটা দিয়ে আবার শিশুদের ব্যবহারের ব্যাখ্যা দেয়া যায়। তিন-চার বছরের শিশু ভায়োলিন বাজাতে পারে বীণা বাজাতে পারে। কারো কাছে না শিখেই সে বাজাতে পারে। আমি নিজেই এর দৃষ্টান্ত, আমি ছোট সময়েই গীতা জানতাম। অথচ আমাকে কেউ শেখায় নি। আসলে কি এগুলো হচ্ছে সংস্কার যেগুলো আমরা মানি। তাই আমার নিজস্ব মতামতটা এখানে প্রকাশ করছি। জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, শিখধর্ম, হিন্দুধর্ম, তাওইজম, শিন্টোইজম এসব ধর্মই পরজন্মে বিশ্বাস করে। এরা সবাই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে। এবার আমি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে বলছি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, সবার আগে যা দরকার আমাদের ভালোবাসা আর বিশ্বময় শান্তি কাজ করা মানে, আমরা বিশ্বাস করি [সংস্কৃত] যেলোক অন্যের সেবা করে সে আসলে ঈশ্বরেরই সেবা করছে। তাই অন্যকে সেবা করার মাধ্যমেই ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, বিখ্যাত ইসলামিক পণ্ডিত শরীফ সাহেবসহ আরো অনেকেই আছেন যারা এ মতবাদের প্রশংসা করেছেন, ভালো বলেছেন। এটা আসলে আমাদের সবার জন্যেই ভালো।

'কাইকভি কৈলাসা' শব্দের অর্থ হলো মানুষকে সাহায্য করা। আর মানুষকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হবে। মানবজাতিকে সেবা করার মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপাসনা করা হবে। সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। ঈশ্বর সবার মঙ্গল করুন।

প্রশ্ন ঃ ২৮৮। (মহিলা) : আমার নাম আমিনা। আমি পড়াশোনা করি। আমি যে প্রশ্নটা করতে চাই তা হলো যে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে অবতার বলতে কী বুঝানো হয়েছে? আর কল্কি অবতার কী?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : বোন, আপনার প্রশ্নটার উত্তর দেয়ার আগে আমি বলতে চাই যে, আমি একজন মেডিকেল ডাক্তার। তাই আপনাকে জানিয়ে রাখি মায়ের পেটে ভ্রূণ শব্দ শুনতে পায়। গর্ভধারণ করার ৫ মাস থেকে কানে শুনতে পায়। কুরআনেও এটা উল্লেখ আছে সূরা ইনসানের ২নং আয়াতে, আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি দিয়েছি'। প্রথমে শ্রবণশক্তি তার পর দৃষ্টি। গর্ভধারণের ৫ মাস থেকে ভ্রূণ শুনতে পায়। এটা নিয়ে অনেক গবেষণা করা হয়েছে। তাই ডাক্তারগণ গর্ভবতী মহিলাদের ভায়োলেন্ট সিনেমা দেখতে নিষেধ করেন। এ সমস্ত সিনেমা দেখলে ভ্রুণের ক্ষতি হয়। কারণ তখন ভ্রুণ শুনতে পায়। সরি, আগের প্রশ্নটার সাথে আমি একমত ছিলাম না। এখন এই প্রশ্নটার ব্যাপারে আসা যাক, অবতার আসলে কী? ও কল্কি অবতার কে? অবতার শব্দের অর্থ– সংস্কৃত শব্দ 'আও' এবং ত্র অর্থাৎ নেমে আসা। এর সাধারণ অর্থ হলো, বেশির ভাগ হিন্দুই মনে করে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষের রূপ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। তবে কিছু কিছু পণ্ডিত এভাবে বলে থাকেন, 'অবতার' কাজটা আসলে ঈশ্বরের মানুষ রূপ বুঝায় না। হতে পারে ঈশ্বর কাউকে পাঠিয়েছেন। যেমন : ঋষী, সন্ন্যাসী।

কুরআন মাজীদেও এমন কিছু ব্যাপার আছে যে, স্রষ্টা মানুষদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নেন, সবার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তার মাধ্যমে। যাকে আমরা বলি প্রেরিত দূত। তাহলে দেখা গেল ইসলাম প্রেরিত দূত বিশ্বাস করে। পবিত্র কুরআন মাজীদের সূরা ফাতির-এর ২৪ নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে, 'এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্কবাণী যায় নি।' কুরআনের সূরা রাদ-এর ৭নং আয়াতে আছে 'প্রত্যেক যুগে আমি দূত পাঠিয়েছি।' যদি আপনি বেদ পড়েন বেদেও লেখা আছে যে, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অনেক জ্ঞানী লোক, অনেক ঋষী পাঠিয়েছেন।' আর তাদের মধ্যেই একজন হলো কল্কি অবতার। এর উল্লেখ আছে ভগবত পুরাণের ১২নং খণ্ডের ২য় অধ্যায়ের ১৮-২০ অনুচ্ছেদে যে, তার জন্ম হবে বিষ্ণু ইয়াশের ঘরে অর্থাৎ সাম্বালা শহরের প্রধান। তার নাম হবে কল্কি এবং প্রভু নেমে আসবেন। আরো উল্লেখ আছে তার থাকবে ৮টি অসাধারণ গুণ। তিনি সাদা ঘোড়ায় চড়বেন, হাতে থাকবে তরবারি এবং তিনি দুর্বৃত্তদের ধ্বংস করবেন।

এছাড়াও ভগবদ পুরাণের খণ্ড-১; অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-২৫-এ আছে, কলি যুগে যখন রাজারা হবেন ডাকাতের মত, যখন রাজারাই হবে ডাকাত।

বিষ্ণু ইয়াশের ঘরে কল্কি জন্ম নেবে। আরো উল্লেখ আছে, পুরাণের ২য় অধ্যায়ের ৪নং অনুচ্ছেদ কল্কি আসবে তার বাবার নাম হবে বিষ্ণু ইয়াশ। কল্কি পুরাণের ২য় অধ্যায়ের ৪নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে ৪ জন সহচর তাকে সহযোগিতা করবে । কল্কি পুরাণের ২য় অধ্যায়ের ৫নং অনুচ্ছেদে আছে যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাকে বিভিন্ন দেবদূত ও ফেরেশতা সাহায্য করবে। কল্কি পুরাণের ২য় অধ্যায়ের ১১ নং অনুচ্ছেদে আছে, তার জন্ম হবে বিষ্ণু ইয়াশ ঘরে সুমতির গর্ভে। কল্কি পুরানের ২য় অধ্যায়ের ১৫ নং অনুচ্ছেদে আছে। তিন মাসের ১২ তারিখে তিনি জন্মাবেন। এক কথায় কল্কি অবতার নিয়ে আরো কথা বলা যায়। এক কথায় বলা যায়, তার বাবার নাম বিষ্ণু ইয়াশ, যার অর্থ সৃষ্টিকর্তার পূজারি। আর তার মায়ের নাম হবে সুমতি। যার অর্থ শান্তিপূর্ণ অঞ্চল। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মায়ের নাম হলো আমিনা যার অর্থ হলো শান্তিপূর্ণ অঞ্চল। তার জন্ম হবে সাম্বালা শহরের একটি এলাকায়। সাম্বালা অর্থ হলো শান্তিপূর্ণ এলাকা। আর মক্কাকে বলা হয় দারুল আমান বা শান্তিপূর্ণ এলাকা। বলা আছে যে, তিনি জন্মাবেন সাম্বালা শহরের প্রধান ব্যক্তির ঘরে। আমরা জানি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন মক্কার প্রধান ব্যক্তির ঘরে।

তিনি জন্মাবেন মাসের দ্বাদশ দিনে। আমরা জানি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বলা হয় যে, তিনি হবেন অন্তিম ঋষি। তিনিই হবেন সর্বশেষ ঋষি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– সম্পর্কে সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۔

অর্থ : 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।'

আরো বলা আছে তিনি আসমানী কিতাব পাবেন। সেটা তিনি পাবেন গুহার মধ্যে। তারপর দক্ষিণে গিয়ে ফিরে আসবেন। আমরা অবশ্যই জানি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী পেয়েছিলেন জাবালে-ই-নূর এর আঙ্গারে হেরা আলোর পাহাড়ে বসে। তিনি দক্ষিণে মদিনায় গিয়ে আসেন। বলা আছে যে, তাঁর ৮টি অসাধারণ গুণ থাকবে। এই গুণগুলোর নাম হলো– জ্ঞান, আত্মসংযম, জ্ঞান বিতরণ, সম্ভ্রান্ত বংশ, সাহস, শক্তি, পরোপকার ও মহানুভবতা এ আটটা গুণই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছিল।

আরো আছে যে, তিনি সমগ্র বিশ্বের মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন করবেন। পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা সাবা-এর ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা।' আরো বলা আছে তার থাকবে

একটি সাদা ঘোড়া। আমরা জানি যে, মহানবী ﷺ বোরাকে চড়ে মিরাজে গমন করেছিলেন। বোরাক হল সাদা ঘোড়া। তার ডান হাতে একটি তরবারি থাকবে। মুহাম্মদ ﷺ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তার সব তিনি করেছিলেন আত্মরক্ষার জন্যে। তিনি যুদ্ধে ডান হাতে তরবারি ধরতেন। বলা আছে চারজন সহচর তার সাহায্য করবেন। এখানে আমরা খোলাফায়ে রাশেদীন তথা আবু বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা)-কে বুঝব। বলা আছে, তাকে দেবদূত সাহায্য করবে। আমাদের জানা আছে যে, বদরের যুদ্ধে রাসূল ﷺ কে ফেরেশতারা সাহায্য করেছিল। একথা কুরআনের সূরা আলে ইমরান-এর ১২৩ ও ১২৫ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ভবিষ্যৎবাণী নির্দেশ করে মুহাম্মদ ﷺ সর্বশেষ নবী ও রাসূল।

মোহাম্মদ নায়েক : পরের প্রশ্ন ডা. জাকিরের কাছে।

প্রশ্ন ঃ ২৮৯। আমার নাম বিজয় কুমার। আমি একজন T.V টেকনিশিয়ান। ডা. জাকির নায়েকের কাছে আমার প্রশ্ন ইসলামে পুনর্জন্ম বলে কিছু আছে কিনা? কিছু মুসলমান বলে পুনর্জন্ম আছে। আরেকটা প্রশ্ন হলো কিয়ামতের দিন কি? ঐদিনে যারা মারা যাবে তাদের বিচার কাজ কখন হবে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : আপনি প্রশ্ন করেছেন ইসলামে পুনর্জন্ম আছে কিনা? আর কিয়ামতের দিন যারা মারা যাবে তাদের বিচার কখন হবে? এখানে পুনর্জন্ম নিয়ে যখন কথা বলা হচ্ছে, তখন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার কথা দিয়ে শুরু করব। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ ঘোষণা করেন– আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই আমাদের মৃত্যু দিবেন। তিনি সেই মহান সত্তা যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তারপর মৃত্যু দিবেন, তারপর আবার বাঁচিয়ে তুলবেন। তাহলে বুঝা গেল; এই পৃথিবীর জীবনের পর আমাদেরকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হবে সেটা পরকালে। তাহলে দেখুন আপনি যদি মৃত্যুর পরে জীবন নিয়ে বলেন তাহলে বলতে হবে ইসলামে পরকাল আছে। কিন্তু যদি আপনি হিন্দু দর্শনের মত কোনো নিয়মের কথা, বিধানের কথা বলেন যেটা বলেছে, আপনি জন্ম নিবেন। তারপর একদিন মারা যাবেন। তারপর আবার জন্মাবেন, আবার মারা যাবেন, যেটাকে বলে জন্ম আর পুনর্জন্মের চক্র। আসলে আমরা একবারই দুনিয়ায় এসেছি এবং একবারই যথেষ্ট। যদি ভালো করে দেখেন আমি বেদসহ অন্যান্য ধর্ম বিষয়ের ছাত্র হিসেবে বলতে চাই, এই দর্শন বা সংস্কারটা এসেছে ভগবতগীতার একটা শ্লোক তথা অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-২২-এ উল্লেখ আছে যে, মানুষ যেমন কাপড়-চোপড় ছেড়ে নতুন কাপড়-চোপড় পরে, একইভাবে আত্মা

একটা শরীর ছেড়ে নতুন আরেকটা শরীরে প্রবেশ করে। আরো উল্লেখ আছে ভ্রদারণ্যক উপনিষদের ৪র্থ অংশের ৪র্থ অধ্যায়ে ৩ অনুচ্ছেদে শুয়া পোকা যেমন ঘাস খেয়ে উপরে উঠে যায়, তারপর অন্য ঘাসে লাফ দেয়, একইভাবে মানুষের আত্মা একটা শরীর থেকে আরেকটা শরীরে প্রবেশ করে। তবে এ দর্শনটা আমার মতে বেদে উল্লেখ নেই। বেদে বলা হচ্ছে পুনর্জন্মের কথা, গ্রন্থ-১০ পরিচ্ছেদ-১৬, অনুচ্ছেদ-৪-৫ বলা হয়েছে পুনরংল সরসতী জনম মানে জীবন। পুনর্জীবন, পরবর্তী জীবন এসব ঠিক আছে। কুরআনেও পরবর্তী জীবনের কথা বলা হয়েছে, তবে এভাবে বলা হয় নি যে, জন্ম→মৃত্যু →জন্ম→মৃত্যু→জন্ম →মৃত্যু→জন্ম→মৃত্যু। আমার জানামতে বেদের কোথাও নেই।

শ্রী শ্রী রবিশংকর নিজেই বলেছেন যে, বেদ হলো সবার উপরে। তাহলে যদি বেদ আর ভগবতগীতা মিলিয়ে দেখেন সেই সঙ্গে উপনিষদ তাহলে সব ঠিক আছে। আমার দেহ আছে, আত্মাও আছে, শরীরের মৃত্যু হওয়ার পর আবার পরবর্তী জীবনে ফিরে আসব। আমি একথার সাথে একমত যে, মৃত্যুবরণ করার পর আবার জীবন আছে। তবে সেটা অবশ্যই এমন হবে না যে, জন্ম→মৃত্যু →জন্ম→মৃত্যু→জন্ম →মৃত্যু। এই ধরনের সংস্কার এনেছিলেন হিন্দু পণ্ডিতরা। কারণ, তারা বুঝতে পারে নি কেন একজন মানুষ বোবা, কালা, অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কারো হৃৎপিণ্ডের মারাত্মক অসুখ থাকে, কারোর থাকে না। কেউ হয় স্বাস্থ্যবান আবার কেউ অসুস্থ। কেউ জন্ম নেয় বড়লোকের ঘরে, কেউ জন্ম নেয় গরীবের ঘরে। তারা যে দর্শনটা বিবেচনা করলেন সেটা হলো কর্ম। মানুষের কার্যকলাপ, বিভিন্ন কাজ, যেটা করবেন ধর্মের নিয়মে। তাহলে দেখা গেল হিন্দু পণ্ডিতদের মতে, পরবর্তীতে জন্মানোর পদ্ধতি কাজের উপর নির্ভরশীল, আপনি কি কাজ করলেন এর উপর ভিত্তি করে পরের জীবনে ভালো কাজ করলে বড় ঘরে, খারাপ কাজ করলে জন্মাবেন নীচু পর্যায়ে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আপনি বদলাতে থাকছেন। কখনো মানুষ, কখনো গাছ আবার মানুষ। মনে রাখতে হবে আল্লাহর সৃষ্টি সবচেয়ে উপরে হলো মানুষ, যেটা সাতবার ঘটতে পারে। এ মতাদর্শের সাথে ইসলাম একমত নয়। বেদে যেভাবে পুনর্জন্ম পরবর্তী জীবনের কথা বলা হয়েছে সেটা মানলাম। আমরা একবার পৃথিবীতে এসেছি সেটাই যথেষ্ট।

ইসলাম কী বলে? কুরআনের সূরা মুল্‌কের ২নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ ـ

অর্থ : 'আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন।'

পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারার ১৫৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۔ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۔

অর্থ : 'তিনি অবশ্যই পরীক্ষা করবেন ভয়, ক্ষুধা, জীবনের ক্ষতি, ফসলের ক্ষতি এবং ধন-সম্পদের ক্ষতি দিয়ে। আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন?'

তাহলে দেখা গেল আল্লাহ্ আমাদের এই জীবন দিয়েছেন পরকালে পরীক্ষা করার জন্যে। এই দর্শন দিয়ে বলতে চাইলে বলা যায়, কেন মানুষ পঙ্গু হয়, গরিবের ঘরে হয়, ধনীর ঘরে হয়? পবিত্র কুরআনের সূরা আনফাল-এর ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۔

অর্থ : 'জেনে রাখ! তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য।'

তাহলে একথা স্পষ্ট যে, এ জীবন দেয়া হয়েছে পরীক্ষা করার জন্যে, পরকালের পরীক্ষা। তাই আল্লাহ কাউকে পাঠিয়েছেন গরিবের ঘরে আবার কাউকে বড়লোকের ঘরে। এটা আসলেই একটা পরীক্ষা, এই চূড়ান্ত সত্যটা আমাদের বুঝতে হবে। এখন দেখুন পরীক্ষা কীভাবে হয়, আল্লাহ ধনীলোকদের বলছেন তোমরা যাকাত দাও যাদের অতিরিক্ত সম্পদ আছে। প্রতি বছর যাকাত দিবে শতকরা ২$\frac{১}{২}$ টাকা হারে। যাকাত হবে যদি কারো ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ পরিমাণ সম্পদ থাকে। গরিব লোকদের যাকাত দেয়া লাগবে না। আমরা বলি গরিব লোক আদমী, তার টাকা পয়সা নেই, যাকাতের পরীক্ষায় সে পাবে ১০০ থেকে ১০০ মার্ক। ধনী ব্যক্তি সঠিকভাবে যাকাত দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে। যদি ধনী লোক ঠিকভাবে যাকাত দেয় তাহলে সে ১০০ থেকে ১০০ ভাগ মার্ক পাবে, যদি অল্প করে দেয় তাহলে অল্প পাবে আর যদি না দেয় তাহলে শূন্য নম্বর পাবে। অপরদিকে গরিব লোক এক্ষেত্রে পূর্ণ নম্বর পাবে। এটাই হল পরীক্ষা। একইভাবে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করতে কাউকে দেন সুস্বাস্থ্য, আবার কাউকে দেন অসুস্থতা। কারো সন্তান জন্মায় অসুস্থ হয়ে। এটা আগের জন্মের পাপের জন্যে নয়।

কারণ ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী প্রত্যেক শিশুই নিষ্পাপ, মাসুম। এটা বাবা-মায়ের জন্যে পরীক্ষা। যদি কারো হৃৎপিণ্ড অসুস্থ থাকে, তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে. এটা তার আগের জন্মের ফল। এটা আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করার জন্যে দিয়েছেন। গরিব হয়ে জন্মগ্রহণ করা কোন পাপ নয়। কারণ, বেহেশতে যেতে হলে আপনার টাকা পয়সা কাজে লাগবে না, স্বাস্থ্য কাজে লাগবে না। আল্লাহ

তাআলা মা-বাবা, ধনী, গরিব, সুস্বাস্থ্য, অসুস্থ প্রভৃতি দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করছেন। তাহলে দেখা গেল এভাবেই আমরা পরের জীবনে বিশ্বাস করি। সেখানেই আমাদের বিচার হবে। কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ـ

অর্থ : 'প্রত্যেক জীবনকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।'

কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে কিয়ামতের দিন। যদি পৃথিবীতে আংশিক পাপ করেন, আংশিক শাস্তি পাবেন, আবার নাও পেতে পারেন।

চূড়ান্ত শাস্তি হবে পরকালে গিয়ে। বেদেও এ কথা বলা আছে। যেমন : স্বর্গ আর নরক। যদি কাজ ভালো করেন তাহলে যাবেন স্বর্গে। আর যদি খারাপ কাজ করেন তাহলে যাবেন নরকে। কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই অর্থাৎ যারা যারা গেছেন এ পর্যন্ত সবাইকে প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সবাইকে কিয়ামতের দিন বাঁচিয়ে তোলা হবে। সেখানে আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচার করবেন। যার যা প্রাপ্য সে তাই পাবে সে যা করেছে। ভালো কাজ করলে ভালো পুরস্কার পাবে আর খারাপ কাজ করলে শাস্তি পাবে। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

মোহাম্মদ নায়েক : এবার আমাদের অনুষ্ঠানে আজকের শেষ প্রশ্ন ডা. জাকির নায়েকের কাছে।

প্রশ্ন ঃ ২৯০। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার নাম মিত্রা। আমি ওরাকলে চাকরি করি। আপনার লেকচার শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনি যখন বললেন, যে ব্যক্তি শান্তি ছড়ায় না সে মুসলমান নয়। আমি তখন আনন্দে হাততালি দিয়েছিলাম। তাহলে শুধু ভারতে না, পুরো পৃথিবীতে কেন সন্ত্রাসমূলক কাজের সাথে ইসলামকে জড়ানো হচ্ছে? আর এই বিষয়ে আপনাদের নেতারা কি করছেন? ইসলামের নামে এ বদনাম হওয়া তো ঠিক না।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : বোন, আপনি খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। আমরা লক্ষ্য করছি ইসলামের সাথে সন্ত্রাসকে জুড়ে দেয়া হচ্ছে। এটা আসলে ঘটেছে মিডিয়ার কারণে। টাইম ম্যাগাজিন অনুযায়ী এই খবরটা ছাপা হয়েছিল ১৯৯৭ সালের ১৬ এপ্রিল। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ৬০ হাজারেরও বেশি বই লেখা হয়েছে মাত্র ১৫০ বছরের মধ্যে। ১৮০০-১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন একটার বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। আর ৯ সেপ্টেম্বর এর পরে এর পরিমাণ আরো বাড়ছে। মানুষ উদ্ধৃতি দিচ্ছে কুরআন থেকে কিন্তু প্রসঙ্গ বাদ দিচ্ছে। ইসলাম সম্পর্কে এমন সব বক্তব্য দেয়া হচ্ছে যা সত্য নয়। এগুলোর একটা হলো পবিত্র

কুরআনের সূরা তাওবার ৫নং আয়াত। 'যখনই কোন কাফেরকে সামনে পাবে তাকে মেরে ফেলবে।' এটা বলা হয়েছে প্রসঙ্গ ছাড়া। এই আয়াতের প্রসঙ্গ বলা হয়েছে প্রথম দিকের আয়াতে। একটা শান্তি চুক্তি হয়েছিল মক্কার মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের। এই চুক্তি আবার মুশরিকরাই ভঙ্গ করেছিল। এই সময় আল্লাহ সূরা তাওবার উক্ত আয়াত নাযিল করেন এবং বলেন, তোমরা চার মাসের মধ্যে সব ঠিক কর তারপর যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। আর মনে রাখবে যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ মুসলমানদের পরীক্ষা করেন।

যখন তোমার শত্রুরা, যখন কাফিররা যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমাকে মারার জন্যে আসে, তখন যুদ্ধ কর, তাদের মারো। ঠিক একইভাবে আর্মি জেনারেলগণ তার সৈনিকদের মরণপণ যুদ্ধ করতে বলবেন। তাদের মরে যেতে বলবেন। তাই আমি বলব, ঐ উদ্ধৃতি যা উগ্রপন্থীরা দিয়েছে তা প্রসঙ্গ ছাড়া। আর ভারতে ইসলামের একজন সমালোচক, অরুণ শুরী, তিনি বই লিখেছেন 'দ্য ওয়াল্ড অব ফতোয়া'। আর তিনি এই বইয়ে সূরা তাওবার ৫নং আয়াত থেকে ৭নং আয়াতে বলে দিয়েছেন। এর কারণ কী জানেন? কারণ ৬নং আয়াতে ৫নং আয়াতের জবাব দেয়া আছে। ৬নং আয়াতে বলা আছে। 'যদি কোন কাফির আশ্রয় চায়, শান্তি চায়। তার ক্ষতি করিও না। তাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাও।' মনে রাখবেন কুরআন যুদ্ধের কথা বলে শেষ অস্ত্র হিসেবে, যখন যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। তবে কুরআন সবসময় বলে যে, শান্তিই ভাল, শান্তিই কল্যাণ। যদি তারা শান্তিতে থাকতে চায় তাহলে শান্তি দাও। আমি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্র হিসেবে বলতে চাই, পৃথিবীর সব ধর্মে, তাদের ধর্মগ্রন্থে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তবে শেষ উপায় হিসেবে, যাতে শান্তি বজায় থাকে।

শ্রী শ্রী রবিশংকর বলেছেন গীতার কথা। কৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন– গীতার অধ্যায়–১ম অনুচ্ছেদ ৪৩–৪৮-এ এভাবে অর্জুন বলেছে, সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিবে। আরো বলেছে, আমার আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ না করে আমি নিরস্ত্র অবস্থায় মারা যাবো। এরপরে আছে ভগবতগীতার ২৩৩ নং অনুচ্ছেদে, শ্রী কৃষ্ণ বলেন। কীভাবে এমন চিন্তা তোমার মাথায় আসলো? কীভাবে তুমি শক্তিহীন হয়ে পড়লে? তারপর ভগবতগীতার ৩১ থেকে ৩৩ নং অনুচ্ছেদে, তুমি একজন ক্ষত্রিয় তুমি একজন যোদ্ধা। যুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য। সেই ক্ষত্রিয় সেই সৌভাগ্যবান যে, যুদ্ধ করার সুযোগ পায়। আর যদি মহাভারত পড়েন তাহলে কুরআন থেকে বেশি যুদ্ধের কথা পাবেন। তবে মজার কথা হলো, হিন্দুরা আমাকে বলে 'এটা মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের যুদ্ধ।'

আমি বলছি কুরআনও একই কথা বলছে। তাহলে সমস্যা কোথায়? আমরা সবাই একমত। তাই, আপনি যদি প্রসঙ্গসহ পড়েন তাহলে দেখবেন সব ধর্মই শেষ উপায় হিসেবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে যুদ্ধের কথা বলে, অনুমতি দেয়। শ্রী শ্রী রবিশংকর

নিজেও বলেছেন যে, যোদ্ধার কর্তব্য হলো যুদ্ধ করা। এখন প্রত্যেক দেশেই পুলিশ আছে। তাই অপরাধীদের থামিয়ে রাখার জন্যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে পুলিশ বাহিনী অপরাধীদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে। সে জন্যে পবিত্র কুরআনও অনুমতি দেয়। তবে কিছু লোক প্রসঙ্গ ছাড়া কথা বলে তারা ইসলামের নিন্দা করে। আর এ কারণেই লোকজন ইসলামের সাথে সন্ত্রাসকে জড়িয়ে ফেলে। আরো বিস্তারিত জানতে আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন 'জিহাদ অ্যান্ড টেরোরিজম : ইন দ্য রাইট পারসপেকটিভ'। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

মোহাম্মদ নায়েক : আমি আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সবার আগে ধন্যবাদ জানাব সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে। তাঁর ইচ্ছেতেই আমরা অনুষ্ঠানটা সফলভাবে শেষ করতে সক্ষম হলাম। সবাই আমরা একত্রিত হতে পারলাম। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাব আজকের অনুষ্ঠানের বক্তাদের যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে, ধৈর্যের সাথে আমাদের সাথে থেকে সহযোগিতা করলেন, সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আস্‌সালামু আলাইকুম। সবাই শান্তিতে থাকুন, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ।

ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিলহাম দুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

প্রশ্ন ঃ ২৯১। ধন্যবাদ ডা. নায়েককে তাঁর 'ইসলামে আল্লাহর ধারণা' বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য। আমার সাধারণ একটি প্রশ্ন তা হলো– আপনি জাতিগত ভ্রাতৃত্ব, ভাষাগত ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বলেছেন এবং সেগুলো বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ধারণার সাথে বৈপরীত্য বহন করে। কিন্তু আপনি কাফির সম্পর্কে কিছু বলেন নি, যেটা আমি মনে করি সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বড় বাধা।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আমি কি আপনার নাম জানতে পারি, যাতে আমি উন্নত পন্থায় আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি? আচ্ছা ইনি ভিওয়ান্দি কলেজের প্রফেসর নিগাদ।

অধ্যাপক সাহেব একটা প্রশ্ন করেছেন যে, আমি সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক ধরনের ব্যাখ্যাই করেছি। আরো বলেছি যে, ভ্রাতৃত্বের ধারণা রক্ত সম্পর্ক জাতি, বর্ণ, গোত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে যা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। কিন্তু আমি কাফিরের ধারণার ওপরে আলোচনা করি নি।

কাফির সম্পর্কে ভুল ধারণা

কাফির একটি আরবি শব্দ, যা কুফর (كفر) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ : ঢেকে ফেলা, লুকানো। এর অর্থ প্রত্যাখ্যান করা ও বাতিল করাও হয়। ইসলামি পরিভাষায় এর অর্থ হলো– যে ব্যক্তি ইসলামের সত্যকে প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করে এ ধরনের ব্যক্তিকে কাফির (كافر) বলে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের সত্যকে

অস্বীকার করে যে, আল্লাহ এক, আমি যা বললাম সে কাফির। যেকোনো ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বাসের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পাশাপাশি এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্ব অন্য যেকোনো **কিছুর ভিত্তিতে যে ভ্রাতৃত্ব তার মধ্যে পড়ে।**

শতশত প্রকারের ভ্রাতৃত্ব হতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভিত্তিতে যেমন : ভারত, পাকিস্তান, আমেরিকার ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব। এ সব অন্যান্য ভ্রাতৃত্ব যা বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে ভ্রাতৃত্ব তার আওতাভুক্ত নয় .... এক ঈশ্বরের ভিত্তিতে গঠিত ভ্রাতৃত্ব সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। এমনকি কাফিরের ভ্রাতৃত্ব। তারা কি সমস্যার সৃষ্টি করে? হ্যাঁ, যেগুলো সমস্যার সৃষ্টি করে। কাফিরের অর্থ কী? যে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে।

কিছু অমুসলিম আমাকে প্রশ্ন করে। প্রশ্নোত্তরের সময়–একটা ক্যাসেটে আছে সে বলে, কেন মুসলিমরা আমাদের 'কাফির' বলে গালি দেয় এবং লোকেরা বলে যে, তাদের আঁতে ঘা লাগে। আমি বলি, দেখুন, 'কাফির' হলো একটি আরবি শব্দ যার অর্থ 'যে ব্যক্তি ইসলামের সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে।' যে ব্যক্তি ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে ইংরেজিতে তাকে যদি আমি অনুবাদ করি তাহলে দাঁড়াবে নন-মুসলিম/অমুসলিম। যে ইসলামের সত্যকে অস্বীকার করে এভাবে তাকে কাফির বলে। এটা ইংরেজি নন-মুসলিম শব্দের অনুবাদ। সুতরাং আপনি যদি অমুসলিম বলতে বাধা দেন, তাহলে আমি কি করতে পারি? সুতরাং যদি কেউ বলে... কেন আপনি আমাকে কাফির বলেন? আমাকে কাফির বলবেন না। তাহলে আমি তাকে বলতে পারি আপনি ইসলাম কবুল করলে আমি আপনাকে কাফির বলা বন্ধ করব। এটা অমুসলিম/নন-মুসলিম শব্দের আরবি মাত্র। আশা করি উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২৯২। ডা. নায়েক, আমি অ্যাডভোকেট মাধব পাদকী। আপনি আপনার বক্তব্যে বলেছেন, খোদা জীবন্ত অনুভবের বাইরেও আকারবিহীন যেমন– হিন্দু ধর্মে বলে। তবে কেন আপনারা মুসলিমরা হজ বা তীর্থযাত্রা করেন? ওখানে লোকেরা তীর্থস্থানের পূজা করে যেমনভাবে হিন্দুরাও করে।

উত্তর : ডা. জাকির ঃ দাদা যেটা করলেন তা খুবই ভালো প্রশ্ন যে, ইসলামে খোদার যদি কোন অনুভবের ধারণা ইসলামে না থাকে। আল্লাহর কোন আকার নাই। তবে কেন মুসলমানরা হজে বা তীর্থযাত্রায় গিয়ে পবিত্র কাবার পূজা করে?

মুসলমানরা কাবার পূজা করে না, এটা হলো শুধু ক্বিবলাহ (নামাযের দিক নির্দেশনা) ঃ

ভাই এটা একটা ভুল ধারণা। আমরা শুধুই আল্লাহর ইবাদত করি যাকে আমরা এ পৃথিবীতে দেখতে পারি না। আমরা কাবাকে কিবলাহ হিসেবে গ্রহণ করি, আরবিতে কিবলাহ যার অর্থ 'দিক নির্দেশনা'। কাবা হলো কিবলা, কারণ আমরা মুসলিমরা

একতায় বিশ্বাসী। উদাহরণত, যদি আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদত করতে চাই, যদি আমরা সালাত আদায় করতে চাই, কেউ বলতে পারে, আসুন আমরা দক্ষিণ দিকে মুখ করি, কেউ বলতে পারে, উত্তর দিকে, কেউ বলতে পারে পূর্ব দিকে, কেউ পশ্চিম দিকে। আমরা কোন দিকে ফিরব? আমরা একতায় বিশ্বাসী। তাই সারা পৃথিবীর সব মুসলিমের কিবলার দিকে মুখ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যা হলো দিক-নির্দেশনা, আমরা এর পূজা করি না।

প্রথম যে লোকেরা বিশ্ব মানচিত্র অংকন করেছিলেন, তারা ছিলেন মুসলমান এবং মুসলমানরা যখন বিশ্ব মানচিত্র অংকন করেন তারা দক্ষিণ দিককে উপরের দিক এবং উত্তর দিককে নিচে স্থাপন করেন, তখন কাবা ছিল কেন্দ্রে। যখন পশ্চিমারা এল তারা ওপরের দিককে নিচে স্থাপন করল, উত্তর দিক ওপরে, দক্ষিণ দিক নিচে, আলহামদুলিল্লাহ তখনও কাবা কেন্দ্রেই পাওয়া যায়। কারণ মক্কা হলো কেন্দ্রে এবং যেহেতু মক্কা কেন্দ্রে অবস্থিত। যেকোনো মুসলিম বিশ্বের যে অংশেই থাকুন, যদি তিনি কাবার উত্তরে থাকেন তিনি দক্ষিণে মুখ করবেন, যদি তিনি কাবার দক্ষিণে থাকেন, তাহলে উত্তরে মুখ করবেন। পৃথিবীব্যাপী সব মুসলিম একই দিকে মুখ করবেন।

আর আমরা যখন হজে যাই, তীর্থ যাত্রায়, আমরা কাবার চারদিকে তাওয়াফ করি, যাতে সবাই জানতে পারে যে, সব চক্রের একটাই কেন্দ্র। সুতরাং আমরা কাবার চারদিকে তাওয়াফ করি এ প্রমাণ দেবার জন্য যে, আল্লাহ একজনই। এ কারণে নয় যে, আমরা কাবার পূজা করি এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর কথা, যা সহীহ মুসলিমে কিতাবুল হজে দ্বিতীয় ভলিউমে এসেছে, তিনি বলেন, আমি কালো পাথরকে চুম্বন করি, যা হলো কাবার হাজরে আসওয়াদ। এ কারণে যে আমার নবী একে চুম্বন করতেন। অন্যথায় এ কালো পাথর আমার কোন ক্ষতি কিংবা কোন উপকার করতে পারে না। তিনি এটা পরিষ্কার করে দিলেন যে, কোন মুসলিম কালো পাথরের ইবাদত করতে পারে না। এটা আমাদের কোন উপকার ও ক্ষতি করতে পারে না।

এর আরো ভাল উদাহরণ হলো রাসূল ﷺ-এর সময়ে রাসূল ﷺ-এর সাহাবা তথা সঙ্গিগণ কাবার ওপর উঠে আযান দিতেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি কোন পৌত্তলিক সে যে পুতুলের পূজা করে তার ওপরে দাঁড়াবে? সুতরাং এগুলোই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট.যে, কোন মুসলমানই কাবার পূজা করে না; বরং কা'বা হলো কিবলা, আমরা আল্লাহর ইবাদত করি, যাকে আমরা চোখে দেখি না। আশা করি উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২৯৩। আমি ডা. ভিয়াস, চিকিৎসা সেবী। আমরা এখানে এসেছি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জন্য, আমরা ইসলামের ভাউদ্দিক (উকালতি) এর জন্য এখানে আসি নি। আমি আপনাকে এ পৃথিবীর

ভ্রাতৃত্বের বিষয়ে কথা বলতে অনুরোধ করব। এখন এটা হলো বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, আমি জানতে চাই বিশ্বের অন্য অংশেও কি আমাদের ভাইয়েরা আছেন? ভারতে আমাদের ভাইয়েরা আছেন, সুতরাং আমরা ভারতীয় ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বলি। সুতরাং এদেশের ভ্রাতৃত্ব কিভাবে বিগত একশত বছর যাবত এদেশের ইতিহাসের ওপর প্রভাব ফেলেছে?

উত্তর : ডা. জাকির ঃ ভাই একটি খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন, একটি খুবই সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন। তিনি বলেন যে, আপনি জানেন তিনি এখানে এসেছেন ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে জানার জন্য এবং আমি শুধু এ পৃথিবীর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বলেছি এবং পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও আমাদের ভাইয়েরা আছেন কিনা? ভাই একজন ডাক্তার আল-হামদুলিল্লাহ। যদি আপনি আমার কথা শুনে থাকেন, যদি ভাই আমার বক্তব্যের দিকে মনোযোগ দিয়ে থাকেন, আমি বলেছি, আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহতে বিশ্বাস করি, যিনি বিশ্বের প্রতিপালক, সারা পৃথিবীর রব, বিশ্বের প্রতিপালক অর্থ এ পৃথিবীর বাইরেও যে জগৎ আছে তারও প্রতিপালক।

এরই মধ্যে তিনি ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বলতে বলেছেন যে, যা হলো ভ্রাতৃত্ব এবং সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব অর্থ শুধু এ পৃথিবীর ভ্রাতৃত্ব নয়; বরং বিশ্বগুলোর ভ্রাতৃত্ব, মহাবিশ্বের ভ্রাতৃত্ব।

আল-কুরআন অনুসারে ৪২ নং সূরা শুরার ২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ـ

অর্থ : 'তার নিদর্শনের মধ্যে আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি, এ দুয়ের মাঝে বিচরণশীল প্রাণী তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ কুরআন বলে এ বিশ্বের বাইরেও জীবজন্তু সৃষ্টি রয়েছে।'

বিজ্ঞান তত দূর পৌঁছাতে পারে নি, এ প্রমাণ দিতে যে, এ পৃথিবীর বাইরেও সৃষ্টি রয়েছে। আপনি জানেন বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহে প্রাণী আছে এটা ভ্রমণের জন্য রকেট, উপগ্রহ এবং মোমশীপ পাঠাচ্ছেন। এটা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তারা বলে খুব সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কুরআন বলে, এ পৃথিবীর বাইরেও জীবন আছে এবং আমি এতে বিশ্বাস করি। সুতরাং সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বলতে শুধু এ পৃথিবীর ভ্রাতৃত্ব বুঝায় না। এটা অন্যান্য বিশ্বের ভ্রাতৃত্বও বুঝায়। যেমন– আপনি ঠিকই বলেছেন–এমনকি ভারতীয় ভ্রাতৃত্ব। ভারতীয় ভ্রাতৃত্বও বিশ্বব্যাপী।

এ ধরনের ভ্রাতৃত্ব থাকার জন্য যদি আপনি আমার বক্তব্য শুনে থাকেন। আমি আমার পূর্ণ বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। যে একটা নৈতিক চুক্তি থাকা উচিত যে, কোন মানব অন্য মানবকে হত্যা করবে না, সে চুরি করবে না, তাকে যাকাত দিতে হবে, তার প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে হবে, তাকে গীবত পরিহার করতে

হবে, তাকে এটা দেখতে হবে যে, সে যখন পেট পুরে খেয়ে ঘুমায় তার প্রতিবেশীও ভালভাবে খেল কিনা। তাকে এটাও দেখতে হবে যে, তাকে মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে, যা বিদ্যমান বিশ্ব ভ্রাতৃত্বকে ব্যাহত করে। তাকে গীবত করা চলবে না, সে কাউকে ঠকাবে না। এ সব জিনিস সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের উন্নয়ন ঘটাবে শুধু ভারতেই নয়, শুধু পৃথিবীতেই নয়, বরং সারা মহাবিশ্বে। হতে পারে যে, আপনি আমার বক্তব্যের কিছু অংশে মনোযোগ দেন নি।

আমার বক্তব্য আলহামদু লিল্লাহ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছে। এটা ভারত, আমেরিকা সারা পৃথিবী এমনকি মহাবিশ্বকে শামিল করেছে এবং এটা মূলত ধর্মেরও স্থলাভিষিক্ত, যদি আপনারা বিশ্বাস করেন যে, মানব স্রষ্টা, সবার স্রষ্টা তা ভারত, আমেরিকা এমনকি এ পৃথিবীর বাইরে যা আছে তারও স্রষ্টা। তিনি এক সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং সব ধর্মই মূলত এক আল্লাহতে বিশ্বাস করতে বলে, যা আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আল্লাহর ধারণা সম্পর্কে আমি Concept of God in Major Relegions-এ বিস্তারিত বলেছি। এতে অন্যান্য ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে যেমন শিখ ও পার্সী ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত বলেছি। বিস্তারিতই বলেছি, তারপরেও যদি কেউ ভালভাবে জানতে চান, তাহলে "Concept of God in Major Relegions"-এর ওপর যে ক্যাসেট আছে তা সংগ্রহ করতে পারেন, ফয়েরের বাইরে তা পর্যাপ্ত রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২৯৪। আমি উলহাস নগরের সাবকাটাল মালানি। আমি মনে করি ডা. জাকির বক্তব্যের খেলা খেলছেন। তিনি শুধু বক্তব্যের ভোজবাজি খেলছেন। ইসলাম সারা পৃথিবীর মানুষকে দু ভাগে বিভক্ত করেছে। একদল মুমিন আরেকদল কাফির। নিশ্চিতভাবেই ইসলাম যা বলে তার অনেক কিছুই আমরা বিশ্বাস করি না। ইসলাম আমাদের ওপর যা চাপিয়ে দিতে চায়, তাতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্ভব নয়। ইসলাম শুধু বিভক্ত শক্তি সৃষ্টি করে। এমনকি আমরা শিয়া, সুন্নী সম্পর্কে জানি এবং ইসলামের মধ্যেই আরো ৭০টি সম্প্রদায় রয়েছে। ইসলাম সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব দিতে পারবে না। শুধু হিন্দুধর্মই সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব দিতে পারে, যেটা আপনি উদ্ধৃত করেছেন। ইসলাম স্বীকার করে না, গোহত্যা, কাফির হত্যা, সম্পদ অধিগ্রহণ, লুট, নারী সম্পর্কে যা ইসলাম বলে। কীভাবে ভ্রাতৃত্ব আসবে? আপনি ভ্রাতৃত্বের কথা বলেন। এটা কথার ফুলঝুরি মাত্র। বাস্তবে বলতে গেলে, আপনি ইসলামের নামে হিন্দুধর্মের কথাই বলছেন।

উত্তর : ডা. জাকির ঃ দাদা অনেক মন্তব্য করেছেন এবং ইসলাম বলে–

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

অর্থ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।'

ভ্রাতৃত্ব পেতে হলে আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে। আমি যদি ধৈর্য না ধরি তাহলে আমার ও দাদার মধ্যে যুদ্ধ হবে। ইসলাম ২ নং সূরা আল বাকারার ১৫৩ নং আয়াতে বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। আমি আমার বড় দাদাকে এখানকার বাইরেও শ্রদ্ধা করি। তার হয়তো হিন্দুধর্মের ওপর ভালো পড়া-শুনা আছে; কিন্তু আমি দুঃখিত যে আমি তার সঙ্গে একমত হতে পারছি না আমি আরো বলতে চাই যে, ইসলাম সম্পর্কে তার পড়াশুনা কিছুটা দুর্বল।

আমি এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একমত যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ দু' ধরনের। এক প্রকার হলো বিশ্বাসী মুমিন, অন্য প্রকার হলো কাফির তার বক্তব্য মতে। প্রত্যেক ধর্মে এমনকি হিন্দুধর্মের দৃষ্টিতেও মানুষ দু' ধরনের– হিন্দু ও অহিন্দু। খ্রিস্ট ধর্মে খ্রিস্টান ও অখ্রিস্টান। ইহুদি ধর্মে ইহুদি ও অইহুদি। ইসলামে একজন মুসলিম ও অন্যজন অমুসলিম। সুতরাং ইসলাম কোথায় পার্থক্য করল? আমি এখানে হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করব না। কিন্তু যেহেতু আপনি শিক্ষিত বক্তা, আমি হিন্দুধর্মের ওপর কথা বলতে চাই। কারণ আমি তুলনামূলক ধর্ম তত্ত্বের একজন শিক্ষার্থী। আমি (ধর্ম তত্ত্ব) বেদ ও উপনিষদ অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু শুধু একটা ছোট্ট মন্তব্য করি, বেদ অনুসারে সেখানে উল্লেখ আছে যে, মানবজাতি সর্বশক্তিমান খোদার চার অংশ থেকে সৃষ্ট। মস্তক থেকে ব্রাহ্মণ, বক্ষ থেকে ক্ষত্রীয়, উরু থেকে শুদ্রগণ সৃষ্টি হয়েছেন। এ বক্তব্যই বর্ণ প্রথার জন্ম দিয়েছে।

আমি এখানে এ ধরনের বিষয়ে মন্তব্য করতে চাই না। আমি আমার হিন্দু ভাইদের অনুভূতিতে আঘাত করতে চাই না। ইসলাম এর সাথে একমত নয়। আমিও ঐ সব বিষয়ের ওপর মন্তব্য করতে চাই না। আমি কোন ধর্মের সমালোচনা করব না।

আমি বলি নি যে, অমুক ধর্ম ভুল। কিন্তু যদি আপনি আপনার বেদ ভালভাবে জানেন, আপনি শ্রোতাদেরকে পরীক্ষা করতে দিন, বেদ কি বলে না যে, মাথা থেকে ব্রাহ্মণ, বক্ষ থেকে ক্ষত্রীয়, উরু থেকে বৈশ্য–ব্যবসায়ী শ্রেণী, শিক্ষিত ও যোদ্ধা শ্রেণী? শুদ্রদের মনে হয় পদদলিত করা হয়েছে। ড. এমবেডকার-এর লিখিত অনেক বই আছে, আমি বিস্তারিত আলোচনার দিকে যেতে চাই না, দাদা আমি হিন্দু ধর্ম ভালভাবে অধ্যয়ন করেছি। আমি হিন্দুদের অনেক বিষয়কে শ্রদ্ধা করি, তবে কিছু বিষয়ের সাথে একমত হতে পারি না। আমাকে এখানে বলতে হচ্ছে কারণ আপনি আমাকে বলতে বাধ্য করছেন। আল-কুরআনের ৬ নং সূরা আনআমের ১০৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ -

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত যাদের তারা ডাকে তোমরা তাদের বকিও না, যাতে সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত তারা আল্লাহকে বকা না দেয়।'

আমি যা বলেছি তা হলো হিন্দুদের ভালো দিক। তা হলো তারা এক খোদার ধারণায় বিশ্বাস করে।

আপনার প্রশ্নানুযায়ী ..... যে আপনি জানেন মুসলমানরা লোক হত্যা করে, আপনি বলেছেন, তারা গো হত্যা করে, সঠিক। আপনি বলেছেন যে, প্রত্যেক সমস্যারই সমাধান প্রয়োজন। সময় অনুমতি দেয় না, আমি মাত্র কয়েকটি তুলে ধরব। অন্যগুলো আপনি পরবর্তীতে আসতেও জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমি ভুল ধারণা দূর করার জন্য এখানে আছি। এতে আমার জন্য ভালোই হবে। শুধু আমি যদি ভুল ধারণা দূর করতে পারি, তাহলে হয়তো ঐ লোকটা ভালভাবেই ইসলামকে বুঝতে পারবে। অতএব আমাদের এ অধিবেশন শুধু প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং আমরা যে কোনো ব্যক্তিকে আমাদের সমালোচনা করার জন্য স্বাগতম জানাব, আমি একেই ভালবাসি। যে ব্যক্তি বেশি সমালোচনা করে, সে যুক্তি দ্বারা বেশি আশ্বস্ত হয়, সে ইসলামকেও ভালভাবে বুঝতে পারবে, এটাই আমি করি। ইসলাম তাঁর সত্য বাণীকে হিকমতের সাথে শিক্ষা দিতে চায়। আল-কুরআনের ১৬ নং সূরা নাহল-এর ১২৫ নং আয়াতে বলেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

অর্থ : 'ডাক তোমার প্রভুর পথে, প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশ দিয়ে।'

আমরা কি আমিষভোজী হতে পারি? এ ধারণা অনুযায়ী গো বা এ ধরনের হত্যার ব্যাপারে অনেক অমুসলিম আছেন যারা বলেন ... আপনারা জানেন, আপনারা মুসলিম, আপনারা সবাই নিষ্ঠুর লোক, আপনারা সবাই প্রাণী হত্যা করেন। শুধু আপনার সদয় অবগতির জন্য বলি, একজন মুসলিম শুধু নিরামিষ ভোজন করেও ভাল মুসলিম হতে পারে, এটা বাধ্যতামূলক নয় যে, তাকে মাংসাশী হতেই হবে। ভাল মুসলমান হতে হলে; কিন্তু যেহেতু আল-কুরআন বহু স্থানে বলেছেন, আপনি গরু খেতে পারেন। তাঁকে কেন আমরা খাব না? ৫ নং সূরা মায়িদা ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ ـ

অর্থ : 'তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর, তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে, তবে সেগুলো ব্যতীত যা বর্ণনা করা হয়েছে।'

১৬ নং সূরা নাহল-এর ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ـ

অর্থ : 'তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্যে, ওতে রয়েছে শীত উপকরণসহ আরো অনেক ধরনের উপকার এবং তাদের গোশত তোমরা ভক্ষণ কর।'

২৩ নং সূরা মুমিনূন-এর ২১ নং আয়াতে এ কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এভাবে–

وَإِنَّ لَكُمْ فِى الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ.

অর্থ : 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে অবশ্যই এই চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে প্রচুর শিক্ষণীয় আছে, তাদের পেটের মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে আমি তোমাদের দুধ পান করাই, এ ছাড়াও আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে, এ ছাড়া তার গোশতও তোমরা খাও।'

আপনারা জানেন আমিষজাতীয় খাদ্যে প্রচুর আয়রন আছে এবং অনেক পুষ্টিকরও। এটা এখানে যে চিকিৎসকরা রয়েছে তারা নিশ্চিত করবেন। এমনকি আমিও একজন চিকিৎসক আমিও তা জানি। অন্যান্য খাদ্য এবং যে পরিমাণ প্রোটিন আপনি গোশতজাতীয় খাদ্যে পাবেন, আপনি অন্য সবজিজাতীয় খাদ্যে তা পাবেন না। সবজিজাতীয় খাদ্যের মধ্যে সয়াবিন যাকে সর্বোত্তম প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য হিসেবে গণ্য করা হয়, তাও গোশতজাতীয় খাদ্যের প্রোটিন মানের ধারে কাছেও না।

আর গোহত্যা বিষয়ক ধারণার ক্ষেত্রে যদি আপনি হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, আপনি পাবেন যে, তারাও এক ব্যক্তিকে মাংসাশী হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আমি এখানে কোন ধর্মের সমালোচনা করতে চাই না। যেহেতু ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন, সেহেতু আমাকে সত্য বলতে হবে। যদি আপনি হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাহলে দেখবেন সাধক-সন্ন্যাসীরা মাংসাশী ছিলেন। এমনকি তারা গোমাংসও ভক্ষণ করতেন। পরবর্তীতে জায়ন বা এ ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাবে, লোকেরা অহিংসা দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত হন। অর্থাৎ প্রাণী হত্যা করা যাবে না। তারা জীবনের ক্ষেত্রে এ দর্শন অবলম্বন করেন। অন্যথায় ইসলামও প্রাণী অধিকারের পক্ষে।

আমি প্রাণী অধিকারের ওপরও বক্তব্য দিতে পারি। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা বলে– প্রাণীদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিও না, তাদের সাথে ভাল আচরণ কর, তাদের আহার্য দাও। কিন্তু প্রয়োজনে তারাও আহার্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

আপনারা যদি অন্য ধর্ম বিশ্লেষণ করেন, যাতে এ দর্শনে বিশ্বাস করে যে 'আপনাকে মাংসাশী হওয়া চলবে না।' এ দর্শন ঐ ধারণার ওপরে ছিল যে, 'তোমার প্রাণী হত্যা করা উচিত নয়, কারণ তারা জীবিত। অতএব মাংস ভক্ষণ করা পাপ।' আমি তাদের সঙ্গে একমত। এ পৃথিবীতে যদি কেউ কোনো জীবন্ত সৃষ্টি হত্যা না করে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আমি হব প্রথম ব্যক্তি।

হিন্দু ধর্মে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের নমুনা হলো প্রত্যেক জীবিত জিনিস আপনার ভাই। প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী চাই, সে প্রাণী পাখি বা পোকা-মাকড় যাই হোক না কেন।

আমি একটি সাধারণ প্রশ্ন করতে চাই, কিভাবে একজন মানুষ মিলিয়ন মিলিয়ন তার ভাইকে হত্যা না করে পাঁচ মিনিটও জীবিত থাকতে পারে? যারা চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে জানে, তারা আমি যা বলছি তা বুঝতে পারবেন যে, যখনই আপনি শ্বাস নেন, তখন লক্ষ লক্ষ জার্ম আপনি শ্বাসের সাথে গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথে হত্যাও করেন। তার অর্থ এ ধর্মের মর্মানুসারে আপনি আপনাদের ভাইদের হত্যা করছেন নিজেদের বেঁচে থাকার তাগীদে।

ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ধারণা অনুযায়ী প্রত্যেক মানব আপনাদের ভাই। বিশ্বাসের ভাই অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমান একজন ভাই। প্রত্যেক জীবন্ত জিনিসই আমার ভাই নয়, যদিও প্রত্যেক জীবিত জিনিসের রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। অপ্রয়োজনে তাদের কষ্ট দেয়া যাবে না, অত্যাচার করা যাবে না। অবশ্য প্রয়োজনে আপনারা তাদেরকে খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন।

সুতরাং এ দর্শন বলে যে, মাংস ভক্ষণ করা পাপ, কারণ আপনি জীবিত জিনিস হত্যা করছেন। আজ বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, '.....এমনকি গাছেরও জীবন আছে।' আপনি কি তা জানেন? এভাবে এ যুক্তি যে, জীবিত জিনিস হত্যা করা পাপ এটা ব্যর্থ। সুতরাং এখন তারা তাদের যুক্তি পরিবর্তন করছে এবং তারা বলে, দেখুন গাছেরও জীবন আছে, কিন্তু তারা ব্যথা অনুভব করতে পারে না। অতএব প্রাণী হত্যা করা, বৃক্ষ হত্যা করার চাইতেও বেশি পাপ। আপনারা কি জানেন আজ বিজ্ঞান আরো অগ্রসর এবং আমরা জানতে পেরেছি, এমনকি বৃক্ষও ব্যথা অনুভব করতে পারে। তারা কাঁদতে পারে, তারা সুখানুভব করতে পারে– গাছপালা ব্যথা অনুভব করতে পারে না। কি কারণে গাছের ক্রন্দন মানবকর্ণ শুনতে পারে না, কারণ মানবকর্ণ প্রতি সেকেন্ডে ২০ থেকে ২০,০০০ সাইকেল পর্যন্ত শুনতে পায়। এর মাঝে যা আছে তা মানুষ শুনতে পায়। এর নিচে বা উপরে যা আছে তা মানবকর্ণ শুনতে পায় না। উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো মানব কুকুরের বাঁশি বাজায় আপনারা জানেন কিছু কুকুরের বাঁশি আছে।

এগুলোকে নীরব কুকুরের বাঁশি বলা হয়, এটা এমন বাঁশি বাজায় যার ফ্রিকোয়েন্সি ২০,০০০ সাইকেল এরও ওপরে এবং ৪০,০০০ সাইকেলেরও নিচে প্রতি সেকেন্ডে। কুকুর প্রতি সেকেন্ডে ৪০,০০০ সাইকেল পর্যন্ত শুনতে পারে। সুতরাং মনিব যখন বাঁশি বাজায়, তখন কুকুর তা শুনতে পায়; কিন্তু মানুষ তা শুনতে পায় না। একে বলে নীরব কুকুরের বাঁশি।

একইভাবে গাছ-পালার ক্রন্দন মানুষ শুনতে পায় না; কিন্তু বাস্তবতা হলো তারা কাঁদে এবং ব্যথা অনুভব করে। আমাদের এক ভাই ছিলেন যিনি বেশির ভাগ যুক্তি পেশ করতেন এবং আমাকে বলেন, ভাই জাকির, আমি আপনার সঙ্গে একমত যে, গাছেরও জীবন আছে, তারা ব্যথা অনুভব করে; কিন্তু আপনি জানেন, গাছের দুটি

অনুভূতি কম আছে। তাদের মাত্র তিনটি অনুভূতি আছে যেখানে প্রাণীর আছে পাঁচটি অনুভূতি। সুতরাং প্রাণী হত্যা করা গাছ হত্যা করার চেয়ে বেশি পাপ। আমি তাকে বললাম, ভাই মনে করেন আপনার একজন ছোট ভাই আছে; যে জন্মগতভাবে বধির এবং বোবা–দুটি অনুভূতি কম। সে বড় হওয়ার পর যদি কেউ গিয়ে তাকে হত্যা করে, তাহলে কি আপনি বিচারককে বলবেন, জনাব, আপনি হত্যাকারীকে কম শাস্তি দিন, কেননা আমার ভাইয়ের দুটি অনুভূতি কম ছিল। আপনি কি তা বলতে পারবেন? আপনি বলবেন, তাকে আপনি দ্বিগুণ শাস্তি দিন; কারণ সে এমন একজনকে হত্যা করেছে যে ছিল নিরপরাধ।

অতএব ইসলামে যুক্তি ঐরূপ কাজ করে না– দুই অনুভূতি বা তিন অনুভূতি। ২ নং সূরা বাকারার ১৬৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا ـ

অর্থ : 'তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র জিনিস থেকে খাও।'

অর্থাৎ যাই ভালো ও আইনসিদ্ধ তা তুমি খেতে পার এবং ঐ কারণেই তো আপনারা পৃথিবীর গরু, বাছুরকে বিশ্লেষণ করেন। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় গরু-বাছুরের উৎপাদন অনেক বেশি। এমনকি মানুষের তুলনায়ও সেগুলো খুবই দ্রুত বৃদ্ধি পায়। আমি যদি আপনার সঙ্গে একমত হই যে, কোন মানুষ গরু-বাছুর খাবে না; তাহলে গরু-বাছুরের উৎপাদন পৃথিবীতে অতিমাত্রায় বেড়ে যাবে এবং গরু হত্যার ব্যাপারে মাওলানা আব্দুল করীম পারিখ-এর 'গোহত্যা'–গো-জবাই নামে একটা বই রয়েছে। কে দায়ী?

আপনি যদি চর্ম শিল্পে যে লোকেরা কাজ করে, তাদের ওপরে বিশ্লেষণ করেন যারা গোচর্মের ওপর কাজ করে। আপনি সেখানে মুসলমানের চেয়ে অমুসলমানের সংখ্যাই বেশি পাবেন। চামড়া জেইনগুলো ওখানে কাজ করে। সুতরাং যে লোকেরা গোহত্যার দ্বারা উপকৃত হয়, তাদের বেশির ভাগই অমুসলিম। সুতরাং আপনি যদি ইতিহাস ভালভাবে জানেন এবং আপনি যদি যুক্তি ভালভাবে জানেন, আপনি বুঝতে পারবেন যে আল্লাহ বলেন, 'পবিত্র জিনিস খাও, যা আমরা তোমাদের দিয়েছি।' যদি আপনার থাকে তাতে কোন সমস্যা নেই। এরপরও যদি আপনি গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি তৃণভোজী প্রাণীর দাঁতের পাটি বিশ্লেষণ করেন সেগুলো শুধু সব্জি খায় এ কারণে দাঁতের পাটি চ্যাপ্টা। যদি আপনি, সিংহ, বাঘ, চিতা ইত্যাদি মাংসাশী প্রাণীর দাঁতের পাটি বিশ্লেষণ করেন, তাদের দাঁত ধারাল। কারণ তারা শুধু আমিষ ভোজন করে। যদি আপনি মানব দাঁতের পাটি বিশ্লেষণ করেন আপনি আয়নার সামনে গিয়ে নিজের দাঁতগুলো দেখেন, আপনি দেখবেন আপনার সুচালো দাঁতও আছে আবার চ্যাপ্টা দাঁতও আছে। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ

চাইতেন যে আমরা যেন নিরামিষভোজী হই, তাহলে তিনি কেন আমাদের সুচালো দাঁত দিলেন? কেন? স্বাভাবিকভাবে যেন আমরা মাংসভোজী হই।

যদি আপনি গরু, ভেড়া ইত্যাদি তৃণভোজী প্রাণীর পাচন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেন, তাহলে আপনি পাবেন যে, এগুলোর পাচন প্রক্রিয়া এমন যে, এগুলো শুধু তৃণ হজম উপযোগী। আবার সিংহ বাঘ, চিতা এরূপ মাংসাশী প্রাণীর পাচন প্রক্রিয়া মাংস ভোজন উপযোগী। মানুষের পাচন প্রক্রিয়ায় উভয়ই অর্থাৎ মাংস ও সবজি সব প্রকারের হজম শক্তিই রয়েছে। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ চাইতেন যে আমরা নিরামিষভোজী হবো তাহলে তিনি কেনো আমাদের এমন হজম প্রক্রিয়া দান করলেন যাতে আমিষ, নিরামিষ, উভয় প্রকারের জিনিসই হজম হয়? সুতরাং বৈজ্ঞানিকভাবে যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন, তাহলে পরিষ্কার হয় যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের উভয় প্রকারের ভোক্তা হবার ব্যবস্থাই রেখেছেন। আমিষ ও নিরামিষভোজী। আশা করি উত্তর হয়ে গেছে। যদি আরো কিছু জানার থাকে আরো কোন ভুল ধারণা থাকে, তাহলে আমি উত্তর দিব। কারণ আমাকে সব ভুল ধারণার সাথে ইনসাফ করতে হবে। দাদা আপনাকে ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ঃ ২৯৫। (হিন্দিতে) নেহি বুরা হায় বেদ আওয়ার শাস্ত্র নেহি কুরআন বুরা হায়, বিনা সমঝে বাতইন, আওর বি সমঝা ভায়াখিয়ান বুরা হায়, সমঝো হাম আপনি বাতাউ, আউর সবকা ধিয়ান বুরা হায়, আপনি আপনি হিসাব সি ঘোকো, কি আস উসবা প্রভুকা সাম্মান নেহি বুরা হায়, আউর ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড কি পাহলি সি, জাহাভি কুই বাতইন হোনি চাহিয়ে উহাঁ পর মাযহাব কি কুই বাত হোনী নেহি চাহিয়ে। মাযহাব সী উপার উঠ কর বাত হোনি চাহিয়ে, কিউঁ কি মাযহাব মে উপার উঠনা হি উস আল্লাহ তায়ালা কো বানা হায়–উস পরমত কো পানা হায়। আউর পহেলী গডকা মিনিং সমঝোকো গডকো মেনিং কিয়া হায়। গড গাওস কুচ নাহি হোতা হায় G-O-D ঐ সুপার পাওয়ার আমাদের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করছে এবং ঐ প্রকৃতির তিনটি অংশ আছে G-O-D G-দ্বারা জেনারেটর (পরিচালক) O-দ্বারা অপারেটর (শক্তি প্রয়োগকারী) D-দ্বারা ডিস্ট্রয়ার (ধ্বংসকারী) বুঝায়। অর্থাৎ প্রকৃতি আমাদের শক্তি প্রয়োগে পরিচালনা করে এবং আমাদের ধ্বংসও করে। আমরা পরিচালিত, প্রয়োগিত এবং ধ্বংস হই। ইস মেইন গডেস আওর গড কা মিনিং কুঝভী নেহি হায়, আউর গডকা আসলি মিনিং কুঝভী নেহি হায়, আল্লাহ তাআলা গড সী উপার হায়, পরমেশ্বর গড সী উপার হায়, পরমেশ্বর গড সী উপার হায়।

উত্তর : ড. জাকির ঃ ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ভাই আমার বক্তব্যকে খুবই সংক্ষেপে সার-সংক্ষেপ করেছেন আলহামদু লিল্লাহ। আমি তাকে ধন্যবাদ

দেই। তিনি সঠিকই বলেছেন সেখানে কোন গড গডেস নেই, যা আমি ব্যাখ্যা করেছি। তিনি হিন্দিতে ব্যাখ্যা করেছেন যাতে যারা ইংরেজি না জানে তারা বুঝতে পারে। তিনি ভালোই ব্যাখ্যা করেছেন, কোনো গড গডেস নেই আল্লাহ তাআলাই সর্বোপরি এবং আমি তার সাথে একমত এবং তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে, ধর্মের মধ্যে কোন বিভক্ত করা উচিত নয়। আমি তার সঙ্গে একমত যে ধর্মের বিভিন্নতা থাকা উচিত নয়। কারণ ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতে আল-কুরআন বলেন–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ـ

অর্থ : 'আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান হচ্ছে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ (ইসলাম গ্রহণ)।'

আর আপনার সঙ্গে ভাই আমি একমত যে, যদি আপনারা নিজেদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে মারামারি করেন, তাহলে যদিও সেগুলোর মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। আপনারা নিজেরাই পার্থক্য সৃষ্টি করলেন।

ভাই সুনির্দিষ্ট মন্তব্যও করেছেন যে, শিয়া ইত্যাদি এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে এবং সেখানে ৭৩ ফিরকা সম্পর্কে বলেছেন। আমি এরও উত্তর দিতে পারি; কিন্তু সময় সাপেক্ষ, যদি আপনি এটা জানতে চান তাহলে আপনি বেশি করতে পারেন, আমি তারও উত্তর দিব ইনশা-আল্লাহ। কেন........ বিভিন্ন ফিরকা সম্পর্কে আলোচনা? ভাই সঠিকই বলেছেন যে, ধর্ম একটি থাকা উচিত। জীবন চলার একটিই পথ এবং তা হলো আপনার ইচ্ছাকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা। আপনি যদি এতে বিশ্বাস করেন, তাহলে 'সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' হবে। যদি আপনি এটা না করেন, তাহলে অবশ্যই বিভেদ হবে। ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ঃ ২৯৬। জাকির ভাই আমার একটা খুবই সাধারণ প্রশ্ন আছে। আমি অধ্যাপক দেবার। আমি কোনো ধর্ম অধ্যয়ন করি নি এবং আমি ধর্মে বিশ্বাসও করি না এবং আমার সাধারণ প্রশ্ন হলো আপনি কি বিশ্বাস করেন বিভিন্ন ধর্ম আছে এবং বিভিন্ন ধর্ম থাকা উচিত? কারণ আপনার ভাষণে আপনি বলেছেন, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি পৃথিবীর সব লোক সৃষ্টি করেছেন। নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদেরকে বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করেছেন, বিভিন্ন অঞ্চলে ইত্যাদি...... ইত্যাদি। যাতে তারা পরস্পরের দ্বন্দ্বের পরিবর্তে পরস্পরকে বুঝতে পারে। আপনি কি দয়া করে আমাকে ক্রুসেডগুলোর উদ্দেশ্য এবং হিন্দু-মুসলিম পার্থক্যের আপনার নিজস্ব মতামত তুলে ধরবেন? আপনি বলেছেন যে এটা হিন্দুবাদ এবং এটা ইসলাম ধর্ম, আপনি কখনো বলেন নি যে হিন্দু মতবাদ

একটি ধর্ম। আপনি বলেছেন হিন্দুবাদ ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য, তা হলো, যে হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, সব কিছুই খোদা বা দেবতা আর মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, সবকিছুই আল্লাহর (খোদার)। কেন এখানে এত হত্যাযজ্ঞ, ভারতে বা দুনিয়ার অন্য স্থানে এমনকি মুসলিম দেশগুলোতেও? আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

উত্তর : ডা. জাকির ঃ ভাই খুবই ভালো একটি প্রশ্ন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমি আমার বক্তব্যে বলেছি যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পূর্ণ মানবতা মাত্র এক জোড়া মানব মানবী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করেছেন। ভাই আমি কখনো বলি নি যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করেছেন। এটা রেকর্ড করা আছে, আমি কখনো বলি নি, 'বিভিন্ন ধর্মে'। আমি বলেছি বিভিন্ন গোত্র উপ-গোত্রে ধর্মে নয়। আল্লাহ বলেন, 'ধর্ম একটাই' সর্বশক্তিমান আল্লাহ লোকদেরকে কখনোই বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করেন নি; বরং বিভিন্ন জাতি ও বর্ণে এবং বিভিন্ন ভাষায় যাতে একে অপরকে চিনতে পারে। ঐটাই যথেষ্ট। এ ব্যক্তি এ বর্ণ থেকে এসেছে, এ অঞ্চল থেকে। এটা অঞ্চল ধর্ম নয়। সুতরাং আপনার ধর্ম বর্ণনা সঠিক নয়। অন্যান্য জিনিস সঠিক আপনি যে বলেছেন, বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন বর্ণে, বিভিন্ন জাতিতে। আমি একমত। তবে এভাবে করা হয়েছে যাতে একে অপরকে চিনতে পারে; এ জন্য নয় যে, একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নয়।

আপনি বলেছেন যে আমি কখনোই হিন্দুত্ববাদকে ধর্ম বলি নি। আমি পুনরায় আপনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছি। আমি বলেছি– অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী ধর্ম হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহতে বিশ্বাস। হিন্দু মতবাদকে বুঝতে, হিন্দুধর্ম মতকে বুঝতে আপনাকে খোদার ধারণা বুঝতে হবে। ইহুদি ধর্মমতকে বুঝতে হলে, ইহুদি ধর্মমতে আল্লাহর ধারণাকে বুঝতে হবে। খ্রিস্ট মতবাদ বুঝতে হলে, খ্রিস্ট মতে আল্লাহর ধারণাকে বুঝতে হবে। ইসলাম ধর্মকে বুঝতে হলে ইসলামে আল্লাহর ধারণাকে বুঝতে হবে, এটাই আমি বলেছি।

পার্থক্যের বিষয়ে...... কে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে? আল্লাহ নন। আল্লাহ পরিষ্কারভাবে ৬ নং সূরা আনআমের ১৫৯ নং আয়াতে বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ -

অর্থ : 'নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরাই নানা দল, উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোনো দায়িত্বই আপনার উপরে নেই।'

আপনি ধর্মকে বিভক্ত করতে পারেন না। যদি কেউ ভাগ করে সে ভুল করে। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, কেন লোকেরা একে অপরকে হত্যা করছে?

সে আপনারই তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত। ধরুন, একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি ছাত্রকে বললেন, 'নকল করো না' এ সত্ত্বেও সে তা করল, কাকে দোষ দেবেন? শিক্ষক না ছাত্রকে? অবশ্যই ছাত্রের দোষ। এখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনতা দান করেছেন যে, তুমি তোমার ইচ্ছায় যা চাও করতে পার। তিনি আপনাকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। সর্বমোট ও চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা হলো মহাগ্রন্থ আল-কোরআন। করণীয়, বর্জনীয় এখানে উল্লেখ আছে।

আল্লাহ্ বলেন এবং আমি আমার বক্তব্যে ৫ নং সূরা মায়িদার ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

অর্থ : 'কোন ব্যক্তি অন্য কোন কোন ব্যক্তি (সে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যাই হোক না কেন) কে হত্যার প্রতি বিধান বা জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ ছাড়া হত্যা করল, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল, আর যে ব্যক্তি মৃত্যুর হাত থেকে অন্য মানুষকে রক্ষা করল, সে যেন সব মানুষকে জীবিত করল।'

সুতরাং সর্বশক্তিমান আল্লাহ লোকদের একে অপরের হত্যাকে পছন্দ করেন না; কিন্তু মানব যদি তা অনুসরণ না করে তাহলে কে দায়ী? অবশ্যই মানুষ। ৬৭ নং সূরা মুল্‌ক-এর ২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ـ

অর্থ : 'যিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি পরীক্ষার মধ্যে বাছাই করে নিতে পারেন কে তোমাদের মধ্যে ভাল আমল করে?'

আল্লাহ জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, কে ভাল কাজ করে তা যাচাই করার জন্য। আল্লাহ হস্তক্ষেপ করেন না। যদি তিনি চান তাহলে করতে পারেন। কুরআন বলেন, যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে সব লোককে ঈমানদার করতে পারতেন। কিন্তু যখন পরীক্ষার প্রশ্ন। যদি শিক্ষক চান তাহলে সব ছাত্রকে পাস করিয়ে দিতে পারেন, যদিও পাস না করার মতো হয়। শিক্ষক পারেন.....কিন্তু সেটা হবে যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্রদের প্রতি অবিচার।

সেখানে ছাত্রদের স্বাধীনতা কোথায়? যদি তারা একটা পরীক্ষার অধীনে থাকে এবং কেউ যদি সঠিক উত্তর না দেয়, তারপরও শিক্ষক পাস করিয়ে দেন। তাহলে যিনি কঠোর শ্রম দিয়েছেন তিনি জিজ্ঞেস করবেন– "আমি এতটা জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছি পরীক্ষার জন্য এ ব্যক্তি যে নকল করেছে এবং চিটিংবাজি করেছে ভুল

উত্তর দিয়েছে এরপরও সে পাস করল এবং পরবর্তী ব্যাচের ছাত্ররা যদি জানে যে, শিক্ষক সব ছাত্রকেই পাস করিয়ে দেন সে সঠিক উত্তরই লিখুক বা ভুলই লিখুন তাহলে তারা সবাই পড়াশুনা বন্ধ করে দেবেন। এরপর আপনি একটি ডিগ্রি (ধরুন) মেডিকেল ডিগ্রি লাভ করবেন, যখন ডাক্তারি সনদ নিয়ে তিনি বের হয়ে যাবেন, তিনি রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে লোক হত্যাই করবেন বেশি।

অতএব আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এরূপভাবে হত্যা করো না, অন্যদের ক্ষতি করো না, লোকদের ভালবাসো, তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো।

আমি আমার বক্তব্যে বলেছি এই সব। কিন্তু জনগণ যদি এভাবে কাজ না করে। অর্থাৎ তারা কুরআনের অনুসরণ করছে না। সে যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো স্থানেরই হোক না কেন, সে আমেরিকা কিংবা পাকিস্তান কিংবা পৃথিবীর যেকোনো স্থানেরই হোক না কেন। লোকেরা বলতে পারে, মনে করুন আপনাকে মুসলিম নাম ধারণ করে যেমন আব্দুল্লাহ অথবা জাকির অথবা মুহাম্মদ আপনি জান্নাতের টিকিট পেতে পারেন না, শুধু একথা বলে যে, আপনি মুসলমান, মুসলিম কোন লেবেল নয়। এই সঠিক যদি আমি বলি আমি মুসলিম। আমি মুসলিম। মুসলিম হল ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নিকট নিজের স্বাধীনতাকে বিক্রি করে দিয়েছে। শুধু কোন ব্যক্তিকে জাকির আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ শাকিব ইত্যাদি বলার সাথে সাথে যদি তারা কাজও করে যদি তারা তাদের ইচ্ছাকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে, তাহলে তারা মুসলিম। আল-কুরআন বলে– কিছু মুসলিম আছে তারা শুধু মুখেই মুসলিম। অতএব লোকেরা যদি হত্যা করে, তারা কুরআনের নির্দেশনা মেনে চলে না। যদি তারা কুরআন অনুসরণ করে, তাহলে সারা পৃথিবীতে শান্তি নেমে আসত। আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২৯৭। (চলমান) সুতরাং জাকির ভাই, যদি কোন হিন্দু কুরআনের নীতি অনুসরণ করে। যা হিন্দুদের বহু গ্রন্থের রীতির মতোই। তাহলে কি একজন হিন্দু নিজেকে মুসলিম বলতে পারে? অন্য দিকে একজন মুসলমান কি নিজেকে হিন্দু বলতে পারবে? কারণ আপনার আলোচনার ভাষণে আপনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথাই বলেছেন?

ভৌগোলিকভাবে প্রত্যেক ভারতীয়ই হিন্দু; কিন্তু বিশ্বাসের দিক দিয়ে নয় ঃ

উত্তর : ডা. জাকির ঃ ভাই একটি খুবই ভালো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। যদি আপনি পরীক্ষার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, আমি উত্তর দিতে পারি আল-হামদুলিল্লাহ। ভাই জিজ্ঞেস করেছেন, কোন হিন্দু কি ইসলামের কুরআনের নীতি অনুসরণ করতে পারে এবং হিন্দুত্ববাদীকে কি মুসলিম বলা যাবে এবং একজন হিন্দুকে কি মুসলিম বলা যাবে? ভাল কথা। আসুন আমরা মুসলিম এবং হিন্দুর সংজ্ঞা জানার চেষ্টা

করি। আমি যেমন বলেছি– মুসলিম ঐ ব্যক্তি যিনি তার ইচ্ছার স্বাধীনতাকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করেছেন, যিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ। 'হিন্দু' শব্দের সংজ্ঞা কি? আপনি কি জানেন? হিন্দু একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা। যেকোন ব্যক্তি ভারতে বাস করে, যে কেউ ভারতীয় উপত্যকার সভ্যতার এ এলাকায় বাস করে সেই হিন্দু। সংজ্ঞানুযায়ী আমি হিন্দু, আপনি কি তা জানেন? হিন্দু হলো ভৌগোলিক সংজ্ঞা। আপনি যেকোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, স্বামী বিবেকানন্দের মতে 'হিন্দু' একটি ভুল নাম।

ভৌগোলিকভাবে আমি একজন ভারতীয়, ভৌগোলিকভাবে আমি হিন্দু। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, তাদেরকে 'বেদানিস্ট' বলা উচিত। হিন্দু নয়। এরূপ আমাকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন আমি কি ভৌগোলিকভাবে হিন্দু? আমি বলতে পারি, হ্যাঁ। আমি হিন্দু। আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কি বেদান্ত বেদের অনুসারী? আমি বলবো বেদের ঐ অংশগুলো মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই। যেগুলো কুরআনের সাথে মিল আছে। উদাহরণস্বরূপ একজন খোদা আছেন। কিন্তু যদি আপনি বলেন যে, সর্বশক্তিমান খোদা ব্রাহ্মণদের মাথা থেকে, আলাদা বর্ণ যারা সর্বোত্তম বর্ণ। ক্ষত্রীয়রা বুক থেকে সৃষ্ট। এটা হলো বেদের কথা আমি যা উদ্ধৃত করলাম। যদি আপনি বেদে বিশ্বাস না করেন আপনার সমস্যা। কিন্তু এটা হলো বেদ আমি যা উদ্ধৃত করলাম। এখানে যেসব বেদিক পণ্ডিত আছেন, আপনি তাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন। বেদ বলে যে, আমি নই। বৈষ্ণরা উরু থেকে এবং শুদ্ররা পায়ের পাতা থেকে। আমি এ ধারণার প্রতি একমত নই যে, এটাই সঠিক। সুতরাং আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আপনি কি বেদের এ দর্শনের সাথে একমত? আমাকে বলতে হবে 'না'। এই সুনির্দিষ্ট দর্শন।

প্রশ্ন ঃ ২৯৮। (চলমান) আপনার মতে, যে ব্যক্তি ভূখণ্ডে বাস করে সে কি হিন্দু?

উত্তর : ডা. জাকির ঃ হ্যাঁ, ভৌগোলিকভাবে আমি বলি হ্যাঁ। ভাই ঠিকই বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ভূখণ্ডে বাস করে সে হিন্দু। কিন্তু স্বভাবগতভাবে যে ব্যক্তি আমেরিকায় বসবাস করে সে আমেরিকার নাগরিক; তাকে আমেরিকান হতে হবে।

শ্রোতাবৃন্দ ঃ এখানকার প্রত্যেকেই হিন্দু। ইয়ে রিয়েল ব্রাদারহুড হ্যাঁয়। (এটা প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব।)

ডা. জাকির ঃ হ্যাঁ এটাই। আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে একমত। ভৌগোলিকভাবে যারা ভারতে বাস করে তারা হিন্দু। সুতরাং আমি সম্পূর্ণরূপে এর সঙ্গে একমত। ভৌগোলিক সংজ্ঞায় যদি আপনি বলেন, ভারতে যারা বাস করে তারা হিন্দু তাহলে এটা সঠিক। যেকোন পণ্ডিত এর সাথে একমত হবেন। যেকোন ব্যক্তি ভারতে বাস করে সে হিন্দু। ভৌগোলিকভাবে আমি হিন্দু। ভারতে বাস করা সত্ত্বেও আমি কি মুসলিম হতে পারি? অবশ্যই।

শ্রোতৃমণ্ডলী ঃ অনুগ্রহ করে এটা ব্যাখ্যা করুন।

ডা. জাকির ঃ অবশ্যই, সুতরাং একজন মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে হিন্দুও হতে পারে। হ্যাঁ একজন মুসলিম যদি ভারতে বাস করে তাহলে সে হিন্দু; কিন্তু যদি অনুরূপ কথিত কোন হিন্দু; আমেরিকায় বাস করে তাহলে সে হিন্দু নয়। আপনি কি তা জানেন? তিনি একজন আমেরিকান সুতরাং হিন্দুবাদকে বিশ্বজনীন ধর্ম বলা যাবে না। পণ্ডিতদের মতে হিন্দু শুধু ভারতের ধর্ম। এটা কোনো ধর্ম নয়, এটা হলো ভৌগোলিক সংজ্ঞা। বড় পণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দের মতে হিন্দু হলো ভুল নাম। আপনি 'মিসনোমা' (ভুল নাম) কি তা জানেন? 'মিসনোমা' অর্থ হলো ভুল লেবেল লাগান। তাদেরকে বেদানুসারী বলা উচিত। যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কি হিন্দু? আমি বলবো এ ভূখণ্ডে বসবাসকারীর পরিচয় যদি হিন্দু হয়, তাহলে সব দিক দিয়েই আমি হিন্দু। কিন্তু আপনি যদি বলেন হিন্দু হলো এমন এক ব্যক্তি যিনি পূজা করেন। যেমন– আপনি এক ব্যক্তির কথা বলেছেন, আপনি জানেন যে আপনি যদি ঐরূপ দেবতায় বিশ্বাস করেন, যে আকৃতি ধারণ করে ইত্যাদি এবং যার মাথা ও হাত আছে ইত্যাদি তাহলে আমি হিন্দু নই। একইভাবে একজন হিন্দু মুসলিম হতে পারে। কিন্তু যদি কোন ভারতীয় পুতুলের পূজা করে সে মুসলিম হতে পারে না। কারণ ৪ নং সূরা নিসার ৪৮ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا .

অর্থ : 'নিশ্চয় কেউ আল্লাহ তাআলার শরিক করলে সেই গুনাহ মাফ করেন না, এছাড়া যেকোন গুনাহ মাফ করে দেন যাকে ইচ্ছা তাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করল সে বড় ধরনের মিথ্যারোপ করল ও মহাপাপে নিমজ্জিত হলো।'

সুতরাং একজন ভারতীয় ভারতে বসবাসকারী ভৌগোলিকভাবে হিন্দু.... মুসলিম হতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ ভৌগোলিক হিন্দু "ভারতীয় আল্লাহর মৌলিক ধারণার নির্দেশ অমান্য করেন, তার সাথে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুওয়াতে বিশ্বাসও করেন, তাতেও মুসলিম হতে পারবেন না। যেকোন মুসলমান যিনি আল-কুরআন অনুসরণ করেন এবং ভারতে বসবাস করেন তিনি ভারতীয় মুসলমান। আশা করি আপনার নিকট পরিষ্কার হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২৯৯। আমি ভিওয়ান্দি কলেজ থেকে ডাক্তার দিভারী। ভাল, প্রত্যেক ধর্মই জীবনের সর্বোচ্চ বিজ্ঞান। ভুল নেই, যেখানে ধর্মের মৌলনীতি জড়িত। কিন্তু নীতি তৈরি করা এক আর নীতি প্রয়োগ করা আরেক। বাস্তবে যেখানে রক্তের সম্পর্ক নেই সেখানে ধর্মীয় সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। বস্তুত আমরা যা পাই (সংস্কৃত ও হিন্দুতে) ইস সনসার মেইন শান্তি প্রস্তাপিতহোনে কি বাদ অশান্তি মত ফেলাও– ইয়া পয়গাম হামে ইন মিলা হায়। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি পাই, আমরা কি উপলব্ধি করি? আমরা কিন্তু অভিজ্ঞতা পাই, তাহলো বেশিরভাগ রক্তপাতই হয়েছে ধর্মীয় বিরোধিতার কারণে। সুতরাং ভুলটা কোথায়? আমি বুঝাতে চাচ্ছি এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি? আপনি কিভাবে ধর্মীয় নীতি এবং এ সব গণ্ডগোলের মধ্যে সমন্বয় করবেন? যা কিন্তু ধর্মের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি? ধন্যবাদ।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ অধ্যাপক সাহেব একটা ভালো প্রশ্ন করেছেন যে, প্রত্যেক ধর্মই মূলত ভালো কথা বলে। কিন্তু প্রয়োগে পার্থক্য হয়। সেগুলো ভালো জিনিস শিখায় অথচ আজ পৃথিবীতে দেখুন অনেক লোকই ধর্মের নামে যুদ্ধ করছে। আপনি কিভাবে এ সমস্যার সমাধান করবেন? এটা খুবই ভালো প্রশ্ন এবং আমি যে কথা বলেছি তার একটা অংশ এবং আমি বলেছি যে, ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের কোন মানুষকে হত্যা করা চলবে না। এটাই ৫ নং সূরা মায়িদার ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

অর্থ : 'যে ব্যক্তি হত্যা অথবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল সে যেন সব মানুষকে রক্ষা করল।'

কীভাবে আমরা সম্মিলিত বিষয়ে আসব? আমরা কিভাবে পার্থক্য নিরসণ করব? তাও আমি আমার বক্তব্যে বলেছি। ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ـ

অর্থ : 'আস এমন একটি বিষয়ের দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মিল রয়েছে।'

মনে করুন, আপনার দশটি পয়েন্ট রয়েছে, এ দশটি পয়েন্টের মধ্যে যদি পাঁচটির মিল থাকে এবং বাকি পাঁচটির অমিল থাকে, তাহলে কমপক্ষে মিল থাকা পাঁচটি বিষয়ের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি, পার্থক্যের বিষয়ে আমরা পরে আসি। আল-কুরআন ঘোষণা করে– তোমাদের ও আমাদের মাঝে যেসব বিষয়ে মিল রয়েছে সেদিকে আস। প্রথম বিষয়টা কি? তাহলো আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না। এ ব্যাপারে সহযোগিতা করব যে, তার কোন অংশীদার নেই। আপনি ঠিকই বলেছেন কিভাবে এর সমাধান সম্ভব? আমি সমাধানের পদ্ধতি দিয়েছি। কিন্তু একটা পয়েন্ট নোট করার আছে তা হলো, অনেক লোক ধর্ম মানে; কিন্তু তাদের ধর্মশাস্ত্রে কি কথা আছে তা তারা জানেন না। সমস্যাটা ওখানেই। অনেক মুসলমানই জানেনা কুরআন এবং ছহীহ হাদীসে কী আছে? অনেক হিন্দুই জানে না তাদের হিন্দু শাস্ত্রে কী আছে? অনেক খ্রিস্টান ও ইহুদি জানে না বাইবেলে কি আছে। দায়ী কে? নিঃসন্দেহে অনুসারীরা।

অতএব আমি লোকদের তাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে বলি। পার্থক্যের বিষয়গুলোতে পরে আসি। কমপক্ষে মিলের বিষয়গুলোতে আসি। আমি ইসলাম এবং খ্রিস্টবাদের মিলের আর একটি বক্তব্য দিয়েছি। আমি বলি যে বিষয়ে আমাদের অমিল আছে তাতে পরে আসি। কমপক্ষে বাইবেল কুরআনে কি বলে– আসুন আমরা মিল বিষয়গুলোতে একমত হই। যুদ্ধের সমাধান আসবে। আমি এখন কোন বিষয়ে কথা বলছি? আমি কি কখনো কোন ধর্মকে সমালোচনা করেছি? আমি বাধ্য হয়েছি যখন নির্দিষ্ট কিছু ভাইয়েরা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করে যাতে করে আমি কিছু সত্য কথা বলতে বাধ্য হই। আপনি ভিডিও ক্যাসেট গ্রহণ করতে পারেন। আমি কোন একটি বিষয়েও কোন ধর্মের সমালোচনা করি নি। আমি কখনো পার্থক্যের বিষয়গুলো বলি নি। আমি শুধু মিলের বিষয়গুলোতেই এসেছি।

পার্থক্যের বিষয়ে, আমি ইসলাম এবং হিন্দু মতবাদের পার্থক্য বিষয়ে এবং ইসলাম ও খ্রিস্টবাদের বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমি তুলনামূলক ধর্ম তত্ত্বের ছাত্র। আমি বিশ্ব শাস্ত্রের কোয়েটেশন দিতে পারি আল হামদুলিল্লাহ। পার্থক্যের বিষয়ে বলতে গিয়ে আমি যখন প্রয়োজন তখন বলবো যখন কেউ প্রোগ্রামে ডিস্টার্ব করতে চায়, আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু আমি কখনো আমার কথায় বলি নি, আমি সাধারণ লোকদের সামনে এ ধরনের কথা বলি নি। আমি সাধারণদের বলি শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন। আপনি আপনার শাস্ত্রের নিকটে আসতে পারবেন এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের দিকে আসতে পারবেন। কমপক্ষে এক প্রভুতে বিশ্বাস করুন।

ইহুদিধর্ম বলে, খ্রিস্টধর্ম বলে, হিন্দু ধর্ম বলে, ইসলাম ধর্ম বলে, শিখ ধর্ম বলে, পার্সি ধর্ম বলে যে, এই এই... খোদায় বিশ্বাস কর এবং একমাত্র তারই ইবাদত কর। কেন আপনারা অন্যান্য দেবতার পূজা করেন? ঐ পয়েন্টে আসুন... অতঃপর অন্যান্য বিষয়ে আসুন। আমরা যদি এ সমস্যার সমাধান করতে পারি, এমনকি যদি

দশটার মধ্যে একটারও মিল থাকে। কমপক্ষে এ মিল বিষয়গুলোর সাথে একমত হই। অন্যান্য পয়েন্টগুলোর মধ্যে দ্বিমত করার ব্যাপারে একমত হতে পারি। সে ব্যাপারে পরে আসি। সুতরাং আমরা যদি মিলের বিষয়গুলোতে আগে আসতে পারি, তুলনামূলক অধ্যয়নের পরে বিশ্বাস করুন বেশির ভাগ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং সেটাই আমি করছি।

আমি বিশ্বব্যাপী সফর করেছি। আমি অমুসলিম শ্রোতাদের মধ্যে বক্তব্য দিয়েছি। তাদের অনেকেই তাদের শাস্ত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে প্রশ্ন ছুঁড়েছে। এমনকি মুসলমানরাও তাদের শাস্ত্র সম্পর্কে সচেতন নয়। সুতরাং তারাও এমন প্রশ্ন করে যে বিষয়ে তারা সচেতন নয়। অতএব আমি তাদেরকে কুরআন হাদীস, বেদ ও বাইবেলে শিক্ষা দেই এবং আমি যখন উদ্ধৃতি দিই, আমি রেফারেন্স নাম্বার দিই যাতে কেউ বলতে না পারে তা! জাকির দ্রুত টেনে যাচ্ছে এবং এ সব শাস্ত্র যার উদ্ধৃতি আমি দিই। এ মওজুদ আছে। আমাদের লাইব্রেরিতে বেদ-এর বিভিন্ন অনুবাদ রয়েছে। আমাদের শতশত প্রকারের বাইবেল আছে। সুতরাং আপনি যে শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট– আপনি ইহুদি, প্রোটেস্ট্যান্ট অথবা ক্যাথলিক হোন না কেন। আমি তাদের নিজ নিজ শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলি। সুতরাং আপনি যদি বলেন জাকির ভুল করেছে, তখন আপনাকে বলতে হবে শাস্ত্রে ভুল আছে। আমি উদ্ধৃতি দেই...এবং আমার বেশির ভাগ বক্তব্যে বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ধৃতি রয়েছে। যদি আপনি শাস্ত্রের সাথে দ্বিমত করেন সেটা আপনার ব্যাপার। যদি আপনি দ্বিমত করতে চান তাহলে এজন্য আপনাকে স্বাগতম। কারণ কুরআন বলে–

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ـ

অর্থ : 'ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই, মিথ্যা থেকে সত্য প্রকাশিত হয়েছে।'

আমি আপনার নিকট হিন্দু মতবাদের সত্যটি পেশ করছি। যদি আপনি একমত হতে চান হতে পারেন। যদি আপনি একমত না হতে চান না হতে পারেন। সেখানে একটি সিম্পোজিয়াম ছিল। তৃতীয় ক্যাসেটে যেটা ইসলাম, হিন্দু ও খ্রিস্টধর্মে খোদার ধারণা। লোকেরা একে বিতর্ক বলতে পারে। একজন হিন্দু পণ্ডিত কেরালা ও কলিকট থেকে, একজন খ্রিস্ট পণ্ডিত এসেছিলেন কালিকট থেকে, আমি নিজে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছিলাম। এটা ছিল সাড়ে চার ঘণ্টার বিতর্ক...-এর ক্যাসেটও বাইরে পর্যাপ্ত রয়েছে। হিন্দু ও খ্রিস্ট ধর্মের পণ্ডিতগণ ছিলেন আমি তো শুধু একজন ছাত্র। আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করছিলাম। যেটা শ্রোতামণ্ডলীর বিচারের ওপর ছিল। আমি মিলগুলো তাদের শাস্ত্রের অধ্যায় ও শ্লোক নাম্বারসহ উদ্ধৃত করছিলাম। সর্বোত্তম পন্থা হলো লোকদের মিল বিষয়গুলোর প্রতি একমত হওয়ার আহ্বান করা। পার্থক্যের বিষয়গুলো সম্পর্কে পরে বলুন। আশা করি উত্তর হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ঃ ৩০০। মিঃ রাজু মালহোটরা জিজ্ঞেস করছেন ইসলাম শান্তির ধর্ম তবে কীভাবে এটা তরবারীর মাধ্যমে ছড়িয়েছে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ প্রশ্ন করেছেন...যদি ইসলাম শান্তির ধর্ম হয়ে থাকে, তবে কীভাবে এটা তরবারির মাধ্যমে প্রচার লাভ করল? ইসলাম শব্দটি মূল سلام (সালাম) থেকে এসেছে। যার অর্থ 'শান্তি' এর আরেক অর্থ হলো আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট। সংক্ষেপে ইসলাম অর্থ– ঐ শান্তি যা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। কিন্তু পূর্বে আমি যেমন উল্লেখ করেছি, পৃথিবীর সকলেই পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করুক তা চায় না। কিছু সমাজ বিরোধী লোক আছে যারা নিজেদের স্বার্থে শান্তি চায় না, এ ধরনের লোকেরা চোর-ডাকাত ও অপরাধীদের সঙ্গে হাত মেলায়। যদি শান্তি থাকে তাহলে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব তাদের নিজেদের স্বার্থে কিছু লোক আছে তারা চায় না যে, সমাজে শান্তি বজায় থাকুক। সুতরাং এ ধরনের লোকদের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা লাগতে পারে, পুলিশ লাগে ইত্যাদি। এভাবে ইসলাম শান্তির জন্য তবে মাঝে মাঝে সমাজবিরোধী লোকদের তাদের স্বস্থানে বাধ্য রাখতে ক্ষমতা/শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে এবং এ প্রশ্নের সর্বোত্তম উত্তর হলো...ইসলাম তরবারীর দ্বারা প্রচারিত হয়েছে এ তথ্য ডিলে সী ওলারীর মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছে। যে হলো অমুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিখ্যাত। তাঁর "Islam at the Cross Roads" বইতে ৮ম পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, ইতিহাস একে পরিষ্কার করেছে যে, সারা পৃথিবীতে অনুরক্ত মুসলমানদের সাধু জীবনী যা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। ইসলাম তরবারীর মাধ্যমে ছড়িয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর বিজয় লাভ করেছে, এ হলো উদ্ভট ও অযৌক্তিক কল্পকাহিনী, যাকে ঐতিহাসিকগণ বারবার উল্লেখ করেছেন।

আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই, আমরা মুসলমানরা পৌনে ৮শত বছরের ওপরে স্পেন (Spain) শাসন করেছি। পরবর্তীতে ক্রুসেডাররা আসল এবং মুসলমানদের সমূলে উৎখাত করল। এমনকি প্রকাশ্যে আযান দেবার মত একজন মুসলমানও ছিল না। আমরা কোনো শক্তি প্রয়োগ করি নি। আপনারা জানেন আমরা আরবে চৌদ্দশত বছরের ওপরে শাসন করছি। অল্প কয়দিনের জন্য ব্রিটিশরা এসেছিল, অল্প দিনের জন্য ফরাসিরাও এসেছিল; কিন্তু সর্বোপরি আরবের রাজত্বে মুসলমানরাই ১৪০০ বছরের মত দখল করে রেখেছিলেন। আপনারা কি জানেন এখনো আরবে ১৪ মিলিয়ন কপটিক খ্রিস্টান আছে। কপটিক খ্রিস্টান হচ্ছে যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুসলমান। যদি মুসলমানরা চাইতেন তাহলে প্রত্যেক অমুসলিমকে তরবারির মাধ্যমে মুসলমানে পরিণত করতে পারতেন; কিন্তু আমরা করি নি। ১৪ মিলিয়ন আরব, যারা কপটিক খ্রিস্টান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রসারিত হয় নি।

আপনারা জানেন ভারত শতশত বছর মুসলিমদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল এবং আমরা তরবারি ব্যবহার করে নি। যদি কিছু লোকে ভুল করে, আপনি সবাইকে ধরতে পারেন না এবং ঐ কারণে ধর্মকে দোষারোপ করতে পারেন না। যদি কিছু লোক ধর্মের অনুসরণ না করতে পারে এটা তাদের দোষ। আপনি খ্রিষ্টধর্মকে এ কারণে খারাপ বলতে পারেন না যে হিটলার ছয় মিলিয়ন ইহুদিকে হত্যা করেছিল। যদি হিটলার ছয় মিলিয়ন কৈ পুড়িয়ে থাকে তার জন্য খ্রিস্ট ধর্মকে দোষারোপ করতে পারেন না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই কলঙ্ক থাকে। আমরা মুসলিমরা শত শত বছর ভারত শাসন করেছি এবং আমরা যদি চাইতাম আমরা প্রত্যেকটি অমুসলিমকে তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা মুসলিমে পরিণত করতে জোর করতে পারতাম। আমরা তা করি নি। আজ শতকরা ৮০ ভাগ ভারতীয় অমুসলিম এ সাক্ষ্য দিচ্ছে, আপনারা যারা অমুসলিম এখানে রয়েছেন তারা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে ইসলাম তরবারি দ্বারা প্রচার হয় নি। যদিও আমাদের ক্ষমতা ছিল আমরা তা করি নি। যেহেতু ইসলাম তাতে বিশ্বাস করে না।

বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ায় সবচেয়ে বেশি মুসলমান। কোন মুসলমান সৈন্য সেখানে গিয়েছিলেন? কোন মুসলমান সৈন্য মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন? যাতে শতকরা ৫৫ ভাগ মুসলমান জনতা রয়েছে। কোন সৈন্য বাহিনী সেই আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে গিয়েছিল? কোন মুসলিম সৈন্য? কোন্ তরবারি? থমাস কার্লাইল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Heroes and Hero Worship' এ এর উত্তরে লিখেছেন যে, আপনাকে এ তরবারি পেতে হবে, কিছু শুভ ইচ্ছে এটা করতে পারে, যে তার তরবারির মাধ্যমে প্রচার করা উচিত। সারা পৃথিবীতে একটি নতুন মত প্রাথমিকভাবে শুরু হয় একজনের মনে, এক ব্যক্তি সব মানবতার বিরুদ্ধে। এটা খুবই সামান্য কল্যাণ করে যে, সে তরবারি নিয়ে তা প্রচার করে। কোন তরবারি? যদি আমাদের তরবারি থেকেও থাকে আমরা একে ব্যবহার করি নি। ২ নং সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدَ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لاَ انْفِصَامَ لَهَا ......

অর্থ : 'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই, মিথ্যা থেকে সত্য প্রকাশিত হয়েছে। যে কেউ আল্লাহর হাতকে আঁকড়ে ধরে এবং শয়তানের হাতকে প্রত্যাখ্যান করে সে মূলত সর্বশক্তিমানের হাতকেই আঁকড়ে ধরেছে যা কখনো ছুটবে না।'

যে কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস করে ... আল্লাহ্ তাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাবেন, আর যে কেউ শয়তানের ওপর বিশ্বাস করে যে, তাকে আলো থেকে

অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। কোন তরবারি? বুদ্ধির তরবারি। ১৬ নং সূরা আন নাহল-এর ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

أُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

অর্থ : 'ডাক তোমার প্রভুর পথে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর তাদের সাথে তর্ক কর উত্তম পন্থায়।'

"Plain Truth" নামক ম্যাগাজিনে একটা আর্টিকেল ছাপা হয়েছিল। যেটা 'রিডার্স ডাইজেস্টের আল-ম্যানেজার ১৯৮৬-এর একটা পুনর্মুদ্রণ ছিল। এটা বিশ্ব ধর্মের ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত ৫০ বছরের বর্ধনশীলতার পরিসংখ্যান দিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে, বড় বড় ধর্মের মধ্যে এক নম্বর বর্ধনশীল ধর্ম হলো ইসলাম। এটা হলো ৩৫%। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ অমুসলিমকে মুসলিম বানানোর জন্য কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল? আপনারা কি জানেন বর্তমানে আমেরিকার সবচেয়ে বর্ধনশীল ধর্ম হলো ইসলাম। যে আমেরিকানদের তরবারির আগা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করছে? ইউরোপের তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা তাদের একাজ করতে বাধ্য করছে? আল-কুরআন কমপক্ষে তিন স্থানে এর জবাব দিচ্ছে–

৯ নং সূরা তাওবার এর-৩৩ নং আয়াতে;

৪৯ নং সূরা ফাতহর এর-২৮ নং আয়াতে

৬১ নং সূরা আসসফ-এর ৯ নং আয়াতে

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ

অর্থ : 'তিনিই সেই সত্তা যিনি তার রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি তাকে (সত্য দ্বীনকে) সব বাতিল ধর্মমতের ওপর বিজয়ী করতে পারেন।'

ইসলাম সবার ওপর বিজয় লাভ করতে, সবাইকে পরিচালনা করতে, সবার ওপর কর্তৃত্ব করতে এসেছে। সাক্ষ্য হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

আমি এ প্রশ্নের উত্তর ড. আদম পায়ার্সন-এর উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করতে চাই, যিনি বলেছেন, যেসব লোকে ভয় পায় যে, একদিন আরবদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র পতিত হবে, তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামি বোমা পতিত হয়েছে– এটা সেদিনই নিক্ষিপ্ত হয়েছে যে দিন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ ৩০১। মিঃ সুনিল জিজ্ঞেস করছেন যে, ইসলাম বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রচার করছে, সেখানে মুসলমানদের মাঝে কেন বিভিন্ন উপদলের বিভক্তি রয়েছে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ প্রশ্নটি ছোঁড়া হয়েছে যে, যেখানে ইসলাম বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রচার করছে, কীভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন উপদলে বিভক্তি দেখা যায়? এর উত্তর ৩ নং সূরা আলে-ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেছেন–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا .

অর্থ : ‘তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সবাই শক্তভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।’

আল্লাহর রজ্জু কি? মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হলো আল্লাহর রজ্জু। এতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের আল্লাহর রজ্জু ধারণ করতে হবে এবং তাদের বিভক্তি হওয়া চলবে না এবং আল-কুরআন ৬ নং সূরা আনআমের ১৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ .

অর্থ : ‘নিশ্চয় যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো করে নিজেরাই নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোনো দায়িত্বই আপনার ওপরে নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর হাতে। (আল্লাহর নিকট ফিরে গেলে) তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হবে।’

তার অর্থ ইসলামে বিভক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উপদল সৃষ্টি প্রত্যেকের জন্য ইসলামে নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু যখন আপনারা সুনির্দিষ্ট কোনো মুসলমানকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি? কেউ বলে আমি হানাফী, কেউ বলে আমি শাফী, কেউ বলে আমি হাম্বলী, কেউ বলে আমি মালেকী। আমাদের প্রিয়নবী কি ছিলেন? তিনি কি শাফেয়ী ছিলেন? তিনি কি হাম্বলী ছিলেন? তিনি কি মালেকী ছিলেন? তিনি কি ছিলেন? তিনি মুসলিম ছিলেন।

আল-কুরআনের ৩ নং সূরা আলে-ইমরানের ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে– যীশু একজন মুসলিম ছিলেন। এ সূরার ৬৭ নং আয়াতে আরো বলা হয়েছে– ইবরাহীম (আ) মুসলিম ছিলেন। অতএব আমাদের প্রিয়নবী কি ছিলেন> তিনি মুসলিম ছিলেন। ৪১ নং সূরা হা-মীম আস সাজদার ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থ : 'তার কথার চেয়ে কার কথা উত্তম যে লোকদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং নিজেও সৎ কাজ করে আর বলে আমি মুসলমানদেরই অন্তর্ভুক্ত।'

এরপরও যখন কেউ প্রশ্ন করে 'আপনি কী?' আপনার বলা উচিত 'আমি একজন মুসলমান।' আমার কোনই আপত্তি নেই যদি কেউ বলে, আমি নির্দিষ্ট রায়, নির্দিষ্ট মত যেমন ঃ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (র)-এর মতানুসরণ করি। আমি এসকল পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করি। কেউ যদি কিছু ইমাম শাফেয়ী ও কিছু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতানুসরণ করেন, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যদি কেউ প্রশ্ন করে 'আপনি কী?' আপনার উত্তর দেয়া উচিত যে, আপনি মুসলিম।

আর পূর্বে যে ভাই দাবি করলেন, পূর্বে আল-কুরআন বলেছে ৭৩টি দল হবে। তিনি যেটা বলছিলেন সেটা হলো প্রিয়নবী করীম ﷺ এর বাণী, যা আবু দাউদে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস নং ৪৫৭৯ এতে বলা হয়েছে, ইসলাম ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে এবং আপনি যদি নবী করীম ﷺ এর কথাকে নোট করেন তিনি বলেন, দ্বীন বিভক্ত হবে। তিনি বলেন নি, তোমাদের ধর্মকে ভাগ করা উচিত। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যদি কুরআন বলে, 'বিভক্ত হয়ো না'। মুসলমানরা বিভক্ত হতে বাধ্য। আরেকটা হাদীস যেটা তিরমিযী শরীফে উল্লেখ পাওয়া যায়। হাদীস নং ১৭১ প্রিয়নবী করীম ﷺ বলেন, যেখানে ৭৩টি উপদল হবে এবং একটি দল ছাড়া বাকী সবাই জাহান্নামে যাবে। তখন সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন কোন দলটি? নবী করীম ﷺ বলেন, যা নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের পথ এবং ঐটি যা কুরআন এবং সহীহ হাদীসের অনুসরণ করবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন-হাদীসের অনুসরণ করে সেই সত্য পথে রয়েছে। ইসলাম বিভক্তিতে বিশ্বাস করে না। প্রত্যেকে যে কুরআন হাদীস অনুসরণ করে সে মুসলমান এবং ইসলাম ধর্মকে বিভক্ত ও উপদলে ভাগ করার বিপক্ষে। সুতরাং আপনি যদি কুরআন এবং সহীহ হাদীস অধ্যয়ন করেন। মুসলমানদের কুরআন এবং সহীহ হাদীসের অনুসরণে একতাবদ্ধ হওয়া উচিত। আশা করি সেটাই প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন ঃ ৩০২। আমি লাক্সম্যান ডকরাস গুরুজী এবং আমি অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনটি প্রকৃত গ্রহণীয় পথ? আমরা কোন বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দিব? ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান, নাকি রাজনীতিকে? আপনি কি অনুগ্রহ করে বলবেন?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটি প্রশ্ন রেখেছেন, বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রসারের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কি, এটা কি ধর্ম, নাকি সমাজবিজ্ঞান, নাকি রাজনৈতিক কাজ-কর্ম? ভাই আমি পূর্ণ বিষয়ের ওপর একটি বক্তৃতা দিয়েছি। একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করব না। আমার উত্তর একই হবে। সব ধর্মের মধ্যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ছড়িয়ে দেয়ার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে কাজটি করা দরকার তাহলো এক আল্লাহতে বিশ্বাস করা এবং শুধু তাঁরই ইবাদত করা। সেটাই মৌলিক অগ্রাধিকার। মৌলিক অগ্রাধিকার সমাজবিজ্ঞান কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নয়। সেটা পরে আসবে। রাজনীতি সীমিত ভ্রাতৃত্বের ওপর কাজ করে। সমাজবিজ্ঞানও সীমিত। এক আল্লাহতে বিশ্বাসই হলো সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব। তিনিই একক সত্তা যিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানবকে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন সাদা-কালো, ধনী-গরিব সবাইকে। সুতরাং আপনি যদি এক আল্লাহকে বিশ্বাস করেন এবং তাঁরই ইবাদত করেন, তাহলেই শুধু বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব হবে। আশা করি এটাই প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন ঃ ৩০৩। মি. প্রভু জিজ্ঞেস করছেন, সব ধর্মই মূলত ভাল জিনিস প্রচার করে। এভাবে একজন যেকোন ধর্মই অনুসরণ করতে পারে। এটা কি একই কথা নয়?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ প্রশ্ন করা হয়েছে যে, সব ধর্মই মৌলিকভাবে ভালো জিনিস শিক্ষা দেয়। সুতরাং আপনি যেকোনো ধর্ম অনুসরণ করতে পারেন। এটা কি একই রকম নয়?

আমি তার সঙ্গে প্রশ্নের প্রথম অংশের বিষয়ে একমত যেসব ধর্মই মূলত ভাল জিনিস প্রচার করে। উদাহরণস্বরূপ, সব ধর্মই মিনতি করে, তোমাদের চুরি করা উচিত নয়, তোমাদের কোনো নারীকে উত্যক্ত করা উচিত নয় এবং তোমাদের তাকে ধর্ষণ করা উচিত নয়। হিন্দুধর্মে এটা বলে খ্রিষ্টধর্মে এটা বলে, ইসলাম এটা বলে। কিন্তু ইসলাম এবং অন্য ধর্মের বলার সাথে সাথে ঐ সব ভালো জিনিস বাস্তবায়নের পন্থাও বলে দেয়। যেমন– সব ধর্মই ভ্রাতৃত্বের কথা বলে। কিন্তু ইসলাম বাস্তবে দেখায় কীভাবে প্রাত্যহিক জীবনে তার অনুশীলন করতে হবে, সালাত, হাজ ইত্যাদিতে। এভাবে ইসলাম তত্ত্বদানের সাথে সাথে দেখায় কীভাবে এটা আপনার জীবনে কার্যকরি করবেন। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু মতবাদে বলা হয়, তোমরা চুরি করো না, খ্রিস্টধর্মে বলে তোমরা চুরি কর না, ইসলাম বলে চুরি করো না। সুতরাং ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মে পার্থক্য কী? ইসলাম আপনাকে এমন অবস্থানে পৌঁছানোর পথ দেখায় যেখানে গেলে লোকেরা চুরি করবে না।

ইসলামে যাকাত দানের পদ্ধতি রয়েছে। তাহলো প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির যার সঞ্চয় নিসাব পরিমাণ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের সমান হয় তার ২.৫% প্রত্যেক চান্দ্র বছরে প্রদান করতে হবে। যদি প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি যাকাত দিত তাহলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য মূলোৎপাটিত হতো। একজন ব্যক্তিও না খেয়ে মারা যেত না।

এরপর ৫নেং সূরা মায়িদার ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ ـ

অর্থ : 'চোর পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের হাত কেটে দাও, আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি হিসেবে।'

কিছু লোক বলতে পারে, হাত কাটা তাও এই বিংশ শতাব্দীর যুগে! সুতরাং ইসলাম একটা অসভ্য ধর্ম, এটা নিষ্ঠুর আইন এবং আমি জানি হাজার হাজার লোক আছে চুরি করে, যদি আপনি সব লোকের হাত কেটে দেন, তাহলে বহু লোক তাদের হাত হারাবে। কিন্তু আইনটা এত কঠিন যে যদি এটা কার্যকরি করা হয় এবং কোন ব্যক্তি জানতে পারে যে, যদি সে চুরি করে তাহলে তার হাত কাটা হবে তাহলে তৎক্ষণাৎ তার মন থেকে চুরির চিন্তা উধাও হয়ে যাবে।

আপনারা নিশ্চয় জানেন আজ আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ। দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সেদেশে সর্বোচ্চ পরিমাণ অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। সর্বোচ্চ পরিমাণ চুরি ডাকাতি হচ্ছে। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যদি আপনি আমেরিকাতে ইসলামি শরিআহ কার্যকরি করেন যে, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিকে যদি ২.৫% যাকাত দানে উদ্বুদ্ধ করা হয়, তার বর্ধিত সম্পদের, এরপর কোন নারী পুরুষ যদি চুরি করে, এরপর তার হাত কেটে ফেলা হয়। আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি, তাহলে আমেরিকার চুরি, ডাকাতি কি বৃদ্ধি পাবে? নাকি সমান সমান থাকবে, নাকি কমবে? অবশ্যই এ অনুপাত কমবে, যেহেতু এটা বাস্তব আইন। আপনি শরিআহ কার্যকরি করবেন এবং ফলাফলও পাবেন।

আসুন আপনাকে আরেকটি উদাহরণ দিই। বেশিরভাগ ধর্মই বলে, তোমার কোন নারীকে উত্যক্ত করা উচিত নয়। তোমাদের কোনো নারীকে ধর্ষণ করা উচিত নয়। হিন্দুমতে তা বলে, খ্রিস্টধর্মে তা বলে, ইসলাম একই কথা বলে। কিন্তু ইসলাম ঐ অবস্থানে পৌঁছাতে পারে। যাতে পুরুষরা নারীদের উত্যক্ত করবে না, ইসলাম পর্দার ব্যবস্থা করেছে, লোকেরা সাধারণত নারীদের পর্দার কথা বলে কিন্তু আল্লাহ পবিত্র কুরআনে প্রথম পুরুষের হিজাব (পর্দার) কথা বলে। অত:পর নারীদের পর্দার কথা বলে। ২৪ নং সূরা আন নূরের ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ـ

অর্থ : 'মুমিনদের বলুন তারা যেন নিজেদের চক্ষুকে নিচু রাখে ও লজ্জাস্থানকে হিফাজত করে।'

যখনই কোন নর কোন নারীকে দেখবে এবং কোন কোমল চিন্তা তার মনে আসবে অথবা লজ্জাহীনতার কোন আলামত তার মনে আসবে তার দৃষ্টি অবনত করা তার

জন্য উচিত হবে। একদা আমার এক বন্ধু যে ছিল মুসলমান বন্ধু, সে এক বালিকার দিকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাকিয়ে ছিল। সুতরাং আমি তাকে বললাম, ভাই আপনি কি করছেন? ইসলামে কোন বালিকার দিকে তাকিয়ে থাকা নিষেধ। উত্তরে সে আমাকে বলল, প্রিয়নবী করীম ﷺ বলেছেন, প্রথম দৃষ্টি জায়েয এবং দ্বিতীয় দৃষ্টি নিষিদ্ধ এবং এখনো আমি আমার প্রথম দৃষ্টির অর্ধেকও শেষ করি নি প্রিয়নবী করীম ﷺ তাঁর বক্তব্য প্রথম দৃষ্টি অনুমোদন এবং দ্বিতীয় দৃষ্টি নিষিদ্ধ দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? তিনি বলেন নি যে, তুমি একজন নারীর দিকে একাধারে ২০ মিনিট পর্যন্ত কোনোরূপ পলক না ফেলেই তাকিয়ে থাকবে। নবী করীম ﷺ যা বুঝাতে চেয়েছেন তা হলো, যদি তুমি কোন নারীর দিকে অনিচ্ছায় দৃষ্টিপাত করে ফেল, তাহলে দ্বিতীয়বার তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকিও না, তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর না, এটাই নবী করীম ﷺ বুঝিয়েছেন।

পরবর্তী আয়াতে নারীদের হিজাবের কথা বলা হয়েছে। ২৪ নং সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ ۔

অর্থ : 'মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে, নিজে নিজে প্রকাশিত হওয়া ছাড়া তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে। আর তারা তাদের বক্ষদেশে যেন অতিরিক্ত কাপড় ফেলে রাখে, আর তাদের স্বামীদের ছাড়া .... অন্যদের সামনে যেন নিজের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে।'

মুহরিম অর্থাৎ ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়দের একটা বড় তালিকা দেয়া হয়েছে যাদেরকে সে বিয়ে করতে পারে না এবং সেখানে পর্দার মৌলিক ছয়টি বিষয় আছে।

প্রথমতঃ বিস্তারিত যা হলো নারী পুরুষের মধ্যে। পুরুষের পর্দা হলো নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত আর নারীর পূর্ণ দেহ আবৃত থাকতে হবে। শুধু যে অংশটা দেখা যাবে তাহলো দুহাত ও চেহারা হাতের কব্জি পর্যন্ত। কিছু পণ্ডিত বলেন...। এমনকি এ দুটি অঙ্গও ঢাকা থাকতে হবে।

অন্যান্য পাঁচটি একই।

দ্বিতীয়তঃ যে পোশাক তারা পরবে তা এমন টাইট হতে পারবে না যে, অঙ্গের আকৃতি দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ পোশাক এতটা স্বচ্ছ ও পাতলা হতে পারবে না যার মধ্যদিয়ে ভেতরের অংশ দেখা যায়।

চতুর্থতঃ এ পোশাক এতটা উজ্জ্বল ও অদ্ভুত হতে পারবে না, যাতে বিপরীত লিঙ্গের লোকদের আকৃষ্ট করে।

পঞ্চমতঃ অবিশ্বাসীদের সদৃশ বা তাদের ধর্মীয় বা জাতীয় পরিচয় বহন করে এমন পোশাক পরা যাবে না।

ষষ্ঠতঃ বিপরীত লিঙ্গের পোশাক হতে পারবে না। অর্থাৎ পুরুষের পোশাক নারীরা অথবা নারীদের পোশাক পুরুষরা পরতে পারবে না।

এ হলো হিজাবের ছয়টি মূল বিষয় যা কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী সংকলিত।

৩৩ নং সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে হিজাব বা পর্দার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

অর্থ : ‘হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের অংশ চেহারার ওপর টেনে দেয়, এতে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে জানা যাবে এবং তাদের কষ্টও দেয়া হবে না। (পূর্বের বিষয়ে) আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।’

আল-কুরআন বলে, হিজাব নারীদের জন্য এ কারণে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে তারা উত্যক্ত করা থেকে রক্ষা পায় এবং ইসলামি শরিআহ বলে, যদি কেউ কোনো নারীকে ধর্ষণ করে তাহলে সে সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে। অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড লোকেরা বলতে পারে যে এই বিংশ শতাব্দীতে সর্বোচ্চ শাস্তি একটি নিষ্ঠুর আইন এবং যেহেতু ইসলাম এটাকে বিধিবদ্ধ করেছে এটি একটি অসভ্য আইন।

আপনি কি জানেন যাকে আপনারা সবচেয়ে উন্নত দেশ বলেন, যেখানে সর্বোচ্চ হারে ধর্ষণ হচ্ছে? পরিসংখ্যান অনুযায়ী গড়ে সেখানে প্রত্যেক দিন ১৯০০ এরও অধিক নারী ধর্ষিতা হচ্ছেন। অর্থাৎ প্রতি ১.৩ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হচ্ছেন। যখন আমি এই অডিটোরিয়ামে আছি আড়াই ঘণ্টা যাবত। কতজন ধর্ষিতা হয়েছেন? কতজন? একশতেরও অধিক। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই যদি আপনি আমেরিকায় ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়ন করেন, তাহলে প্রত্যেক লোক যখন মহিলাদের দিকে দৃষ্টি যাবে সে তার চোখ নামিয়ে নিবে, মহিলা যথাযথভাবে হিযাব পরিধান করবে এবং এরপরেও যদি কেউ ধর্ষণ করে, তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া হবে। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, তাতে কি

ধর্ষণ বৃদ্ধি পাবে, সমান হার থাকবে না কমবে? এটা নিশ্চিতই কমবে। কারণ এটা বাস্তব আইন। আপনারা শরিয়াহ্ বাস্তবায়ন করেন, ফলাফল পাবেন।

আমি বহুদিন যাবত অমুসলিমদের এ প্রশ্ন করে আসছি,. "মনে করুন দূর্ভাগ্যবশত কেউ আপনার স্ত্রী বা আপনার মাকে ধর্ষণ করল এবং আপনি যদি বিচার করেন এবং ধর্ষককে যদি আপনার সামনে হাজির করা হয়, তাকে আপনি কি ধরনের শাস্তি দিবেন? আমাকে বিশ্বাস করুন, তাদের সবাই বলেছে, 'আমরা তাকে হত্যা করব। কেউ কেউ আরেকটু অগ্রসর হয়ে বলেছে, আমরা তাকে শাস্তি দিতে দিতে মারব। সুতরাং কেন আপনাদের এই দ্বিমুখী নীতি? কেউ যদি অন্য লোকের স্ত্রীকে ধর্ষণ করে, তখন এ শাস্তি হয়ে যায় অসভ্য আইন অথচ সেই লোকই আপনার স্ত্রীকে ধর্ষণ করলে আপনি তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দিবেন। কেন এ দ্বিমুখী নীতি?

আপনারা জানেন ভারতে ক্রাইম ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি ৫৪ মিনিটে একটি ধর্ষণের কেস রেকর্ড করা হয়। কতগুলো স্থানে? মাত্র কয়েক মিনিটে হতে পারে একটা কেন এবং আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, যদি আপনি দশ দিন আগের পেপার পড়ে থাকেন, ২০ অক্টোবরের পত্রিকা, ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এল. কে. আদভানী আপনি কি জানেন তিনি কি বলেছেন? এটা তো The Times of India-(দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া) এর প্রধান শিরোনামে এসেছে– এতে যা বলা হয়েছে "আদভানী ধর্ষকদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করেছেন এবং আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুপারিশ করেছেন। এ বক্তব্য ২০ অক্টোবর টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রধান শিরোনামে এসেছে, দশ দিন পূর্বে। মঙ্গলবারে একদিন পূর্বে ২৭ আক্টোবর ১৯৯৮ তিনি বলেছেন যে, তিনি ধর্ষকদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড চান। আলহামদুলিল্লাহ! ইসলাম যা বলেছে ১৪০০ বছর পূর্বে এল. কে. আদভানী একই কথা বলছেন এবং আমি এজন্য তাকে অভিনন্দন জানাই। আমি এখানে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ হয়ে আসি নি; আমি রাজনীতিবিদ নই; কিন্তু যদি কেউ সত্য কথা বলে, আমাকে তার উৎসাহিত করা উচিত এবং যদি আপনারা (একে বাস্তবায়ন করতে পারেন, নিশ্চিত যে ধর্ষণের হার নিঃশেষের দিকে চলে যাবে।)

হতে পারে যে, পরবর্তী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে ইসলামি হিজাব কার্যকর করবেন। সুতরাং আমরা আশা করবো ইনশাআল্লাহ্ ধর্ষণ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যাবে। তারাও ইসলামের নিকটে আসছেন। আমি একে মনে করি আমাদের ও আপনাদের মধ্যেকার মিলিত বিষয়গুলোর একটি উদাহরণ। মি. এল. কে. আদভানী উপলব্ধি করেছেন যে, ভারতে ধর্ষণ দিন দিন বাড়ছে এবং তিনি সঠিকভাবেই সেই সুপারিশ করেছেন যে, আইনের সংশোধন করা উচিত এবং ধর্ষকদের মৃত্যুদণ্ডই দেয়া উচিত। আর আমি এর পক্ষে, ভারতের সমর্থকদের মধ্যে আমিই হবো প্রথম ব্যক্তি। সুতরাং আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, ভাল জিনিস বলার সাথে সাথে ইসলাম সে পথও দেখায় যার মাধ্যমে আপনি ভালোর অবস্থানে পৌঁছতে পারেন।

অতএব আমি বলি ইসলাম অন্য ধর্মের মত নয়, ইসলাম ভাল জিনিস বলে, আবার আপনাকে সে পথ দেখায় যার মাধ্যমে ভাল অর্জন করতে পারবেন। সুতরাং যদি আমাকে কোন ধর্মের অনুসরণ করতেই হয়, তাহলে সে ধর্মেরই অনুসরণ করবো যাতে ভাল জিনিসের কথাও বলে আবার ভাল অর্জন করার যথাযথ রাস্তাও বাতলে দেয়। এটাই ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ـ

অর্থ : 'আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একই ধর্ম যার মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে।'

প্রশ্ন ঃ ৩০৪। আমার নাম মনোজ রাইচা, আমার প্রথম প্রশ্ন হলো যে 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের' নামে আপনি ইসলামের প্রচারই করছেন এবং তার ওপর ভিত্তি করে আপনি যখন 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব' সম্পর্কে বলছেন, তাহলে আপনার বিষয়টা ব্যাখ্যা করুন যে ভ্রাতৃত্ব শুধু মুসলিমদের জন্য নাকি আপনি যাদের 'কাফির' বলেন, তাদের জন্যও? যারা আর যাই হোক মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মধ্যে পড়ে না, এটাই যথেষ্ট হবে।

উত্তর : ডা. জাকির ঃ দাদা একটা প্রশ্ন করেছেন যে, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের নামে আমি ইসলামের প্রচার করছি। ধরুন, আমাকে বলতে হয় "আপনি কাপড় সম্পর্কে জানেন... আমি বাজারের ভাল কাপড়ের কথা বলি।" সুতরাং এটা বাস্তব, আমি রায়মণ্ড কাপড়ের কথা বলছি, যেটা সর্বোত্তম কাপড়, যাহোক আমি রায়মণ্ডের কোনো ভর্তুকি পাই না, এটা শুধু একটা উদাহরণ, আমি রায়মণ্ডের ডিলার নই। কিন্তু আমি যদি বলি রায়মণ্ড হলো সর্বোত্তম কাপড় এবং কথা যদি বাস্তবের সাথে মিল থাকে, আমাকে বলতে হবে। ধরুন, আমি যদি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার কে? এবং আমি যদি x y z যেকোন ব্যক্তির নাম বলি এবং তিনি যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার হয়ে থাকেন, তাহলে আমি তার প্রচার করবই।

আমি বলছি যে, ইসলাম এমন একটা ধর্ম যা 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের' কথা বলে এবং এটা অর্জন করার পথ দেখায়। আপনার প্রশ্নানুপাতে যে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' আপনি কি মুসলিম অমুসলিম সবার ভ্রাতৃত্ব বুঝাচ্ছেন, নাকি শুধু মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কথা বলছেন?

ইসলামের 'সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' হলো যে, সব মানুষ আপনার ভাই এবং আমি আমার বক্তব্যে এটাকে পরিষ্কার করেছি। আমি বাক্যে কোনরূপ কোমলতা করিনি। আমি একেবারে পরিষ্কার করেছি, হতে পারে এটা স্লিপ হয়েছে, হয়তো আপনি এটা শুনেন নি'। আমি আমার বক্তব্য সূরা আল-হুজুরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করেছিলাম। ৪৯ নং সূরা আল-হুজুরাতের ১৩ নং আয়াত–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ـ

অর্থ : 'হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে এবং তোমাদের গোত্র ও উপগোত্রে বিভক্ত করেছি, তোমাদের পরিচিতির জন্য। আল্লাহর নিকট সেই বেশি সম্মানিত যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সব মানব, যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ পাবে, সে ব্যক্তি তাকওয়া বা সৎপথ প্রাপ্ত। আমার দু জন ভাই আছে, একজন ব্যক্তি হিসেবে ভালো। বাস্তবে আমার ভাই একজনই। ধরুন, আমার দু'জন ভাই আছে, একজন মেডিক্যাল ডাক্তার, এ ভাইয়ের মত, যিনি রোগীর চিকিৎসা করেন, তাদের আরোগ্য করেন। অন্য ভাই মদ্যপ, যে কিনা ধর্ষক। দু'জনই আমার ভাই। কোন ভাই ভালো? স্বাভাবিকভাবেই যে ভাই ডাক্তার, যিনি মানুষের চিকিৎসা করেন এবং সমাজের কারো কোনো ক্ষতি করেন না। তিনিই ভাল অন্যজনও আমার ভাই, কিন্তু ভাল ভাই নন। এমনিভাবে সব মানুষই আমার ভাই, কিন্তু তারা আমার বেশি নিকটবর্তী যাদের তাকওয়া আছে, যাদের সততা আছে এবং আছে খোদাভীতি তারাই আমার নিকটবর্তী। এটা খুবই পরিষ্কার। আমি আমার বক্তব্যে বলেছি, আমি তা পুনরাবৃত্তি করলাম। আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ৩০৫। আপনি হিন্দু মতবাদ, ইসলাম এবং খ্রিস্টবাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এ তিন ধর্মেই ভাল জিনিস আছে, বিশেষ করে ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে, আপনি হিন্দু এবং খ্রিস্ট ধর্মের ভ্রাতৃত্বের কথা বলেন নি।

উত্তর : ডা. জাকির ঃ দাদা বলেছেন যে, আমি ইসলামের ভাল জিনিস বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বলেছি; কিন্তু আমি হিন্দু ও খ্রিস্ট ধর্মের ভাল জিনিস সম্পর্কে বলি নি'। আমি নির্দিষ্ট কিছু ভাল জিনিস সম্পর্কে বলেছি। আমি হিন্দু ও খ্রিস্ট ধর্মের সব ভাল জিনিস সম্পর্কে কথা বলি নি। কারণ, এখানে এসব জিনিস সবার পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়। আমাকে ধৈর্য ধরতে হয়। আমি খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে জানি এবং আমি বাইবেল অধ্যয়ন করেছি, আমি হিন্দুশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছি। আমি যদি এ বিষয়ের ওপর কথা বলি, আমি এখানে ফাটল সৃষ্টির জন্য নয়। আমার কাজ হলো এখানে মিল বিষয়ে আলোচনা করা। সুতরাং মিল যা আছে তা সম্পর্কেই কথা বলব। হিন্দুধর্মে বলে চুরি কর না, খ্রিস্টবাদ বলে চুরি কর না, উত্যক্ত কর না, ধর্ষণ কর না। সুন্দর ভ্রাতৃত্বের অন্য জিনিসগুলো, আপনি কি জানেন, কেবল স্যাম্পল হিসেবে আমি আপনাকে দিচ্ছি। যীশুখ্রিস্ট বলেছেন, যা মথির গসপেলে উল্লেখ আছে– অধ্যায় নং ১০ শ্লোক নং ৫ ও ৬ এতে বলা হয়– এ সম্পর্কে দ্বিতীয় কোন সন্দেহের

অবকাশ নেই। তিনি রাসূলদের বলেছেন, তোমরা জেনটাইলস এর রাস্তায় যেও না, বরং ইস্রাঈলের ঘর থেকে হারানো ভেড়ার দিকে যাও। জেনটাইলস কারা? অইহুদি, হিন্দু, খ্রিস্ট তারা হলো জেনটাইলস। শূকরের গলায় মুক্তার মালা দিও না। তিনি আমাদের শূকর বলেছেন। আপনি আমাকে কি সে সম্পর্কে কথা বলতে বলেছেন? যীশুখ্রিস্ট মথির গসপেলে ১৫ নং অধ্যায় শ্লোক নং ২৪-এ তিনি বলেন–

আমি শুধু প্রেরিত হয়েছি ইস্রাঈলের ঘর থেকে হারানো ভেড়ার জন্য।

আমি অধ্যায় ও শ্লোক নম্বর উল্লেখ করেছি। এর অর্থ ধর্ম ইহুদিদের জন্য, বিশ্ববাসীর জন্য নয়।

অন্যান্য ধর্মে, বৈরাগ্যবাদের ওপরে বিশ্বাস আছে। আপনি যদি আল্লাহর নিকটবর্তী হতে চান, আপনাকে দুনিয়া ত্যাগ করতে হবে। বেশির ভাগ বড় বড় ধর্মে বিশেষত হিন্দু ও খ্রিস্ট ধর্মে বলে, খোদার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য আপনাকে দুনিয়া ত্যাগী হতে হবে।

আল-কুরআনের ৫৭ নং সূরা হাদীদের ২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে এটা বৈরাগ্যবাদের বিরুদ্ধে। বৈরাগ্যবাদের অনুমতি ইসলামে নেই। আমাদের প্রিয়নবী করীম ﷺ বলেছেন– ইসলামে কোনো বৈরাগ্যবাদ নেই। একথা সহীহ বুখারী ভলিউম নং ০৭ কিতাবুন নিকাহ ৩ নং অধ্যায়, ৪ নং হাদীস হে যুবকেরা! যাদের বিবাহের সামর্থ্য আছে, তাদের বিবাহ করা উচিত। – হাদীস একথা বলে।

আমি যদি একমত হই যে, আপনি যদি দুনিয়া ত্যাগী হন, তাহলে আপনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকটবর্তী হবেন, আজ যদি পৃথিবীর সব মানুষ দুনিয়া ত্যাগী হয়, তাহলে ১০০ থেকে ১৫০ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে একজন মানুষও জীবিত থাকবে না। যদি দুনিয়াব্যাপী সবাই এ আইন মেনে চলে, তাহলে কোথায় সেই বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব? অতএব ভাই! আমাকে একটা ভাল বিষয়ের ওপরই কথা বলতে হবে, অন্যথায় আপনাকে অন্য ধর্মের ওপর জ্ঞানার্জন করতে হবে। এটা আমার কাজ। আমাকে সত্যই বলতে হবে। আল-কুরআনের ১৭ নং সূরা বনি ইসরাঈলের ৮১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۔

অর্থ : 'সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, মিথ্যা বিদায় হওয়ার জন্যই।'

আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

পরিশেষে বলতে চাই, শ্রোতৃমণ্ডলীর দ্বারা জিজ্ঞাসিত ডা. জাকির নায়েকের সর্বশেষ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর অ্যাডভোকেট ডা. মুহাম্মদ প্রভাকর রাও হেজকে অডিটোরিয়ামের সবার উদ্দেশে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন। প্রধান অতিথি ডা. জাকির নায়েক ও প্রোগ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রশংসামূলক

কিছু বক্তব্য পেশ করেন। এরপর ডা. মুহাম্মদ মি. কে. আর. হিংগোরেনকে তাঁর সভাপতির বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। এরপর ডা. মুহাম্মদ মাওলানা আতাউল্লাহকে সমাপনি বক্তব্য পেশ করার অনুরোধ করেন। AQSA-এর এডুকেশন সোসাইটির পক্ষ থেকে মাওলানা আতাউল্লাহ প্রধান বক্তা ডা. জাকির নায়েকসহ উপস্থিত সব মেহমানকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি সব লোককে নিকটবর্তী করার ও ভুল ধারণার অপনোদনের জন্য এ ধরনের সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করার প্রত্যাশ্যা ব্যক্ত ও প্রার্থনা করেন।

প্রশ্ন ঃ ৩০৬। পবিত্র কোরআনের অনেক সূরার শুরুতে الم। এসেছে। এগুলো কেন? এর অর্থই বা কী?

উত্তর : এখানে কথা হচ্ছে পবিত্র কোরআনের অনেক সূরার শুরুতে কিছু বিক্ষিপ্ত বর্ণ এসেছে সেগুলো নিয়ে। এ হরফগুলোকে বলা হয়, হরুফে মুকাত্ত্বাআত বা বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এ বর্ণমালা নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। এমন কি অনেক বইও লিখিত হয়েছে। সেগুলোতে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। আমরা জানি আরবি বর্ণমালা ২৯টি এবং ১টি থেকে সর্বোচ্চ ৫টি পর্যন্ত আছে। যেমন– ১টি করে বর্ণ আছে ৩টি সূরায় সেগুলো হলো নুন, ছোয়াদ ও ক্বফ। দুটি বর্ণ আছে ১০টি সূরায় যেমন : طہ (ত্বোয়া হা,) یس: (ইয়াছিন) ইত্যাদি ৩টি বর্ণ আছে। এভাবে বেশ কয়েকটি সূরায়। যেমন : আলিফ, লাম, মিম ৬টি সূরায়, আলিফ, লাম, রা, ৬টি সূরায় এবং তোয়া, সিন, জীম ২টি সূরায়। আবার ৪টি বর্ণ আছে ২টি সূরায় এবং ৫টি বর্ণ আছে দুটি সূরায়।

এখন প্রশ্নকারীর প্রশ্ন, এগুলোর অর্থ কী? আমি আগেই বলেছি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনেক বড়। বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ বলেন ن (নূন) দ্বারা বুঝানো হয়েছে نور তথা আলোক রশ্মি, এমনিভাবে একেক বর্ণের দ্বারা তারা একেকটি শব্দ নির্দেশ করেন, কেউ কেউ মনে করেন, এগুলো আল্লাহর গুণবাচক নাম (সিফাত)। কারো কারো ব্যাখ্যা আবার কোনো কোনোটি আল্লাহর নাম হিসেবে, কোনোটি রাসূল ﷺ-এর নাম হিসেবে আবার কোনোটি কোরআনের নাম হিসেবে। অনেকেই মনে করেন, এগুলো সূরার নামকরণের জন্য করা হয়েছে। যেমন : সূরা ইয়াছিন, সূরা নূর, সূরা ছোয়াদ, সূরা ত্বোহা ইত্যাদি। অনেকে আবার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তারা বলেন, এগুলো হচ্ছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা নির্দেশক বর্ণমালা। কিছু কিছু মুফাসসীর মত প্রকাশ করেন যে, এগুলো হযরত জিবরাইল (আ) পড়েছিলেন মহানবী ﷺ -এর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। আর আমরা তিলাওয়াত করি মনোযোগ সৃষ্টির জন্য।

১৬. একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ

তবে আমি ইমাম তাইমিয়ার সাথে একমত পোষণ করি যিনি বলেছেন, এগুলো দ্বারা মূলত আল্লাহ্ আরবদের বুঝিয়েছেন। আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি তা তোমাদের ব্যবহৃত বর্ণমালা দিয়েই। তোমরা তোমাদের কথায়, লেখায়, ভাষায় যে বর্ণসমষ্টি, যেমন– আলিফ, ছোয়াদ, তোয়া, নূন ব্যবহার কর আমার কোরআনও সেই বর্ণমালার সাহায্যে নাযিলকৃত গ্রন্থ। এখন তোমরা যদি বিশ্বাস না কর এটা আল্লাহর বাণী, তবে ঐ একই বর্ণমালা দিয়ে তোমরা একটা সূরা একটা আয়াত ইত্যাদি রচনা করে দেখাও। এ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়ার জন্যই মূলত এ বর্ণগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, যে তোমাদের বর্ণ আর আমার বর্ণ ভিন্ন নয়।

আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াতে বলেন,

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۔

অর্থ : 'তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন যার কিছু অংশ সুস্পষ্ট এবং এটিই আসল অংশ, অন্যগুলো রূপক।

অর্থাৎ কিছু বর্ণ প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজন বোধগম্যতা 'সমৃদ্ধ। যেমন : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ 'বলুন আল্লাহ এক'। এটি সবাই বুঝে আবার কিছু আয়াত আছে যেগুলো সবাই বুঝতে পারে না। যেমন : الم। (আলিফ, লাম, মীম) এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা কোরআনের অন্য আয়াতের সাহায্যে নিতে হয়। কোরআনের এটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক যে যখন একটি আয়াত পড়তে গিয়ে কোনো প্রশ্নের সৃষ্টি হয় এবং সেটির উত্তর ঐ আয়াতেই পাওয়া যায় না, তখন দেখা যায় অন্য আয়াতে ঠিকই তার উত্তর বিদ্যমান। এখন আমরা যদি বলি আল্লাহ্ এভাবেই কাফেরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন অন্য আয়াতে। যেমন সূরা বাকারায় (২৩-২৪) নং আয়াতে,

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۔ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۔

অর্থ : 'আর যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অবতীর্ণ করেছি, তবে তোমরা এর একটি সূরার অনুরূপ একটি সূরা রচনা কর, তোমরা তোমাদের সাহায্যকারীদের সঙ্গে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

আর যদি তোমরা না পারো, তবে জেনে রেখো পারবে না, তবে ভয় কর সেই আগুনকে যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ আর পাথর।'

আল্লাহ্ কোথাও দশটি সূরা আবার কোথাও একটি আয়াত রচনার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ্ মূলত মানুষকে বুঝাতে চান তাদের বর্ণিত, লিখিত ও পঠিত বর্ণমালা আলিফ, লাম ইত্যাদিই আমি ব্যবহার করেছি অথচ তারা এগুলো ব্যবহার করে একটি ছোট আয়াতও রচনা করতে ব্যর্থ। আসলে এই যে বর্ণগুলো ইংরেজি বর্ণমালার কথা ধরলে আমরা বলতে পারি a, b, c, d, e, f, ইত্যাদির কথা। এই একই বর্ণমালা ব্যবহার করে সবাই কি মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে?

একটা উদাহরণ দেয়া যাক, মানুষের সৃষ্টিতে যে উপাদানগুলো আছে মাটি ও পৃথিবীর সৃষ্টিতেও প্রায় সে একই ধরনের উপাদান আছে। মানুষের শরীর যেসব উপাদান দিয়ে গঠিত তা আপনি কম-বেশি কয়েক হাজার টাকা হলেই কিনতে পারবেন। তাই বলে কি এর অর্থ এই যে, আপনি মানুষ তৈরি করতে পারেন? অবশ্যই না। আপনি কোনোভাবেই প্রাণ দিতে পারবেন না। যদিও সব উপাদানই বিদ্যমান আপনার হাতে তবুও আপনি পারবেন না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ও বলেন, 'তোমরা যে আলিফ, লাম, নূন, মীম ইত্যাদি বর্ণমালা ব্যবহার কর আমিও তাই ব্যবহার করেছি। পারলে তোমরা একটি সূরা বা আয়াত রচনা কর।' সে চ্যালেঞ্জটি প্রতিষ্ঠার জন্য এ বর্ণমালাগুলো হতে পারে। যেমন : আমরা দেখতে পাই সাধারণত এই ইরাব (اعراب) বা বর্ণ বিন্যস্ত আয়াতগুলোর পরপরই কোরআনের মহিমা বিধৃত আয়াত উল্লেখ করা হয়। যেমন : সূরা বাকারার ১ ও ২ নং আয়াত যেখানে প্রথম আয়াতে আলিফ, লাম, মীম বলেই ২য় আয়াতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেন,

الٓمّٓ ـ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ـ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ

অর্থ : 'এটা সেই কিতাব যাতে নেই সন্দেহের লেশ মাত্র, আর এটি মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক।'

অনুরূপভাবে সূরা ইবরাহীম-এ আলিফ, লাম, রা এর পরেই বলেছেন,

الٓرٰ ـ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ

অর্থ : 'এটা সেই কিতাব যা মানুষকে নেতৃত্ব দেয় অন্ধকার থেকে আলোকের পথে।'

এভাবে হয় তো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে কোরআনের মহত্ত্ব বর্ণনাই আল্লাহর উদ্দেশ্য। আল্লাহই ভালো জানেন।

১৭. কোরআন তিলাওয়াত ও পূণ্য অর্জন প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ঃ ৩০৭। আমি রিয়াজ বলছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে– কোরআনের প্রতিটি সূরা পড়ার জন্য আমরা সওয়াব পাই। এখন কোরআনে তো 'ইবলিস' শব্দটিও আছে। সারাদিন আমি যদি 'ইবলিস', 'ইবলিস' করি তবে কি সওয়াব পাব?

উত্তর : ভাই প্রশ্ন করেছেন যে, কোরআন তিলাওয়াত করলে আমরা সওয়াব পাই। প্রতিটি বর্ণের বিনিময়েই, যা এসেছে তিরমিজি শরীফে ১০০৩ নং হাদিসে এসেছে তাহলে 'ইবলিস ইবলিস' যিকির করলে সওয়াব পাব কি না? ভাই আমি আগেই বলেছি কোরআন বোধগম্যতার সাথে পড়তে হবে। আপনি যদি 'ইবলিস' শব্দটি বুঝে পড়েন যে আমাদের শত্রু। সে আমাদের ধোকা দেয়ার চেষ্টা করে। ইবলিসের ধোঁকা থেকে বাঁচতে আল্লাহর আদেশ মানতে হবে ইত্যাদি। তবে আপনি অবশ্যই সওয়াব পাবেন।

১৮. কোরআন বুঝে পড়া ধারণাটি কী নতুন?

প্রশ্ন ঃ ৩০৮। আমি অশোক কুমার। আমি তুলনামূলক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছি। এখন আমি একটি স্থানীয় পত্রিকায় আছি। আমি অনুমতিক্রমে পবিত্র কোরআন ও বেদে উল্লিখিত কালিমা পাঠ করছি। এরপর আমার প্রশ্ন হচ্ছে– আপনি বলেছেন কোরআন বোধগম্যতার সাথে পড়তে। অথচ এখন পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা কোরআন না বুঝেই পড়ছে। তাহলে আপনার কথার ভিত্তি কী? আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে– এর আগে আমাকে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, 'শাকাহারি' অর্থাৎ নিরামিষাসি ও মুসলমান থাকতে পারে, তাহলে ইসলামে পশু খাওয়া কেন হালাল করা হলো? এটা কি নৃশংসতা নয়?

উত্তর : ভাই বলেছেন, পবিত্র কোরআন এতোদিন ধরে মুসলমানরা না বুঝেই পড়ে যাচ্ছে তাহলে আমি কীভাবে বোধগম্যতার সাথে পড়ার কথা বলছি? আসলেই কি তাই? আসলেই কি মুসলমানরা কোরআন না বুঝেই ১৪০০ বছর ধরে পড়ছে? অবশ্যই না। মুসলামনরা যত দিন পর্যন্ত কোরআন বুঝে পড়ে এসেছে ততদিন পর্যন্ত ছিল তাদের স্বর্ণযুগ। ৬০০ সাল থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত যে অন্ধকার যুগ সেটা ইউরোপের অন্ধকার যুগ। মুসলমান বা সেই সময় ছিল নতুন স্বর্ণালি সভ্যতার নির্মাতা। বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখায় তারা ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ও লালনকারী। তারা তখন কোরআন বুঝে পড়তেন, কোরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছিলেন বলেই তারা এতোটা আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতিতে পরিণত হতে পেরেছিলেন।

কিন্তু আস্তে আস্তে যখন কোরআনের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হতে লাগলো তখনই তাদের বিচ্যুতি ঘটলো। মুসলমানরা উন্নয়ন হতে পিছিয়ে পড়লো। কেননা তারা সত্য ধর্ম ইসলাম ও সত্য গ্রন্থ কোরআন থেকে বিচ্যুত হলো। অনুরূপভাবে অমুসলিমরা উন্নত হতে লাগলো। কারণ তারা তাদের মিথ্যা ধর্ম অনুসরণ করা বাদ দিল বলে। তাই মুসলমানরা যদি আবার কোরআন বোধগম্যতার সাথে পড়া শুরু করে তবে অবশ্যই তারা উন্নত হতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ ৩০৯। আপনি বলেছেন অমুসলিমদেরকে আরবিসহ অনূদিত কোরআন উপহার দেয়াই উত্তম। আবার বলেছেন, পকেট কোরআন নিয়ে ট্রেনে বসে কোরআন পড়ার কথা। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এতে কোরআন পবিত্র অবস্থায় তিলওয়াতের যে বিধান আছে তা ক্ষুণ্ন হয় কি-না? অমুসলিম কীভাবে পবিত্র হবে আর ট্রেনে বা বাসে কি সব সময় অজু থাকে?

উত্তর : আপনি কোন্ অজুর কথা বলেছেন? আসলে অজু ছাড়াও কোরআন তিলাওয়াতের অনেক পন্থা আছে। এ উদ্ধৃতিটি ফেরেশতাদের জন্য, যা আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি। তবে এটা নিয়ে অনেক কথা আছে, আছে বিভিন্ন ব্যাখ্যা। একেকজন একেকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এটা ফেরেশতাদের জন্য নাকি মানুষের জন্য এ নিয়ে যেমন বিতর্ক আছে, ভিন্ন ভিন্ন মত আছে তেমনি কুরআন অজু ছাড়া স্পর্শ করা যাবে কিনা তা নিয়েও বেশ মতভেদ লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন জন, যেমন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম হাম্বলী, ইমাম মালেকীসহ বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা মনে করেন, বিনা অজুতে কোরআন ছোঁয়া নিষিদ্ধ, তবে কাপড়ে পেঁচানো থাকলে বা কাপড়ের আবরণ থাকলে ধরতে কোনো অসুবিধা নেই।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, খালি দু মলাটই কাপড়ের কাজ করে। তাই আলাদা কাপড় না হলেও চলবে। যাহোক, অনেকের মতামত আবার একটু অন্য রকম। যেমন– হাম্বলী মনে করেন, এমনি কোরআন, অযু ছাড়া স্পর্শ করতে কোনো সমস্যা নেই, তবে আরবি লিখিত অংশে হাত দেয়া যাবে না। তবে ইমাম মালেক (র) বলেন, শিক্ষার্থীরা শিক্ষার জন্য ও শিক্ষকেরা শেখানোর নিমিত্তে কোরআনের যে কোনো অংশই অজু ছাড়া স্পর্শ করতে পারবে। তাঁর মতে, এক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা রাখলে কোনো না কোনোভাবে তাদের শিক্ষা করা ও দেয়া দুটোতেই বাধার সৃষ্টি হতে পারে যা তাদের জন্য কোরআন ভুলে যাওয়ার পথ সৃষ্টি করতে পারে। তাই শিক্ষা দেয়া ও গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি বেশ উদার।

এভাবে দেখা যায়, এ বিষয়টি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত বর্তমান তবে ইবনে হাজার আসকালানী যিনি এ বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন, তিনি মত প্রদান করেন যে, পবিত্র কোরআন অজু ছাড়াও তিলাওয়াত করা যায়। অজু ব্যতীত কোরআন

স্পর্শ করা যাবে কিনা তা নিয়ে অনেক মতানৈক্য থাকলেও একটি বিষয়ে সকলে একমত আর তাহলো অজুসহ কোরআন তিলাওয়াত উত্তম। ইবনে হাজার কোরআনের অনেক উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করে হাদিস থেকে বিভিন্ন উক্তি দিয়ে স্ববিস্তারে বর্ণনার পর যে সিদ্ধান্ত টেনেছেন তা হলো, কোরআন তিলাওয়াত-এর ব্যাপারে কোনো পূর্ব শর্ত নেই। এটা হাজার আসকালানীর মত। অন্য অনেকের মতও পাওয়া যায়। তবে সাধারণভাবে হাদিসেও এসেছে 'ত্বাহারাত' অর্থাৎ পবিত্রতা ছাড়া কোরআন স্পর্শ করা যাবে না।

কিন্তু 'ত্বাহারাত' বা পবিত্রতা বলতে কি অজু বুঝায়? বিষয়টি বিশ্লেষণের দরকার আছে। অজু থাকলেই কি একজন 'ত্বাহির' তথা পবিত্র আছেন বলা যায়? যদি কেউ আনুষ্ঠানিক বড় অপবিত্রতা তথা স্ত্রী সহবাসের পর অজু করে সে 'ত্বাহারাত' অর্জন করে না। তাই যেসব হাদীসে 'ত্বাহারাত' তথা পবিত্রতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে সেসব হাদীসে মূলত বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। কেননা ঐ অবস্থায় অধিক সময় থাকা অনুচিত। এ ব্যাপারে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী ও ইবনে আজিজসহ অনেকেই অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। আর ইবনে হাজার আসকালানী বিস্তারিত বর্ণনার পর এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অজু ছাড়াও কোরআন তিলাওয়াত বৈধ। সুতরাং তার ব্যাখ্যা দেখে নিতে পারেন। এবার আসা যাক অমুসলিমদের ব্যাপারে। আমার মনে হয় আমরা যদি মনে করি পবিত্র কোরআন অমুসলিমদের দেয়া বৈধ, তবে তাঁর পক্ষে পবিত্র কোরআনের সূরা নাহল-এর ১২৫নং আয়াতই যথেষ্ট। যেখানে আল্লাহ বলেছেন,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ـ

অর্থ : 'মানুষকে ডাক আল্লাহর পথে প্রজ্ঞা ও কৌশলে।'

যদি আমি কোরআনই তাকে না দিই তবে কোন কৌশল অবলম্বন করবো? এছাড়া আল্লাহ সূরা বাকারাহ্-এর ২৩ নং আয়াত ও সূরা বনী ইসরাঈলে কাফেরদের চ্যালে ছুঁড়ে দিয়েছেন এভাবে,

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ـ

অর্থ : 'তারা যদি কোরআনকে মানব রচিত কোনো গ্রন্থ মনে করে, তবে এর মত একটি সূরা এমন কি আয়াত তারা রচনা করে দিক।'

এই যে চ্যালেঞ্জ আল্লাহ ছুঁড়ে দিয়েছেন এটা যদি কাফেররা গ্রহণ করে তবে অবশ্যই তাদেরকে পবিত্র কোরআন পড়তে হবে। শুধু পড়তেই হবে না অত্যন্ত মনোযোগের সাথে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ সবরকম কৌশলেই তাদের পড়তে হবে। আর যদি পড়তে চায় তবে স্পর্শ করতে বা ধরতে হবে। বিনা স্পর্শে তারা পড়বে

কীভাবে? তাহলে আল্লাহ যদি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে কাফেরদের কোরআন স্পর্শ করার পথ খুলে দেন, তবে আমি আপনি নিষেধ করার কে?

আমরা কীভাবে তাদের বাধা দিব কোরআন পড়ার ব্যাপারে? এছাড়া আমি আগেও বলেছি, আল্লাহ যদি আমাকে অমুসলিমদের কোরআন দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন তবে আমি নিশ্চিতভাবেই আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে আমার পাশে পাব যেহেতু তিনি নিজেই কোরআনের আয়াত সম্বলিত পত্র বিভিন্ন অমুসলিম রাজাদের কাছে লিখতেন। তাছাড়া একটু মনোযোগ দিয়ে কোরআনের হেদায়েত বিষয়ক আয়াতগুলো ব্যাখ্যাসহ পড়লে ও যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটা অতি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, অমুসলিমদের কোরআন দেয়ার নিষেধাজ্ঞা থাকার কোনো কারণ কোনোভাবেই দাঁড় করানো যায় না।

২০. কোরআন সংকলনের ইতিহাস প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ঃ ৩১০। আমি আজকের এই বিশেষ আলোচনায় আসতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমি দো'আ করি আল্লাহ যেন আমি ও অন্য সব শ্রোতাকে কোরআন সম্পর্কিত এ মূল্যবান আলোচনাটি হৃদয়ঙ্গম করার ও তার ওপর আমল করার তৌফিক দেন। যা হোক আমি আমার মূল প্রশ্নের দিকে সরাসরি যেতে চাই। আর তা হলো, অনেক অমুসলিম বলে থাকে, তোমাদের নিকট যে কোরআন আছে সেটি তো তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সংকলিত। এটিতো আল্লাহ অবতীর্ণ মূল কোরআন নয়। এ অভিযোগটি কীভাবে খণ্ডানো যাবে?

উত্তর : আপনি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। অনেকেই এ অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে যে, পবিত্র কোরআনের এ সংকলনটি হযরত উসমান (রা) থেকে এসেছে। আসলে যারা এটা বলে, তারা ভুল বলে। এটা বুঝার জন্য আপনারা দেখতে পাবেন ভিডিও ক্যাসেট 'ইজ দ্যা কোরআন দ্যা ওয়ার্ড অব গড।'

আসল কথা হলো এটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই সংকলন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। যখন কোনো আয়াত অবতীর্ণ হত তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে তা মুখস্থ করে ফেলতেন। অনেক সাহাবী (রা)ও সেটা মুখস্থ করে ফেলতেন। তারপরও মহানবী (সা) সেই অংশগুলো নির্বাচিত কয়েকজন সাহাবী (রা)-এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্তূপ যেমন– তালের পাতা, পাতলা পাথর, তরবারির পাত ইত্যাদির ওপর লেখাতেন। পরে বিভিন্নভাবে সেগুলো পরখ করতেন। যদিও তিনি পড়তে পারতেন না তবুও একজনের লিখিত অংশ অন্যদের দিয়ে পড়িয়ে নিজে শুনতেন এভাবে বিভিন্নভাবে পরখ করে কোরআনের বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ নিশ্চিত করতেন। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের পূর্ববর্তী রমজানে তিনি দু'বার পবিত্র কোরআন খতম করেন এবং সাহাবী (রা) তা শুনে আবার মিলিয়ে নেন।

এছাড়াও কোরআন বিক্ষিপ্তভাবে নাযিল হয়েছিল। এ পর্যায়ে মহানবী ﷺ নিজে কোনো আয়াত কোন সূরার কোন আয়াতের পরে অবস্থান পাবে তা তিনি বলে দিলেন এবং এভাবে পবিত্র কোরআনের পরিপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ, পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও সুসামঞ্জস্য একটি সংকলন মহানবী নিজে করে দিয়ে গেলেন। আমরা এখন যেভাবে কোরআন সাজানো ও ধারাবাহিকভাবে সূরায় সূরায় বিন্যস্ত পাই, এটিও কোনো সাহাবী (রা) বা খোলাফায়ে রাশেদীনের মাধ্যমে বরং মহানবী ﷺ তত্ত্বাবধানে সমাপ্তি। তাই এটিকে হযরত উসমান (রা) এর সংকলন বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ব্যাপারটা হলো মহানবী (সা) কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় সাজানো ও বিন্যস্ত কোরআনের অনুলিপি কপি অনেক ছিল না। ছিল স্বল্প কয়েকটি। কিন্তু সাহাবী (রা) যেহেতু মুখস্থ করে রেখেছিলেন, তাই কোনো প্রয়োজনও পড়ে নি অনেক কপি করার। কিন্তু তখন ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফেজ সাহাবী (রা) শহীদ হলেন তখন প্রয়োজন পড়ে মহানবী ﷺ কর্তৃক সুবিন্যস্ত কোরআনের কপি করার। এটিও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করা হয়। এমন কি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কোরআন নকলকারী সাহাবী জায়েদ বিন সাবিত (রা)-এর তত্ত্বাবধানে এ কাজটি সমাধান করা হয়।

এতে বুঝা যায় তাঁরা কোরআনের পরিশুদ্ধতার ব্যাপারে কতটাই আন্তরিক ও সচেষ্ট ছিলেন। আসলে এগুলো ছিল নবী করীম ﷺ এর নির্দেশিত সংকলনেরই অনুলিপি। নতুন কোনো সংকলন নয়। এর একটি কপি হযরত আবু বকর (রা)-এর মৃত্যুর পর নবী করীম ﷺ এর পত্নী ও হযরত উমর ফারুক (রা)-এর মেয়ে হযরত হাফছা (রা)-এর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। হযরত উমর (রা)-এর ওফাতের পর হযরত উসমান (রা)-এর সময় যে সমস্যাটি দেখা দিল তা হচ্ছে ইসলামি খিলাফত ততদিনে অনেক বিশাল এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) যে কয়েকটি কপি করেছিলেন তা অপ্রতুল হয়ে যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে সে কপিগুলো পৌছানো অসম্ভব হয়ে যায়।

ইত্যবসরে অন্যান্য সাহাবী (রা) যারা মহানবী ﷺ -এর তত্ত্বাবধানের বাইরে কোরআন লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাদের অনেক কপিই বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা হলো যেগুলো মহানবী ﷺ -এর তত্ত্বাবধানের বাইরে ছিল সেগুলো কোনোটি ছিল অসম্পূর্ণ কোনোটি ছিল অগোছালো অর্থাৎ মহানবী ﷺ যেভাবে আয়াতগুলো বিন্যস্ত করেছিলেন সেভাবে ছিল না। তবে এটি নিশ্চিত কোনোটিই ভুল ছিল না। তবুও কোরআনের বিশুদ্ধতা পুরোপুরি নিশ্চিত করতে মহানবী ﷺ কর্তৃক সংকলিত প্রতিলিপি বাদ রেখে বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত সব পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে মহানবী ﷺ -এর তত্ত্বাবধানে পরিসমাপ্ত কপি থেকে অনেক কপি করে পুরো মুসলিম বিশ্বে পাঠানো হয়। তাই সত্যি বলতে এটি হযরত উসমান

(রা)-এর সংকলন বলাটা একদিক থেকে ভুল। বরং এটি মহানবী ﷺ কর্তৃক সংকলিত। হযরত উসমান (রা) যা করেছেন তা হলো মহানবী ﷺ-এর তত্ত্বাবধানের বাইরে বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত অংশগুলো পুড়িয়ে ফেলে কোরআনের বিশুদ্ধতার পরিপূর্ণ রূপ দেন ও ভবিষ্যৎ ভুল হবার সব পথ রুদ্ধ করে দেন।

আমি আগেও বলেছি যখন কোরআন নাযিল হতো উপস্থিত সব সাহাবী তা লিখে রাখতেন। কিন্তু মহানবী ﷺ -এর পক্ষে সম্ভব ছিল না সব পরখ করে দেখা। হযরত উসমান (রা) শুধু এই কপিগুলোই পুড়িয়ে ফেলেন। তাই যদি কেউ বলে অনেক সংকলন থেকে একটি রেখে বাকিগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, তবে তা ভুল। কেননা কোরআনের সংকলন একটিই ছিল আর তা সংকলিত হয়েছিল স্বয়ং মুহাম্মদ ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে। হযরত উসমান (রা) শুধু সেটিকেই অবশিষ্ট রেখে বাকিগুলো পুড়িয়ে ফেলেন এবং সেটাকেই অনুসরণ করে, কপি করে তাঁর খেলাফতের সকল এলাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। অতএব আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নিকট মহানবী ﷺ কর্তৃক সংকলিত কোরআনই রয়েছে, অন্য কারো নয়। এরপর শুধু মারওয়ান ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময় অনারব মুসলিমদের পড়ার সুবিধার জন্য হরকত, তানভীন অর্থাৎ আমরা যাকে যের, যবর বলি এগুলো সংযোজন করা হয়েছে। এতে কোনো পরিবর্তন আসে নি। কেননা যখন কোনো আরবীয় ব্যক্তি হরকত ছাড়া ও হকরতসহ কোরআন তিলাওয়াত করে তখন কোনো পার্থক্য থাকে না। তাই এটি বিশুদ্ধ, পরিশুদ্ধ ও মহানবী ﷺ নির্দেশিত সংকলিত কোরআন এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

২১. একটি অমূলক অভিযোগ এবং তা খণ্ডন

প্রশ্ন ঃ ৩১১। যদি কোনো অমুসলিম বলে যে, কোরআন শয়তান রচিত বা শয়তান এটির বাহক যা সে বহন করার সময় ইচ্ছে মাফিক পরিবর্তন করেছে তখন আমরা কী বলে এ অভিযোগ খণ্ডন করতে পারি?

উত্তর : বোন, আপনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ যা কিনা অমুসলিমদের মাধ্যমে অনেক সময় উত্থাপিত হয়ে থাকে অবতারণা করেছেন। আমার মনে হয় একবার প্রত্যুত্তরে এতোটুকু বলাই যথেষ্ট যে, যদি কোরআন শয়তান রচিত হত তবে কেন তিনি সূরা নাহ্ল-এর আয়াত নং-৯৮-এ উল্লেখ করলেন,

فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ -

অর্থ : 'বিতাড়িত ও অভিশপ্ত শয়তান হতে মুক্তি চাও।'

শয়তান কেন তাকে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত বলবে? কেন সে তার বাণীর মাধ্যমে সকলকে তার থেকে দূরে থাকার, মুক্ত থাকার দো'আ শেখাবে? অতএব এটা

অত্যন্ত পরিষ্কার যে, এটা কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে হতে পারে না। বস্তুত পুরো কুরআন জুড়েই মানুষকে সেসব পথের দিকে যাবার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যা থেকে শয়তান মানুষকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। বিপরীতক্রমে শয়তান মানুষকে যা করাতে চায় কোরআনের অবস্থান তার থেকে সবসময় বিপরীতমুখী। আর শয়তানের সবচেয়ে বড় শত্রু আল্লাহ। অথচ পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে আল্লাহর গুণগান ও গুণবাচক নাম রয়েছে। উপরন্তু সূরা আরাফের ২০০ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ -

অর্থ : 'যখনই শয়তান তোমাদের কুমন্ত্রণা দেয় তখনই আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাইবে।'

লক্ষ্য করুন, এখানে শয়তানকে প্ররোচনাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শয়তান কেন নিজেকে প্ররোচনা দানকারী বলবে ও তার খপ্পর থেকে বাচার জন্য তার সবচেয়ে বড় শত্রু আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলবে। নিজের রচিত গ্রন্থে কে এমন বলে? আবার যারা বলে, কোরআন শয়তান বহন করার সময় ইচ্ছে করে পরিবর্তন করেছে তাদের জন্য সূরা ওয়াকিয়াহ-এর (৭৭-৭৯) নং আয়াতগুলোই যথেষ্ট। এ আয়াতগুলো আগেও বলেছি,

إِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ - فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ - لَّا يَمَسُّهٗ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ -

অর্থ : 'নিশ্চয় এটি সম্মানিত কোরআন, যা সংরক্ষিত পবিত্র লওহে মাহফুজে, যেখানে অপবিত্র অবস্থায় কেউ ছুঁতেও পারে না।'

এ আয়াতগুলো অবশ্য কাফেরদের এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছিল যা অনেকেই কোরআন স্পর্শ করার শর্ত হিসেবে অজু করার নির্দেশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে লওহে মাহফুজ এমন সংরক্ষিত স্থান যেখানে কোনো অপবিত্র কিছুই প্রবেশ করতে পারবে না। শয়তান অপবিত্র ফলে তার সেখানে প্রবেশ অসম্ভব। তাই কোরআনের পরিবর্তন শয়তানের পক্ষে সম্পূর্ণভাবেই অসম্ভব। কোরআন নাযিলে শয়তানের যে কোনো ধরনের সংশ্রব নেই তা সূরা শূয়ারা-এর আয়াত (২১০-২১২) নং আয়াত পড়লেও বুঝা যায়। সেখানে বলা হচ্ছে,

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ - وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ -

অর্থ : 'এই কোরআন শয়তান অবতীর্ণ করে নি। তারা এ কাজের যোগ্যও নয় এবং ক্ষমতাও রাখে না। তাদেরকে শ্রবণের জায়গা হতেও অনেক দূরে রাখা হয়েছে।'

প্রশ্ন ঃ ৩১২। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম আলহাজ আমির, প্রশ্ন হচ্ছে এটি কি ঠিক যে, কেউ মারা গেলে কোরআনখানী করতে হবে বা এতে কি কোনো লাভ আছে?

উত্তর : প্রশ্নটা করা হয়েছে যে কোনো অনুষ্ঠানের শুরুতে কারো মৃত্যুতে দল বেঁধে কোরআনখানী করা কতটুকু ঠিক? আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোরআন কি এজন্য অবতীর্ণ হয়েছে যে, মানুষ সেটি দল বেঁধে খতম করবে? কোরআন কি এজন্য অবতীর্ণ হয়েছে যে, কেউ মারা গেলে পড়লেই চলবে? নাকি কোরআন এজন্য অবতীর্ণ যে মানুষ সেটি বুঝে পড়বে। সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝবে ও সে অনুযায়ী আমল করবে। কোনো সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, কোনো সাহাবীর মৃত্যুতে বা তাঁর জানাযায় মহানবী ﷺ এভাবে দল বেঁধে সবাইকে নিয়ে কোরআন খতম করেছেন। যদিও তাঁরা আরবি ভাষী এবং তিলাওয়াতই তাঁদের বুঝার জন্য যথেষ্ট। তাই আমার কথা হচ্ছে, ঠিক আছে যদি কোরআন খতমের একান্তই ইচ্ছে থাকে তবে ৩০ জন লোক না নিয়োগ করে ৬০ জনকে বললেই হয় যেন তাঁরা শুধু না পড়ে প্রত্যেকে আধা পারা অর্থসহ বুঝে পড়ুক। অথবা ধীরে সুস্থে এক ঘণ্টার পরিবর্তে দু' ঘণ্টা ধরে অর্থসহ বুঝে শুনে তিলাওয়াত করুন। তাতেই কি কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য বেশি করে সফল হয় না? আমার মনে হয় আপনারা আমার কথা বুঝতে পেরেছেন।

২২. কোরআনের রহিত আয়াত প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ঃ ৩১৩। আলোচনার এ পর্যায়ে আমার মনে একটি প্রশ্ন এসেছে। সেটি যে সমস্ত মুসলমান কোরআনের 'সংক্ষেপক' তত্ত্বে বিশ্বাস করেন সে বিষয়ে। আমরা জানি পবিত্র কোরআনে এমন কিছু আয়াত আছে যেগুলোর পরিবর্তে অন্য আয়াত নাযিল হওয়ায় রহিত হয়ে গেছে। তারা বলে যে, আল্লাহ প্রথমে সে আয়াতগুলো ভুলবশত নাযিল করেছিলেন পরে অন্য আয়াত নাযিল করে তা সংশোধন করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে আসলেই আল্লাহ ভুল করে পরে শুদ্ধ করেছেন কিনা?

উত্তর : পবিত্র কোরআনে এমন অনেক আয়াত আছে যেগুলো অন্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর রহিত হয়ে গেছে। বোনের প্রশ্ন এটি আল্লাহ ভুল করে করেছেন কিনা? আল্লাহ্ সূরা বাকারাহ্-এর আয়াত নং ১০৬-এ উল্লেখ করেছেন,

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ـ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থ : আমি কোনো আয়াত রহিত করলে তদপেক্ষা উত্তম বার্তার বা সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। আল্লাহ্ সবকিছুর ওপর শক্তিমান।

একইভাবে সূরা নাহ্লের ১০১ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে,

وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ـ

অর্থ : 'আল্লাহ্ কখনো আয়াত রহিত করে না। তবে প্রতিস্থাপন করেন এর থেকে উত্তম বা সমমান আয়াত দিয়ে।'

এ আয়াতে আরবি শব্দ যার অর্থ 'প্রতিস্থাপন' বা 'কোরআনের বাক্য'। যদি আমরা 'প্রতিস্থাপন' অর্থ গ্রহণ করি, তবে বলতে পারি পূর্ববর্তী যেসব আসমানি গ্রন্থ যেমন তাওরাত, যবুর, ইনজিল ইত্যাদিকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে কোরআনের মাধ্যমে। অর্থাৎ ঐ গ্রন্থগুলোর পরিবর্তে এখন কোরআন অনুশীলন করতে হবে, এটিও এগুলোর চেয়ে উত্তম। আবার আয়াতের অর্থ যদি 'পবিত্র' কোরআনের বাক্য গ্রহণ করা হয় তখন উপরোল্লিখিত আয়াত দুটোর ভাবার্থ দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ কোরআনের কিছু বাক্য রহিত করে তার সমমান বা তার চেয়ে উত্তম বাক্য নাযিল করেন। এর অর্থ এ বুঝায় না যে, সে আয়াতগুলো পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলোর আর প্রয়োজন নেই বা সেগুলো পরস্পর বিরোধী অনেক মুসলিমই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তারা মনে করেন কোরআনের কিছু বাক্য অন্য বাক্য দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

তারা মনে করেন, যেগুলো রহিত হয়ে গেছে সেগুলো অপ্রয়োজনীয় ও তা মানা অনুচিত। তারা মতামত দেন যে, একই বিষয়ে কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হলে কেবল শেষেরটি পালন করা উচিত, আগেরগুলো নয়। তারা অনুভব করেন সেগুলো সংঘটিত ও প্রথম আয়াতগুলো অপ্রয়োজনীয়। এ নিয়ে বেশ ভুল বোঝাবুঝি আছে। আসলে অনেক সময় দেখা যায় যে, পরবর্তীতে নাযিলকৃত আয়াত অধিক তথ্য সমৃদ্ধ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আগে নাযিলকৃত আয়াতের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বা সাংঘর্ষিক। বরং বলা যায়, অতিরিক্ত তথ্যপূর্ণ। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। আপনাদের হয়তো মনে আছে আমি উল্লেখ করেছি কোরআনের একটি চ্যালেঞ্জের কথা। আল্লাহ অমুসলিমদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে সূরা ইসরা আয়াত নং ৮৮-এ বলেন,

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ ـ

অর্থ : 'সারা পৃথিবীর সব মানুষ এবং জ্বিন একত্রিত হয়েও কোরআনের মতো একখানা গ্রন্থ রচনা করতে পারবে না।'

এরপর সূরা তুর-এর ৩৪ নং আয়াতে চ্যালেঞ্জ সহজ করে দেয়া হয়েছে। এটিও যখন অমুসলিমরা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তখন সূরা হুদ-এর ১৩নং আয়াতে আল্লাহ চ্যালেঞ্জ অধিকতর সহজ করে দশটি সূরা রচনার সক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে ছুঁড়ে দেন। যখন এটি মোকাবেলা করতেও সমস্ত কাফির সম্প্রদায় পুরোপুরি অকৃতকার্য হয় তখন আল্লাহ্ চ্যালেঞ্জ আরো সহজ করেন। তিনি এবার সূরা ইউনুস-এর ৩৮নং আয়াতের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ অধিকতর সহজ করে দেন। এবার তিনি দশটি নয় বরং একটি সূরা রচনা করার সামর্থ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কাফেরদের প্রতি। দেখা যায় সত্যি সত্যি তারা এ চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করতেও সম্পূর্ণরূপে অপারগ ও অকৃতকার্য হয়। তখন মহান আল্লাহ সূরা বাকারাহ্-এর (২৩-২৪) নং আয়াতের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জকে সবচেয়ে সহজ করে দেন। এবার তিনি কোরআনের ছোট একটি সূরা বা আয়াত রচনার ক্ষমতা নিয়েও অমুসলিমদের ব্যর্থতা ও অক্ষমতা তুলে ধরেন এবং এটি যে মানবরচিত নয় তা আবারো নিশ্চিত করেন।

এ নিশ্চয়তাকে ভুল প্রমাণিত করতে তিনি চ্যালেঞ্জকে পর্যায়ক্রমে সহজ থেকে সহজতর করে মূলত তার বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ ও মানুষের অক্ষমতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। একই সাথে কোরআন যে সম্পূর্ণ রূপেই ঐশীগ্রন্থ সেটি শক্তভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন যদি কেউ বলে সূরা ইসরা আয়াত নং-৮৮ কোরআনের মত দেয়া হয়েছিল তার কোনো প্রয়োজন নেই যেহেতু সূরা বাকারাহ্-এর সর্বশেষে মাত্র একটি সূরা বা আয়াত রচনায় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। এ ছোট চ্যালেঞ্জই যদি যথেষ্ট তবে এতো বড় চ্যালেঞ্জ দেয়ার প্রয়োজন কী? অতএব চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত পূর্বের সব আয়াত অপ্রয়োজনীয় এবং এটির সাথে সাংঘর্ষিক।

যারা এ ভাবনাটি ভেবে থাকেন তারা আসলে কোরআনের নয়। যদি আমি কাউকে প্রথমে বলি যে এস.এস.সি. পাস করতে পারবে না। তারপরে যদি তার বোকামি ধরা পড়ে, আবার বলি সে অষ্টম শ্রেণীও পাস করতে পারবে না। তার অর্থ এই নয় যে, প্রথম চ্যালেঞ্জটি অপ্রয়োজনীয় ও দ্বিতীয়টির সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা ২য় চ্যালেঞ্জ অষ্টম শ্রেণী পাস না করার চ্যালেঞ্জ দ্বারা এটি বোঝায় না যে, সে দশম শ্রেণী পাস করতে পারবে। বরং পূর্বেরটিকে আরো শক্তভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। তাই আগের চ্যালেঞ্জটি অপ্রয়োজনীয় বা সাংঘর্ষিক কোনোটিই নয়।

উপরন্তু এভাবে পর্যায়ক্রমে যদি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া যায় যে, পঞ্চম শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী এবং সর্বশেষ নার্সারিও পাস করতে পারবে না, তবে আগের কোনোটিই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় না বা ভুলবশত প্রমাণিত হয় না। বরং প্রথমেই নার্সারি পাসের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলে লোকটার অক্ষমতা যতটা প্রমাণিত হয়। এভাবে ধাপে ধাপে করার বক্তব্য তার চেয়ে অনেক বেশি পোক্ত ভিত্তির ওপর স্থান পায়। আল্লাহ্ সেটিই

করেছেন এভাবে বার বার চ্যালেঞ্জকে সহজতর করে। তাই যারা পূর্বের চ্যালে গুলো নিষ্প্রয়োজন মনে করেন তারা বুঝতে ভুল করেন। সমস্যা তাদের বোধগম্যতার। আরেকটি উদাহরণ দেয়া যায়, আল্লাহ তাআলা মাদকদ্রব্য গ্রহণ সম্পর্কে কোরআনে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে আদেশ দিয়েছেন। যেমন সূরা বাকারাহ-এর ২১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ـ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ـ

অর্থ : 'তারা জিজ্ঞাসা করে মাদকদ্রব্য সম্পর্কে। আপনি বলে দিন এতে কিছু উপকার আছে, তবে ক্ষতির পরিমাণ বেশি।'

এরপর সূরা নিসা-এর ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা দেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى ـ

অর্থ : 'হে মুমিনগণ তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতে দাঁড়িয়ো না।'

এভাবে আল্লাহ প্রথমে মদ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করে পরে সীমিত আকারে সেটি নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রথমে মদ সম্পর্কে যে সামান্য উপকারিতার কথা বলা হয়েছে, তা বাতিল হয়ে গেছে। না সেটাও সত্য, কিন্তু সালাতে সেটা অগ্রহণযোগ্য বলে নির্দেশ দেয়া হয়। আসলে সে সময় আরব সমাজে মাদক ও জুয়া এতো ব্যাপক ছিল যে, হঠাৎ সেটা বন্ধ করা সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারতো। এজন্যই ধাপে ধাপে করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এটি অন্যটির সাথে সাংঘর্ষিক তা নয়। শেষ পর্যন্ত সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে মাদকদ্রব্য পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করুন, কোনোটার সাথেই কোনোটি সাংঘর্ষিক হয় নি।

যদি আল্লাহ বলতেন, সালাতের সময় মাদকগ্রহণ করা যাবে না কিন্তু অন্য সময় গ্রহণ করা যাবে তাহলে সাংঘর্ষিক হতো। কিন্তু আল্লাহ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত নিষিদ্ধ করেছেন জেনে পেছনের কারণ তিনি জানতেন। তিনি আসলে শেষ পর্যন্ত কোনো আদেশ দেবেন। এজন্যই কোরআনের আয়াতগুলোর মধ্যে কোনো সাংঘর্ষিক অবস্থা থাকে না। ধরুন, আমি কোনো বন্ধুকে বললাম, নিউ ইয়র্কে যেও না। তারপর আবার বললাম ইউ.এস.এ যেও না। এরপর সর্বশেষ বললাম, আমেরিকা মহাদেশে যেও না, তবে আমার কোনো কথাই সাংঘর্ষিক নয়, কেননা আমি যখন আমেরিকা মহাদেশে যেতে বারণ করি তার মধ্যে ইউ.এস.এ. এবং নিউইয়র্ক দুটোই বিদ্যমান। তাই আগের দুটো আদেশও বলবৎ থাকে। কোনোটাই বাতিল হয় না। এভাবেই দেখা যায় কোরআনের আয়াতগুলোও সাংঘর্ষিক হয় না। আল্লাহ্ সূরা নিসা-এর ৮২নং আয়াতে বলেন,

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

অর্থ : 'তারা কি মনে করে কোরআন অন্য কারো কথা? তাই যদি হতো তবে কোরআনে এখতেলাফ তথা একই বিষয় নিয়ে সাংঘর্ষিক তথ্য থাকতো।'

কোরআনে এমন সাংঘর্ষিক তথ্য নেই বরং অতিরিক্ত তথ্য সমৃদ্ধ আয়াত থাকতে পারে। আশা করি সবাই বুঝেছেন।

২৩. কোরআন আরবিতে নাযিলের হেতু

প্রশ্ন ঃ ৩১৪। এরপরের প্রশ্নগুলো চিরকুট-এর মাধ্যমে সংগৃহীত। এ প্রশ্নটি হলো প্রথমতঃ পবিত্র কোরআন কেন আরবিতে নাযিল হলো এবং দ্বিতীয়তঃ আপনার ভাষ্য অনুযায়ী যেহেতু সব মুসলমানের শৈশব থেকেই আরবি শেখা উচিত, এ ব্যাপারে আই.আর.এফ. কী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, বিশেষত, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে?

উত্তর : হ্যা, প্রশ্ন হচ্ছে কোরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য হেদায়াত গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও কেন আরবিতে নাযিল হলো। উত্তরে অনেক কারণ বলা যায়। প্রথমত, কোরআন যে জাতির ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে তারা ছিল আরবি ভাষী। আল্লাহ্ তাআলা সকল ঐশী গ্রন্থই যে সম্প্রদায়ের ওপর নাযিল করেছেন সেই সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন, যেমন তাওরাত, যবুর যথাক্রমে হিব্রু ও ইউনানি ভাষায়। যে সম্প্রদায়ের ওপর অবতীর্ণ সেই সম্প্রদায়ই যদি না বুঝতে পারে তবে তারা গ্রহণ করবে কীভাবে?

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, কোরআন অবতীর্ণ যে নবীর ওপর সেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষাও আরবি। যদি কোরআন আরবি ভাষায় নাযিল না হয়ে অন্য কোনো ভাষায় নাযিল হতো যা মহানবীর মাতৃভাষা নয় তাহলে সে ভাষা যাদের মাতৃভাষা তারা আপত্তি তুলতো, আমাদের মাতৃভাষা আমাদের শেখাতে এসো না। এ আপত্তির উত্তর দেয়া বড় কঠিন হতো। এছাড়াও আরবি ভাষা একটি উন্নত ও জীবন্ত ভাষা। কোরআন যখন নাযিল হয় তখন পৃথিবীতে যেসব উন্নত ভাষা ছিল তা মৃতভাষা অর্থাৎ সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরের ভাষা। গুটি কতক গবেষকমাত্র সেসব ভাষা জানেন। অথচ আরবিতে এখনো কয়েক কোটি লোক কথা বলেন। এই যে, এতো বিশাল পরিমাণ লোক আরবিতে কথা বলেন, তারা আরবি বুঝেন। ফলে কোরআনও বুঝেন। আরবি ভাষার আরেকটি সুবিধা হলো এটি উন্নত ও সমৃদ্ধভাষা। এর ভাব প্রকাশের ক্ষমতা ব্যাপক। এমন অনেক শব্দ আছে যার অর্থ ১২-১৩টি পর্যন্ত আবার একই শব্দের খাস সমার্থক পাওয়া যায়।

ফলে ভাব, ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি মিল রেখে এ ভাষায় কোনো কিছু রচনা বেশি সার্থক হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, প্রথম নাযিলকৃত দুটি আয়াতের কথা, যা সূরা আলাক-এর ১ ও ২নং আয়াত,

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -

প্রথম শব্দ 'ইক্বরা' এর অর্থ পড়া, আবৃতি করা ও ঘোষণা করা। এরপর 'রব' শব্দের দ্বারা বুঝায় প্রভু, শাসনকর্তা ও সরবরাহকারী। তারপর আসুন 'খালাক' শব্দটির ব্যাপারে। এটির দ্বারা শুধু সৃষ্টি করাই বুঝায় না। পরিকল্পনা করা, নমনীয় করা ইত্যাদিও বুঝায়। এরপর আসুন সর্বশেষ শব্দ 'আলাক' এর সম্পর্কে– এ শব্দটির অর্থ জমাট রক্ত, আঠালো বস্তু প্রভৃতি বুঝায়।

এখন আমরা যদি ঠিকভাবে অনুবাদ করি তাহলে অর্থ দাঁড়ায় : 'পড়, আবৃতি কর, ঘোষণা করো তোমার প্রভু, মহান দাতার নামে। যিনি তৈরি করেছেন, পরিকল্পনা করেছেন এবং নমনীয় করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত, আঠালো পিণ্ড হতে।'

তাই দেখা যায়, 'আরবি' ভাষায় যে ব্যাপ্তি নিয়ে ভাব প্রকাশ করা যায় অন্য ভাষায় তা কল্পনাতীত। এজন্যই আমি আগেই বলেছি কোরআন তিলাওয়াতের বিভিন্ন পন্থা আছে। যথা : সাধারণ অর্থ বুঝে পড়া ও গভীর অর্থ বুঝে পড়া। সাধারণ অর্থসহ কোরআন তিলাওয়াত দ্রুতই শেষ করা যায়। কিন্তু গভীর অর্থ বুঝে কোরআন তিলাওয়াত করে শেষ করা কখনোই সম্ভব নয়।

আরবি ভাষায় কোরআন নাযিল হওয়ায় আরো সুবিধা হলো, এতে জায়গা কম লাগে। যেমন ধরুন 'মুহাম্মদ' শব্দটি। 'মিম', 'হা', 'মিম', 'দাল' মাত্র চারটি বর্ণ। অথচ ইংরেজিতে এম, ইউ, এইচ, এ. এম. এ, ডি অথবা এম, ও, এইচ, এ, এম. এ. এ ডি অর্থাৎ ৮টি বর্ণ দরকার। ফলে অন্য ভাষায় লিখতে স্থান, সময়, শক্তিকাল সবকিছুই বেশি লাগে। দেখা গেছে আরবি ভাষায় কোনো কিছু লিখলে যে পরিমাণ সময়, শ্রম, স্থান ও শক্তিকাল দরকার অন্য ভাষায় ঐ একই বিষয় লিখতে তার চেয়ে ৩ গুণ বেশি শ্রম, সময়, স্থান ও কালি প্রয়োজন হয়। এ সব প্রয়োজন ও সুবিধার কথা মাথায় রাখলে পবিত্র কোরআন আরবি ভাষায় নাযিল হওয়ার যুক্তি সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এর উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, যদি কেউ ফরাসি ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অত্যাবশ্যকীয় কিছু আবিষ্কার লিখে থাকেন, সেটা আমেরিকা বা অন্য দেশে ব্যবহার করা যাবে না। বরং ফ্রেঞ্চ ভাষা লিখে সেটি অনুবাদ করে সবদেশেই সব ভাষার লোকই ব্যবহার করতে পারবেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

প্রশ্ন ঃ ৩১৫। অনেকেই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' না লিখে '৭৮৬' লিখে থাকে। এটা কি ঠিক?

উত্তর : প্রশ্নটি হচ্ছে অনেক মুসলিম 'বিসমিল্লাহ্'--- পুরোপুরি না লিখে ৭৮৬ লিখে থাকে। এটা ঠিক কিনা? কিছু লোক আছে যারা আরবি বর্ণমালাগুলোকে নির্দিষ্ট মান দিয়ে সেগুলোর যোগফল বের করে ঐ সংখ্যা দিয়ে আয়াত বা দো'আ বা কোনো নাম নির্দেশ করার চেষ্টা করেন। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'-এর 'বা' 'আলিফ', 'সিন' এ বর্ণমালাগুলোর মান বসিয়ে তারা বের করেছেন ৭৮৬ আবার ৯২ দ্বারা বুঝান মুহাম্মদ ﷺ এভাবে আরো অনেক কিছু। কিন্তু এমন ব্যবহার কোরআন বা হাদীসের কোথাও পাওয়া যায় না। কিছু লোক তর্ক করে যে, আমরা যখন আরবি বর্ণমালা না পাই, তখন দাওয়াতপত্র ভিজিটিং কার্ড ইত্যাদি ছাপতে সংখ্যাগুলো লিখি। কিন্তু আমার কথা হলো, যদি আরবি ফন্ট বা লিপি না থাকে, তুমি ইংরেজিতেই বানান করে লেখ। আর যদি মনে কর তা বুঝবে না, তবে অনুবাদই লিখতে পারো যে, 'পরম করুণাময় দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।' এ সহজ উপায় থাকতে এমন কঠিন ও বিদঘুটে বিষয়ের প্রয়োজন কি?

আসলে বিভিন্ন সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন ধারণা বিভিন্ন সমাজে দেখা যায়। যেমন– পশ্চিমা সমাজে ১৩ সংখ্যাটিকে অপয়া ভাবা হয়। তারা বলে 'আনলাকি থার্টিন।' আবার তারা ৬৬৬ দ্বারা বুঝায় শয়তান। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে চোর, বাটপার, ফটকাবাজদের ৪২০ বলা হয়। এর অবশ্য কারণ আছে, ভারতীয় উপমহাদেশের সবদেশেই যদি কোনো চোর, বাটপার বা ফটকাবাজ ধরা পড়ে, তবে তাকে যে ধারায় শাস্তি দেয়া হয় সেটি পেনাল কোডের ৪২০ নং ধারায় বর্ণিত। তাই যদিও কারণ আছে, এটি বলা অনেকে না জেনেই এটি বলে থাকে। যেমন– দেখা যায় ভারত থেকে কেউ যুক্তরাজ্যে অধিবাসী হলে তাকে ৪২০ বলা হয়। অবশ্য যারা বলেন যে, বিভিন্ন বর্ণের অবস্থানগত মান যোগ করে ঐ শব্দের প্রতিনিধিত্বকারী সংখ্যা বের করেছেন, আমি তাদের সমর্থন করি না।

কারণ, একই মান দিতে পারে এমন সংখ্যা এমন দুটি শব্দের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। যার একটি ভালো অন্যটি খারাপ। সে ক্ষেত্রে আপনি কোনটি গ্রহণ করবেন? উদাহরণ দিই, যদি বলি ইংরেজি বর্ণের B-এর মান ১ এবং A -এর মান ৭ আর ধরুন D-এর মান চার। এখন যোগ করলে আমরা পাই ১২। অর্থাৎ BAD (খারাপ) এর সংখ্যাগত মান পেলাম ১২। এখন G এর মান ২, O এর মান ৩ এর D এর মান 8 ধরলে Good-এর মান কত পাই? দেখুন ২ + ৩ + ৩ + 8 = ১২ অর্থাৎ ভালো। তাহলে ১২-কে এখন ভালো বা মন্দ কোনটা নির্দেশক বলবো ? যদি

প্রথমটি মেনে বলি ১২ একটি মন্দ নির্দেশক তখন পরে আবার দেখলাম সংখ্যাটি যে মান ধরে নেয়া হয়েছে তা ভালোকেও নির্দেশ করে। তাই যারা 'বিসমিল্লাহ্'-এর বিভিন্ন বর্ণের মান বসিয়ে যোগফলকৃত সংখ্যা ৭৮৬ তাই এটি বিসমিল্লাহ্ প্রকাশক তাদেরকে বলি আরো এমন অনেক শব্দ ও বাক্য পাওয়া যাবে যাদের মান বসিয়ে যোগ করলে যোগফল ৭৮৬ পাওয়া যায়। সে শব্দ বা বাক্যগুলোর কিছু হবে ভালো নির্দেশক, কিছু হবে মন্দ নির্দেশক। তাই কোনো মুসলমানকেই সমর্থন করি না যখন সে বলে ৭৮৬ দিয়ে তিনি বিসমিল্লাহ্ প্রকাশ করতে চান। আশা করি সবাই বিষয়টি বুঝেছেন।

প্রশ্ন ঃ ৩১৬। আমি হিন্দু ভাইয়ের সম্পূরক প্রশ্ন দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করবো। হিন্দু ভাইটি প্রশ্ন করেছেন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা কাফেরদের মেরে ফেল ও নিষিদ্ধ কর" এর পটভূমি কি একটু ব্যাখ্যা করবেন? সূরা তাওবার "কিতাল আল কাফির"-এর আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : হিন্দু ভাই প্রশ্ন করেছেন সূরা তাওবা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে যে, তোমরা কাফেরদের কেটে বা মেরে ফেল। তাদের নিষিদ্ধ কর। সূরা তাওবার ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে ,

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ .

অর্থ : যেখানে তুমি কাফের ও মুশরিকদের পাবে, তাদেরকে সেখানেই মেরে ফেল।

এ আয়াতের উদ্ধৃতিটি ইসলামের বিভিন্ন সমালোচকগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে দিয়ে থাকেন। তসলিমা নাসরিনের মতো লোকেরা বলে, 'ইসলাম একটি উগ্রধর্ম' যেহেতু এটি কাফেরদের মেরে ফেলার কথা বলে। তারা আবার 'কাফির' শব্দের পর বন্ধনীর মধ্যে 'হিন্দু' শব্দটি উল্লেখ করে বুঝাতে চায় যেখানে হিন্দু পাবে সেখানে মেরে ফেল। তারা আসলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা ও অপচেষ্টা চালায়। বিভ্রান্তি সৃষ্টিই তাদের মূল উদ্দেশ্য। ধরুন আমেরিকার সাথে ভিয়েতনামের যুদ্ধ হচ্ছে। যখন যুদ্ধ চলছিল তখন আমেরিকার আর্মি জেনারেল বা প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দিলেন, যেখানে ভিয়েতনামীদের পাও মেরে ফেল। যেহেতু যুদ্ধাবস্থা, তাই এ নির্দেশ তিনি দিতেই পারেন। কিন্তু আজকে ঐ যুদ্ধের এতোগুলো বছর পরে যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বা আর্মি জেনারেল বলেন, যেখানে ভিয়েতনামী পাও মেরে ফেল, তবে তা হবে নরঘাতকতার শামিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি তা বলবেন না।

প্রথম আদেশটির পূর্বসূত্র ছিল। এজন্যই আয়াতটির পূর্বসূত্র জানা জরুরি। পূর্বসূত্র জানতে আগের আয়াতগুলোও পড়তে হবে। যখন আয়াতগুলো নাযিল হয় তখন

মুসলিম ও কাফিরদের মাঝে একটি শান্তিচুক্তি হয়েছিল যা কাফিররা একতরফাভাবে ভঙ্গ করে। তখন তাদেরকে চার মাসের সময় দেয়া হয়। তাও যখন তারা মুসলমানদের ঘর থেকে বের করে দিতে থাকে এবং হত্যা করতে থাকে তখন এ আয়াত নাযিল করে যুদ্ধে নামার কথা বলা হয়। তাই আয়াতটি যুদ্ধাবস্থায় প্রযোজ্য যখন মুসলমানদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয় এবং হত্যা করা হয় সেই অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু যারা বিভ্রান্তি ছড়ায় তারা শুধু এ আয়াত অর্থাৎ ৫ নং আয়াত বলে ৭নং আয়াতে লাফ দেয়। তারা ৬ নং আয়াত পড়ে না। কেন পড়ে না? তাহলে বিভ্রান্তি ছড়ানো অসম্ভব হতো তাই। কেননা ৬নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'যদি কাফের এবং মুশরিকদের যে কেউ আশ্রয় চান তবে আশ্রয় দাও।' কোরআন এখানেই ক্ষান্ত হয় নি। আরো অগ্রসর হয়ে বলেছে, "নিরাপত্তার সাথে তাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাও। যাতে তারা আল্লাহর বাণী শুনতে পারে।" কোরআন বলে নি যারা আশ্রয় চাইবে তাদের শুধু মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে তাদের মতো করে ছেড়ে দাও। বরং আদেশ দিয়েছে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করার।

আমাকে বলুন, আজকের দিনের কোন আর্মি জেনারেল তার সৈন্যদের বলবে যে, তোমাদের শত্রুরা আশ্রয় চাইলে নিরাপত্তা দিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। কোনো আর্মি জেনারেলই বলবে না। অথচ কোরআন নির্দেশ দিয়েছে কাফের বা মুশরিকরা যদি আশ্রয় চায় তবে তাদের নিরাপত্তাই শুধু দিবে না বরং নিরাপত্তার সাথে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে হবে। যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছিল তখন নির্দেশ করা হয়েছে তোমরা ভয় পেও না। যারা তোমাদের ঘর থেকে বের করে দিয়েছে তাদের খুঁজে বের কর ও হত্যা কর। আবার এটাও নির্দেশ দিয়েছে যে আশ্রয় চাইলে নিরাপত্তার সাথে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাও। তাই ইসলাম মুসলিমদের যে পরিমাণ হৃদ্যতার প্রতি উৎসাহ দেয় যে, কোনো সংস্থা UN হোক বা মানবাধিকার সংস্থাই হোক যাদের কথা সব সময় বলা হয় তারা যেসব অধিকারের কথা বলে তা কোরআনপাকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বলে এসেছে।

আজ 'হিউমান রাইট',' উইমেন রাইটস' সম্পর্কিত সব সংস্থা বলে 'শান্তি চাই', 'শান্তির সাথে বাঁচতে চাই'। এ শান্তির কথা বহু আগেই কোরআনে এসেছে। যদিও এ শান্তির কথা কোরআন থেকে নেয়া এবং এটা মুসলিমদের পবিত্র গ্রন্থ, তাই তারা এটার কোনো উদ্ধৃতি দেয় না। আজকে হিউম্যান রাইটসের প্রবক্তারা যে কথা বলছে যে মানুষের লিঙ্গ, গোত্র, বর্ণ, ইত্যাদির পার্থক্য করা উচিত নয়। সবাই সমান মর্যাদা প্রাপ্য সেটা কোরআনই সর্বাগ্রে বলেছে। তাই এটি আবদ্ধ করে রাখা উচিত নয়। বরং পৃথিবীর প্রতিটি ভাষায় এটি অনুবাদ করে বিনা মূল্যে বিতরণ করা উচিত।

আমি মহান আল্লাহ্র দরবারে এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে, আজকের অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে শেষ করতে পেরেছি। আই.আর.এফ-এর পক্ষ থেকে অতিথি ও শ্রোতা ভাই-বোনদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ধৈর্যের সাথে শোনার জন্য। আমরা মিডিয়া ধারণের কলাকুশলীদেরও ধন্যবাদ জানাই।এছাড়া স্বেচ্ছাসেবক, আয়োজক সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করি জাকির নায়েকের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আবারও দেখা হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

প্রশ্ন : ৩১৮। আমি আল্লাহ্র রাস্তায় ফুলটাইম বা সার্বক্ষণিক দায়ী ইলাল্লাহ্ হতে চাই। এখন আমি কি করতে পারি বা কোথায় যাওয়া উচিত? আবার যদি কেউ তার সন্তানকে সার্বক্ষণিক দায়ী ইলাল ইসলাম করতে চান তবে তিনি তার সন্তানকে কিভাবে গড়ে তুলবেন?

উত্তর : আল-হামদুলিল্লাহ্, কেউ যদি নিজে ফুলটাইম দায়ী ইলাল্লাহ্ হতে চায় তবে তাকে স্বাগতম। তবে তাকে কি করতে হবে তা সরাসরি বলা সম্ভব নয়। কারণ তার অবস্থান কোথায় বা তার আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ও অজানা। যদি তিনি বম্বের হন তবে আলহামদুলিল্লাহ। এখানে দাওয়াহ্ সেন্টার আছে যেখান থেকে তিনি প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। বোম্বে ছাড়াও জেদ্দা সহ বিভিন্ন স্থানে অনেক দাওয়াহ্ সেন্টার আছে সেখানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আবার নিজের এলাকায় ফিরে আসতে পারেন দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দেয়ার নিমিত্তে।

আমাদের এখানে, বোম্বে, শিশুদেরও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। যারা পার্টটাইম দায়ী হিসাবে কাজ করতে চায় তাদের জন্য সপ্তাহের তিনদিন– শনি, রবি, সোম, বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এখানে থাকে প্রশ্নোত্তর পর্ব যা থেকে প্রশিক্ষন গ্রহণকারীগণ নিজে থেকে উত্তর দেবার উপায় খুঁজে পায়। এই প্রশিক্ষণ পর্বে বিভিন্ন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পার্টটাইম দায়ী হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তাছাড়া ফুলটাইম দায়ীদের বিভিন্ন বিষয় এমনকি কথা বলার সময় মাইক্রোফোনে কতটুকু দূরে থাকবে সে প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। মনে রাখবেন ফুলটাইম দায়ী অর্থ ফুলটাইম ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য যেমন ফুলটাইম কোর্স সম্পন্ন করতে হয় তেমনি ফুলটাইম দায়ী হওয়ার কোর্স করতে হয়। এখানে শেখানো হয় কিভাবে যৌক্তিকভাবে প্রশ্নোত্তর করতে হয়। কিভাবে কোরআন থেকে হাদিস থেকে, বাইবেল থেকে ইঞ্জিল থেকে কোটেশন নিতে হয়। এগুলো কিভাবে মুখস্ত করতে হয়।

আমাদের বোম্বে দাওয়াহ সেন্টারে, আল হামদুলিল্লাহ্, ৬-৭ জন ফুলটাইম দায়ী বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, বিভিন্ন বিষয় মুখস্ত করেছেন যার দ্বারা তারা জেদ্দায় গিয়ে ভালভাবে দাওয়াতের কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন। বোম্বেতে ছেলে-মেয়েদের

জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ খোলা হচ্ছে দাওয়াতের প্রশিক্ষণের জন্য এবং একই সাথে শিশুদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ বিভাগ। আমরা শিশুদেরকে একদম প্রথম পর্যায় থেকেই ইসলামী প্রশিক্ষণ দিতে চাই। অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে শুরুতে ডলার বা অর্থ উপার্জনের রাস্তা দেখায় আমরা সেখানে পূর্ণ উপার্জনের পথও বাতলে দেব। শিশুদের জন্য বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামী মনোভাব গড়ে তোলা হবে। মনে রাখবেন, ইহলোকিক লাভ-ক্ষতির জ্ঞান যেমন প্রয়োজন পারলৌকিক লাভ-ক্ষতির জ্ঞানও তেমনি অপরিহার্য। আমরা শিশুদের কোন একটি নয় বরং উভয়ের মিশ্রণে পূর্ণাঙ্গমানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। সে ভাবেই একটি বিভাগ খোলা হবে যা থাকবে সম্পূর্ণ শিশু বিষয়ক। আশা করি উত্তর দেয়া হয়েছে। ধন্যবাদ।

প্রশ্ন : ৩১৯। আসসালামু আলাইকুম। আমি ওমর ফারুক। আমার তিনটি প্রশ্ন আছে। তার মধ্যে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যখন খ্রিস্টানরা যিশুকে মুহাম্মাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে তখন কি যুক্তিতে তাদের জবাব দেয়া যায়?

উত্তর : দেখুন, আপনি তিনটি প্রশ্নের কথা বলেছেন। কিন্তু এখানে অনেক মানুষের প্রশ্ন করার আছে। তাই প্রথমে শুধু প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেব এবং সবশেষে সময় থাকলে বাকীগুলোরও জবাব পাবেন। আগেই বলা হয়েছে খ্রিস্টানরা বিভিন্নভাবে অমুসলিমদের বিভ্রান্ত করার জন্য বলে যে, যীশু মুহাম্মদ ﷺ থেকে শ্রেষ্ঠ। তারা বলে মুহাম্মদ ﷺ এর পিতা মানুষ কিন্তু যীশুর পিতা স্বয়ং খোদা। তাদের আপনি বলুন সূরা আলে-ইমরানের ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন–

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ـ

অর্থ : আল্লাহ্র নিকট নিশ্চয় ঈসার দ্রষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সাদৃশ। তিনি তাকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন; অতঃপর তাকে বলেছিলেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেল।

তাহলে কোরআন বলছে ঈসা আল্লাহ্র সন্তান নয় বরং আদমের মত মাটি থেকে সৃষ্ট। আর আল্লাহ্ যদি আদমকে মাতা-পিতা উভয়হীন থেকে সৃষ্টি করতে পারেন তবে ঈসা বা জেসাসকে শুধু মাতা থেকে সৃষ্টি করতে বাধা কোথায়? অতএব, তিনি যে আল্লাহ্র পুত্র নন এবং এর সুবাদে মুহাম্মদ ﷺ থেকে শ্রেষ্ঠ নন এটি প্রমাণিত। এখন তাদের কেউ কেউ বলেন যে, মুহাম্মদ ﷺ এর পিতা ও মাতা উভয় থেকে স্বাভাবিকভাবে জন্ম নিয়েছেন অথচ যীশু বা জেসাস বা ঈসা যাই বলি না কেন তাকে শুধু মাতা থেকে বিশেষভাবে জন্ম দিয়েছেন তাই তিনি মুহাম্মদ ﷺ থেকেও বিশেষ

সম্মানের অধিকারী। তাদেরকে এর জবাবে যুক্তি তুলে ধরে বলতে পারেন মাতা-পিতা কার উপস্থিতিতে জন্ম নিল এটা যদি বিশেষত্বের বা সম্মানের মাপকাঠি হয় তবে তো আদম (আ) সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী কারণ তিনি সৃষ্ট না পিতা থেকে না মাতা থেকে কিন্তু ঈসা (আ) তো মাতা হলেও আছেন। তবে কি তারা এটা মানেন যে ঈসা (আ) থেকে আদম (আ) শ্রেষ্ঠ? যে যুক্তিতে মুহাম্মদ ﷺ থেকে ঈসা (আ)কে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে সেই যুক্তিতে আদম (আ)কে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিতে বাধা কোথায়? তবে কি তাদের যুক্তি অযৌক্তিক নয়? এছাড়াও তাদের ধর্ম গ্রন্থে সলোমন নামক রাজার উল্লেখ আছে যারও পিতা-মাতা সন্তান কিছুই নাই। তারা কি তাকেও ঈসা (আ) বা যীশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেবে? যদি তারা তাদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ব্যক্তিকেই নিজেদের যুক্তি অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ বলে মেনে না নেয় তবে আর সে যুক্তিকে মূল্য দেয়ার কোন অর্থ হয় না।

এখন ধরুন তাদের দ্বিতীয় যুক্তির কথা যেখানে তারা বলে পবিত্র কোরআনে ঈসা (আ) এর নাম এসেছে পঁচিশ বার অথচ মুহাম্মদ ﷺ এর নাম এসেছে মাত্র পাঁচ বার। অতএব মুহাম্মদ ﷺ থেকে ঈসা (আ) শ্রেষ্ঠ। তাদের এ দাবী একেবারেই অযৌক্তিক। আমরা তখনই কারো নাম নেই যখন সে অনুপস্থিত থাকে। যখন ব্যক্তি উপস্থিত এবং তার সাথেই কথা বলা হয় তখন বার বার নাম না বলে তুমি, আপনি, বন্ধু বা অন্যান্য গুণাবলি বেশী উল্লেখ করে সম্বোধন করা হয়। কেননা যার সাথে কথা বলা হচ্ছে তার নাম বার বার উচ্চারণের প্রয়োজন খুব একটা বেশী থাকে না। কোরআন যেহেতু মহানবী ﷺ-এর উপরই নাজিল হয়েছে তাই যখন তার প্রসঙ্গ এসেছে তখন হে নবী, হে রাসূল, হে পথ প্রদর্শক ইত্যাদি বিশেষণে তাকে ডাকা হয়েছে। কেননা তিনি স্বয়ং উপস্থিত আছেন বলে নাম উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় ও বেমানান।

কিন্তু কোরআনে যখন ঈসা (আ), মূসা (আ)-এর বিবরণ এসেছে তখন তারা উপস্থিত নয়, তাই তাদের নাম উল্লেখই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সর্বতভাবে যদি মুহাম্মদ ﷺ ও ঈসা (আ) এর উল্লেখ গুণে দেখা যায় তবে মুহাম্মদ ﷺ অবশ্যই অগ্রগণ্য। তবে আসল কথা হচ্ছে কার নাম কতবার আসলো সেটা সম্মান পরিমাপের মাপকাঠি নয়।

এখন দেখি তাদের পরবর্তী যুক্তি। অনেক মিশনারী বলে মুহাম্মদ ﷺ কি কোন মৃতকে জীবিত করেছেন? অথচ ঈসা মসীহ মৃতকে জীবিত করেছেন। অতএব যীশু বা ঈসাই শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, মহানবী ﷺ-এর অসংখ্য মুজিজা আছে তবে মৃতকে জীবিত করার কোন মুজিজা নাই। কিন্তু ঈসা (আ) যখন মৃতকে জীবিত করেছিলেন সেটা হয়েছিল بِإِذْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে। আসলে সকল মু'জিজা

তা নবীই করুন না কেন সেটা আল্লাহ্র অনুগ্রহেই হয়ে থাকে তাই এখানে নবী বা রাসূলের শ্রেষ্ঠত্বের কোন বিষয় নাই। সকল মু'জিজাই আল্লাহ্র কুদরত। এনিয়ে মর্যাদার প্রশ্ন তোলা অযৌক্তিক। এখানে মহিমা আল্লাহ্র দিকে ধাবিত। এটি কোরআন ও বাইবেল উভয় স্থানেই স্বীকৃত। গসপেল অব জোয়ান-এ বলা হয়েছে–

"ও গড, এর সবকিছুই তুমি করেছ, সব কুদরত তোমার।"

তাই মিরাকল বা মুজিযা যা ঘটে তার পূর্ণ মহিমা কুদরত ও শান আল্লাহ্র দিকে ধাবিত। যে ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর এ কুদরতি শক্তি জাহির করেন তার মধ্যে নয়। সে তো নিছক একটি মাধ্যম।

প্রশ্ন : ৩২০। খ্রিস্টান মিশনারীরা দরিদ্র লোকদের বিভিন্নভাবে ধোঁকার মাধ্যমে খ্রিস্টান করছে। মুসলিমগণও কি তাই করবে?

উত্তর : খ্রিস্টান মিশনারীগুলো গরীব মানুষকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে খ্রিস্টান বানাচ্ছে। এটা অনৈতিক। আল্লাহ্ মুসলিমদেরকেও কালো-সোনা বা পেট্রো ডলার দিয়েছেন। আমরা কি সে অর্থ দাওয়াহ ইলাল্লাহের জন্য ব্যয় করছি? আমি বলছি না খ্রিস্টানদের মত ধোঁকাবাজী বা চালবাজী করার কথা কেননা ইসলাম সত্য। আমি বলছি দাওয়াত ইলাল্লাহ্ এ অর্থ খরচের কথা।

খ্রিস্টান মিশনারীগুলো যদি মিথ্যাকে ছলাকলার আবরণে চালিয়ে অনেককে খ্রিস্টান করতে পারে আমরা কেন সত্যের দাওয়াত দিতে সময় ও অর্থ ব্যয় করছি না? দেখুন, এখন খ্রিস্টান মিশনারীগুলো শুধু দরিদ্রদের মাঝেই নয়, বিভিন্ন বেশে, ছদ্মাবরণে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে প্রভাবিত করছে। তারা যদি উন্নত দেশের সকল আরাম আয়েশ ত্যাগ করে এসব অনুন্নত দেশে আসতে পারে, আমরা পারি না কেন? মুসলমানদের মধ্যে কতজন দাওয়াত এর ফরজ কাজটি করার জন্য এভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছে? দু'চারজন যে নাই তা নয়, তবে তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। আমাদের অবশ্যই নৈতিকতার সাথে দাওয়াত ইলাল্লাহ্র নিমিত্ত অর্থ খরচ করতে হবে। আশা করি বিষয়টি এখন পরিষ্কার।

প্রশ্ন : ৩২১। আমি খলিলুর রহমান। আমি একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন করবো। বি, জে, পি দিনের পর দিন জনপ্রিয় হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে আমরা এটি রুদ্ধ করতে পারি দয়া করে বলবেন কি?

উত্তর : আজকের আলোচ্য বিষয় "দাওয়াহ" আমি এ বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তর দিতে আগ্রহী। তাছাড়া রাজনৈতিক বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছিও না। তবুও আপনার প্রশ্নের উত্তর দাওয়াহ্ এর দৃষ্টিকোণ থেকে কোরআন হাদীসের আলোকে দেয়ার চেষ্টা করছি। প্রথমত দাওয়াহ পৌঁছাতে হবে সকলের কাছে তা সে বি, জে,

জীবনে ইসলামের পূর্ণ আমল আনতে হবে। দ্বিতীয়ত দাওয়াতের আঞ্জাম করতে হবে। তাহলে তৃতীয় বা চূড়ান্ত পর্যায় "ইক্বামাতে দ্বীন"অনেক সহজ হয়ে যাবে। তা না করে যতই রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে চান শক্তিতে পেরে উঠা যাবে না। তখন কুটচালের ভাষায় বলতে হবে– 'রাম মানে ইসলাম' এটা অনেক মুসলমান রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য বলে, কিন্তু 'এটা সিরাতাল মুস্তাকিম' বা সহজ সরল পথ নয়। বরং তা থেকে অনেক দূরে। তাই দাওয়াহকে প্রাধান্য দেয়াই আমাদের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত, আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

প্রশ্ন : ৩২২। আমি গত সাবান মাসে শুনেছিলাম অমুসলিমরা যেসব বিষয় নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তার জবাবে বই লিখবেন। বইটি কি বের হয়েছে?

উত্তর : দেখুন, অমুসলিমরা ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করে থাকে তার সংখ্যা পনের থেকে বিশের অধিক হবে না। তাদের সামনে যদি এই অভিযোগগুলো যেমন একাধিক বিবাহ, নারীর অধিকার ইত্যাদির জবাব দেয়া যায়, তবে ৯০% অমুসলিমের ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার আর কোন সুযোগ বা বাহানা থাকবে না। এ উদ্দেশ্যে আমি বই লেখা শুরু করেছিলাম। তবে বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে হয়ে ওঠেনি। প্রেস এর ঝামেলাও কম নয়। তবে যত ব্যস্ততা বা সমস্যাই থাকুক না কেন আগামী দু' এক মাসের মধ্যে ইনশাল্লাহ বইটি প্রকাশ করা হবে। আসলে এটি প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রথম কাজ হবে অভিযোগগুলো খণ্ডন করা। তা না করে ইসলামের যত গুণাবলীই তাদের সামনে তুলে ধরুন না কেন তা তাদের মনপুত হবে না। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত অভিযোগ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের ভাল গুণগুলো তার সামনে স্পষ্ট হবে না। ফলে ইসলামের বিরোধিতাও বন্ধ করা যাবে না আর বলবে মুসলমানেরা অনেক বিবাহকারী ও নারী অধিকার হস্তক্ষেপকারী ইত্যাদি।

অতএব ইসলাম সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ আছে সেগুলো খণ্ডন করে যদি আমরা নিজেদেরকে ইসলামী আমালের মাধ্যমে ইসলাহ আনতে পারি এবং সঠিকভাবে দাওয়াত আঞ্জাম দিতে পারি তবে অবশ্যই আমরা সফল হব। দেখুন দাওয়াহ এবং ইসলাহ বা পরিশুদ্ধ হওয়া পারস্পরিক জড়িত বিষয়। যখন আপনি দাওয়াহ শুরু করবেন ইসলাহ আপনা আপনি এসে যাবে। আপনি কাউকে যখন সালাতের দিকে আহ্বান করবেন তখন আপনি নিজে সালাত নিয়ে কখনই গাফিলতি করতে পারবেন না। আপনার মন আপনাকে বলবে আমি নিজেই মানুষকে সালাতে আহ্বান করি তবে আমি কিভাবে সালাতের ব্যাপারে শিথিলতা দেখাব? আমি গাফিলতি করলে ওরা কি বলবে?

পি হোক আর যেই হোক। মহানবী ﷺ কি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করেন নি যে কট্টর মুসলিম বিরোধী দু'জনের যেকোন একজনকে ইসলামে দাখিল করতে? সেই দোয়া কবুলের পর ইসলামের মহা শত্রু কি মহা বন্ধু হয়নি? তাহলে আমরা কেন ভাবতে পারি না যে, আজ যারা ইসলাম ও মুসলিমদের মহাশত্রু তারা সঠিকভাবে দাওয়াহ ইলাল্লাহ্‌ বা দাওয়াহ ইলাল ইসলাম পেলে হয়তো বা একদিন আমাদের মহাবন্ধুও হতে পারে। অতএব দাওয়া-ই হল সর্বোত্তম উপায়।

দেখুন, আমরা মুসলিমরা অনেক দলে-উপদলে বিভক্ত। আমরা কেউ বা হানাফী, কেউবা শাফেয়ী, কেউবা শিয়া, কেউবা সুন্নী ইত্যাদি বহু দল-উপদলে বিভক্ত। কিন্তু যখনই কোন সাম্প্রদায়িক হামলা হয় তখনই আমরা সকল মুসলমান এক হওয়ার সুযোগ পাই যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আদেশ–"তোমরা সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জু ধর, কখনও বিচ্ছিন্ন হইও না" এটি পালন করতে পারি। তাই কোন রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয় হওয়া দেখে মুসলিমদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বরং আমরা যদি তাদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছাই তবে তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আমাদের বন্ধুও হতে পারে। বাকী যারা থাকবে হয়তো তারা অত্যাচারের মাত্রা বাড়াতে পারে তবে তাতে মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য আসবে যা তাদের ইসতিকামাহ (ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকা) এ সাহায্য করবে। আর যদি দাওয়াহ ও ইসতিকামাহ একসাথে হয়ে যায় তবে আর ভয় কিসের? আল্লাহ্‌ চাহেতো এ দু'টি ধাপ পার হওয়ার পর তৃতীয় ধাপ তথা ইসলামী রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা হতে পারে। অতএব ভীত না হয়ে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করাটাই এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ।

তাছাড়া আপনি কিভাবেই বা থামাতে পারবেন তাদের? যদি আপনি বলেন– 'এই বি, জে, পি থাম' তবে কি তারা থামবে? কখনও থাকবে না। আর আপনি প্রতি আঘাত করতে যান তবে নিশ্চিত শক্তিতে পারবেন না। অতএব হিকমাহ বা কৌশলই আসল পন্থা। তাদের গ্রন্থ সমূহ যেমন গীতা, রামায়ন, পুরান ইত্যাদি পড়ুন। অসামঞ্জস্যগুলো তাদের কাছে তুলে ধরুন তবে অবশ্যই যারা বুদ্ধিমান তারা ইসলামের ছায়াতলে আসবে। আবার সবাই যে আসবে এমনটাও নয়। আপনার দায়িত্বও নয় সবাইকে ইসলামের পতাকাতলে দাখিল করানো। আল্লাহ্‌ বরং নির্দেশ দিয়েছেন–

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ـ

"তুমি তাদের সতর্ক কর। তুমি শুধু সতর্ককারীই।"

অতএব সতর্ক করা পর্যন্তই আপনার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করলে ইক্বামাতে দ্বীন অবশ্যই সম্ভব। তবে এর আগে দু'টি কাজ করতে হবে। প্রথমত নিজেদের

এই ধরনের আত্মবিশ্লেষণ আপনাকে সালাতের ব্যাপারে অধিক যত্নশীল হতে সাহায্য করবে। একইভাবে শুধু আমল নয় 'ইলম'বা ইসলামী জ্ঞান অর্জনেও আপনাকে উৎসাহিত করবে দাওয়াহ এর কাজ। যখন আপনি কোন অমুসলিমকে দাওয়াহ ইলাল-ইসলাম পৌঁছে দিতে যাবেন তখন সে ইসলামী সম্পর্কে বিভিন্ন নেতিবাচক দিক তুলে ধরবে। এ পর্যায়ে আপনি এ বিষয়গুলোর জবাব খুঁজতে নিজে থেকেই প্রবৃত্ত হবেন। তখন আপনি ভাববেন কিভাবে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। নিজে না পারলে অন্যের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করবেন এবং পথ পেয়ে যাবেন।

এ জন্য ইসলাহ্ বা সংশোধন এবং ইলম বা জ্ঞান অর্জন এ দুটোর জন্য বসে না থেকে আজ থেকেই দাওয়াহ এর কাজ শুরু করুন। দেখবেন ইসলাম ও ইলমের মান্‌জিলে মাকসুদে আপনি কত দ্রুত, কত সহজে পৌঁছে গেছেন। আমার এ সম্পর্কিত লেখা বইগুলো এখনও প্রিন্টিং এর শেষ পর্যায়ে আসেনি। এর মধ্যে জেদ্দা মুম্বাই বার বার দৌড়ানোর কারণেও দেরী হয়েছে। ইনশাল্লাহ অতি সত্তর এসে যাবে। আপনারা দোয়া করুন।

প্রশ্ন : ৩২৪। তাহলে আপনি বলতে চান মুসলমানরা কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর মুখস্ত করবে আর সবাইকে এটি বুঝাবে তাদের ইবাদতের আর কোন প্রয়োজন নাই? আল্লাহ্ কি আমলের কথা বলেননি?

উত্তর : আমলকে বাদ দেয়ার তো কোন সুযোগই নাই। আগেই সূরা আসর থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যার মধ্যে চারটি শ্রেণীর লোক বাদে অন্য সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও 'সৎ আমালের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমি যা বলছি তা হলোএই চারটি বিষয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। শুধু সৎ আমল নিজে করলাম আর দাওয়াহ এর কাজ থেকে বিরত থাকলাম তাহলে হবে না। অথবা আমি সৎ আমল করি না তাই কিভাবে দাওয়াহ এর কাজ করবো এমন অজুহাতও গ্রহণযোগ্য নয়। অথবা আগে নিজে সৎ আমল করে অভ্যস্ত হই তারপর দাওয়াতী কাজ করবো এমনটাও বলা যাবে না। বরং আপনাকে দুটো কাজই এক সাথে করতে হবে। আর যখন আপনি দাওয়াতের কাজের আঞ্জাম দেবেন তখন সৎকর্ম করা দু'ভাবে সহজ হবে। প্রথমত নিজে যখন মানুষকে দাওয়াহ ইলাল্লাহ্ করবেন তখন সৎকর্ম না করাটা আপনার মন সায় দেবে না। দ্বিতীয়ত দাওয়াহ্ এর কাজ করলে ইসলাম, ঈমান, কোরআন, হাদিস ইত্যাদির উপর বিশ্বাস এতই গভীর ও স্থির হবে যে নেক আমল বা সৎ কর্ম আপনি ছাড়তেই পারবেন না।

আপনি যখন কাউকে প্রমাণ করে দেবেন কোরআন সত্য তখন কিভাবে কোরআনের সেই আদেশ অবহেলা করতে পারবেন যেখানে মদ নিষিদ্ধ করা

হয়েছে? তাই পূর্বে যদিও আপনার মধ্যে এ্যালকোহলের অভ্যাস থেকে থাকে যে মুহূর্তে আপনি কোরআনের সত্যাসত্য হাতে কলমে প্রমাণিত করবেন তখন আর এ্যালকোহল গ্রহণ আপনার দ্বারা সম্ভব হবে না। আমাদের দাওয়াত সেন্টারের অনেক সদস্য যারা জীবনে সালাত আদায় করেন নি এখন দাওয়াত ইলাল্লাহ্ শুরু করায় পাক্কা মুসলিম হয়ে গেছে। এভাবে একটি অন্যটিকে সহজ করে দেয়। একটির অপেক্ষায় অন্যটি ছেড়ে দেয়ার কোন সুযোগ নাই আমি তাই বলছি। আমি বলছি না সৎ কর্মের প্রয়োজন নাই। বরং উভয়টিই ফরজ এবং সমান গুরুত্বের দাবীদার। আশা করি বিষয়টি পরিষ্কার।

প্রশ্ন : ৩২৫। আপনি বলছেন দাওয়াহ আর ইসলাহ্ বা সংস্কার এক সাথে চালাতে। অনেক খ্রিস্টান বলে– আমরা ইসলামকে ঘৃণা করি না মুসলিমকে ঘৃণা করি। এতে কি প্রমাণিত হয় না ইসলাহ্ আগে প্রয়োজন?

উত্তর : ইসলাহ্ অবশ্যই প্রয়োজন। আমি সৎকর্মের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করছি না। আমি যা বলছি তা হলো ইসলাহের অজুহাতে দাওয়াহ এর কার্যক্রম বন্ধ থাকতে পারে না। আর যারা বলে যে তারা ইসলামকে ঘৃণা করে না মুসলিমকে ঘৃণা করে তাদের বলুন যে আমরা তাদেরকে ইসলামের পথে ডাকছি মুসলিমের পথে নয়, আমরা বলছি ইসলাম গ্রহণ করুন ও ইসলামের বিধান অনুসরণ করুন। আমরা কি বলছি মুসলমানকে অনুসরণ করুন? আপনি যখন তুলনা করবেন তখন ইসলামের সাথে খ্রিস্টান ধর্মের, ইসলামের সাথে হিন্দু ধর্মের। মুসলিমের সাথে খ্রিস্টানের নয় বা মুসলিমের সাথে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর নয়। মনে করা যাক, আপনি একটি নতুন মার্সিটিজ গাড়ি কিনলেন ও ড্রাইভার নিয়োগ দিলেন। এখন ড্রাইভারের অজ্ঞতায় বা অপরিপক্কতায় গাড়িটি দুর্ঘটনার শিকার হল। এখন কি আপনি মার্সিটিজ কোম্পানির দোষ খুঁজবেন না কি ড্রাইভার বা চালক বদল করবেন? অবশ্যই চালক বদল করবেন। অতএব কোন মুসলিমের অবস্থা দেখে আপনি ইসলামকে দোষারোপ করতে পারেন না।

পৃথিবীতে ধর্ষণের ঘটনা সবচেয়ে বেশী ঘটে কোথায়? পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে অর্থাৎ খ্রিস্টান প্রধান দেশগুলোতে। তাই বলে কি আপনি বলবেন খ্রিস্ট ধর্ম ধর্ষণের জন্য দায়ী? খ্রিস্ট ধর্মতো ধর্ষণকে নিষিদ্ধ করেছে। এ কারণে কোন ধর্মের মানুষ দেখে ঐ ধর্মকে জানা বা বুঝা যায় না। আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করার মত, তারা যখন মুসলমানদের দোষ ধরে ইসলামকে দোষারোপ করে এবং এক্ষেত্রে মুসলিমদের মধ্যে যে অংশটি খুবই দুর্বল তাদের উদাহরণ দেয়। কিন্তু নিয়ম তো এটি নয়। আপনি উৎকৃষ্ট হিন্দুর সাথে উৎকৃষ্ট মুসলিমের তুলনা করে দেখুন কারা উত্তম। খ্রিস্টানদের উৎকৃষ্ট অংশের সাথে মুসলমানদের উৎকৃষ্ট অংশের তুলনা করে

দেখুন কারা শ্রেষ্ঠ। এটি না করে মুসলিমগণের নিকৃষ্ট অংশকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে ইসলামের বিরুদ্ধাচারণের বিষয়টি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? যদি নৈতিকতার বিচারে সামগ্রিকভাবে দেখেন তবে দেখবেন সমষ্টিগতভাবেও মুসলিমগণ এগিয়ে, মদ, ধর্ষণ, বেহায়াপনা ইত্যাদিতে সামগ্রিকভাবে মুসলিমগণ অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বী থেকে অনেক ভাল অবস্থানে আছে। তাই তারা ইসলাম নিয়ে যে সব অভিযোগ করে থাকে যেমন বহু বিবাহ, নারী অধিকার ইত্যাদি নিয়ে যদি আমরা যৌক্তিকভাবে ইসলামের অবস্থান তুলে ধরতে পারি তবে অবশ্যই তারা হয় নিশ্চুপ থাকবে অথবা ইসলাম গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন : ৩২৬। অনেক মুফতি বলে থাকেন 'দাওয়াহ' ফরজে কিফায়া। জানাযাহ এর সালাত যেমন কয়েকজন পড়লেই পুরো সম্প্রদায় থেকে করা হয়েছে এমন বুঝায় তেমনি কয়েকজন মুসলিম ব্যক্তি যদি দাওয়াত এর কাজ করে থাকে তবে সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে হয়ে যাবে। এর পক্ষে তারা সেই আয়াতটি উল্লেখ করে যা আপনিও উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে একদল লোক থাকবে যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকবে। এখানে 'একদল' মুসলিমের কথা বলা হয়েছে সবার কথা নয়। দাওয়াহ যে সকলের উপর ফরজ নয় এর পক্ষে ঐ মুফতিগণ আরও যুক্তি দেন যে হাদিসে আসছে ইসলামে ফরজ পাঁচটি যথা ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত। তারা আরও যুক্তি দেন ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম তাই সবাই দাওয়াতের কাজ করবে এটা স্বভাব বিরুদ্ধ। এভাবে তারা নানা যুক্তি দেয়। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন?

উত্তর : প্রথম কথা হচ্ছে মুফতি কোন দলীল নয় বরং দলীল কুরআন ও হাদীস। আপনি বলছেন কিছু মুফতি বলেন এটা এমন ইত্যাদি। আমি যদি বলি অনেক মুফতি বলেন দাওয়াহ ফরজ তখন আপনি কি করবেন? এজন্য বলছি মুফতি নয় বরং কোরআন ও হাদীস আমাদের প্রথম স্থান যেখান থেকে সমাধান পাব। আপনার মুফতিগণ বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরেছেন। এবার আসা যাক যুক্তিগুলোর ব্যাপারে।

প্রথমেই বলেছেন এটি ফরযে কেফায়া অর্থাৎ কয়েকজন করলে সবার পক্ষ থেকে হয়ে যাবে। জানাযাহ এর সালাত যেভাবে হয়ে যায়। দেখুন, জানাযাহ এর সালাত পড়তে হয় কেউ মারা গেলে। এটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে কেউ মারা যায় বলে কারা জানাযার সালাতে অংশ নিলএবং কারা অংশ নিল না তা সহজেই পার্থক্য করা যায় এবং সকলের পক্ষ থেকে আদায় হল কিনা তা বোঝা যায়। কিন্তু দাওয়াতের কাজ সব সময়ের জন্য সব মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য। এটি নির্দিষ্ট সময় বা স্থানের সাথে নির্দিষ্ট নয়।

এখন আপনিই বলুন কে কোথায় দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করছে তার উপর আপনি ভরসা করবেন? পৃথিবীর কোথায় কোন মুসলিম দাওয়াতের দায়িত্ব করছে সেই খোঁজ করবেন না কি নিজেই পালন করা শ্রেয় মনে করবেন? আপনি বলতে পারেন আমার এলাকায় কেউ করলেই আমারও হবে। এতবড় মুম্বাই শহরে কেউ দাওয়াতের কাজ করছে কিনা অথবা অন্য সব মুসলিম দাওয়াতের কাজ করছে এই আশায় বসে আছে তা জানবেন কিভাবে? আবার 'একটি দল' বলে যে আয়াতটি আছে সেখানে 'ফুলটাইম' দাওয়াতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অন্য স্থানে আল্লাহ্ বলেন– "তোমরা উত্তম জাতি, তোমরা মানুষকে সৎ কাজে আদেশ দাও, অসৎ কাজে বাধা দাও।"

এখানে "তোমরা" বা 'কুনতুম' দিয়ে সকলকে বোঝানো হয়েছে। কোন একটি দল নয় বরং পুরো মুসলিম জাতি। তাদের এই উত্তম হওয়ার শর্তই হচ্ছে দাওয়াহ তথা সৎপথে আদেশ ও অসৎ পথে বাধা। এ আয়াতের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? আবার সূরা আসরে আল্লাহ্ বলছেন "সকল মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন।" শুধুমাত্র চারটি দাবী পূরণকারী শ্রেণী ছাড়া।" এ সূরার কি ব্যাখ্যা করবেন।

এরপর আসা যাক হাদীসটির বিষয়ে। হাদীসটির ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন হাদীসটি দ্বারা পাঁচটি ফরজের কথা বলা হয়েছে। আসলে তা নয়। এখানে বলা হয়নি ইসলামের পাঁচটি ফরজ বরং বলা হয়েছে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ বা খুঁটি বা পিলার। হ্যাঁ, এগুলো ফরজ অবশ্যই তবে শুধু পিলারকে আপনি পুরো বিল্ডিং বলতে পারেন না।

বিল্ডিং এর জন্য আরো অনেক কিছু প্রয়োজন। একথা ঠিক পিলার যত মজবুত হবে বিল্ডিং তত মজবুত হবে এবং পিলার শক্তিশালী না হলে বিল্ডিং কোনভাবেই মজবুত করা যাবে না তেমনি একথাও ঠিক শুধু পিলার তৈরী করলেই বিল্ডিং হবে না এবং বসবাস করা যাবে না। অতএব ইসলাম বলতে শুধু ঐ পাঁচটি কাজই নয় আরও অনেক কিছুই করার আছে। আমরা এজন্যই বলেছি দাওয়াহকে অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। অনেকের যুক্তি দেখানোর নামে অযৌক্তিক অজুহাত দেখানোর এই মানসিকতা ও প্রবৃত্তি থেকে বের হতে পারলেই কেবল আমরা এ দায়িত্ব আ াম দিতে পারবো এবং ইহ ও পারলৌকিক জীবনে আমরা সফল হব। আশা করি আর কোন সংশয় আর নেই এ বিষয়ে।

প্রশ্ন : ৩২৭। কোন অমুসলিম মুসলিম হলে তার নাম পরিবর্তন কি অত্যাবশ্যক?

উত্তর : নাম সেটা কেউ মুসলিম আগে থেকেই থাকুন আর নতুন হোন না কেন যদি শিরকের অন্তর্গত হয় তবে জানামাত্র পরিবর্তন করতে হবে। নামের ব্যাপারে

এটাই প্রথম কথা। সাধারণত মুসলিমের নাম শিরক থেকে পবিত্র থাকে। কিন্তু অনেক অমুসলিম থাকে যাদের নাম অর্থের দিক বিবেচনায় শিরক এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ অবস্থায় মুসলিম হওয়ার সময় তার নাম পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। মুসলমানদের নামের নিজস্ব একটি স্টাইল বা সংস্কৃতি আছে। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের নাম দেখেই চেনা যায়। তাই অমুসলিম অবস্থায় যে নাম ছিল তা যদি শিরক দোষে দুষ্ট নাও হয় কিন্তু পূর্বের ধর্ম পরিচয় নাম থেকেই বুঝা যায় তবে পরিবর্তন করাই শ্রেয়।

অনেক আগে আমার কাছে এক নব মুসলিম নারী এসেছিল এক ব্যাপারে আপত্তি নিয়ে। সে অভিযোগ করলো তার নাম রীতা আর পঁচিশ বছর ধরে এ নামে সে অভ্যস্ত। এখন তার এ নামটি ত্যাগ না করলেই কি নয়? আমি বললাম রীতা নাম পরিবর্তন করতেই হবে এমন কোন কথা নেই। আবার পঁচিশ বছর ধরে অভ্যস্ত তাই এটা পরিবর্তন করা যাবে না এটাও কোন কথা নয়। অনেক মেয়ের নামই বিয়ের পূর্বে থাকে তাহমিনা হোসাইন বা খানম কিন্তু বিয়ের পর হয়ে যায় তাহমিনা হক বা খন্দকার এমন অন্য কিছু। তাই বলে কি তারা অসন্তুষ্ট? তাই বলা যায় শিরক দোষে দুষ্ট নাম না হলে তা পরিবর্তন না করলেও চলবে। মহানবী ﷺ এর সময় অনেক সাহাবী (রা)ই তাদের পূর্বনাম ঠিক রেখেছিলেন।

শুধুমাত্র পৌত্তলিকতা বা শিরক দোষে দুষ্ট নামগুলোই পরিবর্তন করতে হবে। এমন অনেক আরব অমুসলিম আছে যাদের আরবী নামের কারণে মনে হয় যে সে বুঝি মুসলিম। অথচ সে অমুসলিম। এ কারণে নামের অর্থটাই প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিৎ। তবে ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে নাম পরিবর্তন যদি জীবনের জন্য হুমকি বিবেচিত হয় তবে তাৎক্ষণিকভাবে সেটা না করাই শ্রেয় যদিও নামটি পৌত্তলিকতা বা শিরক মিশ্রিত হয়। দেখুন নাম পরিবর্তন না করলে হবে বলবে না এমন কথা আমরা বলতে পারি না। আল্লাহ্ বলেছেন– "আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তোমরা তা হারাম কর না।" এতে বোঝা যায়, অনেকেই অনেক বৈধ বিষয় কঠিন করে ফেলে অবৈধ ভাবতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ এটি নিষেধ করেছেন এমতাবস্থায় পূর্বের নাম রাখা ঠিকই হবে না এটা বলা কোনভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে ইসলামী ভাবধারা সম্পন্ন নাম রাখলে ক্ষতি নেই বরং তা আনন্দের। আল্লাহ্ এ জন্য পুরস্কৃত করতে পারেন।

প্রশ্ন : ৩২৮। আমরা সময়ের শেষ প্রান্তে এসে গেছি। সম্ভবতএটিই শেষ প্রশ্ন যদি নতুন আর কোন প্রশ্ন না করা হয়। শেষ প্রশ্নটি হচ্ছে কিভাবে আমরা আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি?

উত্তর : এখন যে প্রশ্নটি করা হয়েছে তার উত্তর আরেকটি লেকচার দাবী করে। এ বিষয়ে "কোরআন কি আল্লাহ্র বাণী" এই লেকচারে বিস্তারিত বলা হয়েছে? এখান

থেকে বিস্তারিত উত্তর পাওয়া যেতে পারে। তবে এখন আমরা সংক্ষেপে বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দেব। প্রথমত আমরা নাস্তিককে ধন্যবাদ জানাতে পারি। অনেকেই এটা শুনে আশ্চর্য হতে পারেন যে নাস্তিককে আবার কিভাবে ধন্যবাদ জানানো যেতে পারে? দেখুন, যে শিরক করে তার নিকট এক আল্লাহ্র বাণী পৌঁছাতে হলে প্রথমে অন্যান্য বিধাতার অসারতা প্রমাণ করতে হয় এরপর আল্লাহ্র একত্ববাদের ধারণা তাকে বিশ্বাস করতে হয়। এখানে কাজ দুটো অন্যান্য কল্পিত বিধাতার অসারতা প্রমাণ করা এবং এরপর আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু যে নাস্তিক সেতো "কালেমাহ" এর প্রথম অংশ لَا اِلٰهَ বা "কোন ইলাহ্ বা উপাস্য নেই" এটুকু মেনে নিয়েছে। এখন বাকীটুকু اِلَّا اللّٰهُ বা "আল্লাহ্ ছাড়া" এটুকু বিশ্বাস করাতে হবে। অর্থাৎ কালেমা'র প্রথম অংশ বিশ্বাস করে এখন দ্বিতীয়াংশ বিশ্বাস করানোই আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব।

ঠিক আছে নাস্তিককে প্রশ্ন করুন কোন দ্রব্য এখনও বাজারে আসেনি বা নতুন আজকেই আসলো। এ দ্রব্য বা পন্য সম্পর্কে কে বেশী জানবে? অবশ্যই দ্রব্য বা পণ্যটি নির্মাতা বা উৎপাদনকারী। এরপর আস্তে আস্তে সরবরাহকারী, মেরামতকারী এবং আরও পরে ব্যবহারকারী এটা সম্পর্কে জানবে। কিন্তু নির্মাতা বা উৎপাদক বা উদ্ভাবক যত বেশী জানেন অন্য কেউ ততটা বেশী জানেন না। হ্যাঁ আপনি নাস্তিকের নিকট প্রশ্ন করে এ উত্তর তার নিকট থেকেই জানবেন।

এবার আপনি সামনে অগ্রসর হোন। তাকে আবার প্রশ্ন করুন এবং বিশ্বজগৎ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে? তিনি হয়তো বলবেন "বিগব্যাং থিওরির কথা। বিগব্যাং থিওরির বর্ণনা অনুযায়ী মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহের মধ্যে বিশাল বিস্ফোরণের মাধ্যমে এ পৃথিবীর সৃষ্টি। আপনি এবার তাকে বলুন এ মহা বিস্ফোরণ সম্পর্কে মানুষ কবে জানতে পারে? এইতো বলতে গেলে গতকালই। ১৯৭৩ সালের দিকে এ তত্ত্বটি আবিষ্কার করা হয়। অথচ এ ধরনের মহা বিস্ফোরণের কথা পবিত্র কোরআনে ১৪০০ বছর আগেই বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সূরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে চোখ বুলান। সেখানে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেন–

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاۤءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থ: যারা অবিশ্বাসী তারা কি দেখে না যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী উভয়ে একাকার ছিল, তারপর আমরা তাদের দু'টিকে বিচ্ছিন্ন করে দিলাম, আর পানি থেকে আমরা সৃষ্টি করলাম প্রাণবন্ত সবকিছু? তারা কি বিশ্বাস করবে না?

বিজ্ঞান যা গতকাল আবিস্কার করেছে কোরআন তা চৌদ্দশত বছর আগে প্রমাণ করেছে। বাতলে দিয়েছে পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য। আসলে এটা কি কোন মানুষের লেখা হতে পারে? অবশ্যই না, পৃথিবীর রাতদিনের বাড়া কমার রহস্য বা জমিনের স্ফীত হওয়ার রহস্য এটি মানুষ জানতে পেরেছে সর্বোচ্চ দু'শত বছর পুর্ব থেকে অথচ আল কোরআন ১৪০০ বছর আগেই তা বর্ণনা করেছে। আল-কোরআনের সূরা লুকমান ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ ঘোষণা দেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۔

অর্থ: "তুমি কি দেখ না যে তিনি রাতকে দিনের মধ্যে আর দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান। আর চাঁদ ও সূর্যকে যিনি করেছেন অনুগত। প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বিচরণ করে।"

তাহলে চন্দ্র ও সূর্যের গতিপথ ও গতিপথ যে নির্দিষ্ট তা আল্লাহ্ কোরআনে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বলে দিয়েছেন। আর আমরা এই সেদিন এটা প্রমাণিত হয়েছে বলে জেনেছি। সূরা জুমার ০৫ নং আয়াতে বর্ণনা করেন–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۔

অর্থ: "তিনি রাতকে দিনের উপর ছাউনি বানান আর দিনকে ছাউনি বানান রাতের উপর। চাঁদ ও সুরুজ কার বশীভূত? প্রত্যেকেই তাদের গতিপথে ধাবিত হচ্ছে।"

তাহলে চন্দ্র ও সূর্যের গতিপথ যে নির্ধারিত যা আমরা এই সেদিন বিজ্ঞানের মাধ্যমে জেনেছি অথচ পবিত্র কোরআন দেড় হাজার বছর আগেই সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। এছাড়া সূরা নাজিয়া এর ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বর্ণনা করেন–

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ۔

অর্থ: "তিনি পৃথিবীকে প্রসারিত করেছেন।"

পৃথিবী এই যে সৃষ্টি রহস্য তা আমরা এখনও অনুসন্ধানে ব্যস্ত। অথচ তা হলো সূর্যের আলো চাঁদের উপর প্রতিফলিত হয় মাত্র। এ ব্যাপারটি কোরআনের বর্ণনায় এসেছে– সূরা ফুরক্বান এর ৬১ নং আয়াতে–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا ـ

অর্থ: "মহান আল্লাহ্ মহাকাশে সৃষ্টি করেছেন তারকারাজি। আর তাতে বানিয়েছেন এক প্রদীপ ও এক চন্দ্র। আর চন্দ্রতো দীপ্তিদায়ক।"

দেখুন, আল্লাহ্ চাঁদের ব্যাপারে বলেছেন এটি "মুনির" অর্থাৎ অন্যের আলোকে আলোকিত। এই যে প্রতিফলিত আলোর কথা বলা হয়েছে এটি দেড় হাজার বছর আগে কে কল্পনা করেছে? তাহলে কোরআন অবশ্যই মানব রচিত নয়। আসুন আরও এমন অনেক বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের কথা জেনে নিই যা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে অথচ মানুষ প্রমাণিত করেছে সেদিন।

চন্দ্র-সূর্যের এই যে কোটেশন বা ঘূর্ণন পথ তা আমরা ২ শত বছর আগে জেনেছি অথচ পবিত্র কোরআনে সূরা আম্বিয়া ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা পরিস্কার ভাষায় বিধৃত করেছেন। তিনি বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থ: "আর তিনিই সেই জন যিনি রাত ও দিনকে এবং চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন। সব ক'টি কক্ষপথে ভেসে চলে"।

এভাবে কক্ষপথে ভেসে চলার বিষয়টি কোরআনের পূর্বে কে বলতে পেরেছে?

একই সূরায় ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ـ

অর্থ: "আর পৃথিবীতে আমরা পাহাড় পর্বত স্থাপন করেছি"

পৃথিবীকে স্থিতিশীল রাখতে পাহাড় পর্বতের এ ভূমিকার কথা, প্রয়োজনীয়তার কথা কোরআনের পূর্বে আর কার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে?

সূরা ইয়াছিনের ৩৮–৪০ নং আয়াতে ও আল্লাহ্ চন্দ্র সূর্যের গতিপথ নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। এত বিষদভাবে এই বিজ্ঞানসিদ্ধ বার্তাগুলো আর কে কোরআনের পূর্বে বলেছে?

সমাপ্ত